সাহিত্যে নারী : স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী কর্তৃক প্রদত্ত লীলালেক্‌চারস্‌ ১৯৪৪

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ছয় টাকা

JUNE 1949.

৪০৫৬ (১৩)
STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA.
১১.২.৬০

Printed by K. V APPAROW,
at the Metropolitan Ptg. and Pblg. House, Ltd.
90 Lower Circular Rd., Calcutta.

উৎসর্গ

আমার পুত্র

৺অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

এম্, এ (পাটনা) এম্, এ, (কলিকাতা)

পি, আর, এস, বি, এল

কে

মা

নিবেদন

সুদীর্ঘকাল কাগজের অভাবের অজুহাত এবং দুই বৎসর মুদ্রাযন্ত্রের অধীনে থাকার পর এতদিনে "সাহিত্যে নারী" মুক্তি লাভ করলো, কিন্তু যে দু'জন এর প্রধান পাঠক ছিল, এই দীর্ঘকালে তাদের আমি হারিয়েছি, সে ক্ষতি আমার পক্ষে অপূরণীয়। একজন আমারি পুত্র অম্বুজ, অপর আমার ভাই বিশ্বনাথ ফণ্ডের প্রেসিডেণ্ট, বর্ত্তমান এডুকেশন সম্পাদক নীরবকর্ম্মী প্রগাঢ় পণ্ডিত আমার ভ্রাতা বটুকদেব মুখোপাধ্যায়, এম্, এ। সুধীবৃন্দের সহানুভূতি লাভ সমর্থ হ'লে আমার শ্রম সার্থক হ'বে।

পরম স্নেহাস্পদ সুলেখক ও সুবিদ্বান প্রভাত মোহনের আপ্রাণ সহায়তা না পেলে এ বই কোনদিনই লেখা হ'ত না।

১৩৫৬ লেখিকা

সাহিত্যে নারীঃ স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত রণেন্দ্র মোহন ঠাকুর ও শ্রীমতি সুলাজিনী দেবীর একমাত্র কন্যাসন্তান এবং আশুতোষ চৌধুরীর পুত্রবধূ ও আর্য্যকুমার চৌধুরীর পত্নী লীলা দেবীকে প্রথম দেখি মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় তাঁর একটী আলোকচিত্রের মধ্য দিয়ে। চিত্রটির নাম করণ করা হয়েছিল, "শিল্পী"।

রূপের পূজারী জগতে কে' নয়? মানুষ থেকে ক্ষুদ্র পতঙ্গেরাও মৃত্যুরূপী অগ্নিশিখার রূপে আকৃষ্ট হয়ে আত্মোৎসর্গ করে। ঐ ছবি যদি চিত্রকরের কল্পনা প্রসূত চিত্র হ'ত, অতটা আকর্ষণীয় হত'না, ফটো-চিত্রটী এতই আকর্ষণীয় যে তার পরিচয় না জেনে স্থির থাকা গেলনা। "ভারত-বর্ষের" কল্যাণে তাঁকে নানান ভাবাভিব্যক্তিতে আমরা মধ্যে মধ্যে দেখতেই পেতাম। কখনও "প্রতীক্ষা পরায়ণা," কখনও "উপাসিকা," কখনও "পূজারিণী" এই সকল লীলা-সুন্দর অবস্থানে মূর্ত্তিগুলি সুন্দরতর হয়ে উঠেছিল। ঐ চিত্ররূপ দেখতে আমার অত ভাল লাগার মধ্যের একটা নিগূঢ় কারণও অবশ্য বর্ত্তমান ছিল। আমার প্রিয় বন্ধু বেলার (রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা ৺মধুরীলতা) সঙ্গে ওঁর মুখের বেশ একটুখানি সৌসাদৃশ্য ছিল, হয়ত সেই জন্যই ভিতরে ভিতরে ঐ চিত্র-কন্যাটি আমায় একটু বিশেষ ভাবেই আকৃষ্ট করে থাকবে। তারপর লীলা দেবীর সঙ্গে আমার বহুবার দেখা সাক্ষাৎ ঘটেছে। প্রথম দেখা হয় স্নেহাস্পদা প্রীতিলতা কাঞ্জিলালের বাড়ীতে। বেলারই মত মিষ্ট স্বর, আমার লেখা উপন্যাস সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন সে কথাও বল্লেন।

সঙ্গীত সম্মীলনীতে আমারই লেখা "সাগরিকার" অভিনয় দেখতে গিয়ে এবং পরে আরও ঐ রকম কয়েক স্থানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। ওঁর ছবি দেখে দেখে আমার মনে ওঁর সুন্দর মূর্ত্তিটি যে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল, তাই প্রথম দিনে দেখেই ওঁকে চিনতে আমার বাধেনি। পরে যেখানেই দেখেছি, সহস্রের মধ্যে ঐ দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। একটা কেমন যেন স্নেহ পড়ে গিয়েছিল। ছবি মানুষের কতটুকুই বা পরিচয়, মানুষ তার অনেকখানি উপরে, একথা সত্যি হ'লেও একটি বিষয়ে লীলা দেবীর ছবির সঙ্গে লীলা দেবীর বিশেষ একটা সাদৃশ্য বেশ দেখতে পাওয়া যেত, সেটা তাঁর চিত্রের মতই প্রশান্ত নিরবতা। কথা তিনি খুবই কম কইতেন, শুধু তাই নয়; চোখের দৃষ্টিতেও কেমন যেন একটা সুদূর নিরাসক্ত উদাসীনতা;—যা'তে করে তাঁকে খুব বেশী নিকটে টানবার ভরসা হয়না, ঈষৎ সম্ভ্রমের সঙ্গে নীরবে প্রতীক্ষা করতে হয়। অথচ আমি তাঁর থেকে যতটা দূরের মানুষ, কতটুকুই বা আমাদের দেখাশোনা, আশ্চর্য্য হই যে, সে হিসাবে আমি তাঁকে নিকটবর্ত্তী করে নিয়েছিলুম। কোথায় যেন মনের গহন-গুহায় নিহিত একটা মানসিক সাদৃশ্য থাকে, কর্ম্মবন্ধন থাকে, মানুষের অবচেতন মনের তলায় কি যে কখন চাপা পড়ে থাকে, সব সময় সেটা স্পষ্ট ক'রে বলা যায়না, নিজেই শুধু অনুভব করা চলে। প্রিয়তরের সাদৃশ্য এবং ওঁর ঐ নিস্পৃহ ঔদাস্য ঐ দুটো জিনিষে মিলে আমার তখনকার ভাবপ্রবণ মনকে হয়ত অতটাই উনি আকর্ষণ করে থাকবেন। ওঁর মধ্যে সংসার বহির্ভূত একটা ভাব-দ্যোতনা দেখতে পেয়েছিলাম। ভাব প্রবণদের মনের গঠনতো একটু সৃষ্টি ছাড়া হয়েই থাকে! এমনও হয়েছে, তাঁর হাসি এবং কথায় অকস্মাৎ আমার চির অপগতা প্রিয় বান্ধবীকে আমি যেন দেখতে পেয়েছি। তাই যেখানে দেখা হয়েছে, লীলা দেবীকে চোখ থেকে সরাতে পারিনি। তাঁকে শেষ দেখেছি নদীয়ার রাজবাটীতে। পূর্ণিমা দেবীর বিবাহের প্রীতি ভোজনে। প্রথম দেখেই

চমকে উঠেছিলুম। নিরঞ্জনের পর দেবী প্রতিমার দিকে চাইলে মনের মধ্যে যে ভাব আসে, ঠিক সেই রকম মনোভাব নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম। সেই লীলাই বটে, অথচ সেই প্রথম দৃষ্ট ছবির মত, বিসর্জনের প্রতিমার মত, দেহে যেন ওঁর প্রাণ নেই! জীবনে সমস্ত পেয়েও যিনি জীবনে শান্তি পাননি, যেন সেই সমস্ত সুখ ও দুঃখ থেকে বিমুক্ত হয়ে তাঁর অন্তরাত্মা ভবভূতির সীতার মতই ছায়াময়ী রূপে মর্ত্ত্যধামে বিচরণ করছেন, কায়াময়ী লীলা যেন সে প্রতিমার মধ্যে নেই। সেই স্তব্ধ নীরব মূর্তিটার পাশে ব্যথাজড় চিত্ত নিয়ে বহুক্ষণ নীরবে বসে রইলেম, সেদিনের আনন্দোৎসবে আর ভাল করে যোগ দিতে পারলেম না। কিছুকাল পরে যখন সংবাদ পত্রে "বিজয়াদশমীর" সংবাদ পেলেম খুব বেশী আশ্চর্য্য হইনি। সেই দিনই দেখেছিলেম বিসর্জন তাঁর হয়েই গেছে! নিরাসক্ততার চরমে পৌছে মানুষ বেশী দিন বাঁচতে পারেনা। একমাত্র সন্তান হারা জনক জননীর ব্যথা অন্তরে অনুভব করে বারে বারেই চোখ মুছেছিলেম। মনে মনে লীলাকে আশীর্বাদ করেছিলেম, "এই নব জীবনে তুমি চির শান্তির অধিকারিণী হয়ো"।

ধর্মতত্ত্বের মতই কর্মতত্ত্ব বড় সূক্ষ্ম, আমরা আজও তার হিসাব মিলাতে শিখিনি। তখন স্বপ্নেও জানতেম না যে আমার সেই গোপন আকর্ষণ আজ প্রত্যক্ষ হয়ে তাঁর জীবন স্মৃতির সঙ্গে আমার নামকে একত্র বিজড়িত করে আমাকেই তাঁর প্রথম স্মৃতি পূজা করাবে! লীলা দেবীর বাহ্য-রূপই নয়; মধুর শান্ত স্বভাবই নয়; তাঁর অন্তরের সমুজ্জ্বল কবি-প্রতিভা, সাহিত্য সাধনার প্রতি একান্ত অনুরাগ, সকল দিক দিয়েই তাঁর জীবনটিকে নারী সুলভ সৌকুমার্য্যে মণ্ডিত করেছিল। এতটা দেবদত্ত ঐশ্বর্য্যের একত্র সমাবেশ প্রায় দেখা যায়না, অথচ আশ্চর্য্য এই যে, জগতে এ জিনিষের ও সমুচিত মূল্য দিতে মানুষ পেরে ওঠেনা! তাঁর "ধ্রুবা" "রূপহীনার রূপ" উপন্যাস দু'খানির মর্মকথা বড় করুণ ও হৃদয় স্পর্শী। পড়তে পড়তে ভাঙ্গা বুকের একটী অতি করুন কান্নার

অস্ফুটগুঞ্জন শুনতে পাওয়া যায়। এবার পরিণাম যেন আমাদের মনে সবিস্ময়ে এই প্রশ্ন জাগায়; এ কল্পনা না দূরদৃষ্টি? এমন একটি সৌন্দর্য্য সুষমামণ্ডিত ভাব বিকশিত সুন্দর জীবন যেন অকরুণ ভাগ্য দেবতার অনেকখানি হেলা ফেলায় অকালে নষ্ট হয়ে গেছে, একথা মনে হলে দুঃখ বোধ করা যায় না। ফুটন্ত পদ্মটিকে টেনে তুলে ছিঁড়ে ফেলা হলো, ভাল করে বিকশিত হতে দিলেন না, এই বলে অকরুণ বিধাতাকে নিন্দা করতে ইচ্ছা করে। কবি রজনী কান্তের এই বিলাপ বাণীটি কানে ভেসে আসে;—

"ফুটিতে পারিত গো ফুটিলনা সে,
নীরবে ঝরে গেল, অকালে মরে গেল,
প্রাণ ভরা আশা সমাধি পাশে।"

উপন্যাসের মধ্যে এবং কবিতা পুস্তক 'কিশলয়ে' লেখিকার যে পরিচয় পাওয়া যায় সেইটাই তাঁর সুস্পষ্ট পরিচয় পত্র। জগতের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখকে নাড়া চাড়া করতে করতে অবশেষে সহসাই যেন জগদতীতের পদপ্রান্তে স্থান গ্রহণ করতে পেরেছেন। যেমন "শিল্পীর" মডেল থেকে "প্রতীক্ষা কারিণী" এবং তার পরেই হঠাৎ "পূজারিণী" "উপাসিকায়" পরিণতা হয়েছিলেন!

"কেন তাড়াতাড়ি কাজ সারা আর—
নাই উদ্দাম প্রাণের ঢেউ,
মোর তরে আজ অধীর আবেগে—
পথ চেয়ে আর রাইত কেউ।"
"নিভে যায় শোকানল কালের মায়ায়,
স্মৃতির আগুন কভু নে'ভেনা ত হায়!"

"প্রতীক্ষিতার" বুকভাঙ্গা বিলাপমর্ম্মর পার হয়ে এসে যেখানে আমরা শুনতে পেলেম

"গাঁথবনা আর আমার মালা, বাঁধবনা না আর প্রেমের গান,
ভরবনা না আর ফুলের ডালা, রাখবনা মান অভিমান।"

যেখানে শুনি ;—

"সোনার নূপুর রতন কেয়ূর এ সব তোরা নে'রে নে'
ফুলের মালা তাবিজ বালা আধেক গাথা সেরে নে'।"

তখনি মনে পড়ল এই জিনিষটিই সেই সুশান্ত মুখে ফোটবার জন্ম প্রতীক্ষিত হয়েছিল। তাঁর মুখের যে ভাবটি আমায় সত্য করে আকৃষ্ট করেছিল, সেত শুধু তাঁর বাইরের রূপই নয়, সে বস্তুটি তাঁর এই নিস্পৃহভাবটুকু। তাঁরই কথায় বলি ;—

"ত্যাগের মাঝে যে সুর বাজে, মধুর সে যে সুমধুর,
ভোগের ক্ষণে সেই মাধুরী, তিক্ত বিরস বিহীন সুর।"
"অবহেলায় আপন জনে যতই আমায় ছাড়ে,
ততই আমার তোমার দিকে আরো যে টান বাড়ে,"
—এবং—"বিলাব আমারে বিলাব,
সুরভি অধীর অনিলের সম, দিক্‌দিগন্তে মিলাব।"

অথবা—

"রেখো নিপীড়ন নির্য্যাতনেও অটুট ধৈর্য্য তপস্বিনী,
হে ললনা! তব ললিত বিলাসে
ত্যজি হও দৃঢ় ওজস্বিনী।"

এর আর একটু উপরের ভাবে তিনি বলেছেন :—

"আমার যা' কিছু রাখিনাই বাকি! ফুরায়ে দিয়েছি দানে,
বিলায়ে দিয়েছি ছড়ায়ে দিয়েছি হারায়েছি প্রাণে প্রাণে।"

ধাপে ধাপে সুরগ্রাম ক্রমশঃই চড়ে উঠ্‌ছিল। ত্যাগমন্ত্র দীক্ষিতা "শ্রমনীর"—অজস্র ভোগের মধ্যবর্ত্তিনী—উদাসিনীর মধ্যে একদা যেটা অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন ছিল, তারই ক্রমশঃ পরিস্ফুরণ হয়ে চলেছে! কার জীবন কিসের জন্ত সৃষ্ট, কিসের মধ্যে দিয়ে কে' জীবনের কোন পরিণতি

প্রাপ্ত হবে, কে' তা' বলতে পারে? আমাদের চক্ষে সংসারের সুখটা যত বড়, ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা তা' স্বীকারই করেন না। তাঁদের মতে "নাল্পে সুখমস্তি।" তাঁদের চরম উপদেশ;—"আত্মানং বিদ্ধি।" আপনাকে জানো। আত্মার সাক্ষাৎকার তো সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে মেলে না। এই ক্ষুদ্র "লীলা পরিচয়" আমি তাঁর জীবন এবং কল্পনার মধ্য থেকে যে ভাবে গ্রহণ করতে পেরেছি, সংক্ষেপে সেইটুকুই জানালাম। গভীর রহস্যময় একটী মানব-জীবনের সম্যক্ পরিচয় এত অল্পের মধ্যে দেওয়া যায় না। ক্ষুদ্র লীলা-সাহিত্যের একমাত্র প্রাণের কথাটি শুধু যে তাঁর সকল কল্পনার মধ্য থেকে ব্যক্ত হতে চেয়েছে সেই সকলের বড় কথাটি তাঁরই বাণী থেকে আমার শেষ কথা রূপে গ্রহণ করলেম। ভক্তের ভক্তি-সাধনার যে এখানেই চরম পরিণতি;—

"কি কাজ জানিয়া তার ঐশ্বর্য্য বিভব
শুধু আমি জানি তার, সে আমার সব।"

সাহিত্যে নারী : স্রষ্টী ও সৃষ্টি

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

মানুষের জীবনকে প্রধানতঃ দু'টো ভাগে ভাগ করা যায় ; একটা দৈবায়ত্ত, আর একটা তার নিজায়ত্ত। প্রথমটাতে সে অন্যান্য ইতর জীবের মতো প্রকৃতির অধীন, প্রবৃত্তির দাস, জন্মায় মরে, খায় ঘুমোয়, সুখে হাসে, দুঃখে কাঁদে। দ্বিতীয়টাতে সে প্রকৃতির নিয়ন্তা, প্রবৃত্তির প্রভু, বিজ্ঞানের সাহায্যে সিন্ধু-পর্বত দেশকালের ব্যবধান দূর করে, বহ্নি-বিদ্যুৎকে আজ্ঞাবহ করে, মরু, মারী, শীতাতপ এবং শত্রু জয় করে, আকাশে ওড়ে, পাতালে ঢোকে : দর্শনের সাহায্যে জীবাত্মা পরমাত্মার, ইহ-পরলোকের গভীর রহস্যের সন্ধান লাভ ক'রে, রোগ, রিপু, শোক, মালিন্যের ঊর্দ্ধে উঠে শান্তি লাভ এবং অনেকের মতে মুক্তি লাভও করে। সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের সাহায্যে বাস্তব জগতের সহস্র দুঃখদৈন্যের মধ্যে দেশকাল নিরপেক্ষ অবাস্তব আনন্দলোক রচনা ক'রে, অপার্থিব সুখৈশ্বর্য উপভোগ করে, নিঃসঙ্গ অবস্থায় সঙ্গী লাভ করে, অজ্ঞান অবস্থায় জ্ঞানদাতা গুরু লাভ করে, অতীতে ভবিষ্যতে স্বদেশে বিদেশে স্নেহপ্রীতির নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করে। মানবসভ্যতার আদিযুগ থেকে মানুষে পশুতে এই পার্থক্য লক্ষিত হ'য়ে আসছে। পশু অন্নেই সন্তুষ্ট, মানুষ অন্নে সন্তুষ্ট নয়। প্রাচীন ভারতের ঋষি যে-দিন বলেছিলেন, "নাল্পে সুখমস্তি-ভূমৈব সুখং" সে-দিন পৃথিবীর সবদেশের সর্বমানবের অন্তরের কামনাই তাঁর কণ্ঠে বাণীরূপ গ্রহণ করেছিল। পশুপাখীর মতো শুধু খেয়ে ঘুমিয়ে মানুষ তৃপ্তি পায় না, বাঁচতে পারে না। আম-মাংসাশী আদিম আরণ্যকও নাচে গায়, গল্প বলে, ছবি আঁকে। নিজের সৃষ্ট যে-সব ঐশ্বর্যে মানুষ

অন্যতম পশু হ'য়েও তার পশুত্বকে অতিক্রম করে দেবত্বের দিকে অগ্রসর হয়েছে, সাহিত্য তাদের মধ্যে উচ্চতম ;—এক কথায় বলতে গেলে সাহিত্য মানবসভ্যতার মুকুটমণি। সাহিত্য বিভিন্ন জাতির অতীত সংস্কৃতির বাহন এবং ভবিষ্য সংস্কৃতির জনক।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই সভ্যতার সর্বনিম্নস্তরে শিল্পের পরেই সাহিত্য দেখা দিয়েছে। ছড়া, বচন, গাথা, রূপকথা, ব্রতকথা, মন্ত্র প্রভৃতি আদিযুগের লোকসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করলে আর একটা সত্য স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, এই সব গ্রাম্য-প্রাকৃত সাহিত্যের অধিকাংশই নারীর রচনা অর্থাৎ পৃথিবীর সকল দেশে আদিযুগে সাহিত্যের সূত্রপাত এবং ভিত্তি স্থাপন হয়েছে নারীর হাতে। মানব সভ্যতার ঊষাকালে বর্বরপুরুষ যেদিন বনে বনে শিকার ক'রে বেড়াত, শত্রু এবং হিংস্রজন্তুর আক্রমণভয়ে আত্মরক্ষার উদ্যোগে এবং আহার্য সংগ্রহের চেষ্টায় যে দিন তার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হ'ত, সেদিন গৃহকর্মরতা নারী ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে শিশুকে ঘুম পাড়াত, অতীতের বীরত্বগাথা গেয়ে মৃগয়া প্রত্যাগত স্বামীপুত্রের অবসর বিনোদন ক'রত, প্রিয়জনের কল্যাণ এবং অপ্রিয়জনের অকল্যাণকর কামনায় তুকতাক তন্ত্রমন্ত্র এবং তরু-প্রস্তর, দেবতা-অপদেবতার পূজামন্ত্র রচনা ক'রত। বিভিন্ন দেশে পুরুষ নারীর প্রদর্শিত পথে চলে ক্রমে ক্রমে সাহিত্যক্ষেত্রে ভাষায় ও শিল্পনৈপুণ্যে এবং ভাবের গভীরতায় তাকে অতিক্রম করেছে, এ কথা আদৌ অস্বীকার করা যায় না, তবু সেই সঙ্গে এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, নারীর দান সাহিত্যক্ষেত্রে উপেক্ষণীয় নয়। আজও অধিকাংশ দেশের লোকসাহিত্য, পৃথিবীর সাহিত্যের শতকরা নব্বই অংশ যার অন্তর্গত, তার রচনাগৌরব অধিকাংশক্ষেত্রেই নারীর প্রাপ্য। অভিজাত সাহিত্যেও পদলালিত্য, ব্যঞ্জনা, অর্থগৌরব কোনোদিক দিয়েই নারীর রচনা পুরুষের চেয়ে খুব বেশী পিছিয়ে নেই, অতীতেও ছিল না।

দেশ ভেদে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে নারীর সাহিত্যিক প্রতিভা বিভিন্ন যুগে প্রশংসিত অথবা অবজ্ঞাত হয়েছে, কখনও সম্যক স্ফূর্তি পেয়েছে, কখনও অবরুদ্ধ এবং অপ্রকাশিত থেকে গেছে। বিভিন্নদেশে পুরুষের স্বাধীনতার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্বাধীনতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে, উদারতা অনুদারতা সমাজে বেড়েছে কমেছে, সংস্কৃতির মান উঠেছে নেমেছে। কোনোযুগের নারীর বহু রচনা সাহিত্যক্ষেত্রে অমর হ'য়ে আছে, আবার কোনোযুগের নারীর অধিকাংশ রচনা বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেছে। যুগভেদে একই দেশে নারী বেদমন্ত্র রচনা করেছে, অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছে, আবার লেখাপড়া শিখলে নারী বিধবা হয়, এত বড় কুসংস্কারের কথা নিজেরাই প্রচার ও বিশ্বাস করেছে। আত্মপ্রচারে কুণ্ঠা, অন্তঃপুরের অবরোধ, গৃহকর্মের অবসরাভাব এবং সামাজিক নানাবাধার জন্য বহু সুসাহিত্যিকা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভার উপযুক্ত পরিচয় রেখে যেতে পারেননি। পুরুষের পক্ষপাতিত্ব এবং নারীর সহজ সংস্কার দুই-ই অল্পাধিক পরিমাণে এ ক্ষেত্রে নারীকে বাধা দিয়েছে। তার কর্মক্ষেত্রের পরিধির ক্ষুদ্রতা মোটের উপর তা'র দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করেছে, তার চিন্তাশক্তিকে খর্বীকৃত করেছে,তাই পৃথিবীর মহাকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে নারীর স্থান হয়নি; কিন্তু তার প্রকৃত কারণ শক্তির অভাব, না সুযোগের অভাব, তা' নিয়ে মতভেদ আছে, সে তর্কের মীমাংসা কোনোদিন হবে কি না সন্দেহ! কারণ যাই হোক কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই শ্রুতি-স্মৃতির যুগ থেকে মুদ্রাযন্ত্রের যুগপর্য্যন্ত নারীর সাহিত্যসৃষ্টি কোনোদিন বন্ধ হয়নি। কখনো অম্ভৃণ ঋষিকন্যা বাগ্‌দেবীর কণ্ঠে সে নিজেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রী ব'লে ঘোষণা করেছে, কখনো মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে অমৃতত্বের পিপাসায় পার্থিব ঐশ্বর্যকে ধিক্কার দিয়েছে, কখনো বিদুলা, দ্রৌপদীর কণ্ঠে, দুর্গাবতী, চাঁদবিবি, সরলাদেবী, মাদাম চিয়াং-কাইশেক, সরোজিনী নাইডুর কণ্ঠে পদাহত কাপুরুষকে রণ-হুঙ্কারে জাগিয়ে তুলে পৌরুষে উদ্দীপিত করেছে, কখনো শীলা, বিজ্জা, মারুলা, মোরিকা

মিসেস ব্রাউনিং, জেন অস্টেন, চন্দ্রাবতী এবং সেল্‌মা গ্রাংসিয়া প্রমুখ বহু আধুনিক নারীর রচনায় মানুষের ছোটো খাটো সুখদুঃখ প্রণয়বিরহ আশানিরাশার মনোহর ছবি এঁকে গার্হস্থ্য জীবনের দুঃখকে সহনীয় সুখকে মোহনীয় এবং অবসরকে লোভনীয় করেছে। গৃহকর্মের দায়িত্ব একদিকে যেমন নারীর সাহিত্যসৃষ্টির বাধাস্বরূপ হয়েছে, তেমনি জীবিকা অর্জনের দুশ্চিন্তা এবং দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে মধ্যযুগে,—এমন কি বর্তমান যুগেও বহু নারী সাহিত্যসৃষ্টির সুযোগ লাভ করেছেন এবং করছেন, এমন কি ধনী এবং মধ্যবিত্ত ঘরের বহু নারী পুরুষের চেয়ে সাহিত্যচর্চার সুযোগ এবং অবসর বেশী পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। অনতিকাল পূর্বেও সাহিত্যসৃষ্টিকে জীবিকা অর্জনের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করা নারীর পক্ষে অসম্ভব ছিল, তাই একদিকে শাণিতভাষার নৈপুণ্যে যেমন নারী পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করতে পারেননি, তেমনি অপরদিকে কৃত্রিমতা, চাটুবাদ প্রভৃতির অভাবে নারীর রচনা সরসতায়, তীক্ষ্ণতায় এবং মাধুর্যে পুরুষের রচনাকে অনেকক্ষেত্রে অতিক্রমও করেছে, ব্যবসাদারী বুদ্ধি তার রচনার সহজ সারল্যকে বিড়ম্বিত করেনি। যেখানেই এর ব্যতিক্রম হয়েছে, অর্থাৎ রাজসম্মান এবং অর্থ যেখানেই নারীর রচনাকে সম্মানিত করেছে, সেখানেই অবশ্যম্ভাবী দোষ এবং গুণ, ভাষানৈপুণ্য এবং ভাবের অসারল্য দেখা দিয়েছে, এ বিষয়ে অতীতে বর্তমানে কোনো প্রভেদ দেখা যায় না।

পৃথিবীর নারী রচিত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে বসে একটা কথা প্রথমেই আমাদের স্বীকার ক'রে নিতে হবে, বিভিন্নদেশের লোকসাহিত্যের অজ্ঞাতনাম্নী রচয়িত্রীদের পরিচয় আমরা কিছুই জানি না। যে-সব রচনা ইটে, পাথরে, প্যাপাইরাসে, চামড়া বা কাগজে লিখিত হ'বার সৌভাগ্য লাভ করেছিল, অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত সমাজে খ্যাতি লাভ করেছিল, তার অধিকাংশই ধর্মবিপ্লবে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, প্রাকৃতিক

বিপর্যয়ে বিনষ্ট হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, সেই সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি বাদ দিয়ে যে ক'টি রচনা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, তাই নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

যাঁরা সাহিত্যসৃষ্টি করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন ধর্মপ্রাণা সাধিকা, কেউ ছিলেন চিন্তাশীলা দার্শনিকা, কেউ ছিলেন রসজ্ঞা কবি, কেউ ছিলেন সিংহবীর্যা বীরনারী, কেউ ছিলেন সুপণ্ডিতা, কেউ ছিলেন অক্ষরজ্ঞানবিহীনা। তাঁদের রচনার উদ্দেশ্য বিভিন্ন; প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন; কেবল এক জায়গায় তাঁদের মিল আছে; তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের বক্তব্যকে বাঙ্ময়ী মূর্তি দিয়েছেন, তাঁদের বাণীকে সর্বমানবের উত্তরাধিকার রূপে রেখে গেছেন। তাঁদের কারো রচনা পাওয়া গেছে, কা'রো শুধু নাম পাওয়া গেছে। অন্যান্য দেশের অল্প-খ্যাত অনেকের নামই আমরা দিতে পারিনি, বিখ্যাত বিদেশিনীদেরও কারো কারো নাম এবং রচনার উল্লেখ হয় তো বাদ পড়ে গেছে। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে পৃথিবীর সাহিত্যক্ষেত্রে নারীর দান সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনার পথ প্রশস্ত করাই আমার উদ্দেশ্য;—কোনো বিষয়েই শেষকথা বলবার অধিকার আমার নেই। যাঁরা ভবিষ্যতের রচয়িত্রী, তাঁদের অতীত সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকা বিশেষ দরকার; দুর্ভাগ্যের বিষয় আজকের দিনে আমাদের দেশের অনেক নারীরই স্বদেশের অতীত সম্বন্ধে এবং সেই সঙ্গে অতীত নারীর স্থান এবং দান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নেই, এককথায় আত্মবিশ্বাস নেই। এই আত্ম-বিশ্বাসের অভাব আমাদের পরদোষানুসন্ধিৎসু করেছে, পরানুকরণপ্রিয় করেছে। স্বদেশে এবং বিদেশে সাহিত্যের প্রয়োজন, সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ, সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার নিয়ে বহু তর্ক ইতিপূর্বে হ'য়ে গেছে; এ নিয়ে আমার নিজের মতও আমি ইতিপূর্বে বহুবার বলেছি। আমি সাহিত্যকে সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে

জড়িত ব'লে মনে করি, সমাজকে আনন্দ দেওয়া এবং পথনির্দেশ করাই তার প্রধানতম কাজ ব'লে বিশ্বাস করি। কবিরা নিরঙ্কুশ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু কবিরা মানুষ এবং সামাজিক জীব একথাও অস্বীকার করা মূঢ়তা। যে কাব্য সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, তা' শ্রুতিমধুর হ'লেও কু-কাব্য। সাহিত্যে অধিকারীভেদ আছে, রুচিভেদ আছে, আঙ্গিকের ভেদ আছে, যুগভেদে দেশভেদে একই বই সুখপাঠ্য এবং অপাঠ্য ব'লে বিবেচিত হয়েছে, কিন্তু সর্বদেশ-কালের সাহিত্যিক বিচারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্য্যাদা যে সমস্ত গ্রন্থ লাভ করেছে, সেই সব গ্রন্থে সমসাময়িক ইতিহাস, আনন্দ ও শিক্ষার উৎস একাধারে সম্মিলিত হয়েছে। বিশেষ ক'রে যে নারী গুহাবাসী বনচারী আদিমানবকে লজ্জা নিবারণের জন্য আচ্ছাদন ব্যবহার করতে এবং হিংসা নিবারণের জন্য ফলমূল আহার করতে শিখিয়েছিল, এককথায় সংযম ও সভ্যতা শালীনতা শিখিয়ে যে পশুকে মানুষ করেছিল, সাহিত্য-সৃষ্টির সময়ে আজ তার প্রতিনিধি যদি অসংযমের পরিচয় দেয়, সমাজকে বিপথে পরিচালিত করে, তবে বুঝতে হবে, সে তার মাতৃ-মাতামহীদের বহু সহস্র বৎসরের সাধনার উত্তরাধিকার হারিয়েছে, সে শুধু সমাজদ্রোহী নয়, আত্মঘাতিনী। আধুনিক নারীসাহিত্যিকাদের মধ্যে অনেকেরই মননশীলতার ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে পরানুকরণস্পৃহা এবং অক্ষমতার পরিচয়ও অল্প পাওয়া যায় না। সংযমের ক্ষমতা যাতে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের পথে বাধা সৃষ্টি না ক'রে, এইটুকু তাঁদের কাছে আমার নিবেদন; অক্ষমের এবং পরানুকরণকারীদের রচিত সাহিত্য উপেক্ষা করাই শ্রেয়। নারী যেখানে নিজের মহত্ত্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেখানে সকল দেশের পুরুষই তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে; বিশেষ ক'রে প্রাচীন ভারত নারীকে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী সম্মান দিয়েছিল, তার বহু প্রমাণ আছে। নারীর নিন্দাও

যেমনছুঁচোরঞ্জন করেছেন, তেমনি নারীর প্রশংসাও তার মহত্বের বর্ণনায় বহু পুরুষ ঋষি, কবি, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। নারীকে পুরুষই বড়ো করেছে, তার যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে, পুরুষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে হিংসাবিদ্বেষ বাড়িয়ে নারী কোন দিন বড়ো হ'তে পারবে না, নিজের চরিত্রের মহত্বে তাকে বড়ো হ'তে হবে, যোগ্যতার পরিচয় দিয়েই তাকে স্বাধিকার লাভ করতে হবে। যে প্রকৃতপক্ষে যোগ্য, তাকে কোনো বিরুদ্ধ শক্তি কোনো দিন দাবিয়ে রাখতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না।

সাহিত্যের স্রষ্ট্রীরূপে একদল নারী যেমন খ্যাতি লাভ করেছেন, তেমনি সাহিত্যের সৃষ্ট-চরিত্ররূপে আর এক দল নারী পৃথিবীর মানব মনের অমরাবতীতে সর্ব্বদেশের সর্ব্বমানবের আত্মীয়ারূপে সঙ্গিনীরূপে এবং আদর্শরূপে স্থানলাভ করেছেন। এঁদের কারো ঐতিহাসিক সত্বা ছিল, কারো ছিল না। সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী সম্ভবতঃ একদিন জীবিত ছিলেন, কিন্তু রাধা, পদ্মিনী, আনাকারেনিনা, বিনোদিনী, নারায়ণী, কমলা, বাণী, চারু, সুরমা, সতী, বিন্দু, মনোরমা, দলনী, ভ্রমর, কুন্দ, উমা প্রভৃতি যে কোনোদিনই মানব দেহে বিরাজিতা ছিলেন না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, তবু এঁদের অনেকে আমাদের বহু আত্মীয়ার চেয়েও পরমাত্মীয়া। আমাদের প্রপিতামহীর সম্বন্ধে শত বৎসর পূর্ব্বের অনেক ঘটনাই আমরা জানি না, কিন্তু বহু সহস্রাব্দী পূর্ব্বের সীতা, শৈব্যার জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি ঘটনা তাঁদের সমস্ত সুখ দুঃখের সঙ্গেই ব্যাস, বাল্মীকির কৃপায় আমরা পরিচিত। বর্ত্তমান যুগেও যে সব নারীচরিত্র সাহিত্যে মূর্তি পরিগ্রহ করছে সেগুলির মধ্যে কতকগুলি অন্ততঃ বহু শতাব্দী ধরে বহু মানব মানবীর আত্মীয়তা এবং সেই সঙ্গে অমরতা লাভ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং এদের মধ্যে সাহিত্য স্রষ্ট্রীদের সঙ্গে এই সব কল্পলোক নিবাসিনী সাহিত্যে সৃষ্টিদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কাজের

সুবিধার জন্য প্রথমে সাহিহিত্যিকা এবং সুপণ্ডিতা অর্থাৎ "সাহিত্য স্রষ্ট্রীদের" কথা পূর্ব্বে ব'লে নিয়ে পরে সাহিত্যে নারীচরিত্র অর্থাৎ "সাহিত্যে-সৃষ্টি"দের সম্বন্ধে কিছু বলবো, ভূমিকা দীর্ঘ হ'ল এইবার কাজের কথা আরম্ভ ক'র।

সাহিত্যে নারী : স্রষ্টী ও সৃষ্টি

'তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥'-যোগবাশিষ্ঠ

'তরুলতাও জীবনধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে।
কিন্তু সেই প্রকৃতরূপে জীবিত, যে মনের দ্বারা জীবিত থাকে।'

নারী—সাহিত্যিকা ও সুপণ্ডিতা :

মানব-সভ্যতার আদিযুগে সকল দেশেই সাহিত্য ছিল ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কবি এবং ঋষির মধ্যে ভেদ-রেখা সেদিন আজকের মতো সুস্পষ্ট ছিল না, ঐতিহাসিক এমন কি বৈজ্ঞানিকও ছন্দোবদ্ধ ভাষা ব্যবহার ক'রলে কেউ বিস্মিত হ'ত না। কবি বা সাহিত্যিকদের মধ্যে সে যুগে অনেকেই ছিলেন তপস্বী, উপাসক বা পুরোহিত। পৃথিবীর সাহিত্য-ক্ষেত্রে সেই অতি প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে এবং আধুনিকযুগে অনবদ্য রসসৃষ্টির জন্য যাঁরা চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে নারীর সংখ্যা অল্প নয়। মিশরের দেবমন্দিরে সেদিন যে

নারীপুরোহিতেরা দেবতার প্রতিনিধিরূপে সম্রাটদের প্রণতি গ্রহণ ক'রতেন এবং ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা সমস্ত জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁদের বাণী আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু ভারতের প্রাচীনতর যুগের বেদমন্ত্ররচয়িত্রীদের রচিত সাহিত্য আজও লুপ্ত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতের আরণ্যক সভ্যতার যুগে আমরা যে সমস্ত জ্ঞানজ্যোতি-বিভাসিতা মহীয়সী মহিলাদের বেদমন্ত্ররচয়িত্রীরূপে দেখতে পাই, তাঁদের জগতের প্রথম নারীজাগরণের অগ্রদূত ব'ললে অত্যুক্তি হবে না। ঋগ্বেদের যুগে এইরকম সাতাশ জন ঋষিকবির পরিচয় আমরা পেয়েছি। তাঁদের নাম ; ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা, উপনিষৎ, নিষৎ, জুহূ, অদিতি, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রমাতা, সরমা, রোমশা, উর্বশী, লোপামুদ্রা, নদীগণ, যমী, নারী, শাশ্বতী, শ্রী, লাক্ষা, সার্পরাজ্ঞী, বাক্‌, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা, সূর্যা, সাবিত্রী। বৃহদ্দেবতার এই তালিকার বাইরেও শচী, বসুক্র-জায়া প্রভৃতি নারীর রচিত বেদমন্ত্র ঋগ্বেদে এবং অন্যান্য বেদে পাওয়া যায়। সূর্যকন্যা সূর্যা, দেবমাতা অদিতি, কুকুরমাতা সরমা. ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণী সাপেদের রাণী সর্পরাজ্ঞী প্রভৃতির লেখা পড়ে মনে হয়, তাঁরাও একদিন মানবীই ছিলেন, পর-বর্তী যুগের মানুষ তাঁদের অতিরিক্ত সম্মান দেখাতে গিয়ে অকারণ দূরে ঠেলে দিয়েছে। যাঁদের মানবীত্বসম্বন্ধে দ্বিমত নেই তাঁদের মধ্যে কক্ষীবান-কন্যা ঘোষা, অত্রিকন্যা অপালা, বৃহস্পতিকন্যা রোমশা এবং অগস্ত্যপত্নী বিদর্ভরাজকন্যা লোপা-মুদ্রা ছাড়া বিশ্ববারা, শাশ্বতী এবং গোধানাম্নী বিভিন্ন ঋষিপত্নী এবং ঋষিকন্যার নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা বিভিন্ন প্রয়োজনে

বিভিন্ন দেবতার স্তবগান করেছেন, পুরুষেরই মতো অকুণ্ঠ ভাষায় আপনাদের অন্তরের কামনা ব্যক্ত করেছেন। কেউ চেয়েছেন রোগমুক্তি, কেউ চেয়েছেন বলিষ্ঠ অনুরক্ত স্বামী, কেউ চেয়েছেন শত্রুদমনে সহায়তা। ভাষার মাধুর্যে এবং প্রকাশভঙ্গীর প্রসাদগুণে এই সব অত্যন্ত ঘরোয়া কথাই চিরদিনের রসসাহিত্যে স্থানলাভ করেছে, বহু সহস্রাব্দীর ওপার থেকে সেদিনের সুখদুঃখ হাসিকান্নায় আজও আমাদের মর্ম স্পর্শ করছে। হিন্দুর বিবাহমন্ত্রে সূর্যার লেখা কয়েকটি অতি অপূর্ব শ্লোক ঋগ্বেদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চ'লে আসছে,—কোটি কোটি হিন্দুনারীকে জীবনের যাত্রাপথে আলো দেখিয়ে। ঋগ্বেদের দেবীসুক্তের রচয়িত্রী অম্ভৃণঋষিকন্যা বাক্‌ নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মবোধে স্বর্গমর্তের অধিষ্ঠাত্রী বলে যে অপূর্ব ওজস্বিনী ভাষায় ঘোষণা করেছেন তা' পড়লে শ্রদ্ধায় এবং বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকতে হয়। ইনিই যদি পরবর্তী যুগের বাগ্দেবী না হন, তবে সকল-কলাধিষ্ঠাত্রী বীণাপুস্তকধারিণী শ্বেতাম্বরা শুভ্রোজ্জ্বলকান্তি দেবী সরস্বতীর রূপমূর্তি এইযুগে ঋষির মানসচক্ষে কোন্‌ পটভূমিকায় প্রথম প্রতিভাত হয়েছিল তা' আজ জানবার উপায় নেই। আমরা শুধু জানি সেদিনের তপোবনে তপোবনে সর্বশুক্লা বা কনকগৌরী বিদুষী ঋষিপত্নী এবং ঋষিকন্যার অভাব ছিল না। 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে' একথা সেদিন ভারতবর্ষ মা'নত, তাই মুক্তিকামীকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে সেদিন ঋষিরা স্ত্রীপুরুষের মধ্যে পার্থক্যবুদ্ধি রাখতেন না। দম্পতি কি ক'রে পণ্ডিতা দুহিতা লাভ ক'রতে পারে তার শাস্ত্রোক্ত বিধান বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া যায়। বৈদিক

যুগে এবং পৌরাণিক যুগের প্রথমদিকে মেয়েদের পুরুষদের মতোই বাল্যে ব্রহ্মচর্য পালন করে পতি লাভ করতে হতো।*

মেয়েকে ছোটবেলা থেকে লক্ষ্য ক'রে অভিভাবকেরা স্থির ক'রতেন, কোন পথে গেলে তার জীবনে সাফল্য এবং শান্তি আসবে, তারপর নিজেদের স্বার্থচিন্তা না ক'রে তাকে সেই

---

* শাস্ত্রমতে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা—"

কন্যাকেও সযত্নে পালন করে শিক্ষিতা করে ধনরত্নসহিত বিদ্বান বরের হাতে সমর্পণ করবে। অন্যত্র শাস্ত্র বলেছেন,

"যদি কুলোন্নয়নে প্রস্থতং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং
যদি নিজমভীষ্ট চিন্তয়মেকদা, কুরু সুতাং শীলবতীং তদা।"

'অথ য ইচ্ছেদ্দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত সর্বমায়ুরিয়াদিতি'

বৃহদারণ্যক উঃ ৬, ৪, ১৭

'ইৎথোপি একচ্চী মা সেয্যো পোসা জনাধিপ। মেধাবতী সীলাবতী...।' সংযুত্তনিকায় ১, ৮৬

'সন্ত্যপি খলু শাস্ত্রপ্রহতবুদ্ধয়ো গণিকা রাজপুত্র্যো মহামাত্য-দুহিতরশ্চ।' কামসূত্র, ১, ৩, ১২

ইধ পণ মাণব, একচ্চো ইৎথি বা পুরিসো বা সমণং বা ব্রাহ্মণং বা উপসঙ্কমিত্বা পরিপুচ্ছিতা হোতি...সো তেন কম্মেন...মহা পঞ্ঞো হোতি।'

মজ্‌ঝিম নিকায় ৩, ২০৬

সা গাথ-লেখ-লিখিতে গুণ অর্থযুক্তা যা কন্যা ঈদৃশ ভবেন্মম তাং বরেথাঃ। ললিতবিস্তর ১২, ১৫৮

'পুরুষবৎযোষিতোঽপি কবী ভবেয়ুঃ। সংস্কারো হ্যাত্মনি সমবৈতি, ন স্ত্রৈণং পৌরুষং বা বিভাগং অপেক্ষতে। শ্রূয়ন্তে দৃশ্যন্তে চ রাজপুত্র্যো মহামাত্য-দুহিতরো গণিকাঃ কৌতুকিভার্যাশ্চ-শাস্ত্র-প্রহতবুদ্ধয়ঃ কবয়শ্চ।" কাব্য-মীমাংসা, ৫৩।

পথেই চ'লতে দিতেন। হারীতের মতে নারীর মধ্যে একদল ব্রহ্মবাদিনী, আর একদল সদ্যোবধূ। ব্রহ্মবাদিনীরা উপনয়ন, অগ্নীন্ধন ও বেদাধ্যয়ন করবেন এবং আত্মীয়দের মধ্যে ভিক্ষাচর্যা করবেন, সদ্যোবধূদের বিয়ের সময় নাম মাত্র উপনয়ন করিয়ে বিয়ে দিতে হবে। যমস্মৃতিতেও মেয়েদের মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়নের কথা আছে, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের পিতা, পিতৃব্য এবং ভ্রাতার কাছে বেদ পড়তেন। সর্বত্র যে এ বিধি পালিত হ'তনা তার প্রমাণ পাই এর বহু পরবর্তী যুগে ভবভূতির লেখা 'উত্তররাম চরিতে'। বাল্মীকি লবকুশকে ত্রয়ী বিদ্যা শেখাচ্ছেন; তাঁরা অতিরিক্ত মেধাবী, এত তাড়াতাড়ি শিখছেন যে সহপাঠিনী আত্রেয়ী তাঁদের সঙ্গে সমান তালে চ'লতে পারছেন না, তাই তাঁকে অন্যত্র যেতে হচ্ছে। মালতী-মাধবেও কামন্দকীর পুরুষের সঙ্গে সহাধ্যয়নের চিত্র পাই। তবু ভবভূতির যুগে নারীর অধিকার অনেক সঙ্কীর্ণ হয়েছে, বৈদিকযুগের স্ত্রীস্বাধীনতা তখন আর নেই। বৈদিক কর্মে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সঙ্গে নারীর যে সমান অধিকার কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে স্বীকৃত হয়েছে, সে অধিকার তার বহু পূর্বেই সে হারিয়েছিল।

পৌরাণিক যুগের প্রারম্ভে উপনিষদের উষায় আমরা কয়েক জন মহীয়সী নারীকে বিদেহরাজ জনকের রাজসভায় দেখতে পাই। সে যুগের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মমহাসভায় ভারতবিখ্যাত ঋষি ও পণ্ডিতমহামণ্ডলীর মধ্যে বালব্রহ্মচারিণী ক্ষত্রিয়া নারী সুলভা রাজর্ষি ধর্মধ্বজের সঙ্গে দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্তা হয়েছিলেন। এই সুলভা একাকিনী পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিলেন, সর্ববেদ-

পারগা এবং যোগসিদ্ধা ছিলেন। পঞ্চশিখশিষ্য রাজর্ষি ধর্মধ্বজ জনককে পরীক্ষা করবার জন্য তিনি যোগবলে তাঁকে বশীভূত ক'রে তাঁর দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন এবং তর্কের দ্বারা তাঁকে পরাজিত করেছিলেন। ছবির পর ছবি চোখের ওপর ভেসে ওঠে। সহস্র সহস্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সম্মুখে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে যেদিন ব্রহ্মবাদিনী গার্গী সে যুগের অপরাজেয় পণ্ডিত দার্শনিক-প্রবর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের,—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার,—চরমমীমাংসার জন্য তর্কযুদ্ধে আহ্বান ক'রলেন, সেদিন কী দিন! সেদিন শ্রেষ্ঠত্বাভিমানী পুরুষের সমস্ত পৌরুষগর্ব সেই জ্ঞানগরীয়সী কুমারীর তর্কপ্রবাহে ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছিল। সেদিনের সভায় শেষ পর্যন্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে ধমক দিয়েই গার্গীকে নিরস্ত ক'রতে হয়, বিচারে পরাজিত ক'রে নয়। এর পর আবার আর এক দৃশ্য। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ভোগৈশ্বর্য্যে বীতস্পৃহ হ'য়ে প্রব্রজ্যা নেবেন, দুই পত্নীকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ভাগ ক'রে দিয়ে যেতে চান। যিনি একদিনের তর্কযুদ্ধে একটি রাজসভায় সহস্র সুবর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গ ধেনুলাভ করেন, তাঁর আজীবনসঞ্চিত সম্পত্তি নিতান্ত অল্প ছিলনা; কিন্তু তাঁর ব্রহ্মবাদিনী পত্নী মৈত্রেয়ীও সামান্যা নারী ন'ন, তিনি আশৈশব ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে লালিতা, রাজকন্যা হ'য়েও স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রব্রতা অরণ্যচারিণী ঋষিপত্নী হয়েছিলেন। তিনি কৌতুকচ্ছলে স্বামীকে প্রশ্ন ক'রে ব'সলেন; "এই সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে কি আমি মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রতে পা'রব?" মহর্ষি স্বীকার ক'রলেন, "না, তা' তুমি পারবে না।" তখন মৈত্রেয়ীর দ্বিতীয় প্রশ্ন এল; "যেনাহম্ নামৃতা স্যাম্ কিমহম্ তেন কুর্য্যাম্?" এত বড় প্রশ্ন

মানবসভ্যতার আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ করেছে ব'লে আমাদের মনে পড়ে না! সহস্র সহস্রাব্দীর ওপার থেকে সেই মর্ম্মস্পর্শী প্রশ্ন আজও ভেসে আসছে, "ওগো, যে বিত্ত আমায় মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারবে না, তা' নিয়ে আমি কি করব?" আমরা আজ প্রগতির গর্ব্ব করি, নারীজাগরণের কথা বলি, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, শক্তির ক্ষেত্রে, এবং ত্যাগের ক্ষেত্রে আজও আমরা সেদিনের নারীর অনেক পিছনে প'ড়ে আছি সে কথা ভুলে যাই। আমরা ভুলে যাই 'অধিকার' ব'লে কোনো বৃন্তহীন পুষ্প জগতে কোথাও কোনোদিন ফোটেনি এবং ফুটবে না, আমরা যে পরিমাণে আমাদের কল্যাণবুদ্ধির এবং মহত্ত্বের প্রমাণ দিয়েছি এবং দে'ব সেই পরিমাণে 'অধিকার' আমাদের গুণমুগ্ধ সমাজ চিরদিন স্বেচ্ছায় দিয়েছে, দিচ্ছে এবং দেবে। বিলাস-লীলায় এবং ভোগ্য বস্তুর জন্য দুরন্ত লালসায় আজ নারী পুরুষের অনুকরণে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং উত্তরোত্তর তা'কেও বিভ্রান্ত করছে। বিবাহের পণে অনেক ক্ষেত্রে বাপকে সর্বস্বান্ত হ'তে হয় জেনেও ভাইকে অবশিষ্ট সম্পত্তির অংশ দিতে বাধ্য-ক'রতে সে আজ বিদেশী রাজশক্তির সাহায্য নিতেও কুণ্ঠিত নয়। আজকের দিনে বারবার এই প্রশ্নই মনে ওঠে, আমরা জাগছি, না চিরনিদ্রার সুযোগ খুঁজছি? চিরযুগের মানবমনের অমরাবতীতে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের—বুদ্ধ, চৈতন্য, ঈশার পাশে স্থানলাভ ক'রে জ্ঞানগরিমায় এবং আন্তরমাহাত্ম্যে যাঁরা সমস্ত পৃথিবীর শ্রদ্ধাঞ্জলি পেয়ে আসছেন, তাঁদের শিক্ষার ধারা কি আজ আধুনিকতার মরুভূমিতে সত্যই লুপ্ত হ'য়ে গেল?

নারীদের বেদমন্ত্র রচনার যুগ কেটে গেলেও বহুদিন পর্যন্ত তাঁদের বেদমন্ত্রে অধিকার ছিল। গোভিল গৃহ্যসূত্রে এবং কাঠক গৃহ্যে নারীর বেদপাঠের সমর্থন আছে। তাঁরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করতেন (গোভিল, ২, ১, ১৯)। আচার্যা এবং উপাধ্যায়ারা আচার্যের পত্নী আচার্যাণী ও উপাধ্যায়পত্নী উপাধ্যায়ী থেকে পৃথক ছিলেন, তাঁরা নিজেরাই ছাত্রীদের পড়াতেন, অর্থাৎ মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্যও অনেক সময়ে পুরুষ-গুরুর প্রয়োজন হ'ত না, মেয়েরা নারী-গুরুর কাছেই বেদবিদ্যা পর্যন্ত শিখতে পারতেন পাণিনির যুগেও। এই যুগের পণ্ডিতাদের মধ্যে মীমাংসাচার্য কাশকৃৎস্নির মীমাংসায় ব্যুৎপন্না কাশকৃৎস্নাদের এবং প্রাচীন ব্যাকরণ আপিশলে ব্যুৎপন্না আপিশলাদের পরিচয় কাশিকাবৃত্তি এবং পতঞ্জলি দিয়েছেন। বহু প্রাচীন দেবী-মূর্তির গায়ে যজ্ঞোপবীত দেখতে পাওয়া যায়, আজও দুর্গোৎসবে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করানো হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও বাণভট্ট মহাশ্বেতার বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর 'ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা পবিত্রীকৃতকায়ার' উল্লেখ করেছেন। ঐতরেয় আরণ্যকের রচয়িতা মহিদাসের মা ইতরাকে নীচজাতীয়া ব'লে তাঁর ঋষি পিতা সম্মান দেন নি, উপযুক্ত পুত্র মায়ের সেই অপমানের প্রতিশোধ দিয়েছেন পিতার উল্লেখ না ক'রে নিজেকে ইতরার পুত্র ব'লে পরিচয় দিয়ে; তাঁর বাল্যশিক্ষার গুরু ছিলেন তাঁর অনাদৃতা মা। গৃহস্থদের সে যুগে পত্নীকে বাদ দিয়ে কোনো ধর্মকার্য করবার উপায়ই ছিল না, শাস্ত্রাদেশ ছিল "সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ"। কৌশল্যা সে যুগের অন্যান্য প্রধানা রাজমহিষীদের মতো রাজা দশরথের যজ্ঞাংশভাগিনী ছিলেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেখা যায় মন্ত্রপাঠে হোমে আহুতিতে স্ত্রী সমানভাবে যোগ দিতে পারতেন। অরণ্যবাসের সময়ে সীতাদেবী নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদির জন্য নদীতীরে যেতেন। বনগমন কালে রামচন্দ্র তাঁকে প্রথমতঃ সঙ্গে নিতে চাননি, সেই সময়ে সীতাদেবী তাঁকে যে সব জ্ঞানগর্ভ কথা বলেছিলেন তাতে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অত্রি-পত্নী অনসূয়া শুধু সর্বশাস্ত্রজ্ঞা সুপণ্ডিতা ছিলেন না, তাঁর তপঃপ্রভাবে অনাবৃষ্টি নিবারণ, ঋষিদের তপোবিঘ্ন নিরসন এবং দেবকার্য সুসাধন হত। তাঁর স্বামী তাঁকে 'মহাভাগা', সর্বভূতের নমস্কারার্হা, ধর্মচারিণী তপস্বিনী' বলে বনবাসকালে সীতাকে তাঁর কাছে উপদেশ নিতে অনুরোধ করেছেন। মতঙ্গ আশ্রমের পরিচারিকা হীনবংশোদ্ভবা শবরীও শংসিতব্রতা তপঃসিদ্ধা নিত্য ধর্মনিরতা তপস্বিনী এবং সাক্ষাৎ 'দেবতার মতো' সকল লোকের নমস্কৃতা ছিলেন। বালির মৃত্যুর পর শোকবিহ্বলা তারা রামচন্দ্রকে অনুরোধ করছেন, তিনি যেন তাঁকে হত্যা করেন। সেই উপলক্ষ্যে বেদ ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে স্ত্রী যে স্বামী থেকে অভিন্নাত্মা সেই কথা প্রমাণ ক'রে, তাঁকে মারলে যে স্ত্রীবধের পাপ হবে না, তাও বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সুগ্রীব রাজভোগে শ্রীরামের কার্য ভুলে বিলম্ব করছেন দেখে লক্ষ্মণ যখন তাঁকে শিক্ষা দিতে যান, তখন তারা তাঁকে কামের দুর্জয় প্রভাব সম্বন্ধে দৃষ্টান্তসহ বক্তৃতা দিয়ে শান্ত করেন। এই অনার্য নারী ছাড়া মন্দোদরী, কৈকসী প্রভৃতি অনার্যা বিদুষীর সাক্ষাৎ আমরা রামায়ণে পাই। রঘুকুলের কুল পুরোহিত মহর্ষি বসিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী বসিষ্ঠের সমানশীলা ও সমান ব্রতচারিণী ছিলেন। (অনু ১৩০) তাঁর কাছে পিতৃগণ

এবং ঋষিগণ ধর্মের গুহ্যতম তত্ত্ব শুনে ধন্য হয়েছিলেন। এই যুগের আর একজন মহীয়সী এবং সুপণ্ডিতা নারী কাশীরাজ-মহিষী মদালসা। তিনি উপযুক্ত তিনপুত্র—বিক্রান্ত, সুবাহু এবং শত্রুমর্দনকে নিজে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে বনবাসী সন্ন্যাসী করেন, শেষে স্বামীর অনুরোধে চতুর্থ পুত্র অলর্ককে রাজনীতি এবং যোগশাস্ত্র শিক্ষা দেন। কাশীরাজ অলর্ক এই পুণ্যবতীর শিক্ষানুসারে যোগাভ্যাস দ্বারা রিপুসমূহ দমন করে কাশীতে ধর্ম-রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। মহাভারতে 'শিবা' নাম্নী এক সিদ্ধা ব্রাহ্মণীর উল্লেখ আছে, তিনি সর্ববেদপারগা ছিলেন। শাণ্ডিল্য মুনির কন্যা কৌমার ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। তিনি যোগযুক্তা তপঃসিদ্ধা হ'য়েছিলেন এবং কঠোর তপস্যা ক'রে দেব-ব্রাহ্মণ-পূজিতা হ'য়ে স্বর্গে গেছলেন। কুনিগর্গ কন্যা, গৌতমী প্রভৃতি তপস্বিনীর কথা মহাভারতে পাওয়া যায়, তাঁরা প্রত্যেকেই সুপণ্ডিতা ছিলেন। ধ্রুবজননী সুনীতি তাঁর পিতৃগৃহে অপমানিত পুত্র ধ্রুবকে ধর্মের মধ্যেই সান্ত্বনা লাভ করতে শিখিয়েছিলেন। ধ্রুবের ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের মূলে ছিল তাঁর বিদুষী ধর্মপ্রাণা মা সুনীতির শিক্ষা। এই যুগের অন্যান্য বিদুষীর মধ্যে মহারাজ স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহুতি ঋষি-কর্দমের পাণ্ডিত্য খ্যাতি শুনে স্বেচ্ছায় তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। এই জ্ঞানতপস্বী দম্পতির পুত্র মহামনীষী মহর্ষি কপিল সাঙ্খ্য দর্শনের রচয়িতা ব'লে উত্তরকালে বিশ্ববিশ্রুত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর বিদুষী মা'ই যে তাঁকে শৈশবে মাতৃস্তন্যের সঙ্গে মননশীলতায় দীক্ষা দিয়েছিলেন, সে কথা অনেকেই জানেন না।

মদ্ররাজকন্যা সাবিত্রী পিতার সঙ্গে, নারদের সঙ্গে, পতি

সত্যবানের সঙ্গে এবং সর্বোপরি যমের সঙ্গে শাস্ত্রীয় তর্কে নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। পাতিব্রত্যের জন্য তিনি আজও ভারত নারীর কাছে প্রাতঃস্মরণীয়া হ'য়ে আছেন, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য এবং বিচারবুদ্ধির কথা আমরা ভুলে গেছি। বিদর্ভ-রাজদুহিতা দময়ন্তীর অসামান্য সাহস এবং অনন্যদুর্লভ বুদ্ধিমত্তা না থাকলে তিনি নলকে ফিরে পেতেন কিনা সন্দেহ। সে যুগের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণা-সভায় পরামর্শ দেবার জন্যও বিদুষী নারীদের ডাক পড়ত, মহাপ্রজ্ঞা গান্ধারী, ধীমতী দ্রৌপদী প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিমতী নারীরা সেখানে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ রাজগণকেও কর্তব্যনির্ধারণে সহায়তা করতেন এবং সদুপদেশ দিতেন। তাঁদের জন্য সভায় স্বতন্ত্র আসন রাখা থাকত (আদি, ১৩৪,১১)। কূটনীতি বিষয়ে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে এতই উপদেশ দিয়েছিলেন, যে তাঁর বিশ্বাস দাঁড়িয়েছিল, 'শুক্রাচার্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নয়। তাঁরা নিশ্চয় মেয়েদের বুদ্ধির প্রয়োগ-কৌশল দেখেই অর্থশাস্ত্র লিখে গেছেন।' রাজনীতি সে যুগের ক্ষত্রিয় বীরপত্নীদের অবশ্য শিক্ষণীয় ছিল বলেই মনে হয়। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে বহুশ্রুতা দীর্ঘদর্শিনী সৌবীররাজপত্নী বিদুলার কথা আছে। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর রাজ্য অরক্ষিত দেখে সিন্ধুরাজ সৌবীররাজ্য কেড়ে নেন, বিদুলার শান্তশিষ্ট ছেলেরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয় জেনে নিশ্চেষ্ট রয়েছে দেখে বিদুলার সহ্য হচ্ছে না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাণাধিক পুত্রদের রণক্ষেত্রে পাঠাবার জন্য তিনি মরিয়া। এই তেজস্বিনী নারীর বজ্রগর্ভ বীরবাণী চির-দিনের ভীরুর জন্য অপমানিতের জন্য নিত্যকাল ধ্বনিত হচ্ছে,

আত্মপ্রবঞ্চক লাঞ্ছিতকে ধূলিশয়নের তামসিকতা থেকে সুতীব্র ভাষার কষাঘাতে জাগিয়ে তুলছে। তিনি ব'লছেন, "আপনার আত্মাকে অপমান কোরো না, নিজেকে অল্প দিয়ে ভ'রতে যেয়ো না, পরম কল্যাণের জন্য মনকে প্রস্তুত করো, ভয় কোরো না। ক্ষুদ্র নদী অল্প জলেই ভ'রে যায়, ইঁদুরের অঞ্জলি অল্প জিনিষেই পূর্ণ হয়, কাপুরুষেরাই সহজে এবং অল্পে সন্তুষ্ট হয়।...বজ্রাহতের মতো প'ড়ে আছ কেন? কাপুরুষ, ওঠো, শত্রুর দ্বারা নির্জিত হ'য়ে ঘুমিয়ে থেকো না।...হয় আপনার বীর্যকে জাগিয়ে তোলো, না হয় কল্যাণময় গতি (মৃত্যু) প্রাপ্ত হও।") (শুধু সংখ্যা বাড়াবার জন্য পুরুষ বা স্ত্রীলোক হ'য়ে লাভ নেই) "যারা শুধু সংখ্যা বাড়ায়, তারা পুরুষও নয়, স্ত্রীলোকও নয়।" সুদীর্ঘ চার অধ্যায় ধ'রে বিদুলার এই জ্বালাময়ী ভাষা চলেছে, পৃথিবীর সাহিত্যে বীররসের এ এক অপূর্ব সম্পদ্। এই ভাষারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই সভামধ্যে অপমানিতা দ্রৌপদীর মুখে ;— "ধিক ভীমের বলকে, ধিক অর্জুনের গাণ্ডীবকে, এই ক্ষুদ্রজনেরা আমায় অপমান করছে, এঁরা কেমন ক'রে সহ্য করছেন?" শুধু রুদ্র ভাব নয়, শুধু ক্ষমা নয়, সময়বিশেষে উপযুক্ত ব্যবহারই ছিল দ্রৌপদীর নীতি। তাঁর গভীর রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় আমরা তাঁর এই সব কথায় পাই: "ক্রমাগত তেজ ভালো নয়, সব সময়ে ক্ষমা ভালো নয়...উপযুক্ত সময় বুঝে মৃদু বা তীক্ষ্ণ ব্যবহার করবে...মৃদুতার দ্বারা দারুণ অদারুণ সকলকেই জয় করা যায়, মৃদুর অসাধ্য কিছু নেই, সুতরাং মৃদুরই শক্তি বেশী। ...কিন্তু তেজেরও সময় এলে তেজ প্রয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য।" দ্রৌপদী শুধু তেজস্বিনী এবং রাজনীতিতে পারদর্শিনী ছিলেন

না; ধর্মজ্ঞা এবং ধর্মদর্শিনী ছিলেন, নিরীশ্বরবাদ, হঠবাদ প্রভৃতির সমালোচনায় তাঁর গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাই। সে যুগের আর একজন মহীয়সী মহিলা ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারী। এই ধর্ম-প্রাণা বিদুষী নারীর তুলনা—শুধু ভারতে নয়—পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। অন্ধ স্নেহমুগ্ধ স্বামীর প্রশ্রয় পেয়ে পুত্র দুর্যোধন সুসমৃদ্ধ কৌরবরাজপরিবারকে দ্রুতবেগে কি নিদারুণ পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছে তা তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়ে-ছিলেন, তাই সকলের কল্যাণ কামনায় মাতা হ'য়ে পুত্রকে ত্যাগ করবার জন্য বার বার স্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন। যুদ্ধ-গমনোদ্যত পুত্র আশীর্বাদ চাইতে এসেছিল, মুখের কথায় মৃত্যু পথগামীকে তিনি একবার আশীর্বাদ করতে পারেন নি, বলে-ছিলেন "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" দেবতার কাছে ভক্ত অনেক কিছু চায়, কিন্তু তাঁর মতো নিষ্কাম প্রার্থনা ক'জন ক'রতে পারে? ক'জন ব'লতে পারে, "আমার কর্মফল আমাকে ভোগ ক'রতেই হবে (তা থেকে মুক্তি দেবার জন্য অন্যায় অনুরোধ তোমায় করব না) কিন্তু নিজের কর্মফলে যে কোনো যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, হে হৃষীকেশ, তোমার প্রতি ভক্তি যেন আমার অচলা থাকে।" গান্ধারী বিদ্বেষ-ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ মহাভারতের অন্ধকার আকাশে অত্যুজ্জ্বল ধ্রুবতারকা, পাণ্ডব কৌরবের রণহুঙ্কার ছাড়িয়ে আজও তাঁর অকুণ্ঠ কণ্ঠধ্বনি আমাদের কানে এসে পৌঁছায়, আমাদের ধর্মের পথে সত্যের পথে সন্তানকে অবিচল রাখতে সাহস এবং শক্তি দেয়।

এ যুগের আর একজন মনস্বিনী মহিলা পাণ্ডবজননী কুন্তী। পাণ্ডবেরা যে তাঁদের মাকে দেবীর মতো শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন,

সে শুধু মাতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যবোধে নয়, তাঁদের বিদুষী এবং তেজস্বিনী মা আশৈশব পিতৃহীন তাঁদের পিতার মতোই শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং নিজগুণে তাঁদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি একদিকে বেদজ্ঞা, বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে যজ্ঞে যথারীতি সোমপান ক'রে বৈদিক যুগের নারীর মতো তাৎকালীন লোকাচারকে অগ্রাহ্য ক'রে স্বীয় অধিকার খ্যাপন করেছিলেন, অপরদিকে ক্ষত্রিয় বীরনারীর মতো ধর্মযুদ্ধে প্রাণ-প্রিয় সন্তানদের মৃত্যুমুখে পাঠাতে দ্বিধা করেন নি। পরপুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজ পুত্র ভীমকে বক-রাক্ষসের মুখে প্রেরণ করেছিলেন। ভারত-যুদ্ধের প্রাক্কালে বনচারী যুধিষ্ঠিরের কাছে এই বলে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, "ক্ষত্রিয় নারীরা যে জন্য পুত্র প্রসব করে, তার সুসময় উপস্থিত হয়েছে।"

বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগে বহু ঋষিপত্নী তপস্যার এবং পাণ্ডিত্যের জন্য জনসাধারণের প্রণম্যা হয়েছিলেন, তাঁদের সকলের নাম করা এবং পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ধর্মপ্রাণা, পতিব্রতা প্রভৃতিরূপে তাঁদের কা'রো কা'রো কথা অন্যত্র ব'লব। ধর্মনীতির ক্ষেত্রে যাঁদের মহত্ত্ব সর্বজনস্বীকৃত তাঁরা ছাড়া রাজ-নীতির ক্ষেত্রে দূত হিসাবে নারীর নৈপুণ্য প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যায়। সরমা ইন্দ্রের দূতী হয়ে 'পণি'দের কাছে গেছলেন, তাঁদের গরুগুলি আদায় করবার জন্য। তাঁর দৌত্য অবশ্য সফল হয়নি। এই যুগেই গায়ত্রী 'সোম' আনতে গিয়ে অসমর্থ হলে সরস্বতী গন্ধর্বদের ছলনা ক'রে 'সোম' হরণ ক'রে এনেছিলেন। পরবর্তী যুগে রাজনৈতিক প্রয়োজনে এবং গুপ্তচরের কাজে নারী কর্মচারী নিয়োগ অর্থশাস্ত্রের বিধানের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছল।

বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগের বিদুষী নারীদের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই দু'টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর নারীকে দেখতে পাওয়া যায় ;—তাঁদের একদলের কাছে আত্মাই সব, আত্মজ্ঞান এবং মোক্ষচিন্তাই পরম পুরুষার্থ, আর একদলের কাছে দেহ এবং তার সুখ বিধানই সমস্ত, তার জন্য জড়জগতের যত কিছু ঐশ্বর্য, সম্মান, রূপ, শক্তি প্রভৃতি প্রয়োজন তা' সংগ্রহ করা চাই, দৈব কৃপালাভের দ্বারাই হোক আর পুরুষকারের দ্বারাই হোক। বেদ-রচয়িত্রী ব্রহ্মবাদিনীদের মধ্যে অধিকাংশ এবং পৌরাণিক যুগের ক্ষত্রিয় নারীদের মধ্যে অধিকাংশই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়েন। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে মৈত্রেয়ী, গার্গী, সুলভা, মদালসা, শাণ্ডিল্য-কন্যা, শবরী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র নারীদের পাই। এই দুই দলের মধ্যেও আবার দু'পক্ষেই আছেন অথচ কোনো পক্ষেই সম্পূর্ণ নেই গান্ধারী প্রভৃতি এমন কয়েকজন অপূর্বচরিত্রা নারীকে দেখতে পাওয়া যায়। আবার ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য অধর্মে ডুবেছেন, যে রাজ-সিংহাসনের মায়া ছিন্নবস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করে পঞ্চপতির পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে দু'দিন পরে মহাপ্রস্থানের পথের যাত্রী হয়েছেন, তারই জন্য ভারতবর্ষকে শ্মশান ক'রে জ্ঞাতি-শোণিতে কুরুক্ষেত্রের সুবিশাল প্রান্তর প্লাবিত করেছেন, এমন নিষ্কাম হিংসার প্রতিমূর্তি দ্রৌপদীকে দ্বিতীয় দলের মধ্যে ফেললে অন্যায় হবে, অথচ না ফেললেও উপায় নেই।

বৌদ্ধযুগের নারী-লেখিকাদের সম্যক্ পরিচয় আমরা পাই না, আড়াই হাজার বছরের শত শত রাষ্ট্রবিপ্লব এবং বিদেশী আক্রমণে তাঁদের অনেকেরই নাম পর্যন্ত আজ লুপ্ত হ'য়ে গেছে।

তবু যে ক'জনের নাম পাই এবং তাঁদের লেখার যেটুকু নমুনা পাই, তা' থেকে সে যুগের নারীর ধীশক্তির এবং পাণ্ডিত্যের জন্য শ্রদ্ধা এবং গৌরব অনুভব না ক'রে থাকা যায় না। থেরীগাথা নামক একটি গাথা-সংগ্রহে প্রথম যুগের তিয়াত্তর জন থেরীর রচনা পাওয়া যায় : তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের নাম এই :

পূর্ণা, তিষ্যা, ধীরা, মিত্রা, ভদ্রা, উপশমা, মুক্তা, ধর্মদণ্ডা, বিশাখা, সুমনা, উত্তরা, ধার্ম, সজ্ঘা, জয়ন্তী, আঢ্য কাশী (বা অর্ধকাশী) চিত্রা, মিত্রিকা, অভয়া, শ্যামা, উত্তমা, দন্তিকা, শুক্লা, শৈলা, সোমা, কপিলা, বিমলা, সিংহা, নন্দা, মিত্রকালী, বকুলা, সোনা, চন্দ্রা, পটাচারা, বাশিষ্ঠী, ক্ষেমা, সুজাতা, অনুপমা, মহাপ্রজাবতী (বা, মহাপ্রজাপতি) গৌতমী, গুপ্তা, বিজয়া, চালা, উপচালা, বুদ্ধমাতা, কৃশা গোতমী, উৎপলবর্ণা, পূর্ণিমা, অম্বপালী, রোহিণী, চম্পা, সুন্দরী, শুভ্রা, ঋষিদাসী, সুমেধা।

'থেরী' অর্থে স্থবিরা বৌদ্ধ তপস্বিনী, এঁদের মধ্যে অনেকে বুদ্ধদেবের জীবিতকালেই গাথা রচনা করেছিলেন। আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও আগে লেখা এই সব গাথা আজকের দিনেও যে কোনো সুকবির লেখার পাশে অনায়াসে স্থান পেতে পারে। এঁদের মধ্যে কয়েক জনের সম্বন্ধে দু'এক কথা ব'লব। বুদ্ধের শিষ্যাদের মধ্যে তাঁর বিমাতা গোতমীর পরেই ক্ষেমা এবং উৎপলবর্ণার স্থান নির্ণীত হয়েছে, তাঁরা ছিলেন বুদ্ধের অগ্র-শ্রাবিকা। ক্ষেমা মগধরাজ বিম্বিসারের প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন, অপরূপ রূপলাবণ্যের গর্বে তিনি বুদ্ধকেও গ্রাহ্য ক'রতেন না। ঘটনাক্রমে একদিন বেণুবনে বেড়াতে বেড়াতে তিনি বুদ্ধের

কাছে গিয়ে পড়েন। বুদ্ধ মায়াবলে তাঁর চেয়ে অপরূপ সুন্দরী এক অপ্সরা সৃষ্টি ক'রে তাঁর রূপগর্ব চূর্ণ করেন : তারপর তাঁর চোখের সামনে সেই সুন্দরীর দেহের ক্রমপরিণতি—জরা এবং মৃত্যুর বীভৎস করুণ দৃশ্য দেখিয়ে ক্ষেমার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার করেন। ভগবান বুদ্ধের উপদেশে স্বামীর অনুমতি নিয়ে রাজ-মহিষী ভিক্ষুণীসম্প্রদায়ে প্রবেশ করে অচিরে অর্হৎ পদ প্রাপ্ত হন। অলোকসামান্য রূপের জন্য থেরী উৎপলবর্ণার খ্যাতি যৌবনে এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে, বিবাহার্থীদের একজনের সঙ্গে বিবাহ দিলে বহুজনের সঙ্গে শত্রুতা হ'বার সম্ভাবনা দে'খে তাঁর পিতা তাঁকে চিরকুমারী রেখেছিলেন এবং বৌদ্ধভিক্ষুণী-সঙ্ঘে যোগ দিতে দিয়েছিলেন। তিনি পাণ্ডিত্যের এবং ধর্মপরায়ণতার জন্য ভগবান বুদ্ধের বাঁ পাশে আসন পেয়েছিলেন এবং মেয়েদের সম্বন্ধে যে কোনো জটিল প্রশ্ন উঠলে বুদ্ধ স্বয়ং তাঁর পরামর্শ গ্রহণ ক'রতেন। এই যুগের নারীদের মধ্যে সব চেয়ে প্রতিভা-শালিনী বাগ্মী ছিলেন থেরী পটাচারা। তাঁর অমৃতমধুর উপদেশবাণী শুনে একদিনের একটি সভায় পাঁচশ' পর্যন্ত নারী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিতা হয়েছে। বহুসহস্র নারী তাঁর আদেশ দৈবাদেশের মতো মা'নত, বুদ্ধের জীবিতকালে উত্তর-ভারতের বহু রাজ্যে তাঁর অসামান্য প্রভাব ছিল। তাঁর প্রথম জীবনের করুণ কাহিনী তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন শ্রাবস্তীর এক সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা, যৌবনে এক যুবকের প্রেমে প'ড়ে পিতার অসম্মতিতে বিবাহ অসম্ভব দে'খে গৃহত্যাগ করেন। বিদেশে বিবাহ ক'রে কিছুদিন সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিয়েছিলেন, তার পর বিপদের বন্যা এল। স্বামী সর্পদংশনে

মারা গেলেন, দৈন্যে, অনাহারে নিরুপায় হ'য়ে দুই শিশুপুত্র নিয়ে পটাচারা দেশে ফিরছিলেন, পথের মধ্যে দুটি ছেলেরই মৃত্যু হ'ল। উন্মাদিনীর মতো দেশে ফিরে তিনি শুনলেন, ঘরচাপা প'ড়ে তাঁর পিতা, মাতা, ভাই—সবাই এক সঙ্গে মারা গেছেন। সে সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে ছিলেন, হতভাগিনী শোকোন্মত্তা নারীকে তিনি ধর্মের মধ্যে আশ্রয় এবং সান্ত্বনা দিলেন, তাঁর উপদেশে পটাচারার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হ'ল। যে হোমাগ্নি সেদিন তাঁর অন্তরে জ্বলেছিল, সেই হোমশিখার আগুন তিনি সহস্র সহস্র নারীর হৃদয়ে জ্বেলে দিয়েছিলেন, রোগ, শোক, দৈন্য জয় ক'রে নারীকে আত্মসচেতন হ'তে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বৌদ্ধযুগের সর্বপ্রথমা এবং সর্বপ্রধানা ধর্মনেত্রী বুদ্ধবিমাতা গোতমীর কথা অন্যত্র বলেছি। তাঁর কাছে এক-দিক দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর নারী ঋণী। তাঁর রচিত গাথায় তিনি বলেছেন: "হে সুগত, আমি তোমার মা, কিন্তু তুমি আমায় সদ্ধর্ম দান ক'রে নূতন জন্ম দিয়ে আমার পিতৃস্থানীয় হয়েছ। আমি প্রতিপালন ক'রে তোমায় বড়ো করেছিলেম, তুমি আমায় ধর্মদেহ দিয়েছ। তোমার মুহূর্তকালের তৃষ্ণা মেটাতে আমি দুধ খাইয়েছি, তুমি ধর্মদুগ্ধ পান করিয়ে আমাকে অক্ষয় শান্তি দিয়েছ। মান্ধাতা প্রভৃতি রাজার নাম ভবসাগরে লোপ পেয়েছে, কিন্তু তোমার মা হ'য়ে আমি ভবসাগরে উদ্ধার পেয়েছি। রাজার মা, রাজার মহিষী হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে সহজ, কিন্তু 'বুদ্ধমাতা' এই নাম পরম দুর্লভ। মেয়েদের প্রব্রজ্যার অধিকার দেবার জন্য আমি তোমায় বার বার বলেছি, সেজন্য কোনো দোষ হ'য়ে থাকে তো ক্ষমা কোরো। তোমার

আজ্ঞায় আমি ভিক্ষুণীদের শাসন করেছি, সে কাজে কোনো ত্রুটি হ'য়ে থাকে তো, হে আমার আধার, তুমি আমায় ক্ষমা কোরো। তোমার দেওয়া ধর্মরস পান ক'রে যে তৃপ্তি পেয়েছি, শৈশবে তোমার সুন্দর রূপ দেখে, তোমার মধুর কথা শুনে সে তৃপ্তি আমার হয়নি। হে বুদ্ধবীর, তোমায় নমস্কার, তুমি সকল সত্তার শ্রেষ্ঠতম। তোমার কৃপায় আমার মতো কত শত দীন দুঃখী দুঃখের জ্বালা এড়িয়েছে···।"

সমসাময়িক অন্যতমা থেরী শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণকন্যা মুক্তা বলেছেন :—

"শুভযোগে হও মুক্ত চন্দ্রসম রাহুগ্রাস হ'তে।
ঋণমুক্ত হ'য়ে মুক্তা পিণ্ডপাত করো কোনো মতে॥" (বিঃ মঃ)

সুকবি থেরী পূর্ণা বলেছেন :

"পূর্ণে, পূর্ণ করো প্রাণ পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র সম।
পূর্ণপ্রজ্ঞালোকে দূর করো তুমি অজ্ঞতার তম॥"

(বিজয় মজুমদার)

সুবক্ত্রী শুক্লা পাঁচশ' ভিক্ষুণীর নেত্রী ছিলেন, প্রকাশ্য সভায় ধর্মপ্রচার ক'রে তিনি বহুনারীকে মুক্তির বাণী শোনাতেন, তাঁর এক গুণমুগ্ধা শিষ্যা লিখে গেছেন,

"ওগো রাজগৃহবাসী, কেন সবে আছ মত্তপ্রায়।
শোনো গিয়া শুক্লা আজি ধর্মের মধুর গাথা গায়॥
বচনে যে মধু ক্ষরে, পান করি' দীপ্ত করো প্রাণ।
মধুর মাধুরী নহে কভু সেই অমৃত সমান॥
জ্যোতির্ময় ধর্মে রত, বীতরাগ সমাহিত-চিত।
সসৈন্যে 'মার'কে বধি' হয় তার জীবন বাহিত॥" (বিঃ মঃ)

মগধরাজ বিম্বিসারের সভাপণ্ডিতের মেয়ে সোমা বলেছেন ;—শ্রাবস্তীর কাছে এক বনে গাছতলায় ব'সে তিনি ধ্যান করছিলেন, —এমন সময় 'মার' তাঁর তপস্যাভঙ্গ করবার জন্য ভয় দেখাতে এসে অবজ্ঞাভরে ব'ললে, "যোগী ঋষিরা বহু তপস্যায় যে পরমপদ লাভ করেন, তুমি সামান্যা নারী হ'য়ে কি ক'রে তার সন্ধান পাবে ? চিরকাল রাঁধো বাড়ো, তবু তো হাত পা'কল না, এখন ও তো ভাত সিদ্ধ হ'ল কিনা বার বার টিপে দেখতে হয়।" তার উত্তরে সোমা নাকি তাকে বলেন—,

"নারীজন্ম লভিয়াছি বল তাহে ক্ষতি কি আমার ?
নরনারী সবাকার সত্যলাভে তুল্য অধিকার।
একাগ্র করিয়া চিত, আপনায় করিয়া নির্ভর,
অর্হতের পথ ধরি' ধীরে ধীরে হ'ব অগ্রসর।
বিষয়বাসনা যত, কালে হবে ছিন্ন মূল তার,
সত্যের আলোকে আর ঘুচে যাবে অজ্ঞান-আঁধার।
জান্ ওরে ভাল ক'রে, আপনারে দেখ্ দুরাশয়,
আমিও চিনেছি তোরে, নাহি আর নাহি কোন ভয়।"

(সত্যেন্দ্রঠাকুর)

মন্তাবতীরাজ মঞ্চের কন্যা সুমেধা বাল্যেই বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগিণী হয়েছিলেন। বারণাবতীরাজ অনিকর্তের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা চ'লছিল। অন্ন জল ত্যাগকরে তিনি মাতাপিতাকে ব'ললেন "আমি সংসারসুখ চাই না, হয় প্রব্রজ্যা, নয় মৃত্যু বরণ ক'রব।" শেষ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছারই জয় হ'ল, রাজকন্যা ভিক্ষুণী হ'য়ে শান্তি পেলেন।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে সে যুগের এমন অনেক মেয়েকে

দেখা যায়, যাঁরা প্রকৃতই নিঃস্বার্থ এবং ধর্মবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিতা ; তাই দেখি বিদুলা এবং কুন্তী সুপণ্ডিতা হ'য়েও অধর্মকে দমন করবার জন্য পুত্রদের নররক্তপাতে উৎসাহিত করছেন, আবার অপর দিকে দেখি রাজরাণী মদালসা পুত্রদের ব্রহ্মবিদ্যা শিখিয়ে নির্মমচিত্তে বনে পাঠাচ্ছেন। ছোটোবেলায় রাজপুত্র বিক্রান্ত একবার প্রজার ছেলেদের সঙ্গে খেলা ক'রতে গিয়ে মার খেয়ে এসেছিলেন। তিনি মায়ের কাছে নালিস করলেন এবং প্রজার ছেলের রাজপুত্রের গায়ে হাত তোলার স্পর্ধার জন্য শাস্তি দিতে বললেন। তাতে মদালসা তাঁকে বোঝালেন, "ভুলে যেও না তুমি শুদ্ধাত্মা। তোমার বিক্রান্ত নাম বা রাজপুত্র উপাধি প্রকৃত পদার্থ নয়, কল্পনামাত্র। রাজপুত্র ব'লে অভিমান করা তোমার সাজে না। আর যে দেহে আঘাত পেয়ে তুমি উত্তেজিত হয়েছ, সেই তোমার এই দৃশ্যমান শরীর পঞ্চভূত দিয়ে তৈরি, তুমি তো সে দেহ নও, তবে দেহের বিকারে তোমার কাঁদবার কি আছে?" এরকম মা আজকের দিনের বিদুষী নারীদের মধ্যে ক'জন আছেন জানতে ইচ্ছা হয়, আছেন কি ?

এর পর ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভেও ভারতে বিদুষী নারীর অভাব ছিল না। বাৎস্যায়নের মতে, "পুরুষের মতো মেয়েরাও কবি হ'তে পারেন।" শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্না রাজকন্যা মন্ত্রিকন্যা, কৌতুকি-ভার্যা এবং গণিকা তাঁর সময়ে অনেক দেখা যেত। তা' তিনি স্বীকার করে গেছেন। চৌষট্টিকলার মধ্যে কাব্যচর্চা মেয়েদের শিক্ষার অঙ্গ এবং বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক ব'লে বিবেচিত হ'ত। এই যুগে এবং এর পরবর্তী যুগে বিদুষী

নারীদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মসাধনার চেয়ে কবিতা রচনার দিকে বেশী ঝোঁক দিয়েছিলেন। মহাপুরুষ বুদ্ধের সময়ে কিছু-দিনের জন্য এই কাব্যস্রোতের মোড় ফিরে যায় ধর্মসাধনার দিকে নির্বাণের কামনায়। বুদ্ধদেব বলেছেন কোনো কোনো নারী পুরুষের চেয়ে ধর্মপ্রাণতায় এবং মানসিক শক্তিতে বড়। তিনি প্রথম যৌবনে তাঁর পাত্রীনির্বাচনের সময় 'মেয়ের কবিতা লিখতে জানা চাই'* এই দাবী জানিয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে মুক্তিসাধনার বিঘ্ন মনে ক'রে তিনি নারীকে সন্দেহের চক্ষে দেখতেন, তবু আনন্দের এবং মহাপ্রজাবতী গোতমীর অনুরোধে তাঁকে মেয়েদের সন্ন্যাসিনী হ'বার অনুমতি দিতে হয়। ভগবান, তথাগত যেদিন মহাপ্রজাবতী গোতমীকে ধর্মদীক্ষা দিলেন সেদিন ভারতীয় নারীর ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। ইতিমধ্যে দেশের বিলাস-ব্যসন বৃদ্ধি হয়েছিল। জাতীয় জীবনে মনোধর্মী আর্য সভ্যতার উপর প্রাণধর্মী অনার্য সভ্যতার যে প্রভাব মহা-ভারতের যুগেই দেখা দিয়েছিল তা' ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছিল। আত্মার উৎকর্ষসাধনের চেষ্টার চেয়ে পুরুষের অনুকরণে হাবভাব সাজসজ্জা এবং কলাচর্চায় তাদের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হ'ত, ফলে নারীপ্রতিভার বিপুল অপচয় ঘটছিল। হঠাৎ নবধর্মের নূতন উৎসাহবাণী তাদের আত্মসচেতন ক'রে তু'ললে, নির্বাণ-লাভের আশায় সহস্র সহস্র নারী সহসা সেদিন সংসারের সব সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে পথে এসে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে সকল-শ্রেণীর সকল অবস্থার নারীই ছিল, রাজরাণী থেকে ভিখারিণী,

* সা-গাথ লেখ-নিখিত গুণ অর্থযুক্তা যা ফলা ইদৃশ ভবেষ্মম তাং বরেথাঃ।

পতিতা এবং গণিকারা পর্যন্ত সেদিনের সেই ভিক্ষুণীসঙ্ঘে স্থান পেয়েছিল। এদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিতা ছিলেন তাঁরা পূর্বসংস্কৃতি ত্যাগ করেননি, তাঁদের পাণ্ডিত্য ধর্মের সেবায় লোকশিক্ষার কাজে লাগিয়েছেন, যাঁরা কবি ছিলেন তাঁরা ধর্মবিষয়ক কবিতা রচনা ক'রে মানুষের অন্তর জয় করেছেন। নারীর রচিত কবিতা শুধু শিক্ষিতের সৌখীনের সখের সামগ্রী হ'য়ে রাজসভায় এবং নাগরিকের প্রমোদভবনে ব'সে না থেকে যেদিন বিশ্বের প্রশস্ত রাজপথে ধর্মের জয়ভেরী বাজিয়ে যাত্রা ক'রল, 'সেদিন এক হ'য়ে গেল মান-অপমান, ব্রাহ্মণ আর জাঠ', সেদিন ভারতের এক পরম গৌরবের দিন। এর অনতিকাল পূর্বে এবং পরবর্তী বৌদ্ধ ও হিন্দু-যুগে পার্থিব প্রেম এবং প্রকৃতি-বর্ণনাই ছিল অধিকাংশ নারী-লিখিত কবিতার বিষয়-বস্তু, ভগবান বুদ্ধের পুণ্যপ্রভাবে প্রাথমিক বৌদ্ধ যুগের নারীকবিরা নিজেদের সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমায় প্রকাশিত হ'লেন, কাব্যক্ষেত্রে ধর্মের জয়গান গেয়ে দুঃখতপ্ত পৃথিবীকে অভয়ের এবং সান্ত্বনার বাণী শোনালেন। মৈত্রেয়ীর বাণী নূতন মূর্তি নিয়ে ফিরে এল।

থেরী অনুপমা ছিলেন সাকেত নগরের এক বিখ্যাত ধনীর মেয়ে, তিনি লিখেছেন, "আমার সৌন্দর্যখ্যাতি শুনে আমাকে বিবাহ করবার জন্য বহু রাজপুত্র, বহু শ্রেষ্ঠিপুত্র প্রার্থী হয়েছিলেন, তাঁদের দূতেরা এসে পিতাকে ব'লতেন 'অনুপমাকে ওজন ক'রলে যত সোনা হয়, তার আটগুণ সোনা দে'ব, আমাদের পাত্রকে কন্যাদান করুন' কিন্তু লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে দেখবার জন্য আমার প্রাণ উদ্বুদ্ধ হ'ল, তাঁর চরণবন্দনা ক'রে আমি ধ্যানে বসলুম। তিনি আমায় ধর্মদীক্ষা দিলেন।"

শুভানাম্নী এক থেরী আমবাগানে সাধনারত ছিলেন, এমন সময় জীবক নামক এক ধূর্ত্ত তাঁকে কুপথে নিয়ে যাবার জন্য চাটুবাদ আরম্ভ করে। জীবক বলে, "তোমার চোখ দুটি পাহাড়ী কিন্নরীর মতো অথবা হরিণীর মতো। ঐ চোখ দেখলে কি মানুষের প্রেমের তৃষ্ণা বেড়ে যায় না?" শুভা নিজের হাতে নিজের চোখ দুটি উপড়ে ফেলে ধূর্ত্তকে দিয়ে ব'ললেন, "হে পুরুষ, যে চোখ দুটির তুমি এত সমাদর ক'রছ, এই নাও, সে চোখ দুটি তোমাকেই দিলুম।" ধূর্ত্তের পাপলালসা নিমেষ মধ্যে ঘুচে গেল, সে পায়ে পড়ে সেই মহাভাগা তপস্বিনীর কাছে ক্ষমা চাইল এবং জীবনে আর কখনো পরনারীর দিকে পাপদৃষ্টিতে চাইবে না ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ল। বুদ্ধের কৃপায় শুভা দিব্যচক্ষু পেয়েছিলেন। ত্রিশটি গাথায় তিনি তাঁর জীবনের এই স্মরণীয় ঘটনাটি বর্ণনা করে গেছেন। কৃশা গোতমী লিখেছেন, "আমার দুই পুত্র মারা গেল, স্বামী অনশনে মারা গেলেন, মা বাবা ভাই একসঙ্গে একদিনে আগুনে পুড়ে মরলেন। আত্ম-জ্ঞানহারা হ'য়ে দারিদ্র্যের কষ্ট সইলুম, শ্মশানে পুত্রের মাংস গৃধিনীদের খেতে দেখলুম। এই রূপে পতিহারা কুলহারা হ'য়ে ভগবান বুদ্ধের দয়ায় অমৃতত্ব লাভ করেছি।"

সংসারে অনেক জ্বালাযন্ত্রণা পেয়ে যাঁরা বুদ্ধের ধর্মে সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন তার মধ্যে থেরী ঋষিদাসী তিন বার পতি-পরিত্যক্তা হয়েছিলেন, ভদ্রা আত্মরক্ষার জন্য স্বামী হত্যা ক'রে অনুতাপে দগ্ধ হয়েছিলেন, উষিবরী স্বামীশোকে এবং বৈশিষ্টী পুত্রশোকে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। অম্বপালী, বিমলা, অর্ধকাশী প্রভৃতি সুন্দরী গণিকারা তাঁদের পাপজীবনে জলাঞ্জলি

দিয়ে কি ভাবে নূতন জীবন পেয়েছিলেন, তা তাঁদের নিজেদের ভাষাতেই আমরা পাই। বিমলা ব'লছেন, "অমি আমার যৌবন, বর্ণ, রূপ, ভাগ্য ও খ্যাতির অহঙ্কারে মত্ত ছিলুম, লোকের মন ভোলাবার জন্য নানাভূষণে লেপনে দেহ সাজিয়ে ব্যাধের মতো জাল পেতে ব'সে থাকতুম। মানুষের ধর্ম ও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেবার জন্য নানা রকম ছলনা ক'রে আঁচল ওড়াতুম। আজ আমার মাথা মোড়ানো, পরণে ছেঁড়া কাপড়, ভিক্ষা ক'রে উদরান্ন সংগ্রহ করি, গাছতলায় ধ্যান ক'রে আমার জীবন কাটে। আমার সব বন্ধন কেটে গেছে, সব পাপ নষ্ট হয়েছে, নির্বাণের সুখ আমার চিত্ত অধিকার করেছে।" থেরী অম্বপালীর অলৌকিক সৌন্দর্য এক কালে জনপ্রবাদে পরিণত হয়েছিল। বৈশালীর এই সুন্দরীর মোহে মগধেশ্বর বিম্বিসারকেও এক দিন পড়তে হয়েছিল। বৈশালীতে তাঁর আম্রবনে বুদ্ধদেব বিশ্রাম করছেন শুনে অম্বপালী তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। তাঁর সামান্য বেশ-ভূষা অথচ সুন্দর মোহন মূর্তি! স্বয়ং বুদ্ধও তাঁকে দে'খে চমকে গেছলেন, মনে মনে ভেবেছিলেন, "স্ত্রীলোকটি কি অপূর্ব সুন্দরী! রাজপুরুষেরাও এর রূপলাবণ্যে মোহিত এবং বশীভূত, অথচ এ কেমন সুধীর শান্ত। সচরাচর স্ত্রীলোকের মতো যৌবনমদমত্ত চপলস্বভাবা নয়। জগতে এমন নারীরত্ন দুর্লভ।" অম্বপালীর চিত্তক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, পাপে বিতৃষ্ণা এসেছিল, বুদ্ধের ধর্মোপদেশে তাঁর মন গ'লে গেল। সশিষ্য বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ ক'রে পরিতোষ ক'রে খাইয়ে তাঁর প্রাসাদতুল্য উদ্যানভবন বুদ্ধ এবং সঙ্ঘকে দান ক'রলেন। পাপলব্ধ বিপুল ঐশ্বর্য সঙ্ঘের সেবায় ব্যয় ক'রে তপোবনে

অম্বপালী যৌবনেই থেরীপদ লাভ করেন। থেরী গাথায় আমরা তাঁর বার্ধক্যের উক্তি পাই, "আমার ভ্রমরকৃষ্ণ চুল আজ শণের মতো সাদা হয়েছে! যে চুলে আমি চাঁপা করবী গুঁজে রাখতুম সে এখন শশকের লোমের মতো কুৎসিৎ। আমার সুনীল আয়ত নেত্র এক দিন মণির মতো ভাস্বর ছিল, আজ তা মলিন। আমার স্বর্ণবর্ণ সুন্দর উঁচু নাক আজ শুকিয়ে ঝুলে পড়েছে··· বর্তুল অর্গলের মতো বাহু দুটি নত এবং দুর্বল হয়েছে।"

অধ্যাপক সুকবি ৺বিজয়কুমার মজুমদারের কবিতাটী হইতে সামান্য উদ্ধৃত করলেম;

"সুরভিত কালকেশে বেণী হত রচিত;
স্বর্ণভূষণে হয়ে খচিত।
দুলিত শোভায় সাজি,
স্খলিত জরায় আজি,
আজি মোর শির কেশ-রহিত,
সত্য বচন তাঁর অন্যথা কোথা বা ?"
"সোনার শাঁখের মত ছিল যার শোভা গো,
এই কি আমার সেই গ্রীবা গো ?
জরায় গিয়েছে ভেঙ্গে, ঝুলিয়া পড়েছে নেমে,
এ দেহের গৌরব কিবা গো ?
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?"

বৌদ্ধযুগের প্রথম দিকে মগধের তৎকাল প্রচলিত পালি-ভাষাতেই বৌদ্ধ ধর্মের অধিকাংশ বই লেখা হয়েছিল। বৈদিক সংস্কৃত সে সময়ে অপ্রচলিত হ'য়ে গেছে, সাধারণলোকের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা চ'লছে। সংস্কৃত তখন

শিক্ষিতের ভাষা, সর্বসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার ক'রতে সে ভাষার চেয়ে চলিত ভাষাই বেশী কাজে লেগেছিল, তাই বৌদ্ধ বিদুষীদের অধিকাংশ রচনাই পালিতে পাওয়া যায়। থেরী গাথা ছাড়া অন্যত্র যে সব নারীর রচনা পাওয়া যায় তার মধ্যে বুদ্ধপত্নী যশোধরার নাম উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভের পর যখন কপিলাবাস্তুতে শুদ্ধোধনের সঙ্গে দেখা ক'রতে গেছলেন তখন যশোধরা তাঁর শিশু পুত্র রাহুলকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন পিতৃধন চাইবার জন্য, বুদ্ধও তাকে নিজধর্মে দীক্ষা দিয়ে ভিক্ষু ক'রে নে'ন। এই উপলক্ষ্যে একটি পালি কবিতায় যশোধরা ছেলের কাছে তার পিতাকে চেনবার সুবিধার জন্য বুদ্ধের রূপ বর্ণনা করেছেন ; তাঁর শুদ্ধ নীল মৃদুকুঞ্চিত কেশ, সূর্যের মতো উজ্জ্বল প্রশস্ত ললাট, চক্রচিহ্নযুক্ত আরক্ত পদতল, সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুণ্য-শরীরের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, "সেই নরবীর লোকহিতের জন্য চলে গেছলেন,—সেই পুরুষসিংহই তোমার পিতা।" কবিতাটির মধ্যে পতিপরিত্যক্তা নারীর অভিযোগের বা অশ্রুর চিহ্নমাত্র নেই, পুরুষসিংহেরই উপযুক্ত সিংহিনীর বলিষ্ঠ মনের পরিচয়, তাঁর মহাপুরুষ স্বামীর জন্য অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং গৌরববোধ লেখাটির প্রতি ছত্রে দেদীপ্যমান।

থেরী-গাথা ছাড়া হীনযানী বৌদ্ধদের জাতকগুলিতে পালি-ভাষায় এবং মহাযানী বৌদ্ধদের বোধিসত্ত্বাবদানমালা ও জাতক মালার সংস্কৃত ভাষায় আমরা সে যুগের বহু মহীয়সী নারীর পরিচয় পাই। তাঁদের মধ্যে কাশীরাজ কৃকীর কন্যা মালিনী এবং কুমার কাশ্যপের মা'য়ের কথা উল্লেখযোগ্য। মালিনীর বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগ সনাতনপন্থী কাশীর রাজসভার

এবং প্রজাদের ভালো লাগেনি। তারা রাজার কাছে রাজকন্যার নির্বাসন দণ্ড প্রার্থনা করে, নিরুপায় হ'য়ে রাজাও কন্যাকে নির্বাসন দণ্ড দেন। গৃহত্যাগের পূর্বে মালিনী প্রকাশ্য সভায় রাজ্যের সমস্ত পণ্ডিতদের তর্কে পরাজিত ক'রে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেন। তার পর গৃহে থাকবার জন্য তাঁকে আবার সকলে অনুরোধ করে, কিন্তু সে অনুরোধ তিনি রাখেন নি। সারনাথে গিয়ে তিনি ধর্মজীবন যাপন আরম্ভ করেন, তাঁকে কেন্দ্র ক'রে তাঁরই চেষ্টায় দশ সহস্র ভিক্ষুণীর এক বিরাট সঙ্ঘ সারনাথে গড়ে ওঠে।

ভগবান বুদ্ধের জীবিতকালে ভিক্ষু কুমার কাশ্যপ এবং তাঁর মা দুজনেই অর্হত্ব লাভ করেছিলেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং বলেছেন ;— 'ভিক্ষু-সঙ্ঘের মধ্যে কুমার কাশ্যপ সব চেয়ে বাকপটু; তাঁর মতো ধর্মব্যাখ্যা ক'রতে কেউ পারত না।' এই ভিক্ষুর মা ছিলেন রাজ-গৃহের এক ধর্মপরায়ণা শ্রেষ্ঠিকন্যা। শৈশবে তিনি প্রব্রজ্যা নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাপ মার মত ছিল না ব'লে হয়নি। যৌবনে শ্বশুরকুলের সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ ছিল, তাঁদের বাধার জন্য প্রথমতঃ গৃহত্যাগ ক'রতে পারেননি, কিন্তু তাঁর মনে শান্তি ছিল না। একবার পর্বদিনে বাড়ীর সবাই সাজসজ্জা ক'রে উৎসবে যেতেছেন কিন্তু শ্রেষ্ঠিকন্যা প্রতিদিনের মতো সাধারণ সাজেই গৃহকর্মে লিপ্ত আছেন দেখে, তাঁর স্বামী প্রশ্ন ক'রলেন, "তুমি যে সাজলে না?" শ্রেষ্ঠিকন্যা ব'ললেন, "আর্যপুত্র, এই দেহ বত্রিশ রকম শবোপাদানে পূর্ণ, একে সাজিয়ে কি হবে? এ দেবনির্মিত বা ব্রহ্মানির্মিত নয়, স্বর্ণ, মাণিক্য বা হরিচন্দন দিয়েও তৈরি নয়, পদ্মযোনি বা অমৃত-

গর্ভও নয়। এ পাপপুষ্ট, মরণশীল বাপ-মার শরীর থেকে উৎপন্ন, ক্ষণভঙ্গুর, এর ক্ষয় এবং বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এ দেহ কদাচার-নিরত, দুঃখের আকর, পরিদেবনার হেতু, ব্যাধির মন্দির, কর্মের ক্ষেত্র, কৃমির বাসভূমি। শ্মশানভস্মের পরিমাণ বাড়ানোই এর কাজ। মরণের পর শ্মশানে ফেলে দিলেই এর স্বরূপ লোকে বুঝতে পারে।" এর পর দীর্ঘ একটি দেহতত্ত্বের গাথা শুনিয়ে ব'ললেন; "ভেবে দেখুন, এ রকম দেহ সাজিয়ে লাভ কি? একে সাজানো আর মলভাণ্ডকে বাইরে চিত্রিত ক'রে রাখা সমান কথা।" অতঃপর তাঁর স্বামী সংসারের প্রতি তাঁর বীতস্পৃহা দে'খে তাঁকে প্রব্রজ্যা নে'বার অনুমতি দিলেন। দেবদত্তের আশ্রমে ভিক্ষুণীদের যে উপাশ্রয় ছিল, তিনি নিজে তাঁকে সেখানে রেখে এলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রেষ্ঠিকন্যা তখন সবে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন, তা তিনি নিজেই জানতে পারেননি। উপাশ্রয়ে যাবার কিছুদিন পরেই তাঁর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় দুর্নামের ভয়ে দেবদত্ত তাঁকে তাড়িয়ে দেন। দীর্ঘপথ পদব্রজে চ'লে নিরুপায়া নারী শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের শরণাপন্না হন। ভগবান্ বুদ্ধ অগ্রশাবিকা উৎপলবর্ণাকে দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করিয়ে ভিক্ষুণী-সঙ্ঘে স্থান দিলেন। এই শ্রমণা কালে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন। প্রসবান্তে তাঁর ছেলেটিকে রাজা প্রসেনজিৎ লালনপালনের জন্য রাজপ্রাসাদে নিয়ে যান। রাজকুমারদের সঙ্গে লালিত হওয়ায় তাঁকে সবাই কুমার কাশ্যপ ব'লে ডাকত। এই ভিক্ষু-শ্রেষ্ঠের ধর্মজীবন এবং প্রতিভার জন্য তিনি তাঁর মা'র কাছে ঋণী।

বৌদ্ধযুগের আর কয়েকজন বিখ্যাতা মনস্বিনী নারী ভিক্ষুণী ধর্মপালী, তাঁর শিষ্যা সম্রাটকন্যা সঙ্ঘমিত্রা, ভিক্ষুণী হেমা

অগ্নিমিত্রা, সীবলা, মহারুহা, অঞ্জলি, অনুলা এবং চারুমতী। অশোককন্যা সঙ্ঘমিত্রা তথাগতের ধর্মের বাণী বহন ক'রে ভারতের কল্যাণদূতীরূপে যেদিন সিংহলে উপস্থিত হ'লেন, সেদিন সৌভাগ্যক্রমে সিংহলের নারীর চিত্তক্ষেত্র তাঁর ধর্মবীজ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল, সিংহলের রাজমহিষী অনুলা দেবী পাঁচশত সঙ্গীকে নিয়ে একদিনে বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিতা হলেন। 'দীপবংশ'নামক সিংহলীগ্রন্থে সঙ্ঘমিত্রা, হেমা এবং অগ্নিমিত্রাকে ত্রিবিধজ্ঞানপারদর্শিনী বলা হয়েছে। সীবলা এবং মহারুহা সুপণ্ডিতা ছিলেন, তাঁরা বিনয় সূত্রপিটক এবং অভিধর্ম পড়াতেন। অশোকের আর এক কন্যা চারুমতী নেপালে বিহারস্থাপন করেছিলেন এবং বহু নারীকে ধর্মদীক্ষা দিয়েছিলেন। অঞ্জলিনাম্নী ভিক্ষুণী শাস্ত্রজ্ঞা এবং দৈবশক্তিসম্পন্না ছিলেন। মধ্য এসিয়ার কুচীরাজ্যের বিদুষী রাজকন্যা জীবা উত্তরভারতের এক পরিব্রাজক ভিক্ষু কুমারায়ণের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে পতিরূপে বরণ করেছিলেন। তাঁদের যোগ্যপুত্র কুমারজীবের নাম সকলেই জানেন। জীবা দুই পুত্রের জন্মের পর সংসার ত্যাগ ক'রে ভিক্ষুণী হন। তাঁর শিক্ষায় কুমারজীব সাতবছর বয়সে বহু শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, কিন্তু কুচীরাজ্যের জ্ঞানভাণ্ডার ছেলের পক্ষে যথেষ্ট নয় মনে ক'রে জীবা তাঁকে নিয়ে কাশ্মীরে আসেন। সেখানে শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে কুমারজীব কুচীতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন, পরে চীনসম্রাটের আক্রমণে কুচীরাজ্য ধ্বংস হ'লে তিনি বন্দীরূপে চীন-রাজসভায় উপস্থিত হন। সেদিন থেকে ত্রিশবৎসর ধরে তিনি চীনের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের দীক্ষাগুরু ছিলেন, বহু সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ সংস্কৃত থেকে চীনভাষায়

অনূদিত ক'রে তিনি ভারত এবং চীনকে এক ধর্মসূত্রে বেঁধেছিলেন। তাঁর আগে এবং পরে বহু পণ্ডিত চীন দেশে গেছেন, কিন্তু সহস্রাধিক বৎসর ধরে যে সম্মান তিনি চীনে পেয়েছেন, আর কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির ভাগ্যে সে রকম সম্মানপ্রাপ্তি ঘটেনি। এই মহাপুরুষের জীবনের সকল উন্নতির মূলে ছিল তাঁর বিদুষী বিদ্যানুরাগিণী মা জীবার অনলস পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগ।

বুদ্ধের সমসাময়িক মহাপুরুষ মহাবীরের ধর্মেও সে যুগের বহু বিদুষী নারী শান্তি এবং শ্রেয়োলাভ করেছিলেন, জৈনসাহিত্যে তাঁদের অনেকের নাম এবং ধর্মকীর্তির উল্লেখ আছে। মহাবীরের মা ত্রিশলা ছিলেন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের শিষ্যা, মহাবীরের পত্নী যশোদাও তাঁর ধর্মে দীক্ষিতা হ'য়েছিলেন এবং বহু নারীকে ধর্মপথে আকর্ষণ করেছিলেন। বৈশালীরাজ চেতকের মেয়ে চন্দনা ছিলেন বিখ্যাত জৈনবিদুষী, তাঁর অন্যান্য বোনদের মধ্যে বিম্বিসার-মহিষী চেল্লনা এবং কৌশাম্বী রাজমহিষী মৃগাবতী এবং মহাবীরের ভাই নন্দীবর্ধনের স্ত্রী জ্যেষ্ঠা এবং আর একবোন সুজ্যেষ্ঠা মহাবীরের শিষ্যা ছিলেন। তাঁদের সকলেরই পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। আনন্দের বোন শিবনন্দা ছিলেন বিখ্যাত জৈনধর্ম-প্রচারিকা। জৈন সন্ন্যাসিনীদের সাধারণতঃ 'সাধ্বী' বলা হয়, সুপণ্ডিতা চন্দনা ছত্রিশ হাজার সাধ্বীর মধ্যে প্রধানা ছিলেন। ঐ যুগের জৈনসন্ন্যাসিনীদের রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই ; সুতরাং এখানে কোন কিছু উদ্ধৃত করা সম্ভব হ'ল না। গুজরাত অঞ্চলে আজও বহু জৈন ভিক্ষুণী তাঁদের আদর্শ জীবন এবং ধর্মানুরক্তির জন্য জনসাধারণের

সমস্তা হ'য়ে আছেন। মহাবীরের বহুপূর্বে যে সব তীর্থঙ্কর জন্মেছিলেন ব'লে জৈনদের বিশ্বাস, তাঁদের মধ্যে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের দুই বোন ব্রাহ্মী এবং সুন্দরী, অন্যতম তীর্থঙ্কর অমরনাথের মা অযোধ্যারাজ সুদর্শনের মহিষী রাণী দেবী প্রভৃতি সুপণ্ডিতা জৈন নারীর নাম পাওয়া যায়। তীর্থঙ্কর অমরনাথের তিন লক্ষ বিশহাজার ভিক্ষুণী শিষ্যা ছিলেন ব'লে শোনা যায়। অবশ্য এই সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের নারীদের সম্বন্ধে সত্যমিথ্যা নির্ণয় করা আজ সম্ভবপর নয়।

বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের প্রাবল্যের যুগেও সকল বিদুষীই কিছু আর সন্ন্যাসিনী হন নি, বিশাখা, সুজাতা প্রভৃতি ধর্মশীলা বিদুষী গৃহস্থ নারীর পরিচয় আমরা জাতকে এবং অন্যত্রও পাই। আবার ঈশ্বরদত্ত ধীশক্তিকে যাঁহারা পরের ক্ষতির জন্য কাজে লাগাতেন এমন মেয়েরও সে যুগে অভাব ছিল না। মগধেশ্বর নবম নন্দের মন্ত্রী শাকটালের সাতটি মেয়ে—যক্ষা, যক্ষদত্তা, ভূতা, ভূতদত্তা, এণির্কা, বেণা এবং রেণা শ্রুতিধরী ছিলেন। প্রথমা এক বার, দ্বিতীয়া দুই বার, তৃতীয়া তিন বার, এই ভাবে সপ্তমা সাতবার কোনো কিছু শুনলে কণ্ঠস্থ করতে পারতেন। রাজসভায় নূতন কবিদের পুরস্কার দে'বার প্রথা ছিল কিন্তু শাকটাল অন্যের সম্মান সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর ব্যবস্থা মতো সভায় কোনো নূতন কবিতা পড়া হলেই যক্ষা সেটির পুনরাবৃত্তি করতেন, কবির এবং যক্ষার আবৃত্তি শুনে যক্ষদত্তা, তাঁদের তিন জনের আবৃত্তি শুনে ভূতা, এইভাবে সাতজন মেয়ে যখন পরে পরে কবিতাটি আবৃত্তি করতেন তখন সেটিকে পুরাতন এবং বহু প্রচলিত ব'লে উড়িয়ে দেওয়া হ'ত। বিখ্যাত কবি

বররুচি এই সাত বোনের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন বলে প্রবাদ আছে।

প্রাচীন যুগের বিদুষী নারীদের কথা বলতে হ'লে ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশের কথাও কিছু বলা দরকার। আজ থেকে পাঁচ ছ' হাজার বছর আগে মিশরের নারী পুরোহিতরা সুপণ্ডিতা এবং ভবিষ্যদ্বক্ত্রী ব'লে বিখ্যাতা ছিলেন। বহু সহস্র বৎসর ধরে মিশরে এই পুরোহিতাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল. দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডার এই রকম এক নারীর ভবিষ্যদ্বাণী শোনবার জন্য নিজের অভিযানের পথ ছেড়ে চারশ' মাইল মরুভূমি পার হয়ে উবাস্তি দেবীর মন্দিরে গেছলেন, সেই নারীর ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে সফল হয়েছিল।

সম্রাজ্ঞী টিয়ি তাঁর স্বামীর এবং পুত্রের রাজত্বকালে এক বিরাট ধর্মান্দোলনের প্রবর্ত্তন ক'রে একেশ্বরবাদ প্রচলনের চেষ্টা করেন, পাণ্ডিত্যে এবং প্রতিভায় তাঁর সমসাময়িক কোনো পুরুষ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। আখেনাটনের রাজত্বকালে তিনি এবং তাঁর পুত্রবধূ নেকারতিতিই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের কর্ণধার; শিল্প সাহিত্যের উৎসাহদাত্রী হিসাবে তাঁরা দুজনেই ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া হয়ে আছেন। সম্রাজ্ঞী হাটসেপ্‌সুট বা হাত্তাসু একদিকে রণকুশলা নেত্রী, অপরদিকে সুপণ্ডিতা এবং বহু কলাবিশারদা। তাঁর সমাধি-মন্দিরের ছবিগুলিতে আমরা তাঁর জ্ঞানপিপাসার বহুতর প্রমাণ পাই, বিভিন্ন দেশ আবিষ্কার, বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সংস্কৃতির আদান-প্রদান তাঁকে আনন্দ দিত। 'পণি' (ফিনিসীয়া) দের দেশে তাঁর অভিযানের ছবিগুলি এদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টের আড়াই হাজার বছর আগে আসিরিয়া সম্রাজ্ঞী সেমিরাসিস রূপে গুণে বীর্য্যে এবং পাণ্ডিত্যে অতুলনীয়া ছিলেন। পৃথিবীর দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর অসীম শক্তি এবং অতিমানুষী প্রতিভা বিপথে পরিচালিত হ'য়ে লক্ষ লক্ষ লোকের দুঃখের কারণ হয়েছিল।

খৃষ্টের প্রায় তেরো শ' বছর আগে এসিয়া মাইনরে ইলিয়াম নগরে বহু বিদুষী নারী ছিলেন, তন্মধ্যে রাজা প্রিয়ামের দুহিতা কাসাণ্ড্রা ভবিষ্যদ্বক্ত্রীরূপে বিখ্যাত ছিলেন। ট্রোকানেজের পরাজয় এবং ইলিয়াম নগরের পতন সম্বন্ধে তিনি বহু পূর্ব্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। গ্রীসদেশে ঐ যুগে নারী পুরোহিত, সম্ভ্রান্তবংশীয়া নারী এবং গণিকাদের মধ্যে বিদ্যা এবং কলাচর্চ্চা ভারতবর্ষের মতোই প্রবল ছিল। পেরিক্লিসের প্রিয়তমা অ্যাস্পেসিয়া তাঁর উপযুক্ত সঙ্গিনী ছিলেন, তাঁর পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্যবোধ এবং একনিষ্ঠ প্রেম পেরিক্লিসের প্রেরণার উৎস ছিল। এথেন্সের চরম গৌরবের দিনে শিল্পে স্থাপত্যে তার চরম উন্নতি ঘটেছিল নারীর প্রভাবে। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'সাফো' নাম্নী এক বিদুষী নিষ্ফল প্রণয় নামক একটি কবিতার বই লিখে এবং নূতন একটি ছন্দের প্রবর্ত্তন করে বিখ্যাত হন। প্রণয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ইনি পুরুষবিদ্বেষিণী এবং বিপথগামিনী হন। তাঁর কবিতার একটু উদাহরণ দিচ্ছি (প্রথম বয়সে) "মেয়েটি যেন একটি মিষ্টি আপেল, গাছের মগ্‌ডালের শেষ বোঁটায় পেকে লাল টুকটুক্ করছে। লোককে ভুলিয়ে নিজেকে পাড়িয়ে তবে ছাড়ল! (পরে) পাহাড়ী রাস্তার ধারে ফুটে আছে—সে যেন একটি পাহাড়ী ফুল, রাখালদের পায়ের

আঘাতে বারে বারেই সে কেঁপে কেঁপে উঠছে দারুণ ব্যথায়; শেষ পর্যন্ত পথিকের পায়ের চাপেই তার রঙের মায়া মাটিতে মিশিয়ে যাবে।"

রোমের প্রথম যুগের রাজা টার্কুইনাস সিবিলা নাম্নী এক ভবিষ্যদ্বক্ত্রীর কাছে তাঁর লেখা তিনখানি বই কেনেন। সে-গুলির সার্থকতা পরে জানা যায়, ধর্মমন্দিরে রোজ পূজার সম্মান দিয়ে রোমানরা সিবিলার বই ক'খানিকে চিরস্মরণীয় করে। যখন রাজ্যের মধ্যে কোনো বিষয়ে কোনো গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হত; তখনই রোমানরা সিবিলের বই থেকে তার সন্তোষজনক মীমাংসা পেতেন। প্রথম সিবিলের নাম থেকে ভবিষ্যদ্বক্ত্রী মাত্রই রোমে সিবিল উপাধি পেতেন।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগর ছিল পশ্চিম এসিয়া, য়ুরোপ এবং আফ্রিকার জ্ঞানতীর্থ। শত শত বৎসর ধ'রে সহস্র সহস্র পণ্ডিতের আজীবন সাধনায় এই নগরীর বিরাট গ্রন্থাগারগুলি সুসমৃদ্ধ হয়েছিল। শেষ স্বাধীন সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার সময়ে আমরা মিশরদেশের পরিপূর্ণ দীপ্তির মধ্যে এক নারীকে দে'খতে পাই।

ইতিহাসের অপূর্ব চরিত্র এই নারী! ক্লিওপেট্রার চরিত্রে বালিকার সারল্য এবং বয়োবৃদ্ধের বুদ্ধিবিদ্যার একত্র সমাবেশ ঘটেছিল।

দেবীর মতো রূপ এবং সাপের মতো কুটিলতা তাঁকে বহুজনপ্রিয়া এবং সর্বজন-নিন্দিতা করেছিল, এখানে তাঁর নৈতিক চরিত্র আলোচনা ক'রে লাভ নেই, সুপ্রাচীন মিশর সভ্যতার শেষ সৃষ্টি হিসাবে, পাপপুণ্যবিজড়িত অতীত সংস্কৃতির প্রতীক

হিসাবে আমরা তাঁকে শুধু বোঝবার চেষ্টা ক'রব। খৃষ্টপূর্ব উনসত্তর অব্দে মিশরের টলেমি নামক গ্রীকরাজবংশে এই কন্যার জন্ম হয়। সেদিনের সব চেয়ে বড় অধ্যাপকরা তাঁকে শৈশব থেকে পড়িয়েছেন, সব চেয়ে বড় শিল্পীরা ছবি আঁকতে নাচতে গাইতে শিখিয়েছেন। কিন্তু শেখালেই সকলে সব কিছু শিখতে পারে না, গ্রহণ করবার শক্তি চাই। ক্লিওপেট্রার সেই অসামান্য গ্রহণশক্তি ছিল, আর ছিল লোকোত্তর প্রতিভা। চৌদ্দবছর বয়সে তাঁর পাণ্ডিত্যখ্যাতি তাঁর রূপের খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে, তার মধ্যেই তিনি আটটা ভাষায় অবলীলাক্রমে কথা ব'লতে পারতেন, রাজনীতির কূটতর্ক, দর্শনের গভীরতত্ত্ব, শিল্পকলার নিগূঢ় রহস্য নিয়ে অনায়াসে আলোচনা ক'রতে পারতেন। সতেরো বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি ছোট ভাই টলেমির সঙ্গে একত্রে রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী হ'লেন। ছ'জনে এক সিংহাসনে ব'সলেও স্বাধীন ভাবে রাজকার্য দেখতেন ক্লিওপেট্রাই। ক্রমে টলেমি বড় হ'য়ে ক্লিওপেট্রার রাজশক্তি কেড়ে নিলে, তিনি সিরিয়ায় গিয়ে সৈন্যসংগ্রহে নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে পরাজিত পলায়মান 'পম্পি'কে অনুসরণ করে রোমের দিগ্বিজয়ী সেনাপতি জুলিয়াস সিজার মিশরে আসেন। এখানে অসামান্য রূপবতী ও কূটনীতিজ্ঞা সুশিক্ষিতা ক্লিওপেট্রার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, পরিশেষে ক্লিওপেট্রা পরামর্শদাত্রীরূপে বিরাট সাম্রাজ্য শাসনে তাঁকে সাহায্য করতে থাকেন, সিজারের হত্যার পর তিনি স্বরাজ্যে ফিরে আসেন। অতঃপর নানারূপ অনাচার অনুষ্ঠানের পরিণামে ইচ্ছাকৃত সর্পদংশনে নিজেই নিজ পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করেন। এত বড় একটা নারী-প্রতিভার এইরূপ নিদারুণ পরিণতি সত্যই পৃথিবীর দুর্ভাগ্য !

বর্বরের আক্রমণে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের জ্ঞানের প্রদীপ নির্বাপিত হয়, সেদিন যে ক্ষতি হয়েছে, দু'হাজার বৎসরেও তার সম্পূর্ণ সম্পূরণ হ'ল না ! সে যুগের বহু মনীষীর সঙ্গে বহু মনস্বিনীর কীর্তি এমন কি নাম পর্যন্ত আমরা সেদিন হারিয়ে ফেলেছি। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যে কয়েকজনের নাম আজও টি'কে আছে, তাঁদের কথাই আমরা শুধু জানি এবং ব'লতে পারি। আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিওপেট্রার তিনশ' বছর পরে ক্যাথারিন নাম্নী এক বিদুষী তরুণী খৃষ্টধর্মানুরাগের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন।

সম্রাট্ ম্যাক্সিমিনিয়াসের নিষ্ঠুরতায় শত শত মানুষের মৃত্যু দেখে তিনি বিচলিত হন, এবং তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ান। সম্রাটের সভায় সমবেত পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে হারিয়ে এই সুপণ্ডিতা নারী সম্রাটের বিরাগভাজন হন। খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করতে সম্মতা না হওয়ায় তাঁকে নিষ্ঠুর নির্যাতনের পর হত্যা করা হয় ('৩০৭' খৃষ্টাব্দে)। এই ব্রহ্মচারিণী বিদুষীকে পরবর্তী যুগের খ্রীষ্টানেরা ঋষি ব'লে সম্মানিতা করেছেন ঐ চতুর্থ শতাব্দীতেই আর একজন অসামান্যা রূপসী এবং বিদুষী মিশরে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, তিনি পণ্ডিত থিয়নের কন্যা হাইপেসিয়া। এই পুণ্যশ্লোকা ক্যাথারিণা হাইপেসিয়া প্রভৃতি অনেকে খৃষ্টধর্মের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আত্মোৎসর্গ করেন। ক্যাথারিণের আত্মদানের পর ইতিমধ্যে খৃষ্টধর্ম রোমকসাম্রাজ্যের রাজধর্মে পরিণত হয়েছে এবং নব ধর্মের ধর্মান্ধতা অতীতের

জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য সব কিছু নির্মমভাবে ধ্বংস ক'রতে আরম্ভ করেছে। আলেকজান্দ্রিয়ার সেই পতনের যুগে মিশরের প্রাচীন ধর্মের সেই চরম দুর্দিনে স্বজাতির প্রাচীন সভ্যতাকে এবং স্বধর্মের কল্যাণ-বাণীকে রক্ষার জন্য প্রবল শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে দাঁড়িয়েছিলেন হাইপেসিয়া। এই মহীয়সী নারী বক্তৃতার পর বক্তৃতায় মিশরবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন তাদের অতীত গৌরব, তাদের ধর্মের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। বোঝালেন সবাই যাকে ছেড়েছে তাকে ছাড়ার মধ্যে বাহাদুরী নেই। সেদিন নব ধর্মের পক্ষে সায় দিয়ে গেলে অর্থ এবং রাজদত্ত সম্মানে তাঁর জীবনে কিছু অভাব হ'ত না। কিন্তু সাংসারিক সাচ্ছন্দ্য সম্মানকে তিনি তৃণজ্ঞান ক'রতেন। তাঁর অবহেলিত স্বধর্মের পক্ষ নিয়ে ধর্মান্ধ জনসমুদ্রের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়ালেন পর্বতের মতো উচ্চ শিরে। তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতায় ক্রমে জনমতের পরিবর্তন হচ্ছে দেখে, খৃষ্টান পুরোহিতের দল তাঁদের শিশুসুলভ যুক্তি-তর্ক নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত কুটিল পথ আশ্রয় করলেন, ধর্মোন্মত্ত পশুপ্রকৃতির একদল লোককে লেলিয়ে দিলেন তাঁকে হত্যা করার জন্য। হাইপেসিয়ার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড খৃষ্টধর্মের এবং খৃষ্টানজাতিকে কলঙ্ক কালিমা প্রলিপ্ত করেছিল।

এই যুগে পৃথিবীর আর একপ্রান্তে চীনদেশে বিদুষী নারীদের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু না ব'ললে অন্যায় হবে। প্রাগৈতিহাসিক চীনের নারীতন্ত্র সমাজ সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছিল, সেখানে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মেয়েরা রাজসভার

সভাসদ এবং রাজপুরুষদের দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হতেন, তার প্রমাণ আছে।

আজ থেকে প্রায় পৌনে পাঁচহাজার বছর আগে সম্রাট্ হোয়াংতি বিচ্ছিন্ন চীনকে একত্র ক'রে 'চীনজাতির জনক' এবং 'পীত সম্রাট্' উপাধি পান। এই সম্রাটের উপযুক্ত পত্নী লেইৎসু সর্বপ্রথম রেশম আবিষ্কার করে জগতের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। চীনের পরবর্ত্তী যুগের বিদুষীদের মধ্যে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে হ্যান্ সম্রাট চেংটির প্রিয়পাত্রী বিদুষী 'প্যান-চিয়ে-উ'র নাম উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে সম্রাট এঁকে অতিরিক্ত সম্মান দেবার জন্য রথে ক'রে নিজের সঙ্গে নগর ভ্রমণে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেন "প্রাচীনকালে সম্রাটরা সুবিজ্ঞ মন্ত্রীদের নিয়ে ভ্রমণে যেতেন, নারী নিয়ে ভ্রমণে রাজমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে।' পরে অন্য রূপসী এবং বিদুষী এক নারীর মোহে সম্রাট তাঁকে অনাদর করায় 'প্যান চিয়ে-উ' সম্রাটকে একটি পাখার উপর এই কথাগুলি একটি সুন্দর কবিতায় লিখে পাঠান। "গ্রীষ্মাবসানে হত-গৌরব শরৎকালের পাখার মতো আমি আজ অনাদৃত হয়ে পড়ে আছি। বিস্মৃত সুখের দিনগুলির মতো আমিও বেঁচে থেকেই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গেছি।" শেষ বয়সে রাজমাতার সেবা এবং ধর্মচর্চায় তাঁর দিন কাটে, তাঁর সেই 'শরৎকালের পাখা' কথাটি চীনদেশে আজও অনাদৃতা নারীর সমার্থবোধক হ'য়ে আছে।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট 'টুশাও জুই'এর (২০৫-২৪০) রাজত্বকালে নারী-সভাসদ এবং রাজপুরুষ নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। সম্রাটের কয়েকজন প্রধানা রাজকর্ম্মচারী ছিলেন নারী। খৃষ্টীয়

অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত চীন রাজ্যের বিদুষী নারীরা শাসন, বিচার প্রভৃতি বিভাগে উচ্চ রাজপদ লাভ ক'রতেন এবং জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন।

প্রাচীন কালে যে সব বিদুষী আরব নারীদের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে পালমিরার রাণী পূর্বদেশের সম্রাজ্ঞী জেনোবিয়ার নামই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সময়ে রোমের রাজসভার চেয়ে তাঁর সভায় অধিকসংখ্যক জ্ঞানী এবং গুণীর সমাবেশ হয়েছিল, তিনি নিজে জগতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সঙ্গে জ্ঞানালোচনা করতে ভালো বাসতেন। সম্রাট অরেলিয়ানের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় জেনোরিয়ার পরাজয় এবং পালমিরার পতন হয়।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে চীনদেশে সম্রাট 'ফুচিয়ান' একসময় 'টুটাও' নামক এক রাজপুরুষকে কোনো অপরাধের জন্য তাতারের মরুভূমিতে নির্বাসিত করেন। 'টুটাও'এর বিদুষী পত্নী 'সু হুই' তাঁর স্বামীর প্রবাস-দুঃখ ভোলাবার জন্য তাঁর নিজের অবর্ণনীয় বিরহবেদনাকে ছন্দোবদ্ধ একখানি কাব্যে ভাষাদান করেন এবং কাব্যখানি লোকমারফত টুটাওএর কাছে পাঠিয়ে দেন। চীনভাষা না জানায় এই 'নব মেঘদূত' থেকে কোনো উদাহরণ দিতে পারা গেল না।

ভারতবর্ষে আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কর্ণাটেশ্বরী বিজয়াঙ্কা সরস্বতীর অবতার এবং বৈদর্ভী রীতির কবিতা রচনায় মহাকবি কালিদাসের সমকক্ষ ব'লে সম্মানিতা হয়েছিলেন। কবি চণ্ডালবিদ্যা সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য এবং কালিদাসের সঙ্গে এক যোগে একটি কবিতা রচনা ক'রে তাঁর তৎকালীন প্রতিষ্ঠার এবং রচনাশক্তির উদাহরণ রেখে গেছেন।

এঁদের কথা পরে ব'লব।

কাশ্মীরে আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা তুঞ্জীনের মহিষী রণরম্ভা দেবী ছিলেন মহাপণ্ডিতা এবং যোগসিদ্ধা।

রাজতরঙ্গিণীর লেখকের মতে তিনি দেবী ভ্রমরবাসিনীর অবতার ছিলেন, দেহ ত্যাগ করে ভিন্ন দেহ ধারণ, মায়াদেহ সৃষ্টি প্রভৃতি অলৌকিক শক্তি বা বিভূতির অধিকারিণী ছিলেন ব'লে কাশ্মীরের রাজা প্রজা সকলের কাছে তিনি পূজনীয়া ছিলেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পৃথিবীর নানা দেশে বহু বিদুষী নারীর আবির্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে হিল্ডা নাম্নী বিদুষী পুণ্যবতী নারী (৬১৪-৬৮০) হুইট্‌বি মঠের প্রথম মঠাধ্যক্ষা ছিলেন। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অনুপম চরিত্র এবং অত্যদ্ভুত সাধনার জন্য খ্রীষ্টান জগৎ তাঁকে ঋষি ব'লে সম্মানিত করেছে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের আর একজন সুপণ্ডিতা রাজবংশীয়া নারী ছিলেন প্রভাকর বর্ধনের কন্যা কনৌজের রাণী রাজ্যশ্রী।

মালব ও গৌড়েশ্বরের আক্রমণে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হ'লে তিনি বন্দিনী হন, নানা কৌশলে বন্দিশালা থেকে পালিয়ে বিন্ধ্যারণ্যে গিয়ে তিনি চিতায় পুড়ে মরবার আয়োজন করছিলেন। এমন সময় হর্ষবর্ধন এসে পড়ে তাঁকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করেন। তার পর দিগ্বিজয়ী হর্ষকে উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য পরিচালনে সাহায্য ক'রে, তাঁর সঙ্গে ধর্মালোচনায় যোগ দিয়ে এবং তাঁর সকল সৎকর্মের অংশভাগিনী হ'য়ে এই পুণ্যবতী সম্রাট্‌ভগিনী ইতিহাসে বরণীয়া ও স্মরণীয়া হয়ে আছেন।

চীন সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী বহু শাস্ত্রবিশারদ 'উহু' (৬২৫-৭০৫) এই শতাব্দীতেই 'পরমেশ্বর' উপাধি ধারণ ক'রে দোর্দণ্ড প্রতাপে স্বাধীনভাবে সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন। তাঁর জীবন বহুপাপে কলুষিত কিন্তু তাঁর রাজনীতিক জ্ঞানের প্রাধান্য অস্বীকার ক'রার উপায় নেই।

দাক্ষিণাত্যের মাহিষ্মতী নগরীর মণ্ডনমিশ্রের পত্নী উভয়-ভারতীকে অষ্টম শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠা বিদুষী ব'ললে অত্যুক্তি হবে না।

গত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতে শঙ্করাচার্যের মতো দার্শনিক পণ্ডিত জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। সেই মহাপণ্ডিতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মণ্ডনমিশ্র যখন অধ্যাত্মতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হলেন, তখন সর্ববাদিসম্মতিক্রমে উভয়ভারতীর উপর জয়-পরাজয়ের মীমাংসার ভার পড়ল। কয়েকদিন তর্কের পর মণ্ডনমিশ্র পরাজিত হ'লে উভয়ভারতী অসঙ্কোচে সে কথা সর্ব সমক্ষে ঘোষণা করলেন, তারপর নিজে শঙ্করের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামলেন। শেষ পর্যন্ত পরাজিতা হ'লেও এই বিদুষী নারীর গৌরব-দীপ্তি সেই পরাজয়ে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

এই যুগের যে সমস্ত নারী সংস্কৃতে কবিতা রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনার পূর্বে অন্যান্য ভাষার এবং অন্যান্য দেশের সাহিত্যিকা এবং বিদুষীদের কিছু কিছু পরিচয় দিয়ে নিতে চাই।

আরবে ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বে স্ত্রীশিক্ষার অভাব থাকলেও স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব ছিল না, জেনোবিয়া প্রভৃতি

মেয়েরা রাজ্যশাসন করতেন, সাজা প্রভৃতি বিদুষী ধর্মপ্রচার করতেন, মধ্যে মধ্যে এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই।

মুসলিম রাজত্বের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীস্বাধীনতা কিছু ক'মল বটে কিন্তু পারস্য, ভারত, মিশর, রোম প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে সংস্পর্শে এসে আরবজাতির জ্ঞানস্পৃহা বাড়ল, ফলে স্ত্রীশিক্ষারও উন্নতি হ'ল। সপ্তম শতাব্দীতে হজরত মোহম্মদের কন্যা জোহরা, হজরতের কনিষ্ঠা পত্নী আয়শা এবং তাঁর ভগ্নি এস্‌মা, হোসেনের কন্যা সকীনা প্রভৃতি সুকবি এবং বিদুষী ছিলেন। তাঁরা প্রকাশ্য সভায় কবিতা পড়তেন এবং শাস্ত্র আলোচনা করতেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শেখা শুহ্‌দা বাগ্‌দাদ্‌ নগরে ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতেন। এই সময়ে মুসলিম জগতের অদ্বিতীয়া ধর্মনেত্রী এবং সাধিকা তপস্বিনী রাবেয়া বাস্‌রা নগরে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ধর্মদীক্ষা দিয়েছেন। তাঁর মুখে ধর্মোপদেশ শোনবার জন্য যেমন জনসাধারণের আগ্রহের অন্ত ছিল না, তেমনি তিনিও নিরলস ভাবে চিরদিন জ্ঞানের সাধনা ক'রতে ত্রুটি করেন নি, সাধকপ্রবর হোসেন বাস্‌রীয় ধর্মসভায় নিয়মিত জিজ্ঞাসু রূপে উপস্থিত থাকিতেন। সামান্য ক্রীতদাসী থেকে নিজের চেষ্টায় আত্মোন্নতি ক'রে চরিত্রের এবং সাধনার বলে রাবেয়া মুসলিম জগতের প্রণম্যা এবং সর্বদেশের সর্বকালের প্রকৃত ধর্মপ্রাণা নরনারীদের মধ্যে অন্যতমা ব'লে স্বীকৃতা হয়েছেন।

মৌর্যযুগ থেকে মুসলমান রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত দেড় হাজার বছর ধরে বহু নারী ভারতবর্ষের ধর্মে সাহিত্যে এবং কাব্যে তাঁদের দান রেখে গেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রাথমিক যুগের বৌদ্ধ-

নারীদের রচনা পালিতে এবং পরবর্তী যুগের হিন্দু বৌদ্ধ অধিকাংশ বিদুষী নারীর রচনাই সংস্কৃতে পাওয়া যায়।

সংস্কৃত কবিদের রচনার নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া গেলেও তাঁদের অনেকেরই সময় নির্ধারিত হয়নি, সুতরাং তাঁদের কথা পরে একসঙ্গে আলোচনা করব।

হিন্দু বৌদ্ধ যুগে যাঁরা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় কবিখ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে তৎপূর্বে দু'এককথা বলা দরকার। ভারতবর্ষের অ-সংস্কৃত দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে তামিল ভাষার ইতিহাস খুব প্রাচীন। তামিল দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ধর্মগুরুদের নাম ছিল আলোয়ার। এই আলোয়ারদের মধ্যে একমাত্র নারী আলোয়ার আণ্ডাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শ্রীবিল্লিপুট্টুর মন্দিরের পূজারী সুকবি পেরিয়া আলোয়ারের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

আণ্ডাল শিশুকাল থেকেই ধর্মপ্রাণা ছিলেন, নারায়ণকে পতিরূপে বরণ ক'রে তিনি চিরকৌমারব্রত গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণুমন্দিরে দেহত্যাগ করেন। তাঁর কবিত্বের খ্যাতি এক দিন তাঁর সাধনার খ্যাতির সঙ্গে সমভাবে দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তাঁর কবিতার একটি উদাহরণ দিচ্ছি; সমাজের তাড়নায় তাঁর পিতা তাঁর বিবাহ দে'বার উদ্যোগ করছেন শুনে তিনি এই কবিতাটি লিখেছিলেন :
"বৈদিক ব্রাহ্মণের যজ্ঞের হবি মরুচারী শৃগালের দ্বারা দূষিত হওয়ার মতো আমার এই যৌবন পুষ্পিত শঙ্খচক্রধারী প্রভুকে উৎসর্গিত অর্ঘ্যরূপ এই দেহ, কোনো মর্ত-মানবের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে বদ্ধ এবং কলুষিত হবার পূর্বেই,—এমন কি তার

কথা উঠলেই,—হে মন্মথ, আমার যেন মৃত্যু হয়।" বলা বাহুল্য, তাঁর সমাজের লোক তাঁর ভক্তির এবং বৈরাগ্যের অকৃত্রিমতা দেখে মুগ্ধ হ'য়েছিল এবং জীবিত অবস্থাতেই তাঁর সাধনার মাহাত্ম্য স্বীকার ক'রে তাঁকে ঋষি বা 'আলোয়ার' পদে বরণ করেছিল। তামিল জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ 'কুরাল'এর লেখক সাধকপ্রবর তিরুবল্লভনের আবির্ভাবের সময় নিয়ে মতভেদ আছে, তবে তিনিও অষ্টম নবম শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান ছিলেন ব'লে অনুমিত হয়। তাঁর উপযুক্তা ভগ্নী 'অভ্‌ভেই' এই যুগের সুলেখিকা ছিলেন। তাঁর লেখা 'অত্তিসুদ্দি' (আত্মশুদ্ধি) এবং 'কোরেইভেইন্‌দান্‌' নামক নীতিবাক্য এক সময়ে খুব প্রসিদ্ধ ছিল, আজও মাদ্রাজ প্রদেশে অনেক বিদ্যালয়ে এর কোনো কোনো অংশ পড়ানো হয়।

নবম শতাব্দীতে চীনসম্রাট্‌ টেংশুর সময়ে পাঁচটি বোন অলৌকিক সৌন্দর্য এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে চারজন সম্রাটের মহিষী হন, অন্যতমা 'সুংজোচাও' চিরকৌমার্য এবং চির দারিদ্র্যের ব্রত নিয়ে জ্ঞানচর্চায় জীবন কাটিয়ে চীনবাসীর স্মৃতির অমরাবতীতে স্থান লাভ করেন।

নবম শতাব্দীতে ইংলণ্ডেশ্বর অ্যালফ্রেডের মা 'অস্‌বার্গা' বিদুষী এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় অ্যালফ্রেড্‌ সেই অ-শিক্ষার যুগে শিক্ষিত এবং সুশাসকরূপে খ্যাতি লাভ করেন। দশম শতাব্দীতে স্পেনে দ্বিতীয় হাকাম নামক একজন রাজা ছিলেন, তাঁর মতো বিদ্যোৎসাহী মুসলমান নরপতি মুসলমানদের মধ্যে খুব কমই জন্মেছেন। তাঁর রাজত্ব-কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে চারলক্ষ হাতে লেখা পুঁথি

তাঁর পুস্তকাগারে বহুব্যয়ে সংগৃহীত হয়েছিল। এই পুঁথি সংগ্রহের কাজে তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন বহু শাস্ত্রবিশারদা এবং সুগায়িকা 'কাফ্‌ফা'। তিনি হাকামের বিদুষী কার্য সম্পাদিকা (সেক্রেটারী) ছিলেন, তাঁর রচনামাধুর্য, অঙ্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য হাকামকে মুগ্ধ করেছিল। সুকবি ফাতেমা, সুলেখিকা আয়শা এই সময়ে স্পেনদেশে আরবী সাহিত্যে সুসাহিত্যিকা ব'লে খ্যাতি লাভ করেন। সুপণ্ডিত নরপতি হাকামের সব চেয়ে প্রিয়পাত্রী ছিলেন 'রজিয়া' নাম্নী এক অসামান্যা প্রতিভাশালিনী বিদুষী, হাকাম তাঁকে 'সৌভাগ্যসেতারা' উপাধি দিয়েছিলেন। এই যুগে সেভিল নগরে মরিয়ম নাম্নী এক বিদুষী বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েকে বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। একাদশ শতাব্দীতে সেভিলরাজ 'মুতামিদ' 'রুমাইকীয়া' নাম্নী এক ক্রীতদাসীর কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে বিবাহ করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'জয়নাব-উম্মুল-মুয়াইয়েদ' আরবদেশে ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞা রূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ঐ শতাব্দীর শেষদিকে সুলতান সালা-উদ্দীনের রাজত্বকালে আবুলফরোজ দুহিতা 'তকীয়া' "হাদীশ" সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতেন এবং সুললিত ভাষায় কবিতা রচনা ক'রতেন।

ভারতবর্ষে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাকতীয় রাজকন্যা রুদ্রাম্বা স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন ক'রে গেছেন। তিনি নিজে সুপণ্ডিতা এবং রাজনীতিজ্ঞা ছিলেন। তাঁর উৎসাহে তাঁর রাজ্যে ধর্মচর্চা, জ্ঞানচর্চা, কলাচর্চা এবং শক্তিচর্চা সমভাবেই প্রজাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল।

তুরস্কের বর্বরদল পারস্যে এবং এসিয়া মাইনরে রাজ্যবিস্তার করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার প্রাচীন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে জ্ঞানচর্চার মাহাত্ম্য বুঝতে শিখল। প্রাথমিক তুর্কী লেখকেরা কেউ কেউ আরবের ভাষা গ্রহণ করেছিলেন, আরবী অক্ষর অনতিকাল পূর্বেও তুর্কী সাহিত্যের বাহন ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের তুর্কী-সাহিত্যে পারশ্যের প্রভাব খুব বেশী। তুর্কনারীদের মধ্যে বোরখার প্রচলন ছিল, অনতিকাল পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের স্বাধীনতা ভারতবর্ষের হিন্দুযুগের নারীদের চেয়ে অনেক কম ছিল, তবু ভারতীয় মুসলিম-নারীর মতো কঠিন অবরোধপ্রথা তুরস্কে কোনো দিনই ছিল না।

তুর্কী নারী লেখিকাদের মধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে জয়নাব ও মিহ্‌রী খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে লায়লা, ফিৎসেৎহানুম, আমিনা হানুম, হুফেৎ হানুম প্রভৃতি সুকবি এবং সুলেখিকা ব'লে বিখ্যাত হয়েছেন।

ভারতবর্ষে পাঠান মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন নামে প্রধানতঃ তুর্কী-রাজগণই রাজত্ব করেছেন, তাঁরা রাজসভায় এবং দৈনন্দিন জীবনে অনেকেই ফারশী ভাষা ব্যবহার করতেন, হিন্দু প্রজাদের সঙ্গে কথোপকথনের সুবিধার জন্য 'উর্দু' নামক মিশ্র ভাষাও ব্যবহৃত হ'ত। ঐ যুগের মুসলমান নারী-কবিরা অধিকাংশই ফারশী ভাষায় তাঁদের প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁদের কথা ব'লবার পূর্বে তাঁদের পূর্ববর্ত্তিনী সংস্কৃত ভাষার লেখিকাদের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে বুদ্ধ এবং মহাবীরের সময়ে এবং তাঁদের অনতি-

কাল পরে যে ধর্মোন্মাদনা এসেছিল, ক্রমে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মানুষের মনে পরলোকের এবং ধর্মের চিন্তা ক'মে এল। যবন, শক, হুন প্রভৃতি বিদেশী বর্বর জাতিদের আক্রমণে নির্যাতিত এবং বারংবার বিড়ম্বিত হ'য়ে জনসাধারণ অহিংসাধর্মের প্রতি ক্রমেই শ্রদ্ধা হারাচ্ছিল, শুঙ্গ, কণ্ব এবং গুপ্তরাজগণের অভ্যুদয়ে হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃত ভাষার পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেশে শক্তি-চর্চ্চা. আশা ও আত্ম-বিশ্বাস ফিরিয়ে নিয়ে এল বটে, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রাণতা পূর্বের পরিমাণে ফিরল না। সস্কৃত নারীকবিদের অধিকাংশ রচনাই পার্থিব প্রেমের জয়গানে এবং প্রকৃতি বর্ণনায় এবং দেব বন্দনায় পরিপূর্ণ। এই বস্তুতান্ত্রিকতার আদর্শ সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের চরম উন্নতির দিনেও লুপ্ত হয়নি, সে যুগেও তিষ্যরক্ষিতা, চিঞ্চা, মালবিকাদের অস্তিত্ব থেকে প্রমাণ হয়, 'মহেন্দ্রের তপোভঙ্গদূত' এবং 'স্রষ্টার চক্রান্ত' মানবের মুক্তি-চেষ্টার রুদ্রতপস্যার পাশে পাশেই সেদিনও সুযোগ অন্বেষণে ফিরছিল, যথাকালে সে আবার আত্মপ্রকাশ ক'রে বহু শতাব্দীর সাধনাকে ভূমিসাৎ ক'রল। মুসলমান-পূর্ব যুগে যে সব ভারতীয় বিদুষী সংস্কৃতে কাব্য রচনা ক'রে গেছেন তাঁদের মধ্যে ধর্মপ্রবণতার একান্ত অভাব দেখা যায়। অবশ্য দেড় হাজার বছর ধ'রে ভারতীয় নারী ধর্মচিন্তা ছেড়ে দিয়েছিল, এ কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে দিনও বৌদ্ধ এবং জৈন বিহারে লক্ষ লক্ষ ভিক্ষুণী বাস করছিলেন এবং ধর্মালোচনা করছিলেন তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে, উভয়-ভারতীর মতো মনস্বিনী হিন্দু নারীরা সে দিনও বিরাজিতা ছিলেন। দেশে অধ্যাত্ম-বিদ্যার নিয়মিত চর্চ্চা না থাকলে উভয়ভারতীর মতো মহাপণ্ডিতার উদ্ভব সহসা

সম্ভব হয় না। বিদেশী আক্রমণে এবং গৃহবিবাদে বৌদ্ধ এবং হিন্দু বিদ্যাপীঠগুলির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের ধর্মপ্রাণা লেখিকাদের নাম পর্যন্ত লুপ্ত হ'য়ে গেছে ব'লেই মনে হয়; রাজ-সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্টা এবং অত্যধিক জনপ্রিয়া নারী কবিদের সন্ধানই কেবলমাত্র আমরা বিভিন্ন 'সুভাষিতাবলী'তে পাচ্ছি। যাই হোক্, যাঁদের কথা আমরা জানি, তাঁদের কবিত্বশক্তি, ভাবের গভীরতা এবং ভাষার মাধুর্য দিয়েই তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁদের মহত্ত্বের বিচার করবার চেষ্টা করব।

পালিভাষার নারী-কবি 'থেরী'দের কবিতা এবং পরবর্তী সংস্কৃতভাষার নারী-কবিদের কবিতার মধ্যে সব চেয়ে বড় তফাৎ, থেরীরা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন এবং ইহ-পারলৌকিক মুক্তি-প্রচেষ্টার ইতিহাসকেই তাঁদের লেখার বিষয়বস্তু করেছেন। অপরদিকে পরবর্তী যুগের নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপরিচয় সম্পূর্ণ গোপন ক'রে নানা বিষয়ে নানা বিচিত্র বর্ণনায় তাঁদের যুগের দৃষ্টিভঙ্গী এবং আশা আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিয়ে অতীত ভারতের একটা সর্বাঙ্গ সুন্দর উজ্জ্বল নারীরূপ অনাগত মানবের জন্য রেখে গেছেন। অনুদার গভীরতার এবং ঔদার্যপূর্ণ চাপল্যের পরিচয় এই দুই যুগের সাহিত্যের বিশেষত্ব ব'ললে অত্যুক্তি হবে না। এর মধ্যে আর একটা প্রধান দ্রষ্টব্য এই যে বুদ্ধ মহাবীর থেকে আরম্ভ ক'রে শঙ্করাচার্য প্রভৃতি ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীরা অনেক স্থলে নারীজাতিকে সমগ্রভাবে মুমুক্ষু পুরুষকে প্রলুব্ধ করার জন্য যথেচ্ছ অপবাদ দিয়েছেন, কিন্তু থেরীরা বা সংস্কৃত নারীকবিরা কারণসত্ত্বেও একের দোষে

অন্যকে এবং সমগ্র পুরুষ জাতিকে কখনও সে ভাবে আক্রমণ করেন নি। এই একদেশদর্শিতার অভাব তাঁদের স্বভাবগত সংযম এবং সংস্কারগত ধৈর্য ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয়। কোনো মোহে এবং কোনো উত্তেজনায় তাঁরা নিজেদের এই চরিত্রগত মাহাত্ম্য এবং চিরাচরিত প্রথা যেন ত্যাগ না করেন।

উপনিষদের ও বৌদ্ধযুগের জ্ঞানমার্গের জটিলতা ছেড়ে ভারতবর্ষের ধর্মগুরুরা যখন প্রধানতঃ ভক্তিমার্গ আশ্রয় করলেন, জনসাধারণের চিত্ত যখন জ্ঞান-বুদ্ধির অনধিগম্যের সন্ধানে ব্যর্থ ভ্রমণের দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে মনোমত দেবতাকে পূজা নিবেদন ক'রে তৃপ্ত ও শান্ত হ'ল, সেই যুগের অর্থাৎ হিন্দুরাজত্বের শেষদিকের এবং মুসলমান রাজত্বকালের সংস্কৃত নারীকবিরা শিব, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, মীনাক্ষী প্রভৃতি দেবদেবীর বন্দনা গেয়ে আবার নিজেদের সত্য পরিচয় অর্থাৎ ধর্মপ্রাণতার পরিচয় দিয়েছিলেন, এও আমরা দেখতে পাব। নারীর মন স্বভাবতঃই পুরুষের চেয়ে বস্তুতান্ত্রিক, ধরবার ছোঁবার জিনিষ না পেলে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই মন জোর পায় না, রচনায় দানা বাঁধে না। এও সম্ভব যে প্রথম দিকের নারীকবিদের লেখায় সে যুগের বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রের জটিলতা ধর্মালোচনায় বাধা দিয়ে থাকতে পারে।

অতি প্রাচীন যুগের কোনো নারীর লেখা সম্পূর্ণ কাব্য আমরা পাইনি, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 'বচনসমুচ্চয়' 'সুভাষিত সংগ্রহ' 'সদুক্তি সংগ্রহ' প্রভৃতি থেকে এবং রাজশেখর দণ্ডী প্রভৃতি আলঙ্কারিকের লেখা থেকে আমরা তাঁদের কথঞ্চিৎ পরিচয় মাত্র

পাই। সেই সব কয়েক ছত্র ক'রে লেখা নিশ্চয়ই তাঁদের সমস্ত লেখার শতাংশের একাংশও নয়, তবু সেই কয়েক ছত্রেই তাঁদের শক্তির সম্বন্ধে আমাদের নিঃসংশয়িত করে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিস্মিতও করে থাকে। এই নারীকবিদের মধ্যে কাল হিসাবে 'চণ্ডাল-বিদ্যার' নাম সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। তিনি নিঃসন্দেহ কালিদাসের যুগে জন্মেছিলেন, সেই যুগ খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতেই হোক্, আর খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতেই হোক্। 'চণ্ডালবিদ্যা' মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন। নিম্নলিখিত কবিতাটি তিনি, কালিদাস এবং বিক্রমাদিত্য একযোগে লিখেছিলেন ব'লে প্রসিদ্ধি আছে :

"ক্ষীরোদাম্ভসি মজ্জতীব দিবসব্যাপারখিন্নং জগ-
ত্তৎক্ষোভাজ্ জলবুদ্বুদা ইব ভবন্ত্যালোহিতাস্তারকাঃ।
চন্দ্রঃ ক্ষীরমিব ক্ষরত্যবিরতং ধারাসহস্রোৎকরৈ
রুদ্গ্রীবৈ স্তৃষিতৈরিবাদ্য কুমুদৈঃ জ্যোৎস্নাপয়ঃ পীয়তে॥"

কবিতাটির বিষয়বস্তু 'জোৎস্না' বর্ণনা, সারাদিনের কেনাবেচার পরিশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে জগৎ যেন ক্ষীরসমুদ্রে স্নানে নেমেছে তাতে ক্ষুব্ধ সমুদ্রে ফেন বুদ্বুদের মতো রক্তাভ তারকারা দেখা দিয়েছে। চন্দ্র তার সহস্র কিরণ দিয়ে যেন অবিরত সহস্র ধারায় ক্ষীর হ'য়ে ঝরে পড়ছে, আজ রাত্রে উদ্গ্রীব তৃষিত কুমুদেরা যেন জ্যোৎস্নার দুগ্ধ পান করছে।' চণ্ডালবিদ্যার নাম যে বিক্রমাদিত্য এবং কালিদাসের সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হ'ত, এতেই আমরা তাঁর শক্তির এবং প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এঁর লেখা বেশী পাওয়া যায় না।

পরবর্তী যুগের অধিকাংশ কবিরই সময় স্থির হয়নি, তাঁদের

অনেকের কবিতা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বে এবং অনেকের কবিতা ত্রয়োদশ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত কেবল এইটুকু জানা যায়। যাঁদের সময় নিশ্চিত জানা যায় তাঁদের ছাড়া আর সকলেরই কবিতা খৃষ্টের প্রথম সহস্রাব্দীতে রচিত বলে ধরলে খুব ভুল হবে না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্বে লেখা ফল্গুহস্তিনী'র 'দৈব' নামে কবিতাটি উল্লেখযোগ্য :

'সৃজতি তাবদশেষগুণাকরং পুরুষরত্নমলঙ্করণম্ভুবঃ।
তদনুতৎক্ষণভঙ্গি করোতি চেৎ অহহ কষ্টমপণ্ডিততা বিধেঃ॥'

"ঈশ্বর পুরুষরত্নকে জগতের অলঙ্কার এবং অশেষ গুণের আকর ক'রে সৃষ্টি করেন তারপরেই আবার তাকে নষ্ট করেন, বিধাতার এই নির্বুদ্ধিতা বড়ই কষ্টকর।" সপ্তম অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে শীলা-ভট্টারিকা, বিজ্জকা প্রভুদেবীলাটি, বিকট-নিতম্বা প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত নারী কবির নাম পাওয়া যায়। শীলা ভট্টারিকা মহারাজ মিহিরভোজের সভায় ছিলেন এবং রাজার সঙ্গে পাশা খেলতে ব'সে তিনি যেভাবে তাঁকে বিদ্রূপ করতেন, তাতে তাঁর সঙ্গে রাজার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা সূচিত হয়। শীলার বিখ্যাত কবিতা 'অসতী' অনেকেই শুনে থাকবেন :

যঃ কৌমারহরঃ স এব বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ* প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি চৌর্যসুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥'

* অন্যত্র 'পরিমলা।

বিজ্জকা, বিজ্জা বা বিজ্জিকা চন্দ্রাদিত্যের পত্নী বিজয় ভট্টারিকা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, তবে তিনি যে অষ্টম নবম শতাব্দীর মধ্যেই জন্মেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর বহু কবিতা পাওয়া যায়, তার মধ্যে যেটিতে তিনি বিদ্যার দম্ভে নিজেকে সাক্ষাৎ সরস্বতী বলে দাবী করেছেন, সেটিই সব চেয়ে উপভোগ্য, কবিতাটি এই :

নীলোৎপলদলশ্যামাং বিজ্জকাং মাম্ অজানতা।
বৃথৈব দণ্ডিনা প্রোক্তং 'সর্বশুক্লা সরস্বতী॥'

"আমি বিজ্জকা, আমি নীলোৎপলের পাপড়ির মতো শ্যামবর্ণা, আমাকে জানতেন না ব'লেই দণ্ডী বৃথাই সরস্বতীকে সর্বশুক্লা ব'লে বর্ণনা করেছেন।" এই শ্যামবর্ণা সরস্বতীটির বহু বিভিন্ন বিষয়ে লেখা কবিতা পাওয়া যায় তার মধ্যে আর একটি এই :

প্রিয়সখি বিপদ্‌দণ্ডপ্রান্তপ্রপাত-পরম্পরা-
পরিচয়চলে চিন্তাচক্রে নিধায় বিধিঃ খলঃ।
মৃদমিব বলাৎ পিণ্ডীকৃত্য প্রগল্‌ভকুলালবৎ
ভ্রময়তি মনো নো জানীমঃ কিমত্র করিষ্যতি॥'

"প্রিয় সখি, আমার মনটাকে নিয়ে জোরকরে মাটির তালের মতো পাকিয়ে খল বিধাতা প্রগল্‌ভ কুমোরের মতো চিন্তার চাকায় রেখে বিপদের কাঠির ডগার ধাক্কা দিয়ে অবিশ্রান্ত ঘোরাচ্ছে, এ থেকে কি তৈরী করবে জানিনা।" বিজ্জকার সম্পূর্ণ কোনো কাব্য পাওয়া যায়নি।

'কর্ণাটের রাণী বিজয়াঙ্কাকে জনশ্রুতি কালিদাসের সমসাময়িক ব'লে নির্দেশ ক'রে, যদিও তার কোনো প্রমাণ নেই। খৃষ্টীয়

দশম শতাব্দীর পূর্বে যে কোনো সময়ে তিনি জন্মেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে জন্মতিথি তাঁর যে কোনো তিথি নক্ষত্রেই হোক্ ; বৈদর্ভী রীতির রচনায় তাঁকে মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে সমান আসন দিতে এবং সরস্বতীর অবতার ব'লে ঘোষণা করতে সেকালের আলঙ্কারিকরা দ্বিধা করেননি। তাঁর লেখা কোনো সুভাষিত সংগ্রহে পাওয়া যায় না, তবু লোকমুখে কয়েকটি কবিতা আজও তাঁর নামে চ'লে আসছে। উদাহরণ-স্বরূপ একটি উদ্ধৃত করছি :

"একোঽভূন্নলিনাৎ পরস্তু পুলিনাৎ বল্মীকতশ্চাপরঃ।
তে সর্বে কবয় স্ত্রিলোকগুরবস্তেভ্যো নমস্কুর্মহে ॥
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্যরচনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্বতে।
তেষাং মূর্ধ্নি দদামি বামচরণম্ কর্ণাট-রাজ-প্রিয়া ॥"

অষ্টম-নবম শতাব্দীর পূর্বজাতা কবিদের মধ্যে 'বিকট-নিতম্বা' নাম্নী এক কবি বহু বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা লিখে গেছেন, প্রকৃতি বর্ণনা থেকে অশ্লীল আদিরসের কবিতা পর্যন্ত তিনি বাদ দেননি। তাঁর রুচিজ্ঞানের বা যাঁরা তাঁর নাম রেখেছিলেন তাঁদের রুচিজ্ঞানের প্রশংসা করা যায় না, তবু তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রশংসা না ক'রে উপায় নেই! তাঁর লেখার মধ্যে তাঁর স্বামীর মূর্খতাজ্ঞাপক নিম্নলিখিত শ্লোকটি বিখ্যাত :

"কালে মাষং শস্যে মাসং বদতি শকাসং যশ্চ সকাশম্।
উষ্ট্রে লুম্পতি ষং বা রং বা, তস্মৈ দত্তা বিকট-নিতম্বা ॥"

অর্থাৎ বিদুষী বিকট-নিতম্বা এমন লোকের হাতে পড়েছেন, যিনি 'মাস'কে 'মাষ', 'মাষকলাই'কে 'মাস', 'সকাশ'কে 'শকাস' বলেন, যিনি উষ্ট্র বলতে কখনও উষ্ট, কখনও উট্র বলেন। তাঁর হাতে

পড়ে বিদুষী কবির লজ্জার অবধি ছিল না, কিন্তু আজ পাঠক পাঠিকার সহানুভূতি স্বভাবতঃই পাণ্ডিত্য-গর্বিতা পত্নীর চেয়ে স্বামীর দিকেই বেশী আকৃষ্ট হয়। এই কবিতার পাঠান্তর কালিদাসের পত্নী 'নিবিড়-নিতম্বা' রাজকন্যা বিদ্যোত্তমার নামেও প্রচলিত আছে, সম্ভবতঃ সেটি পরবর্তী যুগের রচনা। বিদুষী রাজকন্যা কমলার (বিদ্যোত্তমার) ঐতিহাসিক অস্তিত্বের কোনো নিদর্শন নেই।

এঁদের পর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে আমরা সরস্বতী, সীতা, ত্রিভুবনসরস্বতী এবং সিন্নম্মার রচনা পেয়েছি। কাম-লীলা, কনকবল্লী, ললিতাঙ্গী, মধুরাঙ্গী, সুনন্দা, বিমলাঙ্গী এবং প্রভুদেবী লাটীর নাম ইতিপূর্বে বা এই সময়ে পাওয়া গেলেও তাঁদের কোনো রচনা পাওয়া যায়নি। লাটী অর্থাৎ গুজরাত দেশীয়া প্রভুদেবীই এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন, আলঙ্কারিক রাজশেখর তাঁর কবিত্বের এবং পাণ্ডিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন* বলেছেন, 'তিনি মৃত্যুর পরেও তাঁর কীর্তির জন্য মানুষের হৃদয়ে অমর হ'য়ে আছেন'। তাঁর লেখা নিঃশেষে বিলুপ্ত হ'য়ে যাওয়ার কারণ যাই হোক্, এই ক্ষতিকে সংস্কৃত সাহিত্যের দুর্ভাগ্য ব'লতে হবে। সরস্বতী দেবীর কবিতার একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

"পত্রাণি কণ্টক-দুরাসদানি বার্তাঽপি নাস্তি
মধুনো রজসান্ধকারঃ।
আমোদমাত্র-রসিকেন মধুব্রতেন নালোকিতানি
তব কেতকি দূষণানি॥"

---

* সূক্তিনাং স্মর কেলীনাং কলানাং চ বিলাসভূঃ।
প্রভুদেবী কবির্লাটী গতাঽপি হৃদি তিষ্ঠতি॥"

"ওগো কেতকি, তোমার পাতার সহস্র কাঁটা কাউকে কাছে ঘেঁসতে দেয় না, রেণুতে অন্ধকার তোমার দেহে মধুর খোঁজ পর্যন্ত নেই। ভ্রমর কেবল সুগন্ধ রসের রসিক বলেই তোমার এত দোষ দেখেও দেখে না।"

কবি সীতার দ্ব্যর্থবোধক কবিতাটিতে এক অর্থে চন্দ্রকে উদ্দেশ ক'রে এবং অপর অর্থে ভীরু প্রণয়ীকে উদ্দেশ ক'রে বিদগ্ধ বনিতার উক্তি পাওয়া যায় :

"মাভৈঃ শশাঙ্ক মম সীধুনি নাস্তি রাহুঃ।
খে রোহিণী বসতি কাতর কিং বিভেষি ॥
প্রায়ো বিদগ্ধবনিতা-নব-সঙ্গমেষু।
পুংসাং মনঃ প্রচলতীতি কিমত্র চিত্রম্ ॥"

"হে শশাঙ্ক, তুমি ভয় কোরো না, আমার এই মদের মধ্যে রাহু নেই (আমার স্বামী অনুপস্থিত) রোহিণীও আকাশে বাস করছেন (তোমার পত্নীও অনেক দূরে)। হে কাতর ব্যক্তি, তুমি কেন ভয় পাচ্ছ? শিক্ষিতা মেয়েদের সঙ্গে নূতন আলাপে পুরুষের মন চঞ্চল হ'য়েই থাকে, এতে বিচিত্র কি আছে?"

কবি ত্রিভুবনসরস্বতীর একটি রাজস্তুতি এই :

"শ্রীমদ্রূপবিটঙ্কদেব সকল-ক্ষ্মাপাল-চূড়ামণে
যুক্তং সঞ্চরণং যদত্র ভবতশ্চন্দ্রেণ রাত্রাবপি।
মা ভূত্ত্বদ্বদনাবলোকনবশাদ্ব্রীড়া-বিলক্ষঃ শশী
মা ভূচ্চেয়মরুন্ধতী ভগবতী দুঃশীলতা-ভাজনম্ ॥"

"সমস্ত নরপতিগণের চূড়ামণি স্বরূপ হে পরম সুন্দর মহারাজ, তুমি যে রাত্রে চাঁদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াও এ কাজ তোমারই উপযুক্ত। কেবল দেখো, যেন তোমার মুখ দেখে চাঁদ লজ্জায়

না অদৃশ্য হন, আর ভগবতী অরুন্ধতীর (তোমার জন্য) দুঃশীলতার দুর্নাম না রটে।"

কবি ভাবদেবী বা ভাবকদেবীর সময় ঠিক জানা যায় না, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর আগে কোনো সময়ে তিনি জন্মেছিলেন। অল্প কথায় সহজ ভাষায় কাব্যে মাধুর্য সঞ্চার করবার ক্ষমতা তাঁর খুব বেশী ছিল। একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

"তথাঽভূদস্মাকং প্রথমমবিভিন্না তনুরিয়ং
ততোঽনু ত্বং প্রেয়ান্ অহমপি হতাশা-প্রিয়তমা।
ইদানীং নাথস্ত্বং বয়মপি কলত্রং কিমপরং
ময়াপ্তং প্রাণানাং কুলিশকঠিনানাং ফলমিদং॥"

"প্রথমে এমন দিন ছিল যখন তোমার আমার দেহ একই ব'লে মনে হ'ত, তারপর তুমি আমার কাছে প্রিয়তর হ'য়ে উঠলেও আমি তোমার আশাহতা প্রিয়তমা হ'য়ে রইলুম। উপস্থিত তুমি প্রভু, আমরা তোমার (অবজ্ঞাত) স্ত্রী, এর পর আর কি হ'তে পারে? আমার বজ্রকঠিন প্রাণের (এত অনাদরেও যার শেষ হ'ল না) জন্যই এই ফল আমি পাচ্ছি।"

খৃষ্টীয় একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে মারুলা, মোরিকা, সরস্বতী-কুটুম্ব-দুহিতা, মদালসা, লক্ষ্মী, ইন্দুলেখা এবং রাজকন্যার নাম এবং তাঁদের কবিতা পাওয়া যায়। মারুলার কবিতার একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

"গোপায়ন্তী বিরহজনিতং দুঃখমগ্রে গুরূণাং
কিং ত্বং মুগ্ধে নয়নবিসৃতং বাষ্পপূরং রুণৎসি।
নক্তং নক্তং নয়নসলিলৈরেষ আর্দ্রীকৃতস্তে
শয্যোপান্তঃ কথয়তি দশাম্ আতপে শোষ্যমাণঃ॥"

অয়ি মুগ্ধে, গুরুজনের কাছে বিরহ দুঃখ লুকোতে গিয়ে কেন তুমি বাষ্পপূর্ণ চোখের অশ্রুস্রোত রুদ্ধ ক'রছ? রাতের পর রাত চোখের জলে ভিজে যাওয়া তোমার শয্যার প্রান্তদেশ তুমি যে রৌদ্রে শুকিয়ে নাও, তাতেই তোমার দশা প্রকাশ ক'রে দিচ্চে।"

সমসাময়িক প্রতিভাশালিনী কবি মোরিকার কবিতার একটি উদাহরণ এই :

"লিখতি ন গণয়তি রেখাং নির্ঝরবাষ্পাম্বু-ধৌতগণ্ডতটা
অবধি দিবসাবসানং মা ভূদিতি শঙ্কিতা বালা॥"

(স্বামীর আগমনের বাকি দিনগুলি গ'ণবার জন্য বিরহিণী) "মেয়েটি মাটিতে দাগ কাটে কিন্তু ভয়ে গ'ণে দেখেনা, পাছে দিন ফুরোতে বেশি দেরি আছে দেখা যায়। চোখের জলের ঝরণায় তার গালের দুই কূল ভেসে যায়।"

লক্ষ্মীর কবিতার একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

"ভ্রমন্ বনান্তে নবমঞ্জরীষু ন ষট্পদো গন্ধফলীমজিঘ্রৎ।
সা কিং ন রম্যা স চ কিং ন রন্তা বলীয়সী কেবলমীশ্বরেচ্ছা॥"

"বনান্তে নবমঞ্জরীর মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ভ্রমর প্রিয়ঙ্গুর-গন্ধ শুঁকলনা। সে কি রমণীয় নয়? ভ্রমর কি রসিক নয়? দেখা যাচ্ছে জগতে কে' কি রকম মর্যাদা পাবে, সে বিষয়ে নিজের গুণ কোনো কাজে লাগে না। কেবল ঈশ্বরেচ্ছাই বলবতী।"

ইন্দুলেখার লেখা নিম্নোদ্ধৃত একটিমাত্র কবিতা পাওয়া যায়, এই থেকে তাঁর প্রতিভার কিছু পরিচয় আমরা পাই। তাঁর অন্যান্য রচনা লুপ্ত হ'য়ে যাওয়ায় নিঃসন্দেহ সংস্কৃত সাহিত্য এবং আমাদের দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে :

"একে বারিনিধৌ প্রবেশম্ অপরে লোকান্তরালোকনম্
কেচিৎ পাবকযোগিতাং নিজগদুঃ ক্ষীণেঽহ্নি চণ্ডার্চিষঃ।
মিথ্যা চৈতৎ অসাক্ষিকং প্রিয়সখি প্রত্যক্ষতীব্রাতপং
মন্যেঽহং পুনরধ্বনীন-রমণী-চেতোঽধিশেতে রবিঃ॥

প্রিয় সখি, কেউ বলে সূর্য দিন শেষে সমুদ্রে প্রবেশ করে, কেউ বলে অন্যদেশ দে'খতে যায় কেউ বলে সূর্য্য ঐ সময় অগ্নির সঙ্গে যুক্ত হয়। এ সবই মিথ্যা কথা, কারণ এর কোনো সাক্ষী নেই। আমার মনে হয় সূর্য্য পথিক বধূর (বিরহিনীর) অন্তরে গিয়ে শয়ন করে, কারণ সেইখানে দিনশেষে তার তীব্র দাহ প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়।"

এই যুগের অন্যতমা কবি মদালসা সমসাময়িক অন্যান্য কবির মতো মেঘগর্জনকে মদনের পৃথিবী জয়ের রণ-নির্ঘোষ ব'লে কবিত্ব করেছেন, আবার অ-কবিজনোচিত ভাষায় মানুষকে ধর্মের উপদেশও দিয়েছেন। তাঁর হিতোপদেশটি এই :

পরলোকহিতং তাত প্রাতরুত্থায় চিন্তয়।
ইহ তে কর্মণামেব বিপাকশ্চিন্তয়িষ্যতি ॥"

"বাছা, সকালে উঠে পরলোকে যাতে ভাল হয়, তার চিন্তা কোরো। এ জগতে তোমার কাজের ফলই পরলোকে বিচার করা হবে।"

চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে যাঁরা সংস্কৃতে কবিতা লিখে সাহিত্য ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে কেরলী, কুটলা, পদ্মাবতী, গৌরী, মদিরেক্ষণা, বিদ্যাবতী, গন্ধদীপিকা, জঘনচপলা, গঙ্গাদেবী, দেবকুমারিকা,

লক্ষ্মীদেবী ঠাকুরাণী, প্রিয়ম্বদা, বৈজয়ন্তী, মানিনী, সুভদ্রা, বেণীদত্তা, মধুরবর্ণী এবং চন্দ্রকান্তা ভিক্ষুণীর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের কয়েকজনের কবিতার একটু আধটু উদাহরণ দে'ব। কবি কেরলী সরস্বতীর বন্দনা করছেন :

"যস্যাঃ স্ব-রূপমখিলং জ্ঞাতুং ব্রহ্মাদয়োঽপি ন স্পষ্টাঃ।
কামগবী সুকবীনাং সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

"যাঁর প্রকৃতরূপ ব্রহ্মাদিও স্পষ্টরূপে সম্পূর্ণ জানতে পারেন না, যিনি সুকবিদের কামধেনু স্বরূপা (সকল কামনা পূর্ণকারিণী) সেই সরস্বতী দেবীর জয় হোক।" কবি পদ্মাবতী গ্রীষ্মবায়ুর বর্ণনা দিচ্ছেন :

"ধূলীকর্করিণঃ প্রচণ্ডতপনজ্বালালি-মালা ধরাঃ
স্পর্শাদেব সরিজ্জলং তরুদলং সংশোষয়ন্তক্ষণাৎ।
পীতোন্মুক্ত ফণীশ-ফুৎকৃতি-বিষ-জ্বালালি যুক্তা ইব
স্বচ্ছন্দং পরিতো ভ্রমন্তি বহুশো গ্রীষ্মস্য বাতা অভী॥"

গ্রীষ্মের হাওয়া ধুলো কাঁকর নিয়ে প্রচণ্ড রৌদ্র জ্বালার মালাপরে নির্ভয়ে ইচ্ছামতো চতুর্দিকে ঘুরছে। তার স্পর্শমাত্র নদীর জল এবং গাছপালা শুকিয়ে যাচ্ছে। (সমুদ্রমন্থন কালে) ছাড়া পাওয়া সর্পরাজের ফুৎকার নিঃসৃত বিষের জ্বালা যেন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।"

দক্ষিণ ভারতে বিদ্যাবতী এবং নেপালে চন্দ্রকান্তা ভিক্ষুণী ধর্মপ্রাণা নারী ছিলেন। প্রথমার সুদীর্ঘ মীনাক্ষীস্তোত্র থেকে প্রথম দু' পংক্তি দেওয়া হ'ল :

"যা দেবী জগতাং কর্ত্রী শঙ্করস্যাপি শঙ্করী।
নমস্তস্যৈ সুমীনাক্ষ্যৈ দেব্যৈ মঙ্গলমূর্তয়ে॥'

"যিনি জগতের কর্ত্রী এবং (সর্বলোকের) শুভঙ্কর শঙ্করেরও যিনি কল্যাণ-বিধায়িনী, সেই সুকল্যাণ স্বরূপা দেবী সুমীনাক্ষীকে প্রণাম করি।" ভাষার মধ্যে বিশেষত্ব কিছু না থাকলেও ভক্তিনম্র নারীহৃদয়ের অকপট প্রকাশ এই স্তোত্রটিকে মহিমান্বিত করেছে সেদিক দিয়ে চন্দ্রকান্তার অবলোকিতেশ্বরস্তোত্র এর পাশেই স্থান পেতে পারে। স্তোত্রটি সুদীর্ঘ, কয়েক ছত্র উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হ'ল। শঙ্করাচার্যের শিবাষ্টকের প্রভাব এর ওপর পড়েছে, না আচার্য শঙ্কর ভিক্ষুণীর কাছে ঋণী, তা, আজ নিশ্চিত করে বলা শক্ত,—কারণ চন্দ্রকান্তার সময় নিরূপিত হয় নি।

"ভুবনত্রয়বন্দিতলোকগুরুম্, অমরাধিপতি-স্তুতি-ব্রহ্ম-বরম্।
মুনিরাজবরং যুক্তিসিদ্ধিকরং প্রণমাম্যবলোকিত-নাম-ধরম্ ॥১॥
কুটিলামলপিঙ্গলধূম্রজটং, শশিবিম্বসমুজ্জ্বলপূর্ণ-মুখম্।
কমলায়তলোচনচারুকরং হিমখণ্ডবিমণ্ডল পুণ্ডপুটম্ ॥৩॥"

"ত্রিভুবন কর্তৃক বন্দিত লোকগুরু, দেবতাদের অধিপতি-দ্বারা স্তুত ব্রহ্মবর মুনিশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে প্রধান, যোগ-সিদ্ধিদায়ক অবলোকিত নামধারীকে আমি প্রণাম করি।... যাঁর জটা কুটিল, নির্মল, পিঙ্গল এবং ধূম্রবর্ণ। যাঁর মুখ চন্দ্রকিরণের মতো উজ্জ্বল, পদ্মের মতো আয়ত লোচন তাঁকে সুন্দর করেছে, তুষার-শুভ্র তিলক যাঁর শোভাস্বরূপ।"

এই যুগের কবিদের মধ্যে গন্ধদীপিকা ছিলেন কাজের লোক। তিনি কবিতায় ধূপতৈরি করবার জন্য উপকরণের ফর্দ দিচ্ছেন :

"শশি-নখ-গিরি-মদ-মাংসী-জতু-ভাগো মলয়লোহয়ো র্ভাগৌ।
মিলিতৈর্গুগ্গু-পরিমৃদিতৈর্বস্ত্রগৃহাদীনি ধূপয়েচ্চতুরঃ ॥"

অর্থাৎ "কর্পূর, নখ, গিরি, মদ, জটামাংসী এবং লাক্ষা এক এক ভাগ, চন্দন ও তামা দু'ভাগ ক'রে মিশিয়ে ঝোলাগুড়ের সঙ্গে পিষে চতুর ব্যক্তি তাঁর বস্ত্র এবং গৃহ সুরভিত করবেন।"

বেণীদত্তার রাজস্তুতি মূলক কবিতাটি অতিশয়োক্তিতে পূর্ণ হ'লেও সে যুগের চাটুবাদের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত :

"ক্ষৌণীপাল বিশালভাল ভবতঃ প্রস্পর্দ্ধিবর্গ্যাবিলা-
কীর্ত্যা শ্যামলিতে শিবে গণগণে ভীতে গুহে কম্পিতে।
বিভ্যদ্দেবগণে ত্রসৎফণিগণে কম্পৎপিশাচীগণে
ক্রোধোৎকম্পিত-পাণি-পঙ্কজতলা সা হিঙ্গুলা পাতু নঃ॥

"হে বিশাল ললাট মহারাজ, তোমার শত্রুদের কুকীর্তির কালিমা যখন শিবের কণ্ঠের কালিমাকেও ছাড়িয়ে গেছে, যখন তাঁর প্রমথেরা ভাত, কার্তিক যখন ভয়ে কাঁপছেন, দেবতারা সর্পেরা এবং পিশাচীরা যখন ভয়ে কাঁপছেন তখন যাঁর পদ্মহস্ত ক্রোধে কাঁপছে, সেই হিঙ্গুলা দেবী আমাদের রক্ষা করুন।"

যাঁদের সময় আমরা নিশ্চিতরূপে জানিনা তাঁদের মধ্যে দক্ষিণী পণ্ডিত এলেশ্বর উপাধ্যায়ের বালবিধবা কন্যা নাচী নিজের দুঃখময় জীবন অবলম্বনে 'নাচীনাটক' লিখে গেছেন। তিনি তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে ভারতের নানা প্রদেশে ভ্রমণ ক'রে নানা প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে হারিয়ে দিগ্বিজয় ক'রে এসেছিলেন। চিরকুমারী ব্রাহ্মণকন্যা 'অভয়া' জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ ও ভূগোল বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন, তিনি সংস্কৃত এবং তেলগু উভয় ভাষাতেই সুপণ্ডিতা ছিলেন। ভূগোল এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ কবিতায় লিখে তিনি যশস্বিনী

হয়েছিলেন। তাঁর এক বোন উপাগুগা 'নীলি-পাটল' গ্রন্থ লিখে এবং আর দুই বোন ভল্লী এবং সুরেগা নানা খণ্ডকাব্য এবং কবিতা লিখে খ্যাতি লাভ করে ছিলেন।

সংস্কৃতে প্রাচীন কবিদের লেখা সম্পূর্ণ কাব্য বা কবিতাসংগ্রহ অল্পই পাওয়া গেছে। রাজপ্রাসাদ থেকে যে সব কাব্য রচিত হয়েছিল, বৈদেশিক আক্রমণের নানা অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্যেও সেই রকম কয়েকখানিমাত্র টি'কে গেছে, রাজসভা থেকে দূরে গ্রামের দরিদ্র নারীর লেখার সে সৌভাগ্য হয়নি। রাজা কৃষ্ণদেবের সময় কুম্ভকারকন্যা মল্লী বা মল্লা অবসর সময়ে তেলুগু ভাষায় রামায়ন লিখেছিলেন। মন্দিরের দেবদাসীরা গত শতাব্দীতেও সংস্কৃতে মৌলিক রচনার জন্য খ্যাতিলাভ করেছেন, সুতরাং হিন্দুরাজত্বের সমৃদ্ধির যুগে রাজান্তঃপুরিকারা যে অনেকেই সুশিক্ষিতা এবং সুকবি ছিলেন তা'তে আশ্চর্য হবার কোনই কারণ নেই। উত্তর ভারতে মুসলমান আধিপত্য সংস্কৃতচর্চায় সর্বত্র বাধা না দিলেও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় ঐহিক উন্নতির সম্ভাবনা ছিলনা ব'লে জনসাধারণ সংস্কৃতকে পূর্বের সম্মান দিত না। দাক্ষিণাত্যে বিজয় নগরে এবং তাঞ্জোরে দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাজানুকূলতায় শিক্ষিত সমাজে নারীদের মধ্যেও সংস্কৃতচর্চা অব্যাহত ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বিজয়-নগররাজ বীরকম্পন বা কম্পরায়ের পত্নী গঙ্গাদেবী তাঁর স্বামীর মুসলমানসৈন্যের কাছ থেকে মাদুরা-উদ্ধার উপলক্ষ্য ক'রে মধুরা-বিজয় কাব্য লেখেন, এই কাব্যখানি সম্পূর্ণ পাওয়া গেছে। এই ঐতিহাসিক বীররসপূর্ণ কাব্যে কবি তাঁর যুগকে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন অপরূপ বাণীচিত্রে। একটি উদাহরণ

দে'ব। স্বামীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে তিনি তাঁকে এক দেহে বিরাজিত পঞ্চপাণ্ডবরূপে চিত্রিত ক'রেছেন। অত্যুক্তি হ'লেও বর্ণনাটি উপভোগ্য :

"স সত্যবাক্ ভূরিবলো গুণান্বিত-
স্তুরঙ্গমারোহণকর্মমর্মবিৎ।
কৃপাণবিদ্যা-নিপুণঃ পৃথাভুবাম্
অলক্ষি সংঘাত ইবৈকতাং গতঃ ॥"

"তিনি ছিলেন (যুধিষ্ঠিরের মতো) সত্যবাক্, (ভীমের মতো) মহাবলশালী, (অর্জ্জুনের মতো) সর্বগুণান্বিত, (নকুলের মতো) অশ্বদক্ষ এবং (সহদেবের মতো) অসিচালনানিপুণঃ যেন পার্থেরা (পঞ্চপাণ্ডব) একদেহে মিলিত হয়েছিলেন।"

পঞ্চদশ শতাব্দীতে আর একজন সুকবিকে রাজান্তঃপুরে দেখতে পাই। মিথিলারাজ শিবসিংহের পত্নী লক্ষ্মীদেবী ঠাকুরাণী বা লছিমা দেবীর নাম বিদ্যাপতির বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই জানেন। তিনি শুধু সুন্দরী এবং অন্যের কাব্যরসের উৎস স্বরূপা ছিলেন না, নিজেও তিনি সুকবি ছিলেন। যে সব নির্লজ্জ লোক ধনীর কাছে ভগ্নী বিক্রয় ক'রে ভগ্নীপতির পয়সায় বড়মানুষী করে, নিম্নলিখিত কবিতাটিতে তিনি তাদের তীব্র আক্রমণ করেছেন। কবিতাটি তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা কিনা তা' বলা যায় না :

"চপলং তুরগং পরিনর্তয়তঃ পথি পৌরজনান্ পরিমর্দয়তঃ।
ন হি তে ভুজ-ভাগ্য-ভবো বিভবো ভগিনী-ভগ-ভাগ্য-
ভবো বিভবঃ ॥"

"যতই তুমি চঞ্চল ঘোড়া নাচিয়ে রাস্তায় রাস্তায় সহরের লোককে চাপাদিয়ে বেড়াও, তোমার ঐশ্বর্য তোমার নিজের বাহুবলের দ্বারা উপার্জিত নয়, নিজের ভগ্নী বিক্রয় করেই তুমি এই সৌভাগ্য লাভ করেছ।"

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে রাজপুতানায় রাজা সংগ্রামসিংহের মা 'দেবকুমারিকা' বৈদ্যনাথের মন্দিরস্থাপন উপলক্ষ্যে 'বৈদ্যনাথ প্রশস্তি' নামক এক ঐতিহাসিক কাব্য লেখেন, সেটি এখনও পাওয়া যায়। এই যুগেই মালাবারের লক্ষ্মীরাজ্ঞী ভাগবৎপুরাণের একটি গল্প নিয়ে 'সান্ত্বনা-গোপাল কাব্য' রচনা করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে তাঞ্জোররাজ অচ্যুতরায়ের পত্নী তিরুমলাম্বা তাঁর স্বামীর সঙ্গে 'বরদাম্বিকা' নাম্নী তাঁর সপত্নীর প্রণয় এবং বিবাহ ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে একটি কাব্য রচনা করেন। এই নিরাসক্তচিত্ত কবির পতিপ্রেম আজকের দিনে অনেকের অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু কাব্যের বিষয়বস্তু থেকে নির্লিপ্ত না হ'লে কবির রচনা সার্থক এবং সুন্দর হয়না, একথা তিরুমলাম্বার জানা ছিল তাই কাব্যরচনার সময় সপত্নী-বিদ্বেষ তাঁকে অভিভূত ক'রতে পারেনি। পরবর্তী পরমবিদ্যোৎসাহী তাঞ্জোররাজ রঘুনাথ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিদ্যোৎসাহী এবং সুপণ্ডিত ছিলেন, বহু নারী কবিকে তিনি তাঁর রাজসভায় স্থান দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতা মধুর বাণী রঘুনাথের লেখা তেলুগু রামায়ণ সংস্কৃতে অনুবাদ করেছিলেন। কুমারসম্ভব এবং নৈষধকাব্য ও তিনি নিজের মনের মতো ক'রে সংস্কৃতে লিখেছিলেন। এই যুগের সুভাষিতহারাবলীতে মধুরবর্ণী

নাম্নী একজন নারীকবির রচনা পাওয়া যায়, দু'জনে অভিন্ন বলেই মনে হয়। মধুরবর্ণীর একটি অম্লমধুর কবিতায় কোনো অসতী নারীর স্বামীকে কেন ভালো লাগে না, তার কারণ দেওয়া আছে:

"আকারেণ শশী গিরা পরভৃতঃ পারাবতশ্চুম্বনে
হংসশ্চক্রমণে সমং দয়িতয়া রত্যাং বিমর্দে গজঃ।
ইত্থং ভর্তরি মে সমস্ত যুবতি-শ্লাঘ্যৈর্গুণৈং কিঞ্চন
ন্যূনং নাস্তি পরং বিবাহিত ইতি স্যান্নৈক-দোষো যদি॥"

"আমার স্বামীর রূপ চাঁদের মতো সুন্দর, কণ্ঠস্বর কোকিলের মতো মিষ্ট, তাঁর গতি রাজহংসের মতো,······যুবতীদের কাম্য কোনো গুণেরই তাঁর অভাব নেই। তাঁর একমাত্র দোষ তিনি আমার বিবাহিত পতি।"

এতক্ষণ যাঁদের নাম করলুম তাঁদের অধিকাংশই বাংলার বাইরের মেয়ে। এই বার কয়েকজন বাঙ্গালী নারীর নাম ক'রব, যাঁরা তিন চারশ'বছর আগে মোগল পাঠান-মগ-ভুঁইয়া-পর্টুগিজ রাজা এবং দস্যুদের সংঘর্ষে বিধ্বস্ত বাঙ্গলার সেই নিরতিশয় দুর্দিনে মুসলমানরাজত্বের সশঙ্কিত আবহাওয়ায় সুদূর পল্লীগ্রামে ব'সে দেবভাষার চর্চায়, অধ্যয়নে এবং অধ্যাপনায় বাঙ্গালী নারীর সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং তাদের মুখোজ্জ্বল ক'রে গেছেন। একটি নারীরচিত শ্লোক আপনারা হয়তো অনেকেই শুনেছেন, তবু এখানে উল্লেখ না ক'রে পারলুমনা:

"কালিন্দী পুলিনেষু কেলিকলনং কংসাদিদৈত্যদ্বিষং।
গোপালীভিরভিষ্টুতং ব্রজবধূ-নেত্রোৎপলৈরর্চিতং॥
বর্হালঙ্কৃতমস্তকং সুললিতৈ রঙ্গৈ স্ত্রিভঙ্গং ভজে।
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরং ভবহরং বংশীধরং শ্যামলং॥"

কবি প্রিয়ম্বদা এই শ্লোকটির রচয়িত্রী। ষোড়শ শতাব্দীর সংস্কৃতজ্ঞা মহিলাকবিদের মধ্যে প্রিয়ম্বদা দেবীর স্থান সর্বোচ্চে। তিনি ফরিদপুর কোটালিপাড়ার সুপণ্ডিত শিবরাম সার্বভৌমের কন্যা ছিলেন। বাল্যে পিতার কাছে কাব্য অলঙ্কার, ব্যাকরণ ন্যায়শাস্ত্র প'ড়ে তিনি অদ্বিতীয়া বিদুষী ব'লে খ্যাতিলাভ করেন। পিতা তাঁর পাত্র অন্বেষণে বাংলাদেশের অনেক স্থানে ঘুরে শেষে তাঁকে নিয়ে কাশীতে যান। সেখানে রঘুনাথ মিশ্র নামক এক কনৌজী বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ প্রিয়ম্বদার রূপ গুণে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর পাণি প্রার্থনা করেন, কন্যার সম্মতি বুঝে তাঁকে কন্যা সম্প্রদান ক'রে নিশ্চিন্ত হন। রঘুনাথ ধনীর সন্তান ছিলেন, তাঁর পিতা তাঁদের একটি জমিদারী দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পত্নীর পরামর্শে তিনি তা গ্রহণ করেননি। জমিদারীর দেখাশোনা ক'রতে গেলে পড়াশোনার অসুবিধা হ'বে ব'লে তাঁরা কোনোরকমে দুজনের গ্রাসাচ্ছাদন চলে এইটুকু মাত্র আয়ের সম্পত্তি রেখেছিলেন। দাসদাসী রাখায় নিজের কাজ পরকে দিয়ে অর্থের জোরে করিয়ে নেওয়ার যে হীনতা আছে, সেটা ব্রাহ্মণ-কন্যার ধর্মসাধনার বিরোধী বিবেচনায় প্রিয়ম্বদা সমস্ত গৃহকার্য নিজে করতেন। অবসর সময়ে চিরজীবন তিনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন এবং নিজে যা বুঝতেন অন্যকে তা সহজে বোঝাবার জন্য বহু দুরূহ সংস্কৃত বইয়ের টীকা লিখেছেন। এই সব টীকার মধ্যে 'মদালসা উপাখ্যানের' দার্শনিক টীকা এবং মহাভারতের শান্তিপর্বের মোক্ষধর্ম বিষয়ক সুবিস্তৃত টীকা বিখ্যাত। 'শ্যামরহস্য' নামক ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ লিখেও ইনি যশস্বিনী হয়েছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এমন কি

দাক্ষিণাত্যেও তাঁর কবিত্ব খ্যাতি পৌঁছেছিল, 'রসবতী' প্রিয়ম্বদা নামে তিনি ভারতবিখ্যাতা হয়েছিলেন।

মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের সাধনসহচর নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবা দেবী ষোড়শ শতাব্দীর এক জন শ্রেষ্ঠা বিদুষী ছিলেন। দক্ষিণ পশ্চিমে উড়িষ্যা থেকে পূর্বে আসাম এবং উত্তর পশ্চিমে বৃন্দাবন পর্যন্ত গৌড়িও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য যে বিরাট আন্দোলন চ'লছিল তিনি তার অন্যতমা পরিচালিকা ছিলেন। তিনি বহু নর নারীকে দীক্ষা দিয়েছেন এবং ধর্মজীবনের প্রেরণা দিয়েছেন, তাঁর ভক্তি, পাণ্ডিত্য, প্রচার-কুশলতা, সংগঠনসামর্থ্য সবই অনন্যসাধারণ ছিল। এই মহীয়সী নারীর মৃত্যুর পর তাঁর উপযুক্ত পুত্রবধূ বীরচন্দ্র-পত্নী সুভদ্রা দেবী শ্বাশুড়ির উদ্দেশ্যে 'অনঙ্গকদম্বাবলী' নামে একশত শ্লোকাত্মক স্তোত্ররচনা করেন। তার একটি শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ তুলে দিচ্ছি :

"বন্দে হহং তব পাদপদ্মযুগলং মৎপ্রাণ দেহাস্পদম
সত্যংব্রূমি কৃপাময়ি ত্বদপরং তুচ্ছং ত্রৈলোক্যাস্পদম্ ॥
শ্রীল শ্রীচরণারবিন্দমধুপো মন্মানসং নেচ্ছতি
হা মাতঃ করুণালয়ে তব পদে দাস্যং কদা যাস্যতি ॥"

শ্বাশুড়ির প্রতি পুত্রবধূর এই ভক্তি আজকের দিনে বাড়াবাড়ি ব'লে অনেকের মনে হ'তে পারে, কিন্তু জাহ্নবা দেবী এই ভক্তির যোগ্যা পাত্রী ছিলেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, অপর দিকে বাঙ্গালীর মেয়ে তখনও শ্রদ্ধেয়াকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে লজ্জিত হ'ত না এও সত্য। অবশ্য সুভদ্রা দেবী নিজে গুণী ছিলেন বলেই গুণীর মর্য্যাদা বুঝেছিলেন।

পরবর্তী যুগে খড়দার মা গোঁসাইনাম্নী বৈষ্ণব ধর্মনেত্রীদের মধ্যে ভক্তিশাস্ত্রের এবং দর্শনের চর্চা অব্যাহত ভাবে কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত চ'লে এসেছে। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে শিক্ষিতা বৈষ্ণবীদের পাঠিয়ে এই 'মা গোঁসাইরা' সে দিন পর্যন্ত বাংলার অন্তঃপুরে জ্ঞানের দীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। এঁদের ঋণ আজকের শিক্ষিতা নারীরা যদি ভুলে যান তাহ'লে শুধু অকৃতজ্ঞতা হবে না, মহাপাপ হবে। এই বৈষ্ণব বিদুষীদের বিস্তৃত পরিচয় এখনও হয়ত সংগৃহীত হ'তে পারে, কিন্তু সে জন্য সম্যক চেষ্টা হয়নি। আমরা তাঁদের মধ্যের সবচেয়ে সুপ্রসিদ্ধা হেমলতা এবং গঙ্গা দেবীর নাম শুধু জানি। হেমলতা প্রখ্যাতা ধর্মগুরু ছিলেন, সুবিখ্যাত কবিকর্ণপুর ছিলেন তাঁর শিষ্য। সুপ্রসিদ্ধা স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর জীবন-স্মৃতিতে এমনই একজনের কথা উল্লেখ করেছেন, যিনি ঠাকুর-পরিবারের মেয়েদের শিক্ষা দিতে তাঁদের অন্তঃপুরে যেতেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় দেননি।

সপ্তদশ শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাতা সংস্কৃত নারী কবি বৈজয়ন্তী দেবীর জন্ম আনুমানিক ১৫৫০ শকাব্দে পদ্মাতীরে ধানুকা গ্রামে এক অধ্যাপক ব্রাহ্মণের ঘরে হয়ে ছিল। কোটালিপাড়ার বিখ্যাত কবি কৃষ্ণনাথ সার্বভৌমের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পিতার শিক্ষার ফলে বৈজয়ন্তী বাল্যেই কাব্য ব্যাকরণ এবং ন্যায়শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর শ্বশুর তাঁর গুণ দে'খে তাঁকে নিজেদের চেয়ে নীচু ঘর থেকে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্রের আভিজাত্য গর্ব ছিল পিতার চেয়ে অনেক বেশী। তিনি রূপ'হীনা এবং কৌলীন্যহীনা বৈজয়ন্তীকে দীর্ঘকাল অনাদর ক'রে পিতৃগৃহে ফেলে রেখেছিলেন।

শেষে বহু দিন অপেক্ষার পর বৈজয়ন্তী কৃষ্ণনাথকে নিম্নলিখিত দুই ছত্র কবিতা লিখে পাঠান।

"জিত-ধূমসমূহায় জিত-ব্যজন-বায়বে।
মশকায় ময়া কায়ঃ সায়মারভ্য দীয়তে ॥"

"সন্ধ্যা থেকে সারারাত মশারা আমার দেহকে কষ্ট দিচ্ছে, তারা ধোঁয়াও মানে না, পাখার হাওয়াও মানে না।" এর নিগূঢ় অর্থ "আমি তোমার জন্য সারারাত জেগে ব'সে থাকি, তুমি না এলে কে আমার দুঃখ দূর করবে?" কৃষ্ণনাথ কবির এই ব্যঞ্জনাপূর্ণ চিঠি পেয়ে তাঁর নিজের অপরাধ বুঝতে পারলেন, পত্নীর কবিত্বের জন্য গর্ব অনুভব করলেন। একটি প্রণয়লিপিতে তিনি উপেক্ষিতা পত্নীকে সম্বর্ধিত করলেন, বৈজয়ন্তী তার উত্তরে লিখলেন :

"পুন্নাগ চম্পক লবঙ্গ সরোজমল্লি
মাতঙ্গযূথিরসিকস্য মধুব্রতস্য।
যৎ কুন্দবৃন্দ কুটজেষ্বপি পক্ষপাতঃ
সদ্বংশজস্য মহতোহি মহত্বমেতৎ ॥"

"হে মধুকর, তোমার ব্রত হচ্ছে নাগকেশর, চাঁপা, লবঙ্গ, পদ্ম, মল্লিকা, যুঁই প্রভৃতি সুন্দর ফুলের মধুপান করা, আজ যে কুন্দ এবং কুর্চি ফুলের প্রতি তুমি পক্ষপাত দেখাচ্ছ, এ তোমার মতো সদ্বংশজাত মহতেরই মহত্ব।" এই অভিমান পূর্ণ ব্যাজ-স্তুতি কৃষ্ণনাথকে অনুতপ্ত এবং মুগ্ধ ক'রল, তিনি কবির কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে বাড়ী নিয়ে এলেন। এই কবি দম্পতীর লেখা 'আনন্দ লতিকা' ঐযুগের একখানি বিখ্যাত বই। তাতে বৈজয়ন্তী দেবীর লেখা বহু শ্লোক আজও পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

"আনন্দ লতিকা" রচনা কালে একদিন পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ সন্ধ্যা হইতে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া নায়িকার রূপ বর্ণনা করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া বৈজয়ন্তী দেবী তাঁহার স্বামীকে বল্লেন,—"এত সময় ধ'রে তুমি স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণনা ক'রছো। দেখ আমি একটী শ্লোকে তোমার নায়িকার তিন অঙ্গ বর্ণনা ক'রে দিচ্ছি।" এই বলে তিনি "আনন্দ লতিকা"র জন্য এই শ্লোকটী লিখে দিলেন :—

"অহিরয়ং কলধৌতগিরিভ্রমাৎ
স্তনমগাৎ কিল নাভিহ্রদোত্থিতঃ।
ইতি নিবেদয়িতুং নয়নে হি যৎ
শ্রবণ সীমনি কিং সমুপস্থিতে॥"

পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ উক্ত গ্রন্থের সহকারিণী বলে তাঁর স্ত্রীকে স্বীকার করেছেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"আনন্দ লতিকা গ্রন্থো যেনাকারি স্ত্রিয়া সহ।"

শুনা যায় একদিন কৃষ্ণনাথ তাঁর ছাত্রদের একখানি প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র পড়াতে গিয়ে তার এক স্থানে লিখিত,—"অত্রতু নোক্তং তত্রাপি নোক্তম্"—এর ব্যাখ্যা করলেন,—"এ স্থানেও বলা হয় নাই ও স্থানেও বলা হয় নাই।" কিন্তু এই পাঠটী সুসঙ্গত না হওয়াতে, তিনি এই অর্থে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। যথার্থ অর্থ নির্ণয় করবার জন্য তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। এদিকে বৈজয়ন্তী ছাত্রের মুখে শুনামাত্র পাঠের যথার্থ অর্থ বুঝে ছিলেন। তিনি পুস্তকখানি খুলে এর পদচ্ছেদ করে—"অত্রতু ন উক্তং তত্র অপি ন উক্তম্"

এইরূপ লিখে রাখলেন। এইরূপে সেই দুর্ব্বোধ্য পদটী পদচ্ছেদ দ্বারা সহজবোধ্য হয়েছিল।

বাংলায় বৈজয়ন্তীর পরবর্তী বিখ্যাতা বিদুষী উত্তরবঙ্গের মহামহোপাধ্যায় ইন্দ্রেশ্বর চূড়ামণির কন্যা মানিনী দেবী। তাঁর ভাই ধনেশ্বরকে বর্ণমালা শিখতে দেখেই তাঁর বর্ণশিক্ষা হয়, তাঁকে ব্যাকরণ প'ড়তে দেখেই তিনি ব্যাকরণ শেখেন, এজন্য কাউকে আলাদা কোনো পরিশ্রম ক'রতে হয়নি। পরবর্তী কালে তাঁর পিতার ছাত্রেরা তাঁকে পূজার ফুল তুলে দিয়ে অনেক দুরূহ প্রশ্নের অর্থ জেনে নিত। মানিনী সংস্কৃতে অনেক শ্লোক লিখে গেছেন, এক সময় সেগুলি অনেকের কণ্ঠস্থও ছিল, আজ ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে! তাঁর বিখ্যাত শিবস্তোত্র থেকে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি :

"তরণির্ধরণি সলিলং পবনো, গগনঞ্চ বিরিঞ্চি পুত্রস্বতনোঃ।
শশলাঞ্ছন ভূষণ চন্দ্রকলা স্তনবস্তব ঘোযয়তে-সচতে॥
তমসি ত্বমসীশ্বর তেজসি চ, প্রমথেশ গিরৌ জলধৌ বসসি।
অবনৌ গগনে চ গুহাসু পিত হৃদয়েহসি বহিশ্চ দধাসি জগৎ॥
করুণাজলধে হরিণাঙ্কশিরো গিরিরাজসুতা-দয়িত প্রণতাং।
তবপাদসরোরুহ-কিঙ্করিকাং সকলাদ্ধরমেত্য সমুদ্ধর মাং॥"

একুশদিনের শিশুপুত্র রেখে পূর্ণযৌবনে তিনি যখন স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যান তখন তাঁর পিতৃব্য তাঁকে শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে নিরস্ত ক'রতে চেয়েছিলেন, মানিনী শাস্ত্রীয় উদাহরণ দিয়েই তাঁকে পরাস্ত ক'রে হাসিমুখে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করেন। তাঁর সেই শিশুপুত্র ভবিষ্যতে রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক এবং মহাপণ্ডিত হয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সুবিখ্যাতা বিদুষী জপসা গ্রামের আনন্দময়ী দেবীর কথা অন্যত্র বলেছি, তাঁর শাস্ত্রীয় বিধান সেদিন বাংলা দেশের রাজারাজড়ারা পর্যন্ত মান্য করতেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরিদপুর নিবাসিনী সুন্দরী দেবী ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন।

অধ্যাপক চণ্ডীচরণের বিদুষী কন্যা দ্রবময়ী দেবী পিতার চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্রকে ব্যাকরণ পড়াতেন। এই যুগেই হঠী বিদ্যালঙ্কার বা লক্ষ্মীদেবী হিন্দু আইনের টীকা রচনা করেছিলেন। তদানীন্তন সমাজে তাঁর এতদূর সম্মান ছিল যে বড় বড় তর্কসভায় তাঁর নিমন্ত্রণ হ'ত এবং সর্বত্র সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সমান দক্ষিণা তাঁকে দেওয়া হ'ত। গৃহকার্যের অবসরে শাস্ত্রচর্চা ক'রে তিনি শেষে কাশীর মতো পণ্ডিত প্রধান স্থানে নিজে টোল খুলে ছাত্রদের সকল শাস্ত্রের পাঠ দিতেন এবং সেখানকার জনসাধারণ এবং অধ্যাপকদের দ্বারা সম্মানিতা হতেন।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দক্ষিণ ভারতে অনন্ত আচার্যের কন্যা ত্রিবেণী অল্পবয়সে পতিপুত্রহীনা হ'য়ে দীর্ঘজীবন একান্তে শাস্ত্র এবং কাব্য চর্চায় কাটিয়েছিলেন। তাঁর 'লক্ষ্মীসহস্র' 'রঙ্গনাথসহস্র' ভক্তিবিষয়ক, 'শুকসন্দেশ' 'ভৃঙ্গসন্দেশ গীতিগাথা জাতীয় এবং 'রঙ্গাভ্যুদয়' 'সম্পৎ-কুমারবিজয়' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ, 'তত্ত্বমুদ্রাভদ্রোদয়' এবং 'রঙ্গরাট সমুদয়' নাটক দক্ষিণ ভারতে সুপ্রসিদ্ধ। এই শতাব্দীর সুপণ্ডিতা নারীদের মধ্যে সুনন্দা দেবী বা "মাতাজীর" নাম ভারতবিখ্যাত। ভারতীয় নারীদের ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষা ক'রে সুশিক্ষিতা করবার জন্য তিনি বহু

বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, মহাকালীপাঠশালা তাদেরই অন্যতম। ধর্মপ্রাণা নারীদের কথা বলবার সময় তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা উচিত।

উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাতা বিদুষী এবং সংস্কৃত কবি পণ্ডিতা রমাবাই নিজে বাঙ্গালী না হ'লেও বাংলার বধূ। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরে পণ্ডিত অনন্তশাস্ত্রীর গৃহে তাঁর জন্ম হয়। তিনি বাল্যে পিতার কাছে সংস্কৃত এবং ভারতের কয়েকটি প্রাদেশিক ভাষায় সুশিক্ষিতা হন। ষোলো বছর বয়সে মাতৃপিতৃহীনা হ'য়ে ভাইয়ের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ ক'রে তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। কলকাতার এবং ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা তাঁর বাগ্মিতায় এবং কবিত্বে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে সরস্বতী উপাধি দেন। দ্বারভাঙ্গার রাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহের দ্বারা সম্মানিতা হ'য়ে রমাবাই সংস্কৃতে "লক্ষ্মীশ্বর চম্পূকাব্য" রচনা ক'রে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন, ঐ কাব্যে তাঁর অসাধারণ ছন্দোজ্ঞান এবং অলঙ্কার-নৈপুণ্যের সম্যক্ পরিচয় আছে। ভ্রাতার মৃত্যুর পর নিঃসহায়া রমাবাই শ্রীহট্টের উকিল বিপিনবিহারী দাসকে বিবাহ করেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর স্বামী মারা যান। অতঃপর এই বিদুষী বিধবা একা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত নারী শিক্ষা সম্বন্ধে সভা করে বক্তৃতা দিয়ে হিন্দু-সমাজকে সচেতন ক'রে তুলতে লাগলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি 'আর্য মহিলা সমাজ' স্থাপন করেন, একান্ত পরিতাপের বিষয় যে সেই বৎসরই তিনি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতা হন। উত্তেজনার বশে ধর্মত্যাগ ক'রলেও ভারতের অতীত সংস্কৃতির প্রতি আজীবন তাঁর অসীম

শ্রদ্ধা ছিল, পর বৎসর ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি ভারতের অতীত গৌরব সম্বন্ধে বহু গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রমাবাই চেল্‌টেন্‌হামের নারী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপিকা নিযুক্তা ছিলেন। সেখান থেকে আমেরিকায় গিয়ে কিণ্ডারগার্ডেন প্রণালী শিখে এবং বোষ্টন নগরে হিন্দু বিধবাদের সাহায্যের জন্য 'রমাবাই সমিতি' গঠন করে বোম্বাইয়ে ফিরে আসেন। বোম্বাইয়ে একটি বিধবাশ্রম স্থাপন ক'রে সেইটির পরিচালনার ভার নিয়ে তিনি অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। ১৯২৭ সালে এই সুপণ্ডিতা নারীর কর্মময় জীবন শেষ হয়। ইংরেজীতে 'উচ্চ জাতীয়া হিন্দু নারী' তাঁর বিখ্যাত বই।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কুম্ভকোণমের দেব-নর্তকী জ্ঞানসুন্দরী কয়েকটি সংস্কৃত কাব্য রচনা ক'রে মহীশূর রাজ-দরবার থেকে 'কবিরত্ন' উপাধি পেয়েছিলেন। মাদুরার শৈব ধর্মের জয়গান ক'রে তিনি 'হয়শালা চম্পু কাব্য' লিখেছেন। শ্রীদেবী বালরাজ্ঞীর 'চম্পূ-ভাগবৎ', ভাগবৎপুরাণের সংক্ষিপ্ত গদ্যপদ্যময় সংস্করণ। মহীশূরের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি 'সুন্দর-বল্লী'র ছয়সর্গে লেখা তেলুগু অক্ষরে ছাপা 'রামায়ণ চম্পূকাব্য' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত কবিদের মধ্যে মারাঠী বিদুষী অনসূয়া কমলাবাই বাপটের "শ্রীদত্তপঞ্চামৃত" নামক দত্তাত্রেয়দেবের পূজাবিধি বিশেষ করে মহারাষ্ট্র দেশের জন্যই লেখা। তা'তে প্রথম দু'সর্গ তাঁর নিজের লেখা, বাকি অংশ অন্য লেখকদের লেখা থেকে সঙ্কলন।

বর্তমান কবিদের মধ্যে তামীলদেশীয়া বালাম্বিকার লেখা বিভিন্ন কাব্যের মধ্যে 'সুবোধ রামচরিতে' রামায়ণের উত্তর কাণ্ড বাদ দেওয়া হয়েছে। বালাম্বিকা 'আর্য-রামায়ণ' নামক রামায়ণের একটি সংক্ষিপ্তসার 'গণ-কদম্ব' এবং 'দেবীত্রয়ত্রিংশন্মালা' লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন। হনুমাম্বা ভেন্নেলকান্তি তাঁর গুরু ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর বন্দনায় 'ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী স্বামীপাদুকাপূজন' নামক গদ্যপদ্যময় কাব্যছাড়া 'শঙ্কর ভগবৎপাদ সহস্রনামাবলী' গ্রন্থে শঙ্করাচার্যের তপস্যা, পাণ্ডিত্য, দিগ্বিজয় এবং দৈবশক্তির দ্যোতক তাঁর সহস্র-নামকরণ করেছেন। বহু রাগরাগিণীসমন্বিত গীতি-কবিতায় দত্তাত্রেয় পূজাবিষয়ক 'দত্ত-পূজা গীত-কদম্ব' রচনা ক'রে তিনি প্রসিদ্ধা হয়েছেন।

উড়িষ্যার সামন্তরাজা বিশ্বনাথ দেববর্মনের পত্নী রাধাপ্রিয়া দেবী স্বামীর সঙ্গে একত্রে 'রাধাগোবিন্দ শরৎরাত্র' কাব্য লিখেছেন। এ ছাড়া তাঁর স্বামীর রুক্মিণী-পরিণয়' কাব্যের তিনি একটি পাণ্ডিত্য পূর্ণ টীকা রচনা করেছেন। তাঞ্জোরের মুথুকৃষ্ণ আয়ারের পত্নী 'কামাক্ষী' কালিদাসের ব্যবহৃত বহু শব্দ সুকৌশলে নূতন ভাবে সাজিয়ে ব্যবহার ক'রে 'রামচরিত' রচনা করেছেন, তাঁতে তার অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'মণ্ডয়ম্ ধাতি আলমেলম্মা' উদ্‌ভট-নাম্নী কোন মহিলা সহজভাষায় 'বুদ্ধচরিতামৃত' লিখে প্রশংসালাভ করেছেন।

কাশীতে মহারাষ্ট্রে এবং দক্ষিণ ভারতে আজও সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞা বহু বিদুষী নারী দেখতে পাওয়া যায়, বাংলা বিহার উড়িষ্যাতেও সংস্কৃতজ্ঞা এবং সংস্কৃত উচ্চ উপাধিধারিণী নারী কয়েকজন আছেন, তাঁদের সকলের সন্ধান আমাদের সঠিক

জানা নেই। মাত্র একটী সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিতা বালিকার সংবাদ ও দর্শন আমরা পেয়েছি, তাঁর নাম শ্রীমতী সরলা দেবী, সাত বৎসর বয়সে ঐ বালিকা মাতৃভাষার মত সংস্কৃতে অনর্গল কথা বলতে পারতো, সম্প্রতি চৌদ্দ বৎসর বয়সে কাশীধামে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-শান্তি মহা-যজ্ঞ সভায় তাঁকে ভারতীয় সর্ব্ব-দর্শন-জ্ঞানসম্পন্না এবং দার্শনিক বর্ক্তৃতা সংস্কৃত ভাষায় অন্যূন এক ঘণ্টাকাল ধরে দিতে দেখা গেল। ইনি বোম্বাই প্রদেশের কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা।

সংস্কৃত কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা দীর্ঘ হ'ল। উপায় নেই! একদিন সমস্ত ভারতের বিদ্বজ্জনকে যে ভাষা একসূত্রে বেঁধেছিল, আ-চণ্ডাল জনসাধারণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়েছিল,—গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী-নর্মদা-সিন্ধু-কাবেরীর জলে পুণ্যস্নান করিয়ে, অযোধ্যা-মথুরা-মায়া-কাশী-কাঞ্চী-উজ্জয়িনী-পুরী ও দ্বারাবতীতে তীর্থভ্রমণ করিয়ে সমস্ত ভারতভূমিকে—মনীষী ভূদেবের ভাষায় 'সতীদেহরূপা জননীকে' প্রতিদিন প্রভাতে সন্ধ্যায় শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রতে শিখিয়েছিল,—আজও ভূদেবের দেশাত্ম-বোধের মন্ত্র-শিষ্য বঙ্কিম বাংলার সাহিত্য-সম্রাট হ'য়েও যার কৃপায় 'বন্দেমাতরম্' মহামন্ত্রের রচয়িতা ব'লে জগদ্বিখ্যাত (যে মন্ত্রের সাধনায় লক্ষ লক্ষ নারীপুরুষ কারাবরণ করেছে, শত শত নরনারী মৃত্যুকে তুচ্ছ করেছে) সেই সংস্কৃত ভাষাকে অন্তরের অন্তর দিয়ে একান্তরূপে শ্রদ্ধা করি। তার সম্বন্ধে আলোচনা শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে ক্রমশঃ কমে আসছে ব'লেই এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন বোধ হ'ল। সংস্কৃত সাহিত্যে নারী কবিদের দান সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলে আমরা দেখতে পাই

ঋগ্বেদের যুগ থেকে অতি আধুনিক যুগ পর্যন্ত দেবভাষা চর্চার ধারা নারীরা অব্যাহত রেখেছেন। উত্তরভারতে পারস্য ও গ্রীকসভ্যতার প্রভাব এর ক্ষতি ক'রতে না পারলেও অনুলোম-বিবাহের ফলে বহু অনার্য নারী আর্যসমাজে স্থানলাভ ক'রে সংস্কৃতচর্চার প্রতি অবহেলা দেখানোর ফলে তাঁদের প্রভাবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও শিক্ষিত পুরুষের ভাষা সংস্কৃত এবং নারীর ভাষা প্রাকৃত দাঁড়িয়ে গেছল, প্রাচীন নাটকে আমরা সর্বত্র এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। 'নারীর মুখে সংস্কৃত ভালো শোনায় না' এমন কথাও সে যুগে শোনা গেছে। নারীর সংস্কৃত জ্ঞানের কিছু কিছু প্রমাণ আমরা দিয়েছি, নারীর মুখে সংস্কৃত স্তব কত সুন্দর শোনায় তা দক্ষিণী সংস্কৃতজ্ঞা গায়িকাদের গান যাঁরা শুনেছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন। মুসলমান যুগে উত্তর ভারতে অবরোধপ্রথার বৃদ্ধি নারীর সংস্কৃতচর্চায় বাধা দিলেও তাকে সমূলে নির্মূল ক'রতে পারেনি, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন রাজাদের সভায় এবং দেবমন্দিরে অবরোধহীনা নারীরা চিরদিনই অবাধে সংস্কৃত ভাষায় কাব্য চর্চা ক'রে রাজসম্মান লাভ করে এসেছেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত চর্চা দেশে ক'মে আসায় আমরা আজ তার মূল্য সম্বন্ধে সত্য দৃষ্টি হারিয়েছি, আমাদের অতীতকেও সেই সঙ্গে ভুলে যেতে বসেছি।

ভারতীয় সংস্কৃত কবিদের পর বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে প্রাকৃত ভাষার কবিদের সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। এঁদের অনেকেরই সময় নির্ণীত হয়নি। খৃষ্টের পাঁচ ছ'শ'বছর আগে 'থেরী কবিরা' যখন

অন্যতম মাগধী প্রাকৃত 'পালি' ভাষায় কাব্য রচনা করেন সেই যুগেই অন্যত্র অন্যান্য নারীরা প্রাকৃতে কাব্যরচনা করতেন ব'লে মনে হয়। নিম্নোল্লিখিত কবিদের মধ্যে একমাত্র অবন্তিসুন্দরী ছাড়া আর সকলের কথাই রাজা শাতবাহনের লেখায় পাওয়া যায়, অর্থাৎ তাঁরা গুপ্তযুগের পূর্ববর্তী কালে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। যাঁদের লেখা পাওয়া গেছে তাঁরাই প্রাকৃত কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন কিনা সে কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না, তবু তাঁদের রচনা থেকেই আমরা প্রাকৃত কবিতার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারি। তাঁদের নাম অনুলচ্ছী (অনুলক্ষ্মী) অসুলদ্ধী (?), ওন্দিসুন্দরী (অবন্তিসুন্দরী) মাহবী (মাধবী) পহআ (প্রহতা) সসিপ্পহা (শশিপ্রভা), রেবা, রোহা, (রোহিণী ?) বদ্ধাবহি (?)। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতা ছিলেন কাব্যমীমাংসা-লেখক ব্রাহ্মণ রাজশেখরের ক্ষত্রিয়া-পত্নী চৌহানকুল-মুকুটমণি বিদুষী অবন্তিসুন্দরী। রাজশেখর তাঁর অনুরোধে কর্পূরমঞ্জরী নাটক লিখেছিলেন, তাঁর ভাই ধনপালকেও তিনি প্রাকৃতে কাব্যরচনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। কাব্যমীমাংসায় রাজশেখর প্রামাণ্য ব'লে তিনবার উল্লেখ করেছেন, হেমচন্দ্র 'দেশীনামমালায়' অবন্তিসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর মতভেদের কথা বলেছেন। তখনকার পণ্ডিত সমাজে তাঁর মত শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত এবং বিবেচিত হ'ত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর কবিতার একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

"কিং তং পি বীসরিয় নিক্কিব জং গুরু অণস্স মজ্ঝভি।
অহিধাবিউন গহিও তং ওহুর-উত্তরীয়াএ॥"

(বিরহিণী ব'লছেন) "হায় নিষ্ঠুর, তুমি কি ভুলে গেছ

(লজ্জাহীনার মতো) গুরুজনদের মধ্য দিয়ে স্রস্ত-উত্তরীয়ে ছুটে গিয়ে (একদিন) আমি তোমাকে ধরেছিলুম।"

অনুলক্ষ্মীর কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার মধ্যে একটিতে তিনি, মানুষ মিথ্যা আশার দ্বারা কি ভাবে প্রবঞ্চিত হয় তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন :

"হসিঅং সহৎথ-তালং সুক্‌খবডং উবগ-এহিং পহিএ হিং।
পত্তঅ-ফলানং সরিসে উড্ডীণে সুঅ-বিন্দম্মি॥"

পত্রহীন শুক্‌নো বটগাছে এক ঝাঁক টিয়া পাখী বসেছিল; দূর থেকে শ্রান্ত পথিকেরা গাছের পাতা এবং ফল মনে ক'রে (সবুজ দেহগুলি পাতার এবং লাল ঠোঁটগুলি ফলের মতো দেখানোয়) (বিশ্রামের আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে) হাততালি দিয়ে হেসে উঠতেই পাখীরা (গাছ খালি করে) উড়ে গেল। অনুলক্ষ্মীর কবিতায় অন্ততঃ দেড় হাজার বছর আগেকার অতি-আধুনিকা নায়িকা পরের স্বামীকে প্রলুব্ধ করার জন্য তোষামোদের ছলে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন :

"জং তুজ্‌ঝ সই জ্যাআ অসইও জং চ সুহঅ অম্‌হেবি।
তা কিং ফুট্টউ বীঅং তুজ্‌ঝ সমানো জুয়া নৎথি॥"

"হে সুপুরুষ, তোমার স্ত্রী যে সতী আছেন আর আমরা যে অসতী হচ্চি, তার কারণ সুস্পষ্ট; তোমার মতো (সুন্দর) যুবক আর নেই (সেই জন্যই তাঁর মন অন্যকে দেখে টলে না।)

মাধবীর লেখা নিম্নলিখিত কবিতাটিতে দূতী নায়িকার পক্ষ হয়ে এসে কাঠখোট্টা প্রণয়ীকে প্রণয়ের উপযুক্ত রীতি শেখাচ্ছেন :

"ণুমেন্তি যে পহুতং কুবিঅং দাসাধ্বজে পসাঅ অন্তি!
তেবিবয়ং মহিলাণঁ পিআ সেসা সামিব্বিঅং অরাআ॥"

যারা প্রভুত্ব গোপন ক'রতে জানে, প্রণয়িনী কুপিতা হলে তাকে দাসের মতো (সেবা ক'রে) সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে, তারাই মহিলাদের প্রকৃত প্রণয়ী, অন্যেরা কেবল বর্বর স্বামী মাত্র।"

প্রহতার পতিসোহাগিনী চণ্ড-নায়িকা কি ভাবে তিনি স্বামীকে বশে রাখেন, তারই গল্প বান্ধবীদের কাছে ব'লে গর্ব ক'রছেন :

"একং পহরুবিন্নং হৎথং মুহমারু এ ণ বীঅন্তো।
সো বি হুসন্তীএ মএ গহিও বীএন কণ্ঠম্মি॥"

"এক হাতে তাকে চড় মারলুম (হাতটা জ্বলে উঠল) হাতে ফুঁ দিতে দিতে আর এক হাত দিয়ে হাসতে হাসতে তার গলা জড়িয়ে ধরলুম, (সে কৃতার্থ হ'য়ে গেল)।"

রেবার কবিতায় অপরাধী নায়ক নায়িকার কাছে ক্ষমা চাইছেন : নায়িকা চ'টে আগুণ হ'য়ে ব'লছেন :

"কিং দার কআ অহবা করেসি কারিস্‌সি সুহঅ এত্তাহে।
অবরাহাণঁ অলজ্জির সাহসু কহএ খমিজ্জন্ত॥"

"হে নির্লজ্জ. তোমার কোন অপরাধ আমি ক্ষমা ক'রব ? যে অপরাধগুলি তুমি আগে করেছ, না যে অপরাধগুলি তুমি এখন ক'রছ, না, যে অপরাধগুলি তুমি ভবিষ্যতে করবে ?"

শশিপ্রভার কবিতায় অত্যন্ত সেকেলে নায়িকা স্বামার অবহেলা সহ্য ক'রেও তাঁকে ভালো না বেসে থাকতে পারেন না। তিনি ব'লছেন :

"জহ জহ বা এই পিও তহ তহ নচ্চামি চঞ্চলে পেম্মে।
বল্লী বলেই অঙ্গং সহাব-যদ্ধে বিরুক্খস্তি॥"

"প্রিয় যেমন বাজান, তার প্রেম চঞ্চল জেনেও আমি তেমনি নাচি। গাছ স্বভাবতঃই স্তব্ধ (সাড়া দেয় না) তবু লতা তাকে জড়িয়ে থাকে।"

প্রাকৃত কবিদের কবিতার ভাব অনেক সময় খুব গভীর এবং মধুর হ'লেও সংস্কৃত কবিতার মতো গম্ভীর এবং উদাত্ত ধ্বনির অভাবে সেগুলি বিশেষ করে বর্তমান যুগের আমাদের কানে বেসুরো এবং দুর্বল লাগে। যে যুগে ভারতবর্ষের সভ্যতা গৌরবের চরম শিখরে উঠেছিল, সেই যুগেই ভারতবর্ষের সর্বত্র মেয়েদের প্রাকৃতে কথা ব'লতে দেখা যায়, অবন্তিসুন্দরীর মতো সংস্কৃতজ্ঞা নারীরাও কাব্য রচনার সময় প্রাকৃত ব্যবহার করতেন। জনসাধারণের সঙ্গে নিজেদের ঐক্য স্থাপনের জন্য এই ব্যবহার সমর্থনযোগ্য হ'লেও একই বাড়ীতে শিক্ষিত পুরুষ সংস্কৃতে এবং নারী প্রাকৃতে কথা কইতেন, এটা যেন কেমন অস্বাভাবিক লাগে। বলা বাহুল্য সংস্কৃত যেদিন থেকে ঘরের মধ্যে প্রাকৃতকে আসন ছেড়ে দিয়ে নিজে দরবারে গিয়ে বসল, সেদিনই তার অধঃপতনের সূত্রপাত আরম্ভ হ'ল। আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে বাংলা ভাষা প্রাকৃতের থেকে নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে 'ভিন্ন' হ'তে আরম্ভ করে, গত শতাব্দীর প্রথম দিকেও বাংলা গদ্যে প্রাকৃতের প্রভাব দেখা যায়। গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রধানতঃ বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিম, মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় বহু সংস্কৃত শব্দ আহরণ করে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ এবং সবল হয়েছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। বাংলায় বর্তমান যুগের নারী কবিদের লেখায় ভাষার গভীরতা যেমনই থাক না থাক, ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য গাম্ভীর্য এবং মাধুর্য প্রাকৃত কবিদের লেখার

চেয়ে বেশী। এই সংস্কৃতের সংস্কৃতি ভেঙে দিয়ে নূতন ক'রে বাংলায় প্রাকৃত প্রভাব এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিদেশী শব্দের নির্বিচার প্রয়োগ ফিরিয়ে আনার যাঁরা সমর্থন করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য যতই সাধু হোক, তাঁদের দ্বারা মাতৃ-ভাষার কল্যাণ সাধিত হবে না।

বাংলা দেশে যে সব বিদুষী এবং কবি বাংলা ভাষার সেবায় খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের কথা ব'লবার আগে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মুসলমান যুগে যেসব লেখিকা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা জনসাধারণের কাছে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁদের কথা কিছু কিছু বলা দরকার। প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে দক্ষিণ দেশীয় তামিল তেলুগু প্রভৃতি ভাষায় বারো শ' বছর আগেও ভালো ভালো কাব্য রচিত হয়েছে, সে-কথা পূর্বে বলেছি। তামিল সাহিত্যে আণ্ডাল এবং অভ্ভয়ার এবং তেলুগু সাহিত্যে মল্লা বা মল্লীর নাম সব চেয়ে বিখ্যাত।

সংস্কৃতের সমবয়স্ক সুপ্রাচীন দ্রাবিড় ভাষাগুলির কথা বাদ দিলে, মোটের ওপর দেখা যায়, দ্বাদশ শতাব্দীর পর অর্থাৎ মধ্য যুগে ভারতের তত্ত্বালোচনার এবং রসসৃষ্টির কাজ সংস্কৃত ভাষার চিরপরিচিত খাত ছেড়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার খাত দিয়ে প্রবাহিত হ'তে আরম্ভ ক'রল। এই সময়ে পরাধীনতার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ সমাজে এবং ধর্মে অনেক সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা এবং মূঢ়তা প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, যার প্রভাব আজও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। পৌরাণিক যুগে এবং বৌদ্ধ যুগে মানুষকে দেবতার উপরে স্থান দেবার যে চেষ্টা চলেছিল, তার পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারী প্রণতপ্রতিপালক

রাজগণের আদর্শে সে যুগের ধর্মের হিংস্র দেবতারা পূজা লোভে মানুষের ওপর অন্যায় অত্যাচার করতে আরম্ভ করলেন, সমাজে যে নিরীহ নিপীড়ন চলছিল, সাহিত্যেও তার ছাপ পড়ল। শীতলা, মনসা, ঘেঁটু থেকে আরম্ভ ক'রে বন-বিবি, সত্যপীর, গাজী প্রভৃতি অমঙ্গলের দেবতা,—বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়, কুমীরের দেবতা কালুরায়,—ক্ষেত্রপাল পঞ্চানন্দ, হাজরা প্রভৃতি তথাকথিত প্রেতযোনি,—সে সময়ে ছলে বলে, কৌশলে অসহায় অশিক্ষিত লোকের কাছে পূজা আদায় কর'তে লাগলেন। দেব দেবীদের ভক্তেরা ব্যভিচার বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি করেও নিষ্কৃতি পেল, আর যাঁরা তাঁদের পূজা দিতে সম্মত হলেন না, তাঁরা ভালো লোক হলেও তাঁদের দুর্দ্দশার সীমা রইল না। এই তিমিরাচ্ছন্ন যুগেই আবার নানক, চৈতন্য, কবীর, দাদু, সুরদাস প্রভৃতি মহাপুরুষেরও জন্ম হয়, তাঁদের সৃষ্ট ধর্মপ্লাবনে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ভেসে যায়। এই যুগে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে সব নারী সাহিত্য-চর্চা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন উচ্চস্তরের সাধিকা, তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে ভক্তি-তত্ত্বই প্রধান। এই সব নারী সাহিত্যিকা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তাঁদের দান রেখে গেছেন, তার সবগুলির সঙ্গে পরিচয় আমাদের নেই। কিন্তু অনবদ্যরস-সৃজন-বৈশিষ্ট্যে যাঁর রচনা প্রাদেশিক গণ্ডী এমন কি ভারতের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বের ভক্তি-সাহিত্যের অমরাবতীতে স্থান পাবার যোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়েছে তাঁর নাম জানে না এমন সাক্ষর ও নিরক্ষর নরনারী বাংলাদেশে অল্পই আছেন। আমরা

মীরাবাইয়ের কথা বলছিলাম। রাজপুতনার এক পরম বৈষ্ণব রাঠোর ভূস্বামীর গৃহে আনুমানিক ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে এই পরম ভক্তিমতী নারীর জন্ম হয়। তাঁর অলৌকিক সৌন্দর্যখ্যাতি শুনে মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহ তাঁকে পুত্রবধূরূপে নিয়ে আসেন, কনিষ্ঠ পুত্র কুমার ভোজের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে। বৈষ্ণব মীরার শৈব শ্বশুর-কুলে এসে তখন থেকেই বহু নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল, দশ বছর পরে স্বামীর অকালমৃত্যুতে তাঁর সংসারের সব সুখই ফুরিয়ে গেল, শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন পরম ভক্তিমতী, পার্থিব স্বামীকে হারিয়ে তিনি বিশ্বের স্বামীর সন্ধানে যেদিন ভক্তির উদার রাজপথে যাত্রা করলেন সেদিনও আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁকে ধিক্কার দিল, কিন্তু কোন বাধা মানবার মতো মনের অবস্থা তাঁর তখন ছিল না। রাজগৃহে বহু সাধু সজ্জনের সমাগম আরম্ভ হ'ল, তাঁর ভাসুর বিক্রমসিংহ তাঁকে লজ্জাহীনতার জন্য তিরস্কার করেন, শেষে হত্যা করবার জন্য বিষও পাঠান, ননদ উদাবাই তাঁকে অনেক রকম করে বোঝাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। অতিরিক্ত নির্যাতনে বিদ্রোহী মীরা শুধু বললেন :

"হেরী ম্যাঁয় তো প্রেমদিওয়ানী, মেরা দরদ না জানে কোঈ।"

সখি, আমি যে প্রেমে পাগল হয়েছি, আমার ব্যথা কেউ বুঝ্‌বে না।

"প্যারে দরশন দীজ্যো আয়,
তুম বিন রহ্যো ন জায়।
জল বিন কঁবল চন্দ বিন রজনী ;
ঐ সে তুম দেখ্যা বিন সজনী "

হে প্রিয় এসে দেখা দাও, তুমি বিনা যে আর থাকৃতে পারি না, জল বিনা যেমন কমল, চন্দ্রহীন যেমন রাত্রি, হে প্রিয় তোমা বিনা আমারও যে সেই অবস্থা।

হরির বিরহে উন্মাদিনী মীরার আকুল প্রার্থনা আজও লক্ষ লক্ষ নরনারীর পথের পাথেয়, সেদিন মীরার কণ্ঠের গান যারা শুনেছিল তাদের সৌভাগ্যের তুলনা নেই !

বহু সাধনায় অবশেষে তাঁর সিদ্ধি এল, মীরা অন্তরের মধ্যে 'হরি আওয়ন কি আওয়াজ' শুন্‌তে পেলেন। নিশীথ রাত্রে 'শ্যামল বনে' তাঁর 'শ্যামলের বাঁশি' শুনে মীরা গৃহত্যাগ করলেন। তারপর দীর্ঘজীবন তাঁর কেটেছে পথে, আশ্রমে, মন্দিরে—বৃন্দাবনে, দ্বারকায়। নিজের ব'লতে তিনি কিছুই রাখেন নি, ঈশ্বরপ্রেমে ঐশ্বর্য, লোক-লজ্জা, গৃহসুখ সবই তিনি ছেড়েছিলেন। তাঁর প্রিয়তমের সেবায় যে আনন্দ তিনি পেয়েছিলেন, তাঁর গানগুলি আজও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে :

তাঁর 'মহারো' জনম মরণ কি সাথী, তাকে নহিঁ বিসরূ দিনরাতী।
তুম দেখ্যা বিন কলন পরত হ্যায়, জানত মেরী ছাতি'।

আমার জন্ম-মরণের সাথী, তোমাকে দিনে রাত্রে কখনও ভুলব না। আমার হৃদয় জানে তোমাকে না দেখ্‌লে সময় কাটে না।

"মহাঁনে চাকর রাখো জী"—প্রভু আমায় চাকর রাখো।

"জো তুম তোড়ো পিয়া ম্যায় নেহি তোড়ু"

প্রিয় তুমি এ বাঁধান ছিঁড়তে হয় ছেঁড়ো, আমি ছিঁড়ব না।
"চিতনন্দন আগে নাচুংগী"—চিতনন্দনের সাম্‌নে আমি নাচব।
"মেরে তো গিরধর গোপাল দুসরা ন কোঈ"—আমার তো আছেন শুধু গিরিধারী গোপাল, আর কেউ নেই।

"বরষে বদরিয়া সাওয়ন-কী মন ভাওয়ন-কী।
শাওয়ন মে উমগ্যো মেরী মনোয়া ভনক সুনী হরি আওয়নকী।"

শ্রাবণের বাদল বর্ষণ ক'রেছে, আমার মন ভরানো শ্রাবণের মেঘ। আজ শ্রাবণে আমার মন উন্মুখ হ'য়ে প্রিয়তমের আগমন ধ্বনি শুনছে—"মেহা বরসি ওয়ো কররে, আজ তো রসিয়ো মেরে ঘরে রে," মেঘ বর্ষণ করছে, আজ প্রিয়তম আমার ঘরে প্রভৃতি গানের সমকক্ষ গান পৃথিবীর যে কোনো দেশের সাহিত্যে দুর্লভ।

"তেরে ভুবণ বৃন্দাবনসে শ্যাঁবলিয়াকে সুর বাঁজি"

রবীন্দ্রনাথের যে কোনো শ্রেষ্ঠ রচনার পাশে সমান আসন পেতে পারে। এই রাজ তপস্বিনীর অলৌকিক সৌন্দর্য, কণ্ঠস্বরের মোহিনীশক্তি, সর্ব্বভূতে সমভাব-সূচক বিনয় নম্র ব্যবহার, সর্ব্বোপরি তাঁর অন্তরের অনাবিল নিঃস্বার্থ ঈশ্বরপ্রেম সে যুগের মানুষকে কতখানি প্রভাবান্বিত করেছিল, আজ তা আমরা কল্পনা ক'রতে পারব না। মেবারের রাজবংশ অবশেষে একদিন তাঁর গৌরবে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেছিল, তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য দ্বারকায় দূত গেছল। মীরা সে দিন শ্রীমন্দিরে গেয়েছিলেন : "প্রিয় যদি আমায় শুদ্ধ জেনে থাকো তবে আমায় তুলে নাও, তুমি ছাড়া আমার যে কেউ নেই।...হে মীরার প্রভু, গিরিধর নাগর, একবার যখন তুমি মিলেছ, আর আমায় ছেড়ে যেয়ো না।" কথিত আছে মীরা নাকি তখন রণ্‌ছোড়জীর মূর্ত্তিতে মিলিয়ে যান। অনুমান ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর তিরোধান ঘটে।

মীরাবাইয়ের পরই বিদুষী করমেতি বাই ভারতীয় ভক্তি-সাহিত্যে অমর হ'য়ে আছেন। দাক্ষিণাত্যের খাজল গ্রামে

পরশুরাম পণ্ডিতের কন্যারূপে তিনি জন্মেছিলেন, শৈশবে বৈষ্ণব সাহিত্যে পারদর্শিনী হ'য়ে যৌবনে ধর্মানুরাগে ইনি পতিগৃহ ত্যাগ করেন। নানা বিপদ উত্তীর্ণ হ'য়ে অবশেষে তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর পিতা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসে তাঁর উন্নত জীবনের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে ফিরে যান এবং তাঁদের দেশের রাজাকে সেই সংবাদ দেন। রাজা করমেতিবাইকে দেখতে এসে তাঁর জন্য যে কুটির তৈরি করিয়ে দিয়ে গেছলেন, আজও বৃন্দাবনে তার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। তাঁর ধর্মোপদেশ আজও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বহু বৈষ্ণবের মুখে শোনা যায়।

হিন্দী ভাষায় কবিতা রচনা ক'রে মুসলমান রাজত্বকালে যে কয়জন নারী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সহজীবাই, দয়াবাই, চম্পাদেই, প্রবীণাবাই, শেখ এবং তাজ নাম্নী কবিদের নাম উল্লেখযোগ্য। সহজীবাই রাজপুতানার 'ডুসরকুল' নামক স্থানে জন্মেছিলেন, মহাযোগী চরণদাসের শিষ্যত্ব নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল যোগসাধনা ক'রে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর রচিত বহু দোঁহা এখনও উত্তর ভারতে প্রচলিত! ভক্তিমতী দয়াবাইয়ের সরস ভক্তিপূর্ণ দোঁহাগুলিও হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

ষোড়শ শতাব্দীতে বুন্দেল খণ্ডের রাজা ইন্দ্রজিৎসিংহের সভায় প্রবীণাবাই নাম্নী বিখ্যাত নারীকবি বহু হিন্দী কবিতা রচনা করেন। তাঁর খ্যাতি শুনে বাদসাহ আকবর তাঁকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান। প্রবীণার গমনে বাধা দেওয়ায় ইন্দ্রজিৎসিংহের দশ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়, অবশ্য তাঁর সভাকবি কেশবলাল এবং আকবরের সভাসদ বীরবলের অনুনয়ে আকবর পরে সেই অর্থদণ্ড থেকে তাঁকে মুক্তি দেন। প্রবীণাবাই

মোগলদরবারে গিয়ে পাণ্ডিত্যে এবং কবিত্বে সকলকে মুগ্ধ করেন এবং প্রচুর অর্থ এবং যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। আকবরের সভাসদ রাজপুত রাজবংশীয় কবি পৃথ্বীরাজের পত্নী চম্পাদেই (দেবী)র বীররসাত্মক কবিতাগুলি ঐ যুগেরই লেখা।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত হিন্দীকবি আলমের পত্নী 'শেখ' প্রেমের কবিতা লিখে বিখ্যাতা হয়েছিলেন। হিন্দু আলম তাঁর কবিত্বে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে বিয়ে করবার জন্য মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ব'লে প্রসিদ্ধি আছে। ঐ শতাব্দীর অন্যতমা সুবিখ্যাতা হিন্দীকবি তাজ তাঁর বৈষ্ণব কবিতাগুলির জন্য অমর হয়ে আছেন।

ইসলামের অসি ঝণৎকারের মধ্যে ভারতের ভাগ্যবিধাতার ক্রূর বক্র হাসি স্ফুরিত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু শিল্প এবং জগতে অতুলনীয় বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ, সঙ্ঘারাম, শিল্পসারভূত মূর্তিরাজি চূর্ণবিচূর্ণিত ও মহাকালের নর্তিত চরণক্ষেপের রুদ্র-তালে ধূলিকণায় পরিণত হয়ে গেল। সহস্র সহস্রাব্দীর সমস্ত সাধনা তার প্রগতি হারালো। সমাজ, সাহিত্য, শিল্প এবং এদের যে একত্রিত ক'রে রেখেছিল সেই সংযোগসেতু ধর্ম এক সঙ্গে সমস্তই বিপর্যস্ত হয়ে গেল এবং তার সঙ্গে চিরদিন যা' হয়ে এসেছে এবারও তাই ঘটল। এই বিপর্যয়ের মহাহবে উৎসর্গিতা হ'ল ভারতের নারী;—একান্ত রূপেই তার দশা বিপর্যয় ঘটে গেল। সর্ব সত্ত্ব হারিয়ে সে হ'ল অন্দরের বন্দিনী। পূর্ব পূর্ব আক্রমণকারীদের ভারত আক্রমণে তার এ দশা হয়নি। তবে কথা এই, পুরুষের যখন দাসত্ব ঘটে, তখন নারীরও সেই সঙ্গে সঙ্গে দাসীত্ব ঘটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। অধীনতার প্রথম

ফল দুর্বল পাত্রতেই ফলে। ক্ষয়রোগের মতই পলে পলে তাকে জীবনী শক্তি হারা করে।

গিরিশৃঙ্গ-বিদারী উন্মত্ত নির্ঝরধারা ক্রম-নিম্নভাগে যতই প্রবাহিত হয়ে গেল ততই তার উন্মাদনা হ্রাস পেল। অবশেষে প্রায়-শান্ত সরিৎ দেশমাতৃকার যুগল সন্তানরূপে সরিৎপতির সঙ্গ লাভে পাশাপাশি যাত্রাও করল। কিন্তু ঝড় থামলেও তার রুদ্রতাণ্ডবের ক্ষত ও ক্ষতি সঙ্গে সঙ্গেই কিছু মিলিয়ে যায় না। যদিও এর ফলে এক দিক দিয়ে কাবুল, কান্দাহার, নালন্দা, মথুরা, সারনাথের অতুলনীয় কীর্তিসমূহ বিধ্বস্ত হ'ল, আবার আর এক দিক দিয়ে দিল্লী, আগ্রা, সেকেন্দ্রা, ফতেপুরসিক্রি, লাহোরের সুরম্য হর্ম্য, মিনার, মসজিদে আরব, পারস্যদেশাগত শিল্পসম্ভারে বিচিত্র চিত্রকলায় ভারতবক্ষ বিভূষিতও হ'ল। হিন্দু-নারীর প্রতি অত্যাচার এ সময় খুব কম ঘটেনি এ কথাটা স্বীকার ঐতিহাসিক কারণে করতেই হয়, এবং তারই ফলে বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা, নারীর নাম বাহিরে প্রচার হওয়া, এমন কি এই ভয়ে বিদ্যাশিক্ষা পর্যন্ত মেয়েদের পক্ষ থেকে বন্ধ হয়ে যায়, লজ্জাকর হ'লেও ইহাই ঐতিহাসিক সত্য। একে চাপা দিলেও চাপা পড়ে না এবং আজকের দিনে এর জন্য বিধাতার ইচ্ছা অনিচ্ছা ব্যতীত অপর কাহাকেও দায়ী করাও চলে না। পূর্বপুরুষের কোনও ভালমন্দ কাজের কৈফিয়ৎ উত্তর পুরুষরা দিতে বাধ্য নয়, শুধু সেই ভুলকেই সে শুধরে নিতে পারে।*

---

* একান্ত পরিতাপের বিষয় অতীতের "ভুল" বর্ত্তমানে সংশোধিত হওয়া দূরের কথা, সমগ্র ভারতব্যাপী দাবানলরূপে প্রজ্বলিত হয়ে তার অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ করতে উদ্যত হয়েছে। ভারতবর্ষ আজ ভারতবর্ষ নয়, পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান !!! —মর্ম্মাহতা লেখিকা।

ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনে নারীর অধিকার খুব বেশী সঙ্কুচিত হয়েছিল এ কথা সত্য, কিন্তু তার প্রধান ক্ষেত্র ছিল রাজধানী এবং বড় বড় সহর। সুদূর পল্লীতে, যেখানে মুসলমান রাজপুরুষদের যাতায়াত ছিল না, সেখানে অবরোধ-প্রথারও ততদূর কড়াক্কড়ি হয়নি। ছেলে মেয়ে সেখানে দশ এগার বছর বয়স পর্যন্ত এক সঙ্গেই পড়ত এবং আজও পড়ে। বাংলার নানা উপকথায়, 'সখী সোনার গল্পে' এবং 'চন্দ্রাবতী জয়চন্দ্রে' পাঠশালায় বাল্যপ্রণয়ের ব্যাপারে আমরা এর প্রমাণ পাই। সহরের সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরে তখন জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে-ছিলেন পূর্বে উক্ত "খড়দার মা গোঁসাইদের" নেতৃত্বে শিক্ষিতা বৈষ্ণবীরা এবং মুসলমান ঘরে 'আতুন' বা গৃহশিক্ষয়িত্রীরা। এই যুগের রাজা বাদশাদের অন্তঃপুরে যে সব বোরখা-ঢাকা পর্দানসীন মেয়েরা বাস করতেন, তাঁদের সকলের সংবাদ আমরা পাই না, তবে যেটুকু পরিচয় পাই, তাতে এ কথা জোর ক'রে বলা চলে যে তাঁরা নিতান্ত অশিক্ষিতা ছিলেন না। পাঠান রাজত্বে অবরোধ-প্রথা অগ্রাহ্য ক'রে বাইরে এসেছিলেন সুলতানা রজিয়া। তিনি যে শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা নয়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রবলে রাজনীতি এবং শাস্ত্রজ্ঞানে তিনি সেই কুৎসা দলাদলি ষড়যন্ত্রের যুগেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি চৌগান (পোলো) খেলতেন, বাজপাখী নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন, প্রকাশ্য দরবারে বসে পুরুষের বেশে সাম্রাজ্য শাসন করতেন, আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখতেন, অত্যাচারীকে দণ্ড এবং গুণীকে পুরস্কার দিতেন। তিনি নিজে বিদুষী ছিলেন, সাহিত্য আলোচনায় এবং সাহিত্যিকদের উৎসাহ দানে তাঁর অসামান্য

পারদর্শিতা ছিল; ফেরিস্তার ভাষায় "তাঁর একমাত্র অপরাধ যে তিনি স্ত্রীলোক।"

এই যুগে আলাউদ্দীন জাহানসোজের দৌহিত্রী 'মাহ্‌মালিক' বিদুষী ব'লে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। 'তবকাৎই-নাসিরী'র লেখক মিন্‌হাজ তাঁর দয়ায় লালিত পালিত হয়েছিলেন, তিনি 'মাহমালিকের' পাণ্ডিত্যের এবং সুন্দর হস্তাক্ষরের বহু প্রশংসা করেছেন। মালবাধিপতি সুলতান গিয়াসুদ্দীনের প্রাসাদে পঞ্চদশ শতাব্দীতে পঞ্চদশ সহস্র(?) নারী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কবি, শিল্পী, শিক্ষয়িত্রী, গায়িকা, নর্তকী, ধর্মজ্ঞা সকল স্তরের নারীর সমাবেশ হয়েছিল।

মোগল আমলে শাহ্‌জাদীদের সতেরো আঠারো বছর বয়সের আগে বিয়ে হ'ত না, অনেকের আজীবন বিয়েই হ'ত না, তাঁরা লেখাপড়া, রাজনীতি বা ধর্মনীতি চর্চা ক'রেই জীবন কাটাতেন। এঁদের মধ্যে বয়সের দিক দিয়ে অগ্রণী সম্রাট্ বাবরের মেয়ে গুল্‌বদন বেগম। তাঁর লেখা 'হুমায়ুন নামা' মোগল আমলের একখানি শ্রেষ্ঠ ইতিহাস। বর্তমান পুঁথিটি খণ্ডিত (আনুমানিক ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে লেখা) বাবরের সময় থেকে আরম্ভ হয়ে হুমায়ুনের দ্বিতীয়বার ভারত বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাস ঐ বইটিতে পাওয়া যায়। 'হুমায়ুন নামা' ছাড়া অনেক ফার্সী কবিতা তিনি লিখেছিলেন। তাঁর একটি কবিতার একটি চরণ এই :

"হর্ পরী কে উ বা-আশিক-ই-খুদ্ ইয়ার নীস্ত।
তু ইয়াকীন্ মীদান্ কে হেচ্ অজ্
উমর বর্‌খুর্‌দার নীস্ত॥"

প্রত্যেক পরীই নিজের প্রেমিকের প্রতি বিমুখ। নিশ্চয় জেনো, জীবনরূপ ফল কেউ পূর্ণরূপে আস্বাদন করে না। অর্থাৎ নশ্বর জীবনে যেটুকু পারো সুখভোগ ক'রে নাও।

গুলবদনের নিজের একটি গ্রন্থাগার ছিল, তার জন্য নানা স্থান থেকে তিনি অনেক বই সংগ্রহ করেছিলেন। আকবরের সময়ে শাহ্‌জাদীদের আলাদা পড়বার ঘর ঠিক থাকতো, ফতেপুরশিক্রীতেও এই বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিল। সম্রাট্ আকবরের সময়ে তাঁর অন্তঃপুরে সব চেয়ে বিদুষী এবং বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন তাঁর পিস্‌তুতো বোন এবং পত্নী সলীমা সুলতানা বেগম। অপুত্রকা সলীমা সপত্নীপুত্র সলীমকে নিজ সন্তানের মত ভালো বাসতেন, সলীম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রলে তিনি নিজে এলাহাবাদে গিয়ে তাঁকে সুপরামর্শ দেন এবং আকবরের কাছে ফিরিয়ে আনেন। সলীমা বহু বিচিত্র বিষয়ের বই সংগ্রহ ক'রেছিলেন এবং পড়েছিলেন।

সম্রাট আকবরের ধাত্রী 'মাহম্ আন্‌গা' এই যুগের একজন বিখ্যাতা বিদুষী ছিলেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি দিল্লীতে নিজের নামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন, সেই বিদ্যায়তন দীর্ঘকাল বহু দরিদ্রকে বিদ্যাদান ক'রে তাঁর নাম স্মরণীয় করেছে। পরবর্তী সম্রাট জাহান্‌গীরের পত্নী নুরজাহান শুধুই অলোকসামান্যা রূপবতী এবং বীর্য্যবতী শাসনকর্ত্রী ছিলেন না, সুকবি এবং কাব্যের পৃষ্ঠপোষিকারূপে তাঁর নাম অমর হ'য়ে রয়েছে। তাঁর সব চেয়ে বিখ্যাত কবিতা লাহোরে তাঁর সমাধি-গাত্রে ক্ষোদিত আছে :

"বর্ মজারে মা গরীবাঁ না চিরাঘে না গুলে,
না পরে পর্ওয়ানা সুজদ্ না সদায়ে বুল্বুলে।
'দীন আমি, পতঙ্গের পক্ষ দহিবারে,
জ্বেলো না প্রদীপ মম সমাধি-আগারে।
আকর্ষিতে বুল্বুল্ আকুল সঙ্গীত
কোরো না কুসুমদামে ইহারে ভূষিত॥'

এক জীবনে পতন-অভ্যুদয়ের সঙ্গে এরূপ নিবিড় ঘনিষ্ঠতা তাঁর মতো পৃথিবীর ইতিহাসে অল্প নারীরই হয়েছিল। তিনি একদিন মরুভূমির মধ্যে সদ্যোজাত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, আর একদিন দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাজ্ঞীরূপে বসেছিলেন; শুধু তাই নয়, সম্রাটকে হাতের পুতুল ক'রে বিশাল ভারতবর্ষের ভাগ্য-বিধাত্রীরূপে সাম্রাজ্যের শাসনকার্য দীর্ঘকাল ধরে সগৌরবে চালিয়েছিলেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর সপত্নীপুত্রের রাজত্বে অবহেলিত উপেক্ষিত অস্তিত্বের সায়াহ্নে রূপ, যৌবন, ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের ক্ষণস্থায়িত্ব মর্মে মর্মে অনুভব ক'রে তিনি তাঁর বিদায় অনুরোধ ঐভাবে জানিয়ে গেছেন! নুরজাহান আরবী এবং ফারসী সাহিত্যে সুপণ্ডিতা এবং সুগন্ধি দ্রব্যসমূহের ও বহুবিধ বিচিত্র শিল্পকলার ও অলঙ্কারের আবিষ্কর্ত্রী ছিলেন। তাঁর প্রভাব তাঁর মৃত্যুর পরেও মোগল অন্তঃপুরকে দীর্ঘকাল স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল ক'রে রেখেছিল।

পরবর্তী সম্রাট সাহজাহানের বিশ্ব-বিখ্যাতা পত্নী মমতাজমহল শুধু আদর্শ পত্নীই ছিলেন না, পারস্য সাহিত্য-রসজ্ঞা রূপে এবং ফার্সীতে কবিতা রচনার জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা জহান্-আরা সিত্তী-উন্নিসা নাম্নী এক বিদুষী শিক্ষয়িত্রীর

সাহায্যে শৈশবেই ফার্সী ভাষায় এবং ইস্‌লামীয় ধর্মশাস্ত্রে অধিকার লাভ করেন, পরবর্তী জীবনে এই চিরকুমারী নারী পিতার সেবা এবং ধর্মচর্চা ও কবিতা-রচনাই জীবনের ব্রতরূপে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর রচিত ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে 'মুনিস্-উল্-আর্ওয়া'র মধ্যে আজমীরের ফকির মুইন্-উদ্দীন-চিশ্‌তীর ও তাঁর শিষ্যদের জীবনকাহিনী পাওয়া যায়। জাহান্-আরা বহু প্রাচীন লেখা থেকে সঙ্কলন করে বইটি লিখেছিলেন। তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল, অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরহীন। জাহানারা উদারপন্থী সুফীমতের সাধিকা ছিলেন। নিজাম উদ্দীন আউলিয়া-সমাধি ভবনের প্রচীরবেষ্টনীর একপাশে তাঁর তৃণাচ্ছাদিত সমাধিশীর্ষে শ্বেত মর্মরফলকে ক্ষোদিত তাঁর নিজের লেখা এই কবিতাটি আজও দর্শকের চোখে অশ্রু প্রবাহিত করে ঃ

'বঘাএর্ সব্জ্যা ন পোশদ্ সসে মজার্-ই-মরা
কে কব্‌রপোষ-ই-ঘরিবান্ হামী গিয়া বস্ অস্ত।
আল্-ফকীরা আল্ ফাণীয়া জহান-আরা
মুরীদ্-ই-খ্বাজ্-গাম ই-চিশ্‌ত বিন্ত্-ই-শাহ্-জহান।'

'আমার সমাধি তৃণ ভিন্ন কোনো (বহুমূল্য) আবরণে আচ্ছাদিত কোরো না, দীন-আত্মাদের পক্ষে তৃণই শ্রেষ্ঠ সমাধি-আবরণ। সাহজাহান-দুহিতা চিশ্‌তী সাধুদের শিষ্যা বিনশ্বর ফকীরা জাহান্-আরা।

আওরংজীবের বড় মেয়ে জেব-উন্নিসা ছিলেন তাঁর সময়ের সুবিখ্যাতা বিদুষী। শৈশবে হাফিজা মরিয়মের কাছে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন, পিতার কাছে একদিন সমস্ত কোরাণখানা স্মৃতি থেকে আবৃত্তি ক'রে তিনি ত্রিশ হাজার মোহর পুরস্কার

পেয়েছিলেন। আরবী এবং ফার্সী উভয় ভাষাতেই তিনি কবিতা রচনা এবং শাস্ত্র আলোচনা ক'রে গেছেন। মুল্লা সফীউদ্দিন প্রভৃতি বহু কবি তাঁর দয়ায় নিশ্চিন্ত সুখে সাহিত্যচর্চা ক'রে গেছেন। আওরংজীব পাণ্ডিত্য এবং ধর্মচর্চা ভালো বাসলেও কবিদের ঘৃণা করতেন, জেব-উন্নিসা তাই ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। 'মখ্‌ফী' এই ছদ্মনাম বহু নারীকবিই সে যুগে নিয়েছিলেন, তার মধ্যে জেব-উন্নিসার কবিতা অন্যের কবিতা থেকে পৃথক্ করে নেওয়া শক্ত। 'দিউয়ান-ই-মখফী'র মধ্যে নিঃসন্দেহ জেব-উন্নিসার বহু কবিতা আছে। ছোটো ভাই আকবরের শ্রদ্ধা ছিল তাঁর প্রতি অসীম, তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রলে আজমীরের কাছে তাঁর শিবিরে যে-সমস্ত চিঠি পাওয়া যায়, তাতে আওরংজেব জেব-উন্নিসার গুপ্ত চিঠি পান এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে কন্যাকে আমরণ সলিমগড় দুর্গে বন্দী ক'রে রাখেন। সুদীর্ঘ বাইশ বছর বন্দীজীবন যাপন ক'রে ১৭০২ খৃষ্টাব্দে তিনি বন্দী অবস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করেন। নিষ্ঠুর পিতার হাত থেকে সদয় মৃত্যুর হাত এসে তাঁকে মুক্ত ক'রে নিয়ে যায়। তাঁর বন্দীদশার একটি দীর্ঘ কবিতার শেষ কয়টী ছত্র এই :

'এ বিষাদ-কারা হ'তে মুক্তি তরে বৃথা চেষ্টা তোর,
ওরে মখ্‌ফী, রাজচক্রে নিদারুণ বিরূপ কঠোর ;
জেনে রাখ্ বন্দী তুই, শেষদিন না আসিলে আর
নাই নাই, আশা নাই, খুলিবে না লৌহ কারাগার।' (ব্র-ব)

জেব-উন্নিসার ব্যর্থ প্রেমের বহু কবিতার মধ্যে একটির মর্মানুবাদ দিচ্ছি : "প্রেমিকা লায়লি যেমন প্রিয়তম মজনুর জন্য পাগলিনী হ'য়ে মরুপ্রান্তরে ছুটে বেড়িয়েছিল, আমার ইচ্ছা হয়,

আমিও তেমনি ক'রে ছুটে বেড়াই ; কিন্তু আমার পায়ে সরমের শৃঙ্খল বাধা। এই যে বুল্‌বুল্‌ সারাদিন গোলাপের কাছে কাছে ঘুরে কানে কানে চুপে চুপে প্রেমালাপ করছে, এ আমারই কাছে প্রেম শিখেছে। এই যে আমার সামনে কাঁচের ফানুসের ভিতর উজ্জ্বল আলোর জ্যোতিতে মুগ্ধ হয়ে শত শত পতঙ্গ আত্মবিসর্জন দিচ্ছে,—সে আত্মত্যাগ তারা আমার কাছেই শিক্ষা করেছে। মেহেদি পাতার বাইরের স্নিগ্ধ শ্যামলতা যেমন তার ভিতরের রক্তরাগ লুকিয়ে রাখে, তেমনি আমার শান্ত মূর্তি আমার মনের আগুনের দীপ্তরাগ গোপন ক'রে রেখেছে, আমার হৃদয়ের দুঃখভারের একটুখানি আকাশকে দিয়েছি, আকাশ তারই ভারে অবনত এবং তারই বেদনায় নীল হয়ে আছে। আমি বাদশার মেয়ে, কিন্তু প্রাণ আমার ফকিরের মতো, ধন-ঐশ্বর্য আমার ভালো লাগে না। আমি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা (জেব-উন্নিসা) এই গৌরবই আমার পক্ষে যথেষ্ট!"

জেব-উন্নিসার ছোট বোন বদরউন্নিসাও সমস্ত কোরাণ কণ্ঠস্থ করেছিলেন কিন্তু জেবের মতো তিনি উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না। আওরংজীবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহ আলম বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাহাদুর শাহের পত্নী নুর উন্নিসা সুন্দর হিন্দী কবিতা রচনা করতে পারতেন। এর পরেও মোগল অন্তঃপুরে বিদ্যা-চর্চা এবং কাব্য-চর্চা নিশ্চয়ই বন্ধ হয়নি, কিন্তু আমাদের তার সম্পূর্ণ পরিচয় জানা নেই। মোগলপুর-বাসিনীদের লেখাপড়া এবং গান শেখাবার জন্য সম্ভ্রান্ত এবং মধ্যবিত্ত ঘরের বিদুষী শিক্ষয়িত্রীদের বৃত্তি দিয়ে রাখা হ'ত, প্রতিদিন রাত্রে সম্রাটকে দৈনন্দিন সংবাদ-লিপি (ও কা এ)

পড়ে শোনানোও ছিল এঁদেরই কাজ। সম্রাটের দেখাদেখি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সর্বত্রই অন্তঃপুরে বিদ্যাচর্চা হ'ত, মধ্যবিত্ত ঘরেও শিক্ষয়িত্রীর কাজ করবার জন্য বহু নারী লেখাপড়া শিখতেন। আজকের তুলনায় তাঁদের শিক্ষার ক্ষেত্র অনেক সঙ্কীর্ণ ছিল সত্য কিন্তু তাঁদের শক্তি এবং জ্ঞান-পিপাসা কম তা' ব'লে একটুও ছিল না। হাতে লেখা পুঁথির যুগে যে কঠিন পরিশ্রম ক'রে তাঁরা রাশি রাশি বই নিজেরা আগাগোড়া নকল করেছেন, আজকের দিনে তার তুলনা সত্যই দুর্লভ।

রাজপ্রাসাদ এবং ধনী ও মধ্যবিত্ত-সমাজের বাইরেও এই যুগে সার্বজনীন শিক্ষার জন্য যে সুব্যবস্থা ছিল, তার কথা উল্লেখযোগ্য। মুসলমানের মসজিদ, হিন্দুর মন্দির এবং বৌদ্ধদের বিহারগুলিতে বিনা পয়সায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত, ছেলেরা এবং মেয়েরা শৈশবে সেখানে সমভাবেই শিক্ষার সুযোগ পেত। বহু মসজিদের সামনে দিয়ে যেতে গেলে আজও অনেক সময়ে পাঠনিরত ছেলেমেয়েদের দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর-ভারতে এবং মধ্যপ্রদেশে আজও বহু মন্দির-প্রাঙ্গণে এবং বাংলা দেশের হরিসভায় বা কালীবাড়ীতে ছেলেমেয়েদের পাঠশালা বসে। ব্রহ্মদেশের ফুঙ্গিদের কৃপায় সেখানে নিরক্ষরতা ইংরাজ-রাজত্বের পূর্বে খুবই কম ছিল। ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে রাজ-সাহায্যপ্রাপ্ত চতুষ্পাঠী, দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তরভোগী অধ্যাপক ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার জন্য 'ধান দিয়ে লেখাপড়া শিখবার' পাঠশালা ছিল, যেখানে বালক-বালিকারা নিয়মিত প্রাথমিক শিক্ষা লাভ ক'রত। এই সব স্থাবর শিক্ষায়তন ছাড়া যাত্রা, কীর্তন, কথকতা প্রভৃতি সচল শিক্ষায়তন গ্রামে গ্রামে বর্তমান

থেকে সেদিন নিরক্ষর জনসাধারণকে উচ্চতম ধর্মতত্ত্ব ও নীতি-শিক্ষা দিত এবং দেশের অতীতের সঙ্গে তাদের বিশিষ্টরূপে পরিচিত করত।

পূর্বেই বলেছি, সংস্কৃত ভাষাকে একদিন ভারতীয়েরা শুধু দেবভাষা এবং ধর্মের ভাষা নয়, শিক্ষিতের ভাষা ব'লে জ্ঞান ক'রতেন। ভারতের সকল প্রান্তের এবং সকল প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তি সেদিন সংস্কৃতে পরস্পরের সঙ্গে তর্ক আলোচনা করতেন, রাজসভায় এবং শিক্ষিত সমাজে সংস্কৃত না জানলে সম্মান লাভ দূরে থাক, কোনো কাজই হ'ত না। এর দ্বারা একদিকে যেমন সর্বভারতীয় শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে একটা ঐক্য-বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তেমনি অপরদিকে যে সব দরিদ্র অশিক্ষিত অনার্য-প্রধান জনসাধারণ গ্রামের বাইরে যাবার প্রয়োজন অনুভব ক'রত না এবং ভারত বা পৃথিবীর চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাত না, যাদের মুখ দিয়ে সংস্কৃতের সুস্পষ্ট উচ্চারণ হওয়া শক্ত ছিল, তাদের জ্ঞান এবং ধর্মচর্চার পথে সংস্কৃত ব্যাকরণের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর বাধাস্বরূপ ছিল। তাই দেখতে পাওয়া যায় বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি যে সব মহাপুরুষ ধর্মকে আচণ্ডালের বোধগম্য ক'রতে চেয়েছিলেন এবং দেশের অজ্ঞতম ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তির এবং ধর্মপ্রাণতার বিকাশ সাধন করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা প্রাদেশিক প্রাকৃতে অর্থাৎ নিজ নিজ মাতৃভাষায় ধর্ম প্রচার করেছিলেন। একদিকে অতীত মহিমার এবং ঐক্যের স্মৃতি, আর একদিকে বর্তমানের প্রয়োজন, এই দুই বিরোধী শক্তির যখন সঙ্ঘর্ষ চলছে, অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামায়ণ ভাষায় শুনলে মানুষকে নরকে যেতে হয় ব'লে ভয় দেখিয়ে যখন প্রবীণ দল

নবীন দলকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন, সেই সময়ে মুসলমান রাজশক্তি প্রাদেশিক ভাষার পক্ষ নিয়ে সমস্ত বিরোধের শেষ ক'রে দিল। তারপর দরবারে ও আদালতে ফারসী এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনে বাংলার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। এর বহু পূর্বেই বাংলা ভাষায় সাহিত্য ও ধর্মচর্চা আরম্ভ হয়েছিল, চর্যাপদ প্রভৃতিতে তার আদি রূপ আমরা দেখতে পাই। বৈদিক যুগে বাংলাকে যাঁরা 'পক্ষীর দেশ' ব'লে অবজ্ঞা দেখিয়েছিলেন, বাঙ্গালীর ভাষাকে পাখীর কিচির-মিচির শব্দের মতো দুর্বোধ্য ব'লে অবজ্ঞা ক'রতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁদের বংশধররাই এদেশে এসে যখন বাস ক'রলেন, তখন দেশের ভাষাকে মাতৃভাষা ব'লে স্বীকার ক'রলেও প্রথম প্রথম তাকে শ্রদ্ধা ক'রতে পারেন নি। বাংলা ভাষাকে ধর্মের ভাষারূপে ব্যবহার করবার প্রথম প্রেরণা এল, বৌদ্ধ, জৈন, নাথপন্থী এবং সহজিয়াদের কাছ থেকে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুদয়ে বাঙালী বৌদ্ধেরা এবং জৈনেরা অনেকে বৈষ্ণব সহজিয়া এবং তান্ত্রিকতার আড়ালে বৌদ্ধবাদকে লুকিয়ে হিন্দুধর্মে ফিরে এলেন, অনেকে নবাগত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ক'রে রাজার আশ্রয় পেলেন। প্রাচীনতম বাংলা চর্যাগুলির পর ময়নামতীর গান, শূন্য পুরাণ প্রভৃতির সময় নিয়ে মতভেদ চলছে। তার পরের যুগকে পাঁচালির যুগ বলে, এই যুগে কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস প্রভৃতির লেখায় একদিকে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিধারা অব্যাহত রাখবার চেষ্টা এবং অপরদিকে মঙ্গলকাব্যে অশিক্ষিত জনসাধারণের স্থানীয় লৌকিক দেবদেবীকে তাদের সমস্ত দেহমনের দৈন্য সমেত প্রাধান্য দেবার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। এই যুগে বাংলায় যে সব

নারী কবি জন্মেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের ওপরেই তাঁদের সময়ের ছাপ কমবেশী পড়েছে। প্রাক্‌-চৈতন্যযুগে সহজিয়া প্রভাব, চৈতন্যের এবং তাঁর পরবর্তী যুগে বৈষ্ণব-প্রভাব এবং তার পরের শতাব্দী থেকে মঙ্গলকাব্যগুলির প্রভাব, সে যুগের নারীর লেখায় সুস্পষ্ট দেখা যায়। ধর্মের কাহিনী ছাড়া একেবারে ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ নিয়ে কাব্য রচনাও নারীর দ্বারা আরম্ভ হয়েছে, তার প্রথম নিদর্শন পাই বাংলা দেশের সর্বপ্রথম বাঙ্গালী কবি রামীর রচনায়। তাঁর আগের যুগের যে সব ছেলে-ভুলানো ছড়া, গাথা প্রভৃতি নারী-রচিত লোক-সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে ভাবের গভীরতার এবং পদলালিত্যের অভাব নেই, সহস্রাধিক বৎসর ধরে যোগিপাল, ভোগিপাল এবং মহীপালের গান মেয়েরা গেয়েছে. 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাওয়াও কম হয়নি, কিন্তু সেগুলির রচয়িতা বা রচয়িত্রী যে কে, তা' কেউ জানে না এবং জানা সম্ভবও নয়, সুতরাং তাঁদের প্রাপ্য সম্মান তাঁরা বোধ হয় ব্যক্তিগতভাবে কোনো দিনই পাবেন না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রজকিনী রামী, রামতারা বা তারার রচিত পদগুলির পূর্বে লেখিকার ভণিতাযুক্ত কোনো লেখা আমরা বাংলায় পাইনি। চণ্ডীদাস যে রজক-কুমারীকে বাগ্বাদিনী এবং গায়ত্রীর সঙ্গে তুলনা ক'রতে দ্বিধা করেননি, যাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, শত শত বাশুলী তাঁকে যে প্রেম শেখাতে পারতেন না, রামী তা শিখিয়েছে, স্বয়ং ব্রহ্মা এসে যে জ্ঞান দিতে পারতেন না, রামী তাই দিয়েছে, সেই রমণী শুধুই রূপের দ্বারা তাঁর চিত্ত হরণ করেননি, সে যুগের পক্ষে আশাতীত কবি-প্রতিভা দ্বারা রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গ-কবির হৃদয় তিনি

বিজয় করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। জীবিতকালে রামীকে চণ্ডীদাসের আত্মীয়েরা বিশেষ প্রীতির চোখে দেখেন নি, তাঁর রচিত পদ বাঁচিয়ে রাখার উপযুক্ত সশ্রদ্ধ মনোভাব সে যুগে কম লোকেরই ছিল। তাঁর কয়েকটি পদ থেকে দু'এক ছত্র ক'রে উদাহরণ দে'ব। চণ্ডীদাসের অদর্শনের দুঃখ জানাবার জন্য তিনি বলছেন :

"তুমি দিবা ভাগে লীলা অনুরাগে
ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ না দেখিয়া দুখ
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে ॥···
তুমি সে আমার আমি সে তোমার,
সুহৃৎ কে' আছে আর ?
খেদে রামী কয় চণ্ডীদাস বিনা
জগৎ দেখি আঁধার।"

প্রবাদ আছে, নবাবের বেগম চণ্ডীদাসের গান শুনে, তাঁর অনুরক্তা হন, সেই সংবাদ পেয়ে নবাব তাঁকে হত্যা করেন। চণ্ডীদাসের মৃত্যু সময় রচিত রামীর কবিতার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি :

"নাথ, আমি যে রজকবালা।
আমার বচন না শুনে রাজন, বুঝিনু কৃষ্ণের লীলা ॥
শুদ্ধ কলেবর হইল জর্জর দারুণ সন্ধান ঘাতে।
এ দুখ দেখিয়া বিদরয়ে হিয়া, অভাগীরে লহ সাথে ॥...
রাজা সে যবনজাতি, কি জানে রসের গতি,
চণ্ডীদাস করি ধ্যান, বেগম ত্যজিল প্রাণ।
শুনি ত্রস্তা ধরিনী ধায়, পড়িল বেগম পায় ॥"

বলা বাহুল্য, রামীর কবিতায় চণ্ডীদাসের প্রভাব খুব বেশী চোখে পড়ে।

রামীর পরবর্তী বৈষ্ণব নারী কবিদের মধ্যে ইন্দুমুখী, মাধুরী, গোপী এবং রসময়ী দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের পরিচয় কিছুই আমাদের জানা নেই, কেবল তাঁদের রচিত পদের শেষে তাঁদের নামটুকু পাওয়া যায়। গোপীর রচনার একটু নমুনা দিচ্ছি :

"দণ্ডবৎ হইয়া মা'য় সাজিল যাদবরায়,
সঙ্গহি রঙ্গিয়া রাখাল।
বরজে পড়িলা ধ্বনি, শিঙ্গা বেণু রব শুনি,
আগে ধায় গোধনের পাল॥
গোঠেরে সাজল ভাইয়া, যে শুনে সে যায় ধাঞা,
রহিতে না পারে কেহ ঘরে।
শুনিয়া মুখের বেণু, মন্দ মন্দ চলে ধেনু,
পুচ্ছ ফেলি' পিঠের উপরে॥
নাচিতে নাচিতে যায়, নুপূরে পঞ্চম গায়,
পাঁচনী ফিরায় শিশুগণে।
হৈ হৈ রাখাল বলে, শুনি সুখ সুরকুলে,
গোপী বলে নাথ যায় বনে॥"

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবি এবং বিদুষী মাধবী দেবী তাঁর অন্যতম ভক্ত শিখি-মাইতির ভগ্নী ছিলেন। তাঁর রচিত অনেক পদ 'পদ-কল্পতরু'তে পাওয়া যায়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহাসিক, ভাষা সরল এবং মর্মস্পর্শী। সমসাময়িক অনেক ঘটনার নিখুঁত ছবি তাঁর লেখায় অমর হ'য়ে আছে। চৈতন্যদেব নারীর

মুখ দর্শন করতেন না ব'লে মাধবী দেবীকে আড়াল থেকে লুকিয়ে তাঁর ভাবে ভোলা মূর্তি দেখতে হ'ত। গুরুর কাছে বসবার অধিকার তিনি কোনো দিন পান নি, সে দুঃখ তাঁর জীবনে যে যায়নি, নিম্নলিখিত পদটিতেও তাঁর সেই বঞ্চিত জীবনের মর্মবেদনাটুকু ফুটে উঠেছে :

"যে দেখয়ে গোরা মুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হ'ল নিজ কর্মদোষে॥"

প্রেমাবতার গুরুকে নারী-বিদ্বেষী ব'লে তিরস্কার করতে তাঁর মন চায়নি, কারণ নারীর সঙ্গ সন্ন্যাসীর পক্ষে ক্ষতিকর হ'তে পারে তা' তিনি জানতেন, সেই জন্য নিজের কর্মকেই তিনি দোষ দিয়েছেন, তাঁর নারীজন্মের জন্য। চরিতামৃতের মতে চৈতন্যদেব 'রাধিকার গণ' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠভক্ত বলে সাড়ে তিনজনকে ধরতেন। স্বরূপ, দামোদর, রামানন্দকে পুরো তিনজন আর মাধবীদেবীকে নারী ব'লে আধ জন ধরা হ'ত। গুরু এতবড় সম্মানের মধ্যেও অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে চারজনের অন্যতম ব'লে ধরেও নারী ব'লে তাঁকে সম্পূর্ণ সম্মান দিতে পারেননি কিন্তু উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্র তাঁকে বহু পুরুষের চেয়ে যোগ্যতম বিবেচনা কর'তেন, তার প্রমাণ রাজসভায় বহু পণ্ডিত থাকতেও জগন্নাথ-মন্দিরের দৈনিক বিবরণ লেখার ভার তাঁর উপর দিয়েছিলেন। মাধবীর সুন্দর স্বভাব, অগাধ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এবং নিরাড়ম্বর জীবন সে যুগের বৈষ্ণব নারীদের আদর্শ ছিল। তাঁর রচনার নমুনাস্বরূপ :

"কলহ করিয়া ছলা, আগে পহু চলি গেলা,
ভেটিবারে নীলাচল রায়।

যতেক ভকতগণ, হৈয়া সকরুণ মন,
পদচিহ্ন অনুসারে ধায় ॥'

আজও প্রায়ই সংকীর্ত্তন আসরে উদ্ধৃত হয়। জগদানন্দ নীলাচল থেকে শচীকে দেখতে আসছেন, সে ছবিটিও বড় করুণ:

'ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে এই অনুমানে চায় ॥
লতা তরু যত দেখে শত শত, অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ না হয় স্ফূরণ মেঘগণ দেখে রাতা ॥
ডালে বসি' পাখী মুদি দুটি আঁখি ফুলজল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকারি ডুকরি ডুকরি গোরাচান্দ নাম লইয়া ॥
ধেনু যূথে যূথে দাঁড়াইয়া পথে কারো মুখে নাহি রা'।
মাধবী দাসীর পণ্ডিত ঠাকুর পড়িলা আছাড়ি গা।'

মৈমনসিংহের পাটবাড়ী গ্রামের বংশীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (উপাধি চক্রবর্ত্তী) মনসামঙ্গল রচনা ক'রে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর লেখা 'কথা রামায়ণ' এ পর্যন্ত যত পৌরাণিক ছড়া বা গাথা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন। দরিদ্র পিতার ঘরে চন্দ্রাবতীর জন্ম—তাঁর নিজের ভাষায়:

"ঘরে নাই ধান চাল, চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পাণি ॥
ভাসান গাহিয়া পিতা বেড়ান নগরে।
চাল কড়ি যাহা পান আনি' দেন ঘরে ॥
বাড়াতে দারিদ্র্যের জ্বালা কষ্টের কাহিনী।
তার ঘরে জন্ম নৈল চন্দ্রা অভাগিনী ॥

চন্দ্রাবতীর বাল্যবন্ধু তাঁর স্বগ্রামবাসী ব্রাহ্মণের ছেলে জয়ানন্দ পাঠশালায় তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে পড়তেন, চন্দ্রাবতী অল্পবয়সেই তাঁকে ভালোবেসেছিলেন, দু'জনের বিবাহেরও সমস্ত স্থির হ'য়ে গেছল, এমন সময় জয়ানন্দ একটি মুসলমানের মেয়ের প্রেমে পড়ে মুসলমান হ'য়ে যান। চন্দ্রাবতী জীবনে আর বিয়ে করেন নি।

রামায়ণ গাথায় ইনি সীতাকে মন্দোদরীর কন্যা ব'লে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ভরতের কনিষ্ঠা ভগিনীর অনুরোধে সীতাকে দিয়ে রাবণের ছবি আঁকিয়ে রামের কাছে কুকুয়াকে দিয়ে মিথ্যা অভিযোগ করিয়ে ননদের কুটিলতার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কাব্যের গল্পাংশ রামায়ণের সঙ্গে মেলে না, তবে ভাষা মধুর এবং অনেক জায়গায় অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

কথা রামায়ণ ছাড়া চন্দ্রাবতীর লেখা বহু গীতি-কবিতা একদিন উত্তর ও পূর্ববঙ্গে লোকের মুখে মুখে ফিরত। পূর্ববঙ্গ-গীতিকার কয়েকটি পালা তাঁর লেখা।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবির রচনা কয়েক শত অর্থাৎ দুই শতাধিক বর্ষ ত বটেই; স্থান পেয়ে গেছে। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অনেক মুসলীম কবির কাব্য কবিতা স্থান লাভ ক'রে এসেছে। অবশ্য এতদিন ধ'রে সাহিত্যক্ষেত্রে জাতিভেদের গণ্ডী এমন সংকীর্ণ না হওয়ায় সে সব রচনা, মুসলীম সাহিত্য বা 'মোহম্মদীয়' সাহিত্যরূপে মূল সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি। মুসলমান লেখকের দ্বারা লিখিত সাহিত্য বস্তুকেও যদি হিন্দু-সাহিত্যের সঙ্গে অপাংক্তেয় করা হয়, তা' হ'লে সাহিত্যের শব্দ, অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা সমস্তই নিরর্থক হ'য়ে যায়।

সে-দিনে এসব বিষয়ে মানুষের মনে সংকীর্ণতা কম থাকায় তার মধ্যে শ্রেণীবিভাগ থাকলেও ভাগ-বাঁটোয়ারায় এসে পৌঁছায়নি। হয়ত এই কারণেই সে দিনের মুসলমান কবিদের রচিত পদের মধ্যে কোন নারী রচিত পদাবলী বা ছড়া গান, রূপকথা, উপকথা মিশিয়ে মিলিয়ে পর্দা বজায় রেখে আজও বেঁচে আছে কিনা তা' নিশ্চয় করে বলা যায় না। হিন্দু মুসলমান মেয়েদের কারুই বাইরে নাম জাহির করবার মত চিত্তবৃত্তি তখন অল্পই ছিল, বাদশা হারেমের মখ্‌ফিদের মত হয়ত কেউ কেউ তাঁদের বিশিষ্ট দানে নিষ্কাম দাতৃত্বও করে রেখে গেছেন, তাঁরা জানতেন সাহিত্যিক সাহিত্যরস সৃষ্টি করে নিজের মনের অনুভূতি দিয়ে। সেই সাহিত্য অথবা অপর কোন ললিত কলা শিল্পীর রচিত সৃজিত বস্তুজাতকে নিজের অন্তরের রসবস্তু দিয়ে, সৌন্দর্য্য উপলব্ধি দিয়ে এবং হৃদয় দিয়ে। রূপে রসে গন্ধে বর্ণে ছন্দে শোভায় সে হয় একটী প্রস্ফুটিত সুরভি পুষ্পের মত, সুর-ভরা বীণার ঝঙ্কারের মত, জাতি নীতি কুল গোত্র বিহীন ও সার্ব্বজনীন। এ বিষয়ে সহরের বাইরে মুক্ত মানবতার উদার ক্ষেত্রে হিন্দুনারী এবং মুসলিম নারী বড় বিশেষ ভেদ রাখেননি। তাঁদের দান একই পারাবারে সম্মিলিত নদীদ্বয়ের মতই মিলে মিশে এক হয়ে থেকে গেছে, সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ ক্ষুদ্র চিত্তের পরিচয় রক্ষা করে চলেনি।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের ও উনবিংশ শতকের প্রথমদিকের নারী লেখিকাদের কয়েকজনের নাম এবং তাঁদের রচিত কবিতা বা গান এখনও খুঁজে পাওয়া যায়। আনন্দময়ী দেবী, গঙ্গামণি দেবী, যজ্ঞেশ্বরী দেবী, সুন্দরী দেবী, দ্রবময়ী দেবী, লক্ষ্মী দেবী

প্রভৃতি বিদুষীদের নাম আমরা এই সময়েই পাই। লোক-সাহিত্যের মধ্যে "ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে।" প্রভৃতি আলাবর্দী খাঁর সময়ের বাংলায় বর্গীর অত্যাচারের স্মারক ছড়া নিঃসন্দেহে অষ্টাদশ শতাব্দীর রচিত। এই সমস্ত ছড়াগান যে ছেলের মায়েদেরই রচনা তা'তে সন্দেহ করবার কিছু নেই। আগডম্ বাগডম্ প্রভৃতির আগড়ম বাগড়ম অনেক কিছুই দজ্জাল ছেলেদের ভুলিয়ে রাখবার জন্য তাঁদের তৈরি করে নিতে হয়েছিল।*

"রামকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, গিরি গোবর্ধন।
মধুর মধুর বংশী বাজে, এই তো বৃন্দাবন।"

নিঃসন্দেহ চৈতন্য দেবের সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নূতন ক'রে বৃন্দাবনে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টার স্মারক। পলাসীর যুদ্ধের স্মারক একটি কবিতা একসময়ে খুব বিখ্যাত ছিল, তার এক অংশ এই :

"কি হোলোরে জান! পলাসীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।...
ছোটো ছোটো তেলেঙ্গাগুলি লালকুর্ত্তি গায়,
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীরমদনের গায়।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে র'য়ে।
একলা মীরমদন সাহেব কত নেবে সয়ে?"...

এই ধরণের ঐতিহাসিক কবিতায় সিরাজউদ্দোলার ক'লকাতা আক্রমণ, নন্দকুমারের ফাঁসি প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়।

---

* অবশ্য ইদানীং "আগডম্ বাগডম্" আর ছেলে-ভুলানী ছড়া মাত্র নেই, 'আগা-ডোম', 'বাগাডোম'দের সমর-সঙ্গীত বলে সনাক্ত হয়েছে।

এগুলির সমস্তই মেয়েদের রচনা না হ'তে পারে, তবে কয়েকটি যে মেয়েদের রচনা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনেকগুলি ছড়া যে নারীর রচনা তার প্রমাণ আছে : একটি উত্তরবঙ্গের ছড়ায় নারী কবি মির্জাপুর ও রহিমনগরের দাঙ্গার বিবরণ দিয়েছেন, তার একটু উদাহরণ দিচ্ছি :

'খবরিয়ায় খবর কয়, ছমির চকিদার।
তোমার দুই পুত মারা যায়, ভরসা কর কার ?
শুইনা বেকরার হুঁস হইয়া বান্ধিল কমর।
ডাইন হাতে লইল লাঠি, বাঁও হাতে ফল।
মার মার কইরা ছমির গোঁস্বায় জ্বলিল।
আল্লা নবীর নাম কিছু স্মরণ না করিল ॥···

ঐতিহাসিক কবিতা ছাড়া পালা গান, পাঁচালী, ব্রতকথা প্রভৃতিতে নারীর দান প্রচুর আছে। ছেলে ভুলানো ছড়া, ব্রতকথা, রূপকথা প্রভৃতির রাজ্যে তো নারীর একচ্ছত্র অধিকার ! সেগুলির ধারা খুব পুরাণো হ'লেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে নবতম রূপ পেয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

'ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো'
'দোল দোল দোলানি, রাঙা মাথায় চিরুনি,'
'অন্নপূর্ণা দুধের সর, কাল যাবি মা পরের ঘর,'
'আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম গাছে মৌ,
কথা কওনা কেন বৌ ?'
'তালতলা দিয়ে জল যায় মা' ডুবে মনুগো,
পাটের শাড়ী বার করো মা দখিন যাবোগো।'
'ওপারেতে কালো রং, বিষ্টি পড়ে ঝমাঝ্‌ঝম'।

'ওপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকটুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।'
ইজল বিজল কাজলনাতা, ঝড়ে কাঁপছে গাছের পাতা।
আয় ঝড় আয়, খোকা আমার নাইতে যায়।'

অথবা 'আয় ঘুম ঘুম, যায় ঘুম ঘুম, ঘুমোলো গাছের পাতা।' প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে বহু সতীনের খোয়ার, বৌয়েদের ছিদ্র, শাশুড়ী ননদের কলহের ছড়া এই যুগের লেখা। মধুমালা, শঙ্খমালা, কাঞ্চনমালা প্রভৃতির গল্পও এই যুগে তার শেষরূপ ধরেছে।

এ যুগের নারী কবিদের মধ্যে যাঁদের নাম জানা যায় তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাতা বিদুষী আনন্দময়ী।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপ্সা গ্রামে বৈদ্যবংশীয় লালা জয়নারায়ণ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ীর সঙ্গে একত্রে হরিলীলা নামক সত্যনারায়ণের লীলাবিষয়ক কাব্য রচনা করেন। আনন্দময়ীর পিতা রামগতি রায় 'মায়াতিমির-চন্দ্রিকা'র লেখক এবং সুপণ্ডিত এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। ন' বছর বয়সে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয় পয়গ্রামের অযোধ্যারাম সেনের সঙ্গে। তাঁর অধ্যাপক ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ। গুরুপুত্র হরিদেব বিদ্যালঙ্কারের লেখার অশুদ্ধি ধরে আনন্দময়ী অধ্যাপককে ছেলের লেখাপড়ার সম্বন্ধে অমনোযোগী হওয়ার জন্য তিরস্কার করেন। রাজা রাজবল্লভ এক সময় আনন্দময়ীর পিতা রামগতি রায়ের কাছে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও প্রতিকৃতি চেয়ে পাঠান, রামগতি সে সময় পূজায় ব্যস্ত থাকায় আনন্দময়ী সেগুলি লিখে এবং এঁকে পাঠান

এবং তা' পণ্ডিতসমাজে গ্রাহ্য হয়। যাই হোক, আমরা এখানে তাঁকে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞা এবং বিবিধ-শাস্ত্র-পারদর্শিনী ব'লে ধরবো না, বাঙালী কবি হিসাবেই ধরবো। তাঁর রচনায় সে যুগের দোষ ও গুণ দুই আছে। তাঁর সরল রচনার একটি উদাহরণ দিচ্ছি ; পতি বিরহে সুনেত্রার শোক :

'যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে,
সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে।
যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বেঁধেছ আপনি।
তাহে জটাভার করি হইব যোগিনী॥
শীত ভয়ে যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ।
বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত।...
মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরী।
তাহে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি॥
আর তব স্থাপ্য ধন বিষম যৌবন।
লুকাইয়া নিয়া ফিরি দরিদ্র যেমন।"

আনন্দময়ীর সংস্কৃত শব্দবহুল তৎকাল প্রচলিত অর্থহীন অনুপ্রাসপূর্ণ, সঙ্কর ভাষায় ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে রচিত কবিতার নমুনা :

"পুরী পূরিতা সুন্দরী জাল মালে।
বলেগো উঠগো চলগো সকালে॥...
হেরে চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে।
সমক্ষে পরোক্ষে গবাক্ষে কটাক্ষে॥
কতি প্রৌঢ়রূপা ওরূপে সজন্তি।
হসন্তি স্খলন্তি দ্রবন্তি পতন্তি॥

কত চারুবক্ত্রা সুবেশা সুকেশা।
সুনামা সুহাসা সুবাসা সুভাষা॥"

এই জাতীয় লেখা ভারতচন্দ্রের যুগের বিশেষত্ব, এজন্য লেখিকা একা অপরাধিনী নন। এই কাব্য কর্ণের তৃপ্তি সাধন করলেও মর্ম স্পর্শ করে না। তাঁর মতো শক্তিমতী লেখিকাও নিজ যুগের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এই বিদুষী নারী পিতৃগৃহে স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে তাঁর খড়ম বুকে নিয়ে চিতানলে প্রাণ বিসর্জন করেন। আনন্দময়ীর পিস্‌তুতো বোন গঙ্গামণি দেবীর লেখা অনেক গান একসময়ে বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এখনও তার কতকগুলি ওদেশের বিয়ের সময় গাওয়া হয়। আনন্দময়ীর বোন দয়ামযীও বিদুষী ছিলেন, গঙ্গা এবং দয়াময়ীর অনুরোধে জয়নারায়ণ তাঁর চণ্ডিকামঙ্গলের তৃতীয় উপাখ্যানটি রচনা করেন। গঙ্গামণির কবিতায় বর্ণনা-বাহুল্য ছিল কিন্তু প্রসাদগুণের অভাব ছিল না। তাঁর কবিতার দু'ছত্র উদাহরণ দিচ্ছি :

'জনক নন্দিনী সীতে হরিষে সাজায় রাণী।
শিরে শোভে সিঁথি পাটি হীরা মণি চুণী॥"

বর্দ্ধমান জেলায় কলাইঝুটী গ্রামে অনুমান ১১৮২ সালে রূপমঞ্জরীর জন্ম হয়। ইনি জাতিতে বৈষ্ণব ছিলেন। ইঁহার মাতার নাম সুধামুখী। পিতা নারায়ণ দাস ইঁহাকে বাল্যকালে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করেন। নারায়ণ দাসের আর কোন সন্তান হয় নাই। রূপমঞ্জরীর বিদ্যাশিক্ষায় এত অনুরাগ জন্মিল যে, নারায়ণ দাস বুদ্ধিমতী দুহিতাকে ব্যাকরণ পড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু রূপমঞ্জরী তাঁর অধ্যয়ন অধ্যাপনার সীমা

অতিক্রম ক'রল। তাঁর পিতা তাঁকে তখন শব্দশাস্ত্র পড়াবার জন্য বাহাদুর পুর নিবাসী ৺বদনচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে প্রেরণ করেন। তখনকার ভদ্রপরিবারস্থ বালিকাগণ টোলে কিংবা পাঠশালায় বালকদিগের সঙ্গে একত্র পাঠাভ্যাস করত। এই সময় নারায়ণ দাসের মৃত্যু হয়। পরে রূপমঞ্জরী সর্ নামক গ্রাম নিবাসী গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের নিকট কাব্যপাঠে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ ক'রে শেষে এঁর কাছে বৈদ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

রূপমঞ্জরীর চরিত্র অতি নির্মল ছিল। ইনি বিয়ে করেননি, মস্তক মুণ্ডন ক'রে কেবল একটী শিখা রেখেছিলেন এবং কোনও স্থানে গমন করবার সময় পুরুষের মত উত্তরীয় ব্যবহার করতেন।

বহু লোক রূপমঞ্জরীর নিকট ব্যাকরণ, চরক ও নিদান প্রভৃতি দুরূহ শাস্ত্র সমুদয় অধ্যয়ন ক'রেছিলেন। মানকর নিবাসী বিখ্যাত চিকিৎসক ৺ভোলানাথ কবিরাজ মহাশয় অনেক সময় ইঁহার নিকট চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করতেন।

চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পর বাংলার বৈষ্ণব সমাজের জীবনে এবং সাহিত্যে যে জোয়ার এসেছিল তার ফলে বাংলার গ্রামে গ্রামে হরিসঙ্কীর্তন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান শোনা বা রচনা করা অত্যন্ত অশিক্ষিত এবং নিরক্ষর লোকের পক্ষেও অসম্ভব হয়নি। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্ত্রী পুরুষে লোকের বাড়ী বাড়ী হরিনাম গান শুনিয়ে ভিক্ষা ক'রত এবং এখনও করে। সেই সব গানের মধ্যে অনেক সময়ে তাদের নিজেদের রচনাও থাকত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বহু নীচজাতীয়া নারী, তাঁদের মধ্যে বৈষ্ণবী এবং

প্রবীণ। পতিতার সংখ্যাই বেশী, কবির দল ক'রে গান গেয়ে এবং কবির লড়াইএর অনুকরণে স্বোরচিত কবিতায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রে, জীবিকা উপার্জন করতেন। বিখ্যাত কবি দাশরথি রায়ের প্রণয়িনী অকাবাই এই রকম এক কবির দল খুলেছিলেন, তাঁর দলের জন্য ফরমাস মতো গান লিখতে গিয়েই দাশরথি রায় কবিতায় হাত পাকিয়েছিলেন এবং নীলকুঠির চাকরী ছেড়ে স্বাধীনভাবে পাঁচালীর দল খুলেছিলেন। এই যুগের যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী এক কবির সখী-সংবাদ থেকে একটু উদাহরণ দিচ্ছি :

"এখন অধীনী বলিয়া ফিরে নাহি চাও,
ঘরের ধন ফেলে প্রাণ পরের ধন আগুলে বেড়াও।
নাহি চেন ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা,
সতীরে ক'রে নিরাশা অসতীর আশা পুরাও॥"

এইজাতীয়া কবিরা অনেক সময়েই শ্লীলতার গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতেন, রাজধানী এবং বড় বড় সহরের বিকৃতরুচি শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করাই ছিল তাঁদের জীবিকার্জনের উপায়। কিন্তু ভাষার ও ছন্দের ওপর অসামান্য অধিকার না থাকলে ঐ রকম মুখে মুখে কবিতা রচনা ক'রে প্রতিবাদ করা যায় না, সেদিক দিয়ে এঁদের প্রশংসা করতেই হবে। রজনী প্রভৃতি মেয়ে কীর্তনীদের দল এক সময় খুব সমাদর লাভ ক'রেছিল, এখন আর ততটা নেই।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে গোলোকমণি, দয়ামণি এবং রত্নমণি নাম্নী তিনজন 'নেড়ি কবি' অর্থাৎ বৈষ্ণবী কলকাতায় গাওনা ক'রতে এসে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন। এই যুগে রাধাকান্ত দেবের লেখায় পণ্ডিতা শ্যামাসুন্দরী, হঠি বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি বিদুষীদের

কথা এবং রেভারেণ্ড লং সাহেবের বাংলা বইয়ের তালিকায় ফরিদপুরের সুন্দরী দেবীর লেখা বাংলা বইয়ের কথা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাংলাদেশের, সেই পরম অমঙ্গলময় রাষ্ট্রপরিবর্তনের তামসিক যুগে 'মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়', এ ধারণা পর্যন্তও মেয়েদের অনেকের মনে বদ্ধমূল হ'য়ে ছিল, সেই যুগেও সহর থেকে দূরে সুদূর পল্লীগ্রামের মেয়েরা সেই নিবিড় অন্ধকারে যে একেবারে ডুবে যাননি, পূর্বোক্তা বিদুষীরাই তার প্রমাণ। এই সব থেকে জানা যায় আমাদের প্রপিতামহীরা সকলেই অশিক্ষিতা ছিলেন না। সেদিন বাংলার গ্রামে গ্রামে যত চতুষ্পাঠী এবং পাঠশালা ছিল, আজ তার অধিকাংশই নেই, কথক ঠাকুর এবং পাঁচালী গায়কেরা কথকতা ক'রে পালা গান শুনিয়ে গ্রামে গ্রামে লোকেদের ধর্মনীতি কর্ম-নীতি, সদাচার এবং অনেক উচ্চ আদর্শের বার্তা শোনাতেন। যে শিক্ষা আজ আমরা পয়সা দিয়ে স্কুল, কলেজে গিয়ে পাই না, তেমন অনেক শিক্ষা আমাদের প্রপিতামহীরা বিনামূল্যে গ্রামে বসেই পেতেন। সত্যিকারের যে শিক্ষা নারী জীবনের, এমন কি; নর জীবনেও সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা প্রদান করতে পারে, সেই ধর্ম-ভৌমিক মহত্তম শিক্ষাই সে যুগের প্রত্যেক হিন্দুনারীর পাবার সুযোগ ছিল। হিসাব ক'রে দেখতে পারলে দেখানো যেত, অন্ততঃ ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের ঘরে আজকের চেয়ে ঢের বেশী মেয়ে সেদিন অশিক্ষিতা থাকতেন না, নিম্নতম শ্রেণীর নারীর মধ্যেও উচ্চতম আদর্শ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাঁচালি যাত্রার কৃপায় দৃঢ়তর হ'য়ে যেত। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের মেয়েদের অনেকের বাড়ীতে চতুষ্পাঠী থাকার সুযোগে এবং

পূজাপাঠ নিয়মিত দেখা এবং করার জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ খুবই বেশী ছিল। অনেকে কেবল সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং পুরাণ পড়েই শিক্ষা সমাপ্ত করতেন, কোনো কোনো শক্তিমতী দর্শন-শাস্ত্রের গভীরতার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়েও প্রমাণ করতেন, অনুকূল অবস্থায় নারী পুরুষের চেয়ে বিদ্যার ক্ষেত্রে অন্ততঃ হীন নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর মধ্যের অনেকেই তাঁদের পাণ্ডিত্যের লিখিত নিদর্শন রেখে যাননি, সকলে আবার বাংলা ভাষাতেও লেখেননি, লিখলেও সাধারণের সামনে ধরতে সাহস করেননি। তাঁদের এবং তাঁদের পূর্বযুগের মেয়েদের লেখা জনপ্রিয় গান ও ছড়াগুলি ছাড়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ অল্প পরিচিত অনেক লেখাই মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের পূর্বযুগে নিঃশেষে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। পরের যুগেও সবাকার ঘরের আবহাওয়া, সামাজিক অবস্থা এবং অর্থানুকূল্য এবং আত্মজনের সহানুভূতি না থাকায় কত লেখিকার লেখা উই ইঁদুরের ভক্ষ্য হয়েছে তার কি হিসাব পাওয়া সম্ভব!

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে শ্রীহট্টের 'হরিভক্তি তরঙ্গিণীর রচয়িতা' সহজিয়া সাধক শ্যামকিশোর ঘোষের সাধন-সঙ্গিনী 'শ্রীমতী' কতকগুলি আধ্যাত্মিক পদ রচনা করেছিলেন, রঘুনাথ লীলামৃতে এই রকম কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। এই সময়ে সাহিত্যে এবং সমাজে বাংলার চরম অবনতির দিন চলছিল। মিথ্যাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি সামাজিক দুর্নীতির ছাপ তদানীন্তন সাহিত্যে পড়েছিল, কবির লড়াই, তর্জা, হাফ্ আখড়াই পাঁচালী, টপ্পাগান প্রভৃতিতে শ্লীলতার বালাই ছিল না; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় পর্যন্ত কোনো ভদ্রমহিলার প্রকাশ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে নামবার উপায় ছিল না। ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকারীদের প্রাবল্যে নীতি-

পরায়ণ শিক্ষিত ব্যক্তিরা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত বাংলা বই বা সংবাদপত্র প'ড়তে ভয় পেতেন।

বাংলার শক্তিমতী লেখিকাদের আবির্ভাব আরম্ভ হ'ল প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে। পাশ্চাত্য ভাবধারার যে প্রবল বন্যাস্রোত একদিন ভারতের জাতীয় সংস্কৃতিকে, বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করেছিল, তার প্রথম আক্রমণের বিপদ-বিহ্বলতা দেশ তখন কাটিয়ে উঠেছে। পূর্ব ভারতে রাজা রামমোহন রায়-প্রবর্তিত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ তাকে বাধা দিয়ে হীন করবার পর উত্তর ভারতে দয়ানন্দ প্রবর্তিত আর্য সমাজ এবং বাংলার ঋষিকল্প মনীষী ভূদেব কর্তৃক অনুপ্রাণিত বঙ্কিম, রমেশ, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখকদল দ্বারা সেবিত নবজাগ্রত হিন্দুসমাজ দেশকে সেদিন স্বপ্রতিষ্ঠ করেছে। ভারত তার অতীতকে নূতন ক'রে ফিরে পেয়েছে, তার পরাধীনতার এবং বর্তমানের দৈন্যের লজ্জাকে ছাড়িয়ে উঠেছে তার অতীতের গর্ব, তার প্রাচীন ধর্মের এবং সাহিত্যের অসীম ঐশ্বর্যের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনা। ইংরেজী সাহিত্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ দান তাকে আমরা তখন গ্রহণ করতে শিখেছি নিজের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে। মুসলমান রাজত্বের শেষ যুগে যে সঙ্কীর্ণতা এবং পঙ্কিলতা সমাজে এসেছিল, তাকে অতিক্রম ক'রতে অন্ততঃ অশ্রদ্ধা করতে শিখেছি। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে পুরুষ লেখকদের মধ্যে যে কয়েক জন মহারথের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদের সঙ্গে সমান পদবাচ্য না হ'তে পারলেও নারী সাহিত্যিকারা তাঁদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা ব্যবস্থার

হিসাব ধরলে বহু পুরুষ লেখকের চেয়ে অধিকতর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন সে কথা নিঃসঙ্কোচেই বলা চলে। তাঁদের জীবনের গণ্ডী ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ, বহির্জগতের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক আজকের দিনের চেয়ে অনেক কম ছিল। তথাপি যে তাঁরা নির্ভয়ে এমন ক'রে সাহিত্যক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে ভরসা ক'রেছিলেন সেই ত একটা বিস্ময়! পল্লীগ্রামের মেয়েরা যেটুকু স্বাধীনতা পেতেন, অধ্যাপক পণ্ডিতের বাড়ীর মেয়েরা শাস্ত্রজ্ঞান লাভের যেটুকু সুযোগ পেতেন, সহরের নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মেয়েদের প্রায়ই তা' মিলত না। অতীতের কল্যাণ স্পর্শ তাঁরা হারিয়েছিলেন, অথচ বর্তমানের কল্যাণ তখনো তাঁদের স্পর্শ করেনি। জীবনের দুঃখ-দ্বন্দ্বের ভাগ পুরুষের সঙ্গে সমভাবেই তাঁদের নিতে হ'ত, কিন্তু বাইরের আনন্দে তাঁদের কোনো অংশ ছিল না। যে দেশের শ্রেষ্ঠতম পুরুষের মাথা পরাধীনতায় বিকিয়ে আছে, সেখানে মেয়েদের অবস্থা কত ভালোই বা হ'বে! তবু এই বাধা-বিপত্তির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেও সেদিন নারী যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা নিতান্ত ন-গণ্য নয়, সেদিনে অল্প ও মধ্যশিক্ষিতা মেয়ে লেখিকাদের সংখ্যা নেহাৎ কমও ছিল না। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত আসতে আমরা ইতিমধ্যে সমাজের এবং সাহিত্যের অনেক পরিবর্তনও দেখলুম, পাঠক সমাজের রুচির এবং জীবনযাত্রার প্রথা বদলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক লেখক-লেখিকাকে উঠতে পড়তেও দেখা গেল, কিন্তু সাহিত্যিকের সৃষ্টি যেখানে বাস্তবের প্রতি সজাগ দৃষ্টির সঙ্গে অন্তরের সত্য অনুভূতি মিলিয়ে তৈরি, সেখানে তার ভয়ের কারণ নেই। একদিন

পাঠকের বিচারে মাঘ কালিদাসের ঊর্দ্ধে এবং ভারতচন্দ্র চণ্ডীদাসের ঊর্দ্ধে স্থান পেয়েছিলেন, মধুসূদন ইলিয়াডকে রামায়ণ-মহাভারতের চেয়ে উপরে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হননি, কিন্তু আজ দিন ফিরেছে। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী লেখিকাদের সম্বন্ধে আজকের পাঠকের মত যাই হোক, তাঁদের মধ্যে ভালো জিনিষ যাঁর লেখায় যা' আছে, মহাকালের নিরপেক্ষ দরবারে সেগুলি একটা স্থায়ী স্থান পাবেই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যাই হোক, খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব প্রথম প্রত্যক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যের কর্ণধারদের প্রভাবিত ক'রল, সমাজে নীতিজ্ঞান এবং সাহিত্যে সুরুচি ফিরে এল। উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির রূপ দেশের সঙ্গে মিল রেখে বিদেশী ছাঁচে ঢালাই হ'য়ে সুনির্দিষ্ট হ'ল, বাংলায় কবিতার এবং গদ্যের সমভাবে উন্নতির সূচনা দেখা গেল। অবশ্য নারী লেখিকাদের মধ্যে তখনো সকলে এই পরিবর্তনকে মেনে নেননি, অজ্ঞাতনাম্নী নারী কবি তখনো এইভাবে শ্যামা-বিষয়ক গান লিখছেন :

"কাপড় নেই ব'ললে হ'ত, না হয় আমি দিতেম কিনে!
ছি ছি, কি লাজের কথা! বসন-বিহীনা নবীনে।'

ফরিদপুরের অবলা সেন তখনো চিরপরিচিত ভাষায় অন্তরের বেদনা দেবতাকে জানাচ্ছেন :

"দীননাথ, শুন নিবেদন,
সংসার পূজিয়া মোরা, নিশিদিন, আত্মহারা
খোয়াইনু জীবন জনম॥"

ভারতচন্দ্র থেকে দাশরথি পর্যন্ত বিখ্যাত কবিদের অনুকরণের চেষ্টা তখনো মেয়েদের মধ্যে চ'লছে।

হুগলীর একজন সরকারী উচ্চতম কর্মচারীর স্ত্রী এই যুগে একখানি কবিতার বই লেখেন। পাছে সেখানি কেউ না পড়ে সেই জন্য সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করে ভূরি-ভোজনের দক্ষিণা-স্বরূপ প্রত্যেককে এক একখানি বই তিনি উপহার দেন। তাঁর লেখার একটু নমুনা দেব :

"ওগো লঙ্কা ললিতে, একবেলা যায় তোমার গুণ বলিতে।
যখন লাগে ঝাল, করি ঝালা-লাল, ঝ'রে লাল ঝরঝরিতে।
চারিদিকে করি দৃষ্টি, কোথায় আছে মিষ্টি,
দেখতে পেলে খাই হাপর-হাপরিতে।"

শ্রদ্ধেয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখায় এই যুগের একজন বৈষ্ণবী গৃহশিক্ষয়িত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর নাম ছিল গৌরী দেবী। দ্বারকানাথের অন্তঃপুরে তিনি প্রতিদিন বিদ্যালোক বিতরণ করতে আসতেন, তাঁর কথকতা ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর ছাত্রীরা ছাড়া ও বাড়ীর অনেকে তাঁর অধ্যাপনার সময় পাঠগৃহে সমবেত হতেন। তাঁর ভাষার একটু নমুনা দেব :

"যামিনী চতুর্যামে লগ্না হ'য়ে পড়েছেন, কিন্তু বিদায় গ্রহণ করতে পারছেন না। কেন না কৃষ্ণ রাধিকা দোঁহে দোঁহার প্রেম-বন্ধনে নিদ্রাচেতন হয়ে আছেন। আহা! সারা নিশি মানভঞ্জনে উভয়ের গত হয়েছে, নিশিভোরে তাই ঘুমে বিভোর পড়েছেন। মরি মরি! আহা! প্রাণস্বরূপ শ্রীহরি প্রেম-শ্রীরাধার এই প্রেমমিলনে দ্যুলোক, ভূলোক বিশ্বচরাচর পড়েছে। বিহঙ্গ-বিহঙ্গীর কলরব নাই : নদনদী

নিঃস্রোত, জীবজন্তু নরনারী গভীর নিদ্রামগ্ন, শুকতারা পূর্বাকাশ থেকে এখনো অস্ত যেতে পারছেন না। সূর্যদেব অরুণরথে সমাসীন হ'য়ে উদয় হ'তে ভয় পাচ্ছেন। সৃষ্টিতে প্রলয় আসে আসে।”

দেখা যাচ্ছে আজকের দিনের মতো সক্ষম এবং অক্ষম দু'রকম রচনাই সে-যুগে অনেক হয়েছিল, পিতামহীদের সিন্ধুক বাক্স ঘাঁটলে এ ধরণের লেখা কীটবিশিষ্ট হয়ে এখনও হয়তো কিছু কিছু আবিষ্কার হ'তে পারে। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ এবং বঙ্গীয় নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বহু নাটকের লেখক নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা স্বর্গীয়া ধরাসুন্দরী দেবীর অধিকাংশ লেখাই তাঁদের এডুকেশন গেজেটে ছাপা হ'লেও পুস্তকাকারে ছাপা হয়নি। তাঁর অ-মুদ্রিত ‘নন্দরাণী’ থেকে সে যুগের গদ্যের একটু উদাহরণ দেব :

‘মকরসংক্রান্তির সকালে ত্রিবেণীরঘাটে নৌকায় নৌকায় গাঁদি লাগিয়া গিয়াছে। কোনো নৌকায় কন্‌সার্টের দল গান-বাজনা লইয়া ব্যস্ত, কোনো নৌকায় চাঁদোয়া খাঁটাইয়া বাবুরা ঘিরিয়া বসিয়া মহা আনন্দে তবলা বাজাইতেছেন, মধ্যে খ্যাম্‌টা-ওয়ালির অভাবে টিপকলের নোলক নাকে মেয়ে-সাজানো ছেলের নাচ চলিতেছে।......ঘাটে কীর্তনের দল কাপড় পাতিয়া ঢোল বাজাইয়া ভিক্ষা করিতেছে। ঘাটের উড়িয়া ব্রাহ্মণগণ সিংহাসনে পিতলের ঠাকুর সাজাইয়া ছাপ লইয়া স্নানার্থিনীদের স্নানান্তে ডাকাডাকি করিয়া পয়সা লইয়া কপালে ছাপ লাগাইতেছে। বহুরূপীর দল কেহ গণেশ কেহ শিব দুর্গা সাজিয়া থালা হাতে করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতেছে। সকলেই মহাব্যস্ত।...’

"বড়বধূ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, জানি গো জানি! ওকে বলে পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ! চল্ ভাই সেজবৌ, ওর তো জানবার আবশ্যক নেই, তবে মিছে কেন ব'সে ব'সে হায়রান হওয়া।"

দেখা যাচ্ছে, এই যুগের লেখার মধ্যে শক্তির পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায় না তা' নয়, এইরকম কত শক্তি ব্যক্তিগত কুণ্ঠার বা লোক-লজ্জার ভয়ে লোক লোচনের অন্তরালে আত্মগোপন করে ব্যর্থ হ'য়ে গেছে, কে' তার হিসাব রাখে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পাশ্চাত্যশিক্ষার বিস্তার এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সমাজের সহানুভূতি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বহু মহিলা লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। তাঁদের ধারাবাহিক তালিকা দেবার পূর্বে ঐ শতাব্দীর চারজন সর্বপ্রধানা কবি এবং সর্বশ্রেষ্ঠা উপন্যাসের রচয়িত্রী ও সম্পাদিকাব সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চাই। তাঁদের নাম যথাক্রমে শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী, শ্রীমতী মানকুমারী বসু, শ্রীমতী কামিনী রায় এবং শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

বাংলাদেশে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠা তিন জন কবির মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বয়সের দিক দিয়ে সবার বড়, গিরীন্দ্রমোহিনীর জন্ম ১৮৫৮ সালে। ১৮৬৮ সালে বহুবাজারে এক রক্ষণশীল পরিবারে দশবৎসর বয়সে এঁর বিবাহ হয়। বাল্যকাল থেকে সংস্কৃত পড়ার দিকে, কবিতা লেখাব দিকে এবং ছবি আঁকার দিকে তাঁর ঐকান্তিক আকর্ষণ ছিল, উত্তরকালে এই সব দিকেই তিনি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। 'হিন্দুমহিলার পত্রাবলী' 'ভারতকুসুম' "কবিতাগার", "অশ্রুকণা",

"সন্ন্যাসিনী", "শিখা", "অর্ঘ্য", "সিন্ধুগাথা", "স্বদেশিনী" প্রভৃতি তাঁর বইগুলির মধ্যে যে ভাবমাধুর্য্য ও ভাষার সারল্য দেখতে পাই, তা' আজকের দিনে দুর্লভ। রক্ষণশীল সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তঃপুরবাসিনী নারী সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় কতদূর উন্নতি করতে পারে, তিনি তাঁর উজ্জ্বল নিদর্শন। গদ্যে এবং পদ্যে তিনি সমান স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে রচনা ক'রে গেছেন। কালিদাসের কুমারসম্ভব বাংলায় অনুবাদ করে তিনি তাঁর সংস্কৃত ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর স্বামী নরেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যুর পর থেকে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সাংসারিক শোক-সন্তাপের মধ্যেও গৃহকর্মের অবসরে সাহিত্যচর্চাই ছিল তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। তাঁর লেখার একটু নমুনা দিচ্ছি :

"মাটিতে নিকানো ঘর, দাওয়াগুলি মনোহর,
সমুখেতে মাটির উঠান।
খোড়ো চালখানি ছাঁটা, লতিয়া করলালতা
মাচা বেয়ে করেছে উত্থান।
...শান্ত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গ্রাম্য মাঠে গরু চরে :
তরুতলে রাখাল শয়ান :
সরু মেঠো রাস্তা বেয়ে পথিক চলেছে গেয়ে
মনে পড়ে সেই মিঠে তান।"

"শুভসাধনা", "প্রিয় প্রসঙ্গ", "বিভূতি" "বীরকুমারবধ", 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' এবং 'কনকাঞ্জলি' প্রভৃতির রচয়িত্রী মানকুমারী (১৮৬৩-১৯৪৩) এঁর পরবর্তী কবি। মানকুমারীর কবিতার বিষয়বস্তুর গণ্ডী আরও সঙ্কীর্ণ, কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ বিষয়ও তাঁর আন্তরিক সমবেদনার স্পর্শে, তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় এবং

তাঁর সহজ সরল ভাষার মাধুর্যে অসাধারণ এবং অপরূপ হয়ে উঠেছে, এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। তাঁর আঁকা বাংলার পল্লীপ্রাঙ্গণ, তুলসীতলা, শিবপূজা প্রভৃতির মধ্যে আমরা আমাদের প্রতিদিনের দেখা ছবিই দেখতে পাই, নূতন দৃষ্টিতে, অভিনব ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপে। তাঁর :

"নমো দেব মহাদেব নমো রাঙা পায়।
পোড়া হাড় ভস্ম ছাই, ও চরণে পায় ঠাঁই,
আকন্দ ধুতূরা ফুল গরবে দাঁড়ায়। ··
এমন আপন ভোলা, এমন পরাণ খোলা,
এমন রজতগিরি শ্বেত শতদল,
পবিত্র শঙ্কর কোথাও দেখিনি কেবল।"

প্রভৃতি কবিতা "আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ" "পতিতোদ্ধারিণী" প্রভৃতি কবিতা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'বীরকুমারবধ কাব্য' রচনা ক'রে তিনি শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁকে ও বিষয়ে তাঁর পিতৃব্য মাইকেল মধুসূদনের অনুকরণকারী হেমচন্দ্র বা নবীন চন্দ্রের সমকক্ষ ব'ললে অত্যুক্তি হবে না। মানকুমারী প্রধানতঃ মধুর এবং করুণরসের কবিতায় সাফল্য অর্জন করেছেন।

কবিতার ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যিনি সব চেয়ে বেশী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর নাম শ্রীমতী কামিনী রায়। ইনি বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা, বরিশাল জেলার বাসন্দা গ্রামে ১৮৬৪ অব্দে এঁর জন্ম হয়। শৈশবে পিতামহের কাছে কবিতা ও স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে এঁর কবিতার স্ফুরণ হয়, আট বছর বয়স থেকে ইনি কবিতা লিখতে আরম্ভ

করেন। এঁর প্রথম কবিতার বই 'আলো ও ছায়া' বিনা নামে প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে। অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারে শৈশব কাটিয়ে ইনি সাত বৎসর বয়সে কলকাতায় এসে প্রগতিশীল সমাজের আবহাওয়ায় বর্ধিতা হন এবং কবিত্ব খ্যাতির জোরে ত্রিশবৎসর বয়সে সিভিলিয়ান স্বামী লাভ করেন। "অম্বা" "পৌরাণিকী" "মহাশ্বেতা" "পুণ্ডরীক," "একলব্য" "শ্রাদ্ধিকী," "দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্ন" প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ বই। কামিনী রায় পূর্ববর্তী কবিদের চেয়ে বহির্জগৎকে দেখবার সুযোগ বেশী পেয়েছিলেন বাংলার যুগান্তকারী কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ে, তাঁর চিন্তার পরিধিও তাই ব্যাপকতর। ব্যক্তিগত শোক-দুঃখকে অতিক্রম ক'রে তাঁর আশার বাণী কবিতায় রূপায়িত হয়েছে, তাঁর দেশপ্রেম শতসহস্রের বক্ষে সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁর স্বদেশ প্রেমের কবিতার একটি নমুনা দিচ্ছি :

"যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুখিনী জনমভূমি মা আমার, মা আমার!
অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে,
ছোট খাটো দুঃখ সুখ কে হিসাব রাখে তার?
তুমি যবে চাহো কাজ মা আমার মা আমার!"

এ ধরণের কবিতা নারীর লেখনী পরে লিখেছে, কিন্তু তিনি যে তা'দের পথপ্রদর্শক একথা অনস্বীকার্য। পুত্রশোকে রচিত তাঁর করুণ রসের কবিতা : "তোমার দেহের সাথে হলো

ভস্মীভূত, আমার অগণ্য আশা"; প্রভৃতি এবং তাঁর আত্ম-বিলোপকারী প্রেমের কবিতা : 'হয় হোক প্রিয়তম, অনন্ত জীবন মম, অন্ধকারময়। তোমার পথের পরে অনন্তকালের তরে আলো যদি রয়।"

প্রত্যেকটিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অতুলনীয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সত্তর বৎসর বয়সে এঁর দেহান্তর হয়েছে। সকলের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মিষ্ট মধুর স্বভাবের জন্য এঁরা তিনজনেই কেহ কাহারও চেয়ে কম ছিলেন না। হিন্দুসমাজের মেয়েদের সেকালের বৈশিষ্ট্য প্রথমোক্তাদের মধ্যে ত' ছিলই, আধুনিক সমাজে জীবন কাটালেও কামিনী রায়ের মধ্যেও প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সুমধুর সমন্বয় ঘটেছিল, স্নেহ প্রেমের প্রাচুর্যে সেই প্রাচীন আদর্শ, যাতে করে অপরিচিতকে মুহূর্তে আপন করে, আপনকে পর করে না।

এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালিনী লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা (১৮৫৫-১৯৩২)। তাঁহার আবির্ভাবে বাংলার নারী সমাজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। সেই যথার্থ যুগ-সাহিত্যিকা মহীয়সী মহিলাকে তদানীন্তন সুধীসমাজ মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ দিয়েছেন। তাঁর পূর্বেও মেয়েরা কবিতা গল্প প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু মেয়েদের লেখা তখন পর্যন্ত খানিকটা কৃপার চক্ষেই দেখা হত। তিনিই প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে সকল দিক দিয়ে নারীর শক্তিকে জাগিয়ে তুললেন, নারীর রচনাকে পুরুষের কৃপাদৃষ্টি থেকে উদ্ধার ক'রে শ্রদ্ধার এবং বিস্ময়ের বস্তু ক'রে নিলেন। তাঁর পূর্বে কোনো মহিলা লেখিকা একাধারে গদ্যে পদ্যে সমানভাবে তাঁর

মতো কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। শুধু তাই নয়, গল্প, উপন্যাস, শিশুসাহিত্য, গান, গাথা, ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবন্ধ, ভ্রমণবৃত্তান্ত, অনুবাদ, বিত্যালয়পাঠ্য গ্রন্থ—সর্ববিধ রচনাতেই তিনি জয়যুক্ত হয়েছেন। বঙ্গসাহিত্যে নারীর দানের মধ্যে তাঁর দান যেমন বিপুল, তেমনি বিচিত্র। রচনার মৌলিকতাতেও তিনিই মেয়েদের প্রথম পথপ্রদর্শিকা ব'ললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা দীর্ঘকাল ধরে উজ্জ্বল থেকে তাঁকে দিয়ে বাংলার নারীজগতের যে উপকার সাধন করিয়েছে তার তুলনা হয় না। এ রকম সর্বতোমুখী প্রতিভা শুধু এদেশে কেন, কোনো দেশেই সুলভ নয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস "দীপনির্বাণ" পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার কাহিনী নিয়ে লেখা। তারপর একে একে "বসন্ত উৎসব" (নাটক) "মালতী" (উপন্যাস) "গাথা", "দেবকৌতুক" (নাটক) "কোরকে কীট", "ফুলের মালা", "ছিন্নমুকুল", "স্নেহলতা", "হুগলীর ইমাম্‌বাড়ী", "বিদ্রোহ", "মিবাররাজ", "বিচিত্রা", "স্বপ্নবাণী", "ফুলের মালা", "পাকচক্র", "কাহাকে", "নবকাহিনী", "বাল্য-বিনোদ", প্রভৃতি উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতার বই এবং শিশুপাঠ্য পুস্তক তিনি রচনা করেছেন। খুব ছোট বেলা থেকে তিনি লিখতে আরম্ভ করেন, প্রথম দিকের লেখায় কিছু আড়ষ্টতা এবং ভাষায় কাঠিন্য থাকলেও ক্রমে তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল এবং চরিত্রবর্ণনা নিখুঁত হয়েছে। ঐতিহাসিক সামাজিক রোমান্টিক, সব রকম উপন্যাসই তিনি লিখেছেন, কিন্তু সামাজিক চিত্রে এবং বিয়োগান্ত গল্পে তাঁর নৈপুণ্য সব চেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "স্নেহলতায়" তদানীন্তন সমাজে আধুনিকতার

সংঘাত এবং তার সমস্যা নিয়ে তিনি গভীরভাবে আলোচনা করেছেন, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র দেখাতে চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে অতীত এবং বর্তমানের নারীর মধ্যে তিনিই প্রথম যোগসূত্র। তিনি শুধু নিজেই একজন বড় লেখিকা ছিলেন না, বড় লেখিকাদের শক্তিকে অঙ্কুরে চেনবার অদ্ভুত শক্তি তাঁর ছিল। অখ্যাত অজ্ঞাত লেখিকাদের আবিষ্কার ক'রে প্রথম থেকে তাদের সাহিত্য-সাধনায় উদ্‌বুদ্ধ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ। তিনি দীর্ঘকাল যোগ্যতার সঙ্গে "ভারতী পত্রিকা" সম্পাদন করেছিলেন। একবার বাংলা ১২৯১ সাল থেকে ১৩০১ সাল পর্যন্ত এগারো বছর, আর একবার ১৩১৫ সাল থেকে ১৩২১ সাল পর্যন্ত সাতবছর তিনি এই পত্রিকার সম্পাদিকার কাজ যোগ্যতার সঙ্গে চালিয়েছেন। এই সময়ে সম্পাদিকারূপে বিষয় নির্বাচনে এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যে এবং মৌলিক রচনায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি, বর্ত্তমান বাংলার অধিকাংশ যশস্বী ও যশস্বিনী লেখক লেখিকাকে সস্নেহ প্রেরণা দান করে এবং তখনকার দিনের সব চেয়ে নামকরা মাসিক পত্রিকায় স্থান দিয়ে নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেছেন। তাদের অস্ফুট শক্তিকে ফুটিয়ে তুলে অজস্র কুমুদ-কহ্লারের গাঁথা মালায় বঙ্গভারতীর পূজাবেদীকে সুশোভিত হ'বার সুযোগ করে দিয়েছেন। মনিলাল, সৌরীন্দ্রমোহন, বিভূতিভট্ট, সত্যেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, (এঁর বড়দিদি সর্ব্বপ্রথম ছাপা উপন্যাস ভারতীতেই প্রকাশিত হয়েছিল)। অপর দিকে অনুরূপা দেবী, ইন্দিরা দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, আমোদিনী ঘোষজায়া, লজ্জাবতী

বসু-কন্যা, পাকুড় রাজকন্যা হেমনলিনী বা শৈলাঙ্গিনী দেবী প্রভৃতি নারী লেখিকারাও তাঁর বহু সহায়তা লাভ করেছেন, সে ঋণ তাঁরা কোন মতেই অস্বীকার ক'রতে পারেন না।

বস্তুতঃ তাঁর পরেই বাংলা দেশে সর্ব বিষয়ে মেয়েদের সাহিত্যচর্চা ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। "ফেটালগারল্যাণ্ড" (ফুলের মালা) এবং "আন্‌ফিনিস্‌ড্‌ সং" (কাহাকে) এই দু'খানি ইংরাজী উপন্যাস তিনি নিজেই ইংরাজীতে লিখেছিলেন।

সেদিনে অবশ্য নাম গোপন করে মেয়েদের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশকারীর ভীরু-সঙ্কোচ অনেকখানিই কেটে এসেছিল, তথাপি তাঁরা তখনও সম্পূর্ণরূপে সংশয়মুক্ত হ'তে পারেননি। তখনও বহুস্থলে অভিভাবকরা বা অভিভাবিকারা কন্যা বধূদের বাইরে নাম করা-করি পছন্দ করতেন না, (সমাজ তখনও ভূতপূর্ব মোগল-পাঠান প্রভাব অতিক্রম করতে পেরে ওঠেনি) আবার অপর পক্ষে লেখিকারা নিজেরাই বহুস্থলে, উপহসিত হ'বার বা সমালোচনার ভয়ে ভীতা হতেন। 'পাছে লোকে কিছু বলে!' এ না হলে আমরা আরও দু'জন শক্তিশালিনী লেখিকার পরিচয় পেতে পারতাম। তাঁদের একজন ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা ৺বিজয়া দেবী। তিনি "কাউন্ট অফ্‌ মন্টিক্রষ্ট", "আইভ্যানহো" "ব্রাইড অফ্‌ লামেরমূর", "সেকেণ্ড ওয়াইফ" প্রভৃতি বহু ইংরাজী পুস্তকের অতি সুন্দর অনুবাদ করেছিলেন এবং তাঁর অকালে কাল-কবলিতা কন্যা অপর্ণা দেবীর বহু মৌলিক উপন্যাস লিখিত ছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পরবর্তী কালেও সেগুলি ছাপা হয়নি।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দে সংবাদ-প্রভাকরে একজন বঙ্গমহিলার লেখা

কবিতা প্রকাশ ক'রে কবি ঈশ্বরগুপ্ত যে মন্তব্য লিখেছিলেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করলাম, :

"সংবাদ-প্রভাকর—

মঙ্গলবার ২২শে পৌষ, ১২৬৪ সাল। ইং ৫ই জানুয়ারী ১৮৫৮ সাল। ৩য় পৃঃ। ১ম কলম।

একটী ভদ্র কুলাঙ্গনা বিরচিত পতি-বিরহ বিষয়ক কবিতা আমরা অত্যন্ত আদর ও যত্নপূর্ব্বক প্রকটন করিতেছি, পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে সাতিশয় সন্তোষ সঞ্চয় করিবেন। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া এবং কতিপয় প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়া অবগত হইলাম, ঐ রচনাটী যথার্থই * * কামিনীর বিরচিত। স্ত্রীলোক হইতে এতদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উৎকৃষ্ট পদ্য প্রেরচিত হইয়াছে; ইহা আমরা পূর্ব্বে বিশ্বাস করি নাই, এ কারণ বহুদিবস পর্য্যন্ত অপ্রকাশ রাখিয়াছিলাম, ইহাতে উক্তা রচনা-কারিণী নিতান্তই দুঃখিনী হইয়া দ্বিতীয় একটী কবিতা পুনর্ব্বার প্রেরণ করেন। আমরা তাহাতে সন্দিগ্ধ হইয়া এ পর্য্যন্ত তৎপ্রকাশ পরাঙ্মুখ ছিলাম, কিন্তু এইক্ষণে বিশ্বাসী বন্ধুর বচনে বিশ্বাস জন্মিবার সন্দেহশূন্য হইয়া একটী শব্দও পরিবর্ত্তন না করিয়া অবিকল পত্রস্থ করিলাম। কবিতায় যে সকল বিষয়ের আবশ্যক করে, ঐ রচনায় তাহাই আছে; কোনো অংশেই কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, * * * ... ...

হে স্ত্রী-বিদ্যার বন্ধুগণ! আপনারা এই পদ্যটী একবার পাঠ করুন।"—"বহুগুণালঙ্কৃত মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় বহুগুণ-মন্দিরেষু!

এ অধীনী কর্তৃক পয়ার ছন্দে বিরচিত নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি সংশোধনানন্তর প্রকাশ করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধনে আজ্ঞা হইবেক।

পয়ার।

আশাপথ নিরখিয়ে আছয়ে কামিনী।
যেমন্ চকোরী থাকে, আগতে যামিনী॥
সেইরূপ কিছুদিন করিলাম ক্ষয়।
তবু সেই প্রাণকান্ত না হলো উদয়॥

[থানা রাজাপুরের অন্তঃপাতি ইলিপুর নিবাসিনী কুলকামিনী শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দাসী] ২৯শে কার্তিক। ১২৬৪।"

ইংরাজ আমলে বাঙ্গালী মহিলা কবির লেখা কবিতা প্রথম ছাপার অক্ষরে বার হয়, 'সংবাদ প্রভাকর' নামক পত্রিকায়, কিন্তু সে যুগে মেয়েদের লেখায় নাম দেওয়ার প্রথা ছিল না বলে তাঁদের পরিচয় আমরা জানতে পারিনি। সময়ের দিক থেকে বিচার ক'রলে যাঁদের নাম আমরা এ পর্যন্ত পেয়েছি সেই সব মহিলা লেখিকাদের মধ্যে অগ্রণী শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দাসী। তাঁর "চিত্ত-বিলাসিনী" (১৮৫৬) নামক গদ্যে পদ্যে লেখা বইখানিতে তিনি কৌলীন্য-প্রথার দোষ দেখিয়েছেন। এই যুগের লেখিকাদের মধ্যে কেহ কেহ সংবাদ প্রভাকরে এবং এর পরবর্তিনীরা অনেকেই বামাবোধিনী পত্রিকায় ও এডুকেশন গেজেট পত্রিকায় কবিতা লিখতেন, প্রার্থনা এবং শোকোচ্ছ্বাসই ছিল অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু। নারীজাতির আদর্শ কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ এবং সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে কেউ কেউ প্রবন্ধও লিখতেন, তবে তার সংখ্যা বেশী ছিল না। যাঁদের ছাপা বই পাওয়া যায়

তাঁদের মধ্যে কৈলাসবাসিনী দেবীর "হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা" (১৮৬৩), অজ্ঞাতনাম্নী লেখিকার "কবিতামালা" (১৮৬৫), কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, মার্থা সৌদামিনী সিংহের "নারীচরিত" (১৮৬৬) উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালী নারীর লেখা প্রথম গার্হস্থ্য উপন্যাস হেমাঙ্গিনী দেবীর "মনোরমা" ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লেখা হ'লেও ছাপা হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্গবালা' কাব্যে লেখিকার নাম নেই। ঐ বৎসর (১২৭৫ সাল) প্রকাশিত রাসসুন্দরী দেবীর "আমার জীবন" নামক জীবন-স্মৃতির বইখানি ভাষার সারল্যে এবং মাধুর্য গুণে ঐ সময়কার নারীরচিত শ্রেষ্ঠ রচনা ব'লে বিবেচিত হ'য়েছে। কৈলাসবাসিনী দেবীর কবিতার বই "বিশ্বশোভা", কামিনীসুন্দরী দেবীর নাটক "উর্বশী" এবং দয়াময়ী দেবীর 'পতিব্রতা ধর্ম' ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর পর অজ্ঞাতনাম্নী লেখিকার 'কুসুম-মালিকা' (১৮৭১), অন্নদাসুন্দরী দেবীর কবিতার বই "অবলা-বিলাপ" (১৮৭২), লক্ষ্মীমণি দেবীর গার্হস্থ্য বিষয়ক নাটক "চিরসন্ন্যাসিনী" (১৮৭২) শ্রীমতী নিতম্বিনী দেবীর "অনূঢ়া যুবতী" নাটক (১৮৭২) হরকুমার ঠাকুরের সহধর্মিণী রচিত গার্হস্থ্য উপন্যাস "তারাবতী" (১৮৭৩) এবং ইন্দুমতী দাসী প্রণীত 'দুঃখমালা' নামক কবিতার বই (১৮৭৪) উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের মধ্যেই তাহেরুন্নিছা বিবি, রমাসুন্দরী ঘোষ, ক্ষীরোদা দাসী, শৈলজাকুমারী দেব্যা, মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়, বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, কামিনী দত্ত, রাধারাণী লাহিড়ী, ভুবনমোহিনী দেবী, কুন্দমালা দেবী, নীরদা দেবী, সৌদামিনী খাস্তগীর প্রভৃতি লেখিকার নাম পাওয়া যায়, বসন্তকুমারী দাসীর "রোগাতুরা"

কাব্যগ্রন্থও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত 'বিনোদিনী' মাসিক পত্রিকা ১৮৭৪ সালে বা'র হ'য়ে দু' বৎসর পরে বন্ধ হ'য়ে যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সুরঙ্গিণী দেবীর 'তারাচরিত' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রশংসা লাভ করে। তারপর স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম রচনা "দীপনির্বাণ" প্রকাশিত হ'বার পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাংলার নারীরচিত সাহিত্যে তাঁর একাধিপত্যের যুগ ব'ললে অন্যায় হ'বে না। এডুকেশন গেজেটে এবং বামাবোধিনী পত্রিকায় ইতিপূর্বে বা এই যুগে যে সব নারী লেখিকা স্বনামে অনামে কবিতা লিখতেন তাঁদের সকলের নাম সংগৃহীত হয়নি, তবে কোন্নগরবাসিনী 'জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ' নাম্নী লেখিকার লেখা তখন সকলেরই খুব ভালো লাগত। মনীষী ভূদেব তাঁর গৃহকন্যাদেরও যেমন গদ্য-পদ্য রচনায় উৎসাহ দান ও সেই সব অবান্তর রচনা নিয়ে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাদের সহায়তা করতেন, তেমনি অনাত্মীয়া মেয়েদের ভীরু প্রচেষ্টাকেও কোনো মতেই নিরুৎসাহিত করতেন না। এ বিষয়ে বামাবোধিনী পত্রিকার কাছেও মেয়েদের ঋণ সামান্য নয়। সে সময়ে প্রেম প্রণয়ের কথা নিয়ে কবিতা মেয়েরা সাধ্যপক্ষে লিখতেন না, লিখলেও তা' নির্লজ্জ হ'য়ে ছাপাতেন না। শোকগাথা, ধর্মগাথা, ভাগবত-ভক্তির কাহিনী এই সমস্তই সাধারণতঃ তাঁদের লেখার মর্মকথা ছিল, তবে মিলনানন্দ ও বিরহ-ব্যাকুলতা যে তাঁদের লেখায় একেবারেই স্থান পেত না তা' অবশ্য বলা যায় না। ও-বিষয়ে তো আমাদের দেশে আড়াল দে'বার সুযোগ কিছু কম ছিল না, শ্রীরাধিকার মুক্তামালা ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিয়ে শ্যাম-দর্শন করার

মতো রাধাকৃষ্ণের মধ্যে দিয়েই তো যথেষ্ট হা-হুতাশ করা যায় এবং সেই সঙ্গে পরমানন্দ উপলব্ধি করাও চলে। এই সনাতন প্রথায় এ যুগেও অনেকে চলেছেন। গদ্য রচনায় নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রচলিত রীতিনীতির অনুকূলভাবে গল্প উপন্যাস রচনা হ'ত, নারীপ্রগতি তখনো আত্মপ্রকাশ করেনি। নিজেদের সমাজধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করেও অনেক বড় কাজ এবং ভালো কাজ মেয়েদের করবার আছে, সেই বোধটা তখন জাগ্রত হয়েছিল এবং তখনকার লেখিকারা জনসমাজের মধ্যে, তথা নারীসমাজের মধ্যে সেই সত্যদৃষ্টি খুলে দে'বার যথোচিত সহায়তাও ক'রেছিলেন। কতকগুলি সামাজিক কুপ্রথা যা' ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে বা সাময়িক প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে আলোকলতার মত আসল গাছকে মারতে বসেছে, সেই মারক-লতা উন্মূলনের প্রচেষ্টা করার অধিকার সকলেরই আছে, তাঁরাও তা' করেছেন; যেমন বিবাহ-কৌলীন্যের, যেমন পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতার, যেমন স্ত্রীশিক্ষার, যেমন কঠোর পর্দাপ্রথার, যেমন বরপণের।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বিরাজমোহিনী দাসীর কবিতাহার এবং "জনৈকা ভদ্রমহিলার" লেখা (সম্ভবতঃ লক্ষ্মীমণি দেবীরই) 'সন্তাপিনী' নাটক প্রকাশিত হয়। "সন্তাপিনী" নাটকে বঙ্গ অন্তঃপুরের চিত্র খুব জীবন্ত; ব্যঙ্গ এবং নারীসুলভ বাগ্‌বিন্যাসে বইটি সুখপাঠ্য, বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে এবং বহু বিবাহের বিপক্ষে তৎকালোচিত যুক্তিতর্কও বইটিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। পর বৎসর স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কোরকে কীট' এবং 'মনোরমা' লেখিকা হেমাঙ্গিনী দেবীর রোমান্টিক উপন্যাস "প্রণয়-প্রতিমা" (১৮৭৭ খৃঃ) প্রকাশিত হয়।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ভুবনমোহিনী দেবীর ‘স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান’ নামক কাব্যগ্রন্থ এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতার “শূরবালা” এবং “সুরবালা” উল্লেখযোগ্য বই।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নবীনকালী দেবীর “শ্মশানভ্রমণ” নামক কাব্য, বসন্তকুমারী দাসীর “রোগাতুরা” প্রকাশিত হয়। তরঙ্গিণী দাসীর ‘সুগ্রীবমিলন’ যাত্রার পালাগান, স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘মালতী’গল্প এবং গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর ‘কবিতাহার’ প্রকাশিত হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘গাথা’ নামক কাব্যগ্রন্থ, নয়নতারা দে’র ‘মণিমোহিনী’ এবং মণিমোহিনী দেবীর ‘বিনোদ-কানন’ নাটক ; ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কামিনীসুন্দরী দাসীর “কল্পনা-কুসুম” এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘দেবকৌতুক’ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ অব্দে জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্তের “ধূলিরাশি”, রাণী মৃণালিনীর “প্রতিধ্বনি”। নির্ঝরিণী এবং ১৮৮৫তে “কল্লোলিনী” উক্তা মৃণালিনী দেবী প্রণীত।

শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা ‘ভারতী’ এই ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে (১২৯১সাল) স্বর্ণকুমারী দেবীর পরিচালনাধীনে আসে এবং শরৎকুমারী চৌধুরাণী-প্রমুখ বহু লেখিকা তা’তে লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে নিস্তারিণী দেবীর ‘কেশবজ্যোতি’ এবং ষোড়শীবালা দাসীর “পুষ্পকুঁড়ী” নামক কবিতার বই দু’টি উল্লেখযোগ্য বই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সত্যেন্দ্র ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত ‘বালক’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঐ কাগজে স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবীর এবং অন্যান্য কয়েকজন লেখিকার লেখা দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে নবীনকালী দেবীর

'ষট্‌চক্রভেদ' ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নময়ী দেবীর 'নীহারিকা' কাব্যগ্রন্থ, মানকুমারী বসুর 'বনবাসিনী', ১৮৮৮ সালে প্রসন্নময়ী দেবীর 'আর্যাবর্ত' নামক ভ্রমণ কাহিনী, প্রফুল্লনলিনী দাসীর "ষষ্ঠীবাঁটা" প্রহসন, ব্রজেন্দ্রমোহিনী দাসীর 'কবিতামালা' নামক কবিতা-সংগ্রহ প্রভৃতি কয়েকখানি বই বেরিয়েছিল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' বিনা নামে প্রকাশিত হ'য়ে লেখিকাকে অবিলম্বে যশস্বিনী ক'রে তুলেছিল। তাঁর সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করেছি। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের অন্যান্য বিখ্যাত বই গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'ভারতকুসুম' ও 'অশ্রুকণা' এবং প্রসন্নময়ী দেবীর, 'অশোকা' উপন্যাস, ১৮৯০ (১৮৯৩ ?) খৃষ্টাব্দে ঐ সময়কার অন্যতমা শ্রেষ্ঠা মহিলা কবি মানকুমারী বসুর 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরের আর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই গিরীন্দ্রমোহিনীর 'আভাষ' নামক কাব্যগ্রন্থ, প্রমীলা নাগের 'প্রমীলা' কাব্য, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বিনয়কুমারী বসুর 'নির্ঝর' এবং প্রমীলা নাগের 'তটিনী' কাব্যগ্রন্থ, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'মীরাবাই' নাটক, স্বর্ণকুমারী দেবীর "স্নেহলতা"। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ বাংলা ১৩০০ সালে মনোমোহিনী গুহের 'চারুগাথা' কাব্য এবং বাংলা ১৩০০ সালের মধ্যে লেখা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই, শতদলবাসিনী দেবীর 'বিধবা বঙ্গললনা', বনপ্রসূন রচয়িত্রীর 'সফলস্বপ্ন' উপন্যাস। হিরণ্ময়ী দেবী, প্রতিভা দেবী, সরলা দাসী, ইন্দিরা দেবী, অন্নদাসুন্দরী ঘোষ, লাবণ্যপ্রভা বসু, প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, বিনয়কুমারী বসু প্রভৃতি বহু লেখিকা এই সময় বিভিন্ন মাসিকপত্রে নিয়মিত নানাবিষয়ে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখছিলেন।

এ ছাড়া বহু লেখিকা বিশেষতঃ কবিতারচয়িত্রী বিভিন্ন মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিকের নিয়মিত লেখিকা ছিলেন, পরবর্ত্তী কালে তাঁরা অনেকেই সাহিত্যক্ষেত্র থেকে একান্ত অকালেই অপসৃতা হয়ে গ্যাছেন।

মোট কথা, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং শেষের দিকে নারী-বিরচিত সাহিত্যে আমরা আকাশ পাতাল পরিবর্ত্তন দেখতে পাই। স্বর্ণকুমারী দেবীর সমসাময়িক সরোজকুমারী দেবী, অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা, স্বর্ণলতা বসু, "স্নেহলতা" 'প্রেমলতা'-রচয়িত্রী কুসুমকুমারী দেবী প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে। তারপর কিছুদিন নারী লেখিকার সংখ্যা ও শক্তির অপ্রতুলতা দেখা যাওয়ার পর, শতাব্দীর শেষদিকে আবার নারীকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে দেখতে পাওয়া যায়।

অন্তঃপুর নামক মহিলাদিগের জন্য বিশেষভাবে পরিচালিত মাসিক পত্রের সম্পাদিকা সুমতি-সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী বনলতা দেবীর (১৮৭৯—১৯০০ খৃঃ) কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। ঐ পত্রিকাখানিতে শুধু নারী লেখিকাগণের লেখা প্রকাশিত হতো। "বনজ" নামে একখানি পুস্তকও তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক আরও দু'জন নারী কবির মধ্যে একজন ইংরাজীতে কবিতা লিখে বিশ্ব-বিশ্রুত হয়েছেন। আর একজন বাংলায় অনুরূপ শক্তির পরিচয় দিয়ে এরই মধ্যে বিস্মৃত হ'তে বসেছেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বঙ্গবালা হলেও বাংলা জানেন না। তাঁর জন্ম নিজামরাজ্যে হায়দ্রাবাদে, শিক্ষা উর্দ্দু এবং ইংরাজীতে। বাল্যকাল থেকে তিনি ইংরাজীতে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। "ভাঙ্গা পাখা", 'সময়ের পাখী', "স্বর্ণ-দেহলি" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ

তাঁকে ইংরাজী সাহিত্যে যশস্বিনী করেছে। সাহিত্যসাধনা ছেড়ে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান ক'রে তিনি যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার এবং অশেষ দুঃখক্লেশ বরণ করেছেন এবং দেশনায়িকা-রূপে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন,* আজ তাঁকে কবি সরোজিনী নাইডু বলে অনেকেই চেনেন না, এমন কি বাঙ্গালী বলেও দাবী কর্বার মত সম্বলও তিনি আমাদের দিয়ে রাখেননি, তাঁর পিতৃ-পরিচয়টুকু ছাড়া। অবশ্য আর একদিক দিয়ে তিনি বিশ্ব-বিখ্যাতি লাভ ক'রে ঐ পিতৃপরিচয়ের দাবীতে বাঙ্গালী মেয়েদের পরম গৌরব স্থাপন করেছেন। সে কথা সর্ব্বজন-বিদিত।

ঐ বৎসরে জাত দ্বিতীয় কবি এবং ঔপন্যাসিকা ইন্দিরা দেবী প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী, মুকুন্দ দেবের প্রথমা কন্যা এবং অনুরূপা দেবীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। ইন্দিরা দেবীর শৈশব শিক্ষা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার শিক্ষাগুরু ভূদেব বাবুর হস্তেই ঘটেছিল। তিনি নিজেই তাঁকে সংস্কৃত ভাষায় সযত্নে শিক্ষা দেন।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে লিখিত তাঁর কবিতাগুলি আজও যে কোন আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবির লেখার পাশে স্থান পেতে পারে। দুই একটি নমুনা মাত্র দিচ্ছি,—

"আসবে তুমি, আসবে আমি জানি।
জলে স্থলে চল্‌ছে কানাকানি।

* তার যোগ্য পুরস্কার দিতেও দেশবাসী কার্পণ্য করেনি। (১৯৪৭—৪৮) এখন তিনি যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর। —লেখিকা।

জ্যোৎস্না রাতে ঘুমিয়ে রবে ধরা,
গগন পবন থাকবে স্বপনভরা,
তখন তুমি আমায় দেবে ধরা,
কণ্ঠে নে'বে আমার মালাখানি।"

এই কবিতার আবেগময়ী ভাষার সঙ্গে তুলনীয় অভিমানী কবিতার :

"হাসি খেলা অভিনয়ে অশ্রুজলে ঢাকি,
ভেবেছিলাম এম্‌নি ক'রে তোমায় দেব ফাঁকি।"

'রাধার স্বপ্ন' কবিতার ছন্দমাধুর্য,—

"কোথা সে মধুনিশি গেছে মিশি সজনি,
স্বপন-শোভা ভরা মনোহরা রজনী !
স্মরণে আসে শুধু, হাসে বিধু আকাশে,
কি সুরে গাহে পাখী, অমিয়া কি, মাখা সে !
যমুনা আনমন, তীরবন লগনা।
যেন কি ধ্যান ভরে, রহিত রে, মগনা !
বাজিত নিরজনে, দূর বনে, বাঁশরী।
ডাকিত বুঝি কারে, আপনারে, পাশরি !
দক্ষিণ সমিরণ, ফুলবন, লুটিত,
মরমে সুখসাধ, আধ আধ, ফুটিত।"

তাঁর একান্ত আত্ম-নিবেদনের করুণ সুরটুকু :—

"জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে তোমারে আমি চেয়েছি,
হৃদয়ভরা বেদনা নিয়ে তোমারে বুকে পেয়েছি।
বেদনানলে দহন করে, দিয়েছ মান দয়িত মোরে,
ফেলিয়া পাশে যাবে না সরে, সে আশা আজ পেয়েছি।

আমার চিত-কমল-দলে, সুরভি ছিল স্বপন ছলে,
অমল মম সে পরিমলে গগনতল ছেয়েছি।"

আবার এরই পার্শ্বে তাঁর রুদ্ররসের দুন্দুভি-নিনাদ, "প্লাবন" কবিতায় ;—

সংহর সংহর রুদ্র এ তব সংহার বেশ,
সম্বর তাণ্ডব নৃত্য হে শম্ভো! হে প্রমথেশ!
মৃত্যুঞ্জয় জটাজাল, রুদ্ধ কর মহাকাল,
বহ্নিধূমে ধারাপাতে শ্বাসরুদ্ধ হল শেষ।
কোন যুদ্ধ প্রয়োজনে সাজিয়াছ হে ধূর্জটি?
নবীন নীরদজালে সর্পিয়া বেঁধেছ কটি।
মেঘ ডম্বরুর রবে, সভয় কম্পিত সবে,
ছিন্ন ভিন্ন দশ দিশি, চন্দ্রসূর্য্য পড়ে টুটি।
জটামুক্ত জহ্নুসুতা চরণে পড়িছে লুটি।'

ইন্দিরা দেবীর কবিত্ব-খ্যাতি একদা রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করেছিলেন। "এডুকেশন গেজেট" পত্রে তাঁর বহু কাব্য ও কবিতা প্রকাশিত হলেও পুস্তকাকারে ছাপা হয়নি। সে যুগে ছাপা হ'লে তাঁর কাব্যগুলি "কুমারসম্ভব" "ভট্টিকাব্য" "সাবিত্রী চরিত" "বাল্মীকি রামায়ণের আদি কাণ্ডের" পদ্যানুবাদ প্রভৃতি এবং বহুতর খণ্ড কবিতার জন্য ইন্দিরা দেবী যে তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ নারী কবিদের মধ্যের অন্যতমা বলে বিবেচিত হতেন, তাতে সন্দেহ নেই। পরের দিনে তাঁর বহু কবিতা বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর দেহান্তের পর কয়েকটী মাত্র কবিতা একত্রে গ্রথিত হয়ে কাব্যগ্রন্থ "গীতিগাথায়" স্থান পেয়েছে।

ইন্দিরা দেবীর ছোট গল্প ১৩০১ সালের প্রথম কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত হয় এবং বহু মাসিকেও পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান লাভ করে। তিনি সর্বসমেত পাঁচখানি ছোট গল্পের বই, পাঁচখানি উপন্যাস এবং একখানি কাব্যগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যকে দিয়ে গিয়েছেন। ছোট গল্পের বই 'নির্ম্মাল্য' তাঁর সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তক—১৩১৯ সালে বা ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ছাপা হয়েছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ "কেতকী" মুদ্রিত হয়। "সৌধরহস্য" ১৯১৬ খৃঃ সার আর্থার কোনান ডয়েলের একখানি বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ। এই স্থলে আর একজন সর্বজন-বিস্মৃতা বঙ্গবালার কথা আমরা একবার স্মরণ করবো ; —বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে আর একজন নারী কবি জন্মেছিলেন, যাঁর দান থেকে বাংলা ভাষা বঞ্চিত হয়েছে, যদিও বাঙ্গালীর নাম তাঁর দ্বারা পৃথিবীর সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন পেয়েছে। রামবাগানের দত্ত পরিবারের শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্তের মেয়ে তরুদত্ত (১৮৫৬—১৮৭৭) মাত্র একুশ বৎসরের জীবনে ফরাসী এবং ইংরাজী ভাষায় কাব্যরচনা ক'রে বিদেশী সুধীগণের বিস্ময় উৎপাদন এবং শ্রদ্ধালাভ ক'রে গেছেন। তাঁর ইংরেজী কবিতা সমষ্টি "হিন্দুস্থানের গাথা" এবং পুরাকথার সাবিত্রী, যোগাদ্যা, লক্ষ্মণ প্রভৃতি কবিতায় তিনি ভারতীয় কাব্যের অতীত ঐশ্বর্যকে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য জগতের জন-সাধারণের সামনে ধরেছিলেন। "প্রাচীন ভারত রমণী" নাম দিয়ে একখানি ফরাসী ভাষায় বই লেখা আরম্ভ করে শেষ করতে পারেননি। ইংরেজীতে 'ফরাসী মাঠের শস্যগুচ্ছ' এবং ফরাসীতে 'কুমারী দার্ভেরের পত্রিকা' ইংরেজী এবং ফরাসী সাহিত্যের

অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। দেশে ফিরে সংস্কৃত পড়া আরম্ভ করেন, বোধ হয় ইচ্ছা ছিল এবার স্বদেশী ভাষায় বই লিখবেন। মহাভারত রামায়ণ পুরাণ প্রভৃতি যত্নের সঙ্গে পড়ছিলেন, দুরন্ত কাল অমন জীবন-রত্নটীকে নির্মম হস্তে অকালে হরণ করে নিলে! এঁর ভগ্নী অরু দত্তের নামও ইংরাজী-সাহিত্যে সুপরিচিত।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা হিসাবে নূতন শতাব্দী (১৩০১) আরম্ভ হ'ল, এ বৎসরে প্রসন্নময়ী দেবীর 'নীহারিকা' ২য় ভাগ একখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক বলা যায়।

এ ছাড়া ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সরোজিনী দেবীর 'সুধাময়ী' মানকুমারী বসুর প্রবন্ধের বই 'শুভসাধনা' ছাপা হয়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সরোজকুমারী গুপ্তার 'হাসি ও অশ্রু' এবং রাণী মৃণালিনীর 'নির্ঝরিণী,' কবিতার বই, "দুঃখমালা" রচয়িত্রীর লেখা 'বিরাটনন্দিনী' নাটক, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কবিতা ও গান'। এই সময় সরলাদেবী ও হিরণ্ময়ী দেবী ভারতীর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। হিরণ্ময়ী দেবী ভারতীকে বহু কবিতা উপহার প্রদান করেছেন, ছাপাবই সম্ভবতঃ হয়নি।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মানকুমারী বসুর 'কনকাঞ্জলি,' কুন্দকুমারী গুপ্তার ধর্মতত্ত্বের বই 'প্রেমবিন্দু'।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তার 'প্রীতি ও পূজা' গিরীন্দ্রমোহিনীর 'শিখা'। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সম্পাদনায় 'পুণ্য' মাসিক পত্রিকা এই বৎসর বাহির হয়। বনলতাদেবী সম্পাদিত 'অন্তঃপুর' পত্রিকাও এই বৎসরে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে নগেন্দ্রবালা মুস্তফীর 'প্রেমগাথা', তরঙ্গিণী দাসীর 'বনফুল হার,' স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে'।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণভামিনী দাসীর 'ভক্তি সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে কুসুমকুমারী রায়ের 'প্রসূনাঞ্জলি' এবং রাণী মৃণালিনীর 'মনোবীণা' উল্লেখযোগ্য বই।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে সুরমাসুন্দরী ঘোষের 'সঙ্গিনী,' সরলা দেবীর 'শতগান' বসন্তকুমারী দেবীর 'মজুরী,' নগেন্দ্রবালা মুস্তফীর 'অমিয় গাথা', সরোজকুমারী দেবীর 'অশোকা' কাব্য, জগৎ মোহিনী চৌধুরীর ভ্রমণ 'ইংলণ্ডে সাতমাস' এবং হেমাঙ্গিনা কুলভীর 'সূতিকা চিকিৎসা'।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর শিশুপাঠ্য বই 'বাল্যবিনোদ' ও 'সচিত্র বর্ণবোধ', গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'অর্ঘ্য', নগেন্দ্রবালা মুস্তফীর 'ব্রজগাথা', ইন্দ্রপ্রভা দেবীর 'বৈভ্রাজিকা' এবং 'শেফালিকা' কাব্য।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সুরমাসুন্দরী ঘোষের "রঙ্গিণী", মানকুমারী বসুর 'বীরকুমার বধ'(?) সুমতি দেবীর 'উদ্যান-প্রসূন', চারুশীলা দেবীর 'ভাষাশিক্ষা', শৈলবালা দেবীর 'পাঠশালার পাঠলেখা'।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তার 'খোকা', কুসুমকুমারী রায়ের 'মর্ম্মোচ্ছ্বাস', নিস্তারিণী দেবীর 'মনোজবা', লজ্জাবতী বসুর 'টেম্পেষ্টের' অনুবাদ ও "হোমারের ইলিয়াড"ও এরই কাছাকাছি সময়ের লেখা ও ছাপা। মৃণালিনী সেন মেরী করেলীর "থেলমার" অনুবাদ করেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর স্কুলপাঠ্য বই 'কীর্ত্তি-কলাপ', গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতার বই 'স্বদেশিনী,' শরৎকুমারী চৌধুরাণীর 'শুভবিবাহ', অম্বুজাসুন্দরীর 'প্রভাবতী'

উপন্যাস উল্লেখযোগ্য বই। এই বৎসর সরযূবালা দত্তের সম্পাদনায় 'ভারত মহিলা' পত্রিকা বার হয়।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'সিন্ধুগাথা,' অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তার 'তুটিকথা', 'ভাব ও ভক্তি,' এবং অনঙ্গ মোহিনী দেবীর "শোকগাথা", প্রসন্নময়ী দাসীর 'বিভূতি-প্রভা'।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নিস্তারিণী দেবীর 'রেণুকণা' কবিতার বই, অম্বুজাসুন্দরীর 'গল্প'।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইচ্ছাময়ী দেবীর 'ইচ্ছা-সঙ্গীত' নামক ভগবদ্বিষয়ক গীতিসংগ্রহ, কনকলতা চৌধুরীর 'উদ্দীপনা' নামক রাজনৈতিক প্রবন্ধের বই এবং মৃণালিনী দেবীর 'পলাসী লীলা' নামক ইতিহাস।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বালাবিনোদ' নামক স্কুলপাঠ্য বই, নলিনীবালা ভঞ্জ চৌধুরাণীর 'রুষ জাপান যুদ্ধের ইতিহাস'।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে অনঙ্গমোহিনী দেবীর 'প্রীতি', সরোজকুমারী গুপ্তার 'শতদল', বিমলা দাসগুপ্তার মালবিকাগ্নিমিত্রের অনুবাদ, এবং ফুলকুমারী গুপ্তার "সৃষ্টিরহস্য" নামক দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ উচ্চাঙ্গের বইখানি উল্লেখযোগ্য।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে সরলা দেবীর 'বাঙ্গালীর পিতৃধন' (রাজনৈতিক প্রবন্ধের বই), অমলাদেবীর 'ভিখারিণী' নাটক, এই বৎসর কৃষ্ণভামিনী বিশ্বাসের সম্পাদনে 'মাহিষ্য মহিলা' পত্রিকা প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ হয়, (১৩২২) ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাখানি চলেছিল।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীনাথঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীর 'আমার খাতা' এবং 'প্রবন্ধকুসুম,' প্রফুল্লনলিনী ঘোষের উপন্যাস 'মন্দারকুসুম,' বিনোদিনী দেবীর 'খুকুরাণীর ডায়েরী', লাবণ্যপ্রভা সরকারের "শ্রদ্ধার স্মরণ", হেমলতা দেবীর 'মিবার-গৌরব কথা' অনুরূপাদেবীর 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাস ও ইন্দিরা দেবীর 'নির্ম্মাল্য' গল্পসংগ্রহের বই।

১৯১৩ খৃষ্টব্দে সরযূবালা দাসগুপ্তার 'বসন্তপ্রয়াণ' নামক প্রবন্ধ ও নক্সার বইখানি রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা নিয়ে বার হয়। ঐ বৎসর প্রকাশিত অন্যান্য বইয়ের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কৌতুক নাট্য' এবং নিরুপমা দেবীর উপন্যাস 'অন্নপূর্ণার' মন্দির প্রকাশিত হয়। এই বৎসরই তিলোত্তমা দাসীর কবিতার বই 'আক্ষেপ,' কুমুদিনী বসুর জীবনী গ্রন্থ 'মেরী কার্পেন্টার', রত্নমালা দেবীর 'শ্রীশ্রীভগবৎলীলামৃত', শৈলজা দেবীর 'কণা' এবং কামিনী রায়ের 'শ্রাদ্ধিকী', সরলা দেবীর নাটক 'পরিণাম'।

ইতি মধ্যে প্রকাশিত যে সব বইয়ের সাল তারিখ দিতে পারা গেল না, তার মধ্যে হেমলতা দেবীর 'নেপালে বঙ্গনারী,' রাবেয়া হোসেনের 'মতিচূর', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'প্রথম পাঠ্য ব্যাকরণ,' সরোজিনী দেবীর 'শিশুরঞ্জন নবধারাপাত,' মৃণালিণী দেবীর 'আদর্শ হস্তলিপি,' সুখলতা রাওয়ের 'গল্পের বই', বীণাপাণি দেবীর 'ঠাকুরদাদার দপ্তর' প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য ও শিশুপাঠ্য বই ছাড়া নগেন্দ্রবালা মুস্তফীর 'গার্হস্থ্যধর্ম,' সরোজকুমারী দেবীর 'বঙ্গবিধবা' এবং লাবণ্যপ্রভা বসুর 'গৃহের কথা' প্রভৃতি আরও অনেকগুলিই—উল্লেখযোগ্য বই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 'শিশুসাহিত্যে' সুখলতারাও এর পর অন্যান্য বই

লেখেন এবং তাঁর চেয়ে প্রতিভাশালিনী লেখিকা আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। 'ধূপ' রচয়িত্রী এবং 'পরিচারিকা' সম্পাদিকা নিরুপমা দেবীকে এই সময়ে প্রথম দেখা যায়। ইতিমধ্যে প্রকাশিত অন্যান্য যে সব পুস্তক প্রকাশের সময় উল্লেখ করা গেল না, তার মধ্যে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর 'আমিষ ও নিরামিষ আহার', কামিনী রায়ের 'একলব্য' নাটক, বসন্তকুমারী বসুর 'উপাসনার গুরুত্ব', লাবণ্যপ্রভা বসুর 'পৌরাণিক কাহিনী', কামিনীসুন্দরী দেবীর 'গুরুপূজা', নবীনকালী দেবীর 'ভগবদ্‌গীতা' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ, লজ্জাবতী বসুর হোমরের 'ইলিয়ার্ড্', স্বর্ণলতা চৌধুরীর স্কটের 'মার্ম্মিয়ন', মৃণালিণী সেনের মেরী করেলির 'থেলমা'র অনুবাদ, প্রসন্নতারা গুপ্তার "পারিবারিক জীবন"। বিনোদিনী সেন গুপ্তার 'রমণীর কার্যক্ষেত্র', নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর 'নারী ধর্ম','সতী', নিস্তারিণী দেবীর 'হিরণ্ময়ী' সরোজকুমারী দেবীর 'কাহিনী'।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত নারী রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অনুরূপা দেবীর 'বাগদত্তা', ইন্দিরা দেবীর 'কেতকী', চারুহাসিনী দেবীর কবিতার বই 'অঞ্জলী' এবং কাঞ্চনমালা দেবীর গল্পের বই 'গুচ্ছ' ঐ বৎসরের উল্লেখযোগ্য রচনা। মনোরমা দেবীর "হেমলতা" উপন্যাসখানি সম্ভবতঃ এই বৎসরেই ছাপা হয়েছিল। ইনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ্ সার্ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ, জাষ্টিস্ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী এবং লাহোর চিফকোর্টের জজ্ সার্ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ছিলেন। অকালমৃত্যু এঁর প্রতিভা পূর্ণ বিকাশের অবসর দেয়নি।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সুনীতি দেবীর কবিতাবলী 'সাহানা', হেমন্তবালা দত্তের কাব্যগ্রন্থ 'মাধবী', হরিপ্রভা তাকেদার জীবনীগ্রন্থ

"ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র", অনুরূপা দেবীর 'জ্যোতিঃহারা ও 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাস ও "চিত্র দীপ" "উল্কা" "রাঙা শাঁখা", গল্প সংগ্রহ, ইন্দিরা দেবীর "সৌধ রহস্য", নিরুপমা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'দিদি' ছাপা হয়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কামিনী রায়ের নাটক 'সিতিমা' বাহির হয়। সরযূবালা দাশগুপ্তার 'ত্রিবেণী সঙ্গম' বইখানিও এই বৎসরের দান। এই বৎসরে রাণী নিরুপমা দেবী নব পর্যায় 'পরিচারিকা' পত্রিকার সম্পাদনের ভার নে'ন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণপ্রভা সোমের 'সতী সঙ্গিনী' নামক কাহিনী, ইন্দিরা দেবীর 'মাতৃহীন' নামক ছোট গল্পের বই এবং অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা' উপন্যাস ও 'মধুমল্লী' গল্পগ্রন্থ, নিরুপমা দেবীর 'আলেয়া' ও 'অষ্টক', হেমনলিনী দেবীর 'তরুতীর্থ', শৈলবালা ঘোষজায়ার 'সেখ আন্দু' পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছিল।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে অনুরূপা দেবীর 'রামগড়' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস, সরলা দেবীর গল্প 'নব বর্ষের স্বপ্ন', শান্তা দেবীর বড় গল্পের বই 'উষসী' এবং উপন্যাস "স্মৃতির সৌরভ", মণি মৃণালিনী দেবীর 'সুপ্রভা', ইন্দিরা দেবীর সর্বসমাদৃত উপন্যাস 'স্পর্শমণি' এই বৎসরে পুস্তকাকার ধারণ করে। কাঞ্চনমালা দেবীর 'রসির ডায়েরী', শৈলবালা ঘোষজায়ার 'নমিতা', 'সহধর্ম্মিনী', 'রত্নমন্দির', 'দর্প চূর্ণ' এই বৎসর বাহির হয়।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শৈলবালা ঘোষজায়ার 'আড়াই চাল', সরোজিনী দত্তের 'মাধুরী', রাণী নিরুপমার 'ধূপ', চারুবালা সরস্বতীর গল্পের বই 'সতুর মা' ও 'নূতন উপনিবেশ', হেমনলিনী*

---

* পাকুড় রাজকন্যা শৈলাঙ্গিনী দেবী।

দেবীর 'লাইকা', সুলেখিকা নিরুপমা দেবীর 'বিধিলিপি', কাঞ্চনমালা দেবীর 'শনির দশা' এরই কাছাকাছি ছাপা হয়েছিল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে হেমলতা সরকারের পণ্ডিত 'শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনী', অনুরূপা দেবীর উপন্যাস 'মা' ও 'বিদ্যারণ্য' নাটক, হেমলতা দেবীর 'দুনিয়ার দেনা', প্রিয়ম্বদা দেবীর শিশুপাঠ্য উপন্যাস 'পঞ্চুলাল', নিরুপমা দেবীর 'উচ্ছৃঙ্খল', মিসেস এ, রহমানের 'মুক্তির মূল্য', সরসীবালা বসুর 'প্রতিষ্ঠা', উর্ম্মিলা দেবীর 'পুষ্পহার'। নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী' ও 'বন্ধু' ইহারই কাছাকাছি সময়ে ছাপা হয়েছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে সুনীতি দেবীর 'শিবনাথ জীবনী' মনোমোহিনী দেবীর 'সুষমা' ও 'হেলেনা' উপন্যাস, তুলসীমণি দেবীর 'রাইডার হ্যাগার্ড' লিখিত 'আয়েসার ভাবানুবাদ' 'আয়েসা', শান্তা দেবীর লিখিত 'শোক ও সান্ত্বনা', সরসীবালা বসুর গল্পের বই 'মিলন', ইন্দিরা দেবীর 'পরাজিতা', 'স্রোতের গতি' ও 'ফুলের তোড়া'; শৈলবালা ঘোষজায়ার 'মোহের প্রায়শ্চিত্ত', কামিনী রায়ের 'অশোক সঙ্গীত'।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে অনুরূপা দেবীর উপন্যাস 'পথহারা' 'চক্র' ও 'সোণার খনি' এবং সুবর্ণপ্রভা সোমের 'পঞ্চ সতী', সরযূবালা ভারতীর স্কুলপাঠ্য 'শিক্ষা সোপান'। ইন্দিরা দেবীর 'প্রত্যাবর্ত্তন' উপন্যাসটি তাঁর মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় লেখা ও তাঁর মাসতুত ভাই বিখ্যাত লেখক সৌরীন্দ্রমোহনের প্রযত্নে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বেই ছাপা শেষ হয়। শৈলবালা ঘোষ জায়ার ইমানদার' ও 'অকাল কুষ্মাণ্ডের কীর্ত্তি'।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মানকুমারী বসুর কাব্য 'বিভূতি', অনুরূপা দেবীর উপন্যাস 'হারাণো খাতা', কুমারিল ভট্ট নাটক', লীলা দেবীর উপন্যাস 'ধ্রুবা', উমাশশী কুমারের 'সাকী', প্রফুল্লময়ী দেবীর কবিতা সংগ্রহ 'পুষ্প পরাগ', শ্রীমতী কামিনী রায়ের 'ঠাকুমার চিঠি', রজ্জব উন্নিসার 'সাহসিকা' উপন্যাস, নিরুপমা দেবীর 'আলেয়া', আন্দাজ এই সময়ে ছাপা হয়। সরসীবালা বসুর 'আহুতি', মহারাণী সুনীতি দেবীর 'ইণ্ডিয়ান ফেয়ারি টেলস্' ইংরাজীতে লেখা।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শৈলবালা সেনের কবিতা পুস্তক 'রেণুকণা', সরসীবালা বসুর 'গ্রহের ফের', 'আয়ুষ্মতী', বিজনবালা করের উপন্যাস 'নিগৃহীতা', নিরুপমা দেবীর 'পরের ছেলে', কিরণবালা রায়ের 'জল খাবার', সুরুচিবালা রায়ের উপন্যাস 'ঝরাপাতা', প্রফুল্লময়ী দেবীর গল্প 'প্রতিমা', সুবালা দেবীর কবিতার বই 'ভাব পুষ্প', ইন্দিরা দেবীর কয়েকটি পরিত্যক্ত ছোট গল্প নিয়ে গ্রথিত 'শেষ দান' নামে গল্পের বইটি ছাপা হয়ে বাহির হয়। প্রভাবতী সরস্বতীর 'বিজিতা', লীলা দেবীর 'কিসলয়' ছাপা হ'য়ে বাহির হয়।

এই যুগে ফয়জুন্নেসা খাতুন, মাহমেনা খাতুন, মেহেরুন্নিসা খাতুন, আমিনুন্নিসা বিবি প্রভৃতি মুসলিম নারী বহু স্কুলপাঠ্য বই রচনা করেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর 'নারীর উক্তি', প্রসন্নময়ী দেবীর 'পূর্ব্বকথা', কামিনী রায়ের 'বালিকা শিক্ষার আদর্শ', কমলাবালা বিশ্বাসের 'সচিত্র সেলাই শিক্ষা'। এই যুগের অন্যান্য যে সব বইয়ের উল্লেখ করা গেল না তার মধ্যে সরোজিনী দত্তের 'মাধুরী', বসন্তকুমারী বসুর 'জ্ঞান ভক্তি ও কার্য্যের সামঞ্জস্য',

যামিনীময়ী দেবীর 'সোহং সনাতন জীবন', লীলাবতী ভৌমিকের 'ভারত ইতিহাস', বিভাবতী সেনের 'সংক্ষিপ্ত ভারত ইতিহাস', সরযুবালা দত্তের 'ভারত পরিচয়', জীবনী গ্রন্থের মধ্যে সরলাবালা দাসীর 'নিবেদিতা', সুবর্ণপ্রভা সোমের 'বিবেকানন্দ মাহাত্ম্য', মালতী দেবীর 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন', মহারাণী সুনীতি দেবীর 'শিশু কেশব', হরসুন্দরী দেবীর 'শ্রীনাথ দত্ত', মুসম্মৎ সারা তৈফুর প্রণীত 'স্বর্গের জোতিঃ', নলিনীবালা দেবীর 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন', অনিমারাণী দেবীর 'মহাত্মা গান্ধীর জীবনী', বিমলা দাশগুপ্তার 'ত্রয়ী'। ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে বিমলা দাশগুপ্তার 'নরওয়ে ভ্রমণ,' হরিপ্রভা তাকেদার 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা,' বিবিধের মধ্যে কিরণলেখা রায়ের 'বরেন্দ্র রন্ধন', নির্মলা দেবীর 'রন্ধন শিক্ষা', মোহিনী সেনগুপ্তার 'সুর মুর্চ্ছনা', প্রিয়ম্বদা দেবীর 'কথা উপকথা', ভক্তিলতা ঘোষের 'ছেলেদের বঙ্কিম', সুবর্ণপ্রভা ঘোষের 'খোকার পড়া', সীতা দেবীর 'আজব দেশ', শান্তা দেবীর "হুক্কা হুয়া", কানন দেবীর 'বামনের হাতে চাঁদ'। অনুবাদ সাহিত্যে নির্মলা সোমের 'সরলা', (জেন আয়ার) শান্তা দেবীর 'স্মৃতির সৌরভ' সরসীবালা বসুর 'আয়ুষ্মতী'। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কুমুদিনী বসুর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ কাব্য 'পূজার ফুল' এবং শিশুপাঠ্য 'শিখের বলিদান'। অনুরূপা দেবীর উপন্যাস 'গরীবের মেয়ে', লীলা দেবীর উপন্যাস 'রূপহীনার রূপ', মনোরমা দেবীর 'বরপণ' নিবারণের পক্ষ সমর্থক বই 'নারীর প্রতি' এবং সুরমা সুন্দরী ঘোষের স্কুলপাঠ্য 'সুনীতি শিক্ষা সুধা'। অনুরূপা দেবীর 'শিশুমঙ্গল', প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'দানের মর্য্যাদা', 'বিসর্জ্জন', বিভাবতী দেবীর 'মায়ের ছেলে', গিরিবালা দেবীর

'রূপহীনা', পূর্ণশশী দেবীর 'সুখের বাসর', শৈলবালা ঘোষজায়ার 'অবাক্'। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে নির্মলা রায়ের 'সাঁওতালী উপকথা', মনোরমা দেবীর গানের বই 'মঞ্জরী,' সুনীতি বালা চন্দের প্রবন্ধ পুস্তক 'চরিত্র চিত্র', বাণী ঘোষের স্কুলপাঠ্য 'সংস্কৃত কিশলয়,' রাজবালা বসুর 'অধ্যাত্ম রামায়ণ,' বসন্তকুমারী দাসীর ধর্ম্মমূলক উপন্যাস 'সতী ধর্ম্ম,' অনুরূপা দেবীর 'হিমাদ্রি,' রত্নমালা দেবীর 'হিমালয় ভ্রমণ,' ইঁহার বহু কবিতা ও প্রবন্ধ পুস্তক পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে 'সীতা চিত্র' আদর্শগৃহিনী,' 'প্রবন্ধ মুকুল,' ও অন্যান্য পুস্তক। সুবর্ণপ্রভা সোমের 'দুটি প্রাণ,' পূর্ণশশী দেবীর 'স্নেহময়ী', প্রভাবতী সরস্বতীর 'নূতন যুগ', 'বঙ্গপল্লী' পূর্ণশশী দাসীর 'মধুমিলন', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'মিলন রাত্রি', হেমমালা বসুর 'রাবেয়া', সুধা দেবীর 'ভুলের কারসাজি'।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে—রমণী দেবীর 'দেবী মাহাত্ম' ও 'সংশয় ভঞ্জন', প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতার বই অংশু, 'বঙ্গমাতা,' উমা দেবীর 'বাঙ্গালী জীবন' নামক প্রবন্ধের বই, সুরবালা দেবীর 'মর্ম্মবীণা', সেফুরাণী দাসীর উপন্যাস 'পরিণাম', অক্ষয়কুমারী দেবীর 'বৈদিক যুগ', অনুরূপা দেবীর 'জোয়ার ভাঁটা,' 'প্রাণের পরশ', নিরুপমা দেবীর 'দেবত্র,' বিজনবালা দেবীর 'নিগৃহিতা', সুলেখা দেবীর 'প্রজাপতির খেলা,' নির্মলা দেবীর 'পুজারিণী', কমলা দেবীর 'সন্তান পালন', প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর 'জারক,' প্রভাবতী সরস্বতীর 'প্রেমময়ী,' শৈলবালা ঘোষজায়ার 'অভিশপ্ত সাধনা', সরসীবালা বসুর 'প্রবাল'। শ্রীমতী হেমলতা দেবী এই বৎসর থেকে 'বঙ্গলক্ষ্মী' কাগজখানির সম্পাদনের ভার নেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে—প্রভাবতী সরস্বতীর 'পথের শেষে' ও 'তরুণের অভিযান', উপন্যাস দু'খানি ছাপা হয়ে বাহির হয়। অনুরূপা দেবীর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'ত্রিবেণী' প্রকাশিত হয়। শরৎকামিনী বসুর 'সদগুরু কথামৃত', রাণী নিরুপমার 'গোধূলী'। তমাল লতা বসুর 'অমিয়', তুষার মালার 'সীবন ও কাটিং শিক্ষা', তরুবালার 'কলিকাতায় তিনটি বিবাহ'।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে—শৈলবালা সেনের 'অনুকণা', কনকলতা ঘোষের 'রেখা' কাব্য, অনুরূপা দেবীর উপন্যাস 'উত্তরায়ণ,' গীতা দেবীর নাটক 'বিপর্য্যয়', রাধারাণী দেবীর 'প্রেমের পূজা,' রমা দেবীর 'নির্ম্মাল্য', হেমলতা দেবীর 'মেয়েদের কথা,' কামিনী রায়ের 'দীপ ও ধূপ,' নীহারবালা দেবীর 'আদর্শ রন্ধন শিক্ষা', উমা দেবীর 'সনাতন পাকপ্রণালী', কনকতারা ঘোষের 'রেখা কাব্য', শৈলবালা ঘোষের 'শান্তি', প্রভাবতী সরস্বতীর 'খেয়ার শেষে'।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে—ইন্দুরেখা দেবীর 'ধ্রুবচরিত,' গিরিবালা দেবীর উপন্যাস 'হিন্দুর মেয়ে', ইন্দ্রাণী দেবীব উপন্যাস 'শুভদৃষ্টি,' চারুলতা দেবীর কাব্য 'ব্যথিতার গান,' বিমলা দেবীর 'চিত্রলেখা', কামিনী রায়ের 'জীবন পথে', শান্তিসুধা ঘোষের 'শকুন্তলা', ইন্দুসুধা ঘোষের 'সীবনী,' ৺সুরবালা ঘোষের 'মধুরা' (কবিতা সংগ্রহ) বিনোদিনী মিত্রের 'শ্রীদুর্গাচরণ নাগ', রাধারাণী দেবীর কবিতা পুস্তক 'লীলা কমল', বনলতা দেবীর 'ব্রাহ্মণ পরিবার', মৈত্রেয়ী দেবীর 'উদিতা' কাব্য, প্রভা দেবীর গীতায়ণ', বিমলা দেবীর 'চিত্রলেখা', লক্ষ্মীমণি দেবীর 'অভিশপ্ত', প্রভাবতী সরস্বতীর 'ব্রতচারিনী।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে—মৃণালিনী গুপ্তার গল্পের বই 'নায়িকা', স্নেহলতা রায় চৌধুরীর শিশুপাঠ্য বই 'পদ্মচাকী,' স্বর্ণকুমারী দেবীর স্কুলপাঠ্য বই 'সাহিত্য স্রোত', প্রফুল্লময়ী দেবীর ধর্মবিষয়ক 'অমৃত প্রসঙ্গ', চামেলিবালা মজুমদারের উপন্যাস 'শুকতারা', বিমলা দেবীর 'ক্রমশঃ', প্রীতিকণা দত্তর 'কৃষ্ণকুমারী', 'মীরাবাই', 'তারাবাই', 'পদ্মিনী', হিরণ্ময়ী সেনের 'জলছবি', ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা।

নিস্তারিণী দেবীর কাব্য 'আকাশ-বাণী', ভক্তিসুধা দেবীর কাব্য 'রজনীগন্ধা', উমা দেবীর উপন্যাস 'কাজলী' উল্লেখযোগ্য।

নীলিমা সেনের 'মায়ামুক্তি', প্রভাবতী সরস্বতীর 'দুনিয়ার দান' ও 'প্রতিজ্ঞা'।

প্রিয়ম্বদা দেবীর 'চম্পা ও পাটল' কাব্য তাঁর মৃত্যুর পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ এই বৎসর ছাপা হয়।

শৈলবালা ঘোষজায়ার 'বিপত্তি', অণিমা দেবীর 'অবাক কাণ্ড,' কনকলতা ঘোষের 'অনুরাগ', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'প্রেমগীতি স্বরলিপি', মাহমুদাখাতুন সিদ্দিকার 'পশারিণী'।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের—উল্লেখযোগ্য বই রজ্জব উন্নিসার উপন্যাস 'সাহসিকা', অনুরূপা দেবীর উপন্যাস 'পথের সাথী', হেমলতা রায়ের 'কুম্ভমেলা ও সাধুসঙ্গ', নীলিমা দেবীর 'আগমনী', নীহারবালা দেবীর 'দেশের ডাক', স্বর্ণকুমারী দেবীর স্কুলপাঠ্য 'বালবোধ ব্যাকরণ', বসন্তকুমারী দেবীর 'লক্ষ্মীর পাঁচালী', বিমলা দেবীর 'মীমাংসা', প্রীতিকণা দত্তর 'গার্গী', রাধারাণী দেবীর 'সিঁথি মৌর', প্রভাবতী সরস্বতীর 'সোণার বাংলা', 'জাগৃহী', 'প্রতীক্ষায়', 'জীবন সঙ্গিনী'।

এই যুগে লীলা দেবীর 'ঝরার ঝরণা', হেমলতা দেবীর 'শ্রীনিবাসের ভিটা', প্রফুল্লময়ী দেবীর 'ধাত্রীপান্না', অনুরূপা দেবীর 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞান', ডাক্তার যামিনী সেনের 'প্রসূতি-তত্ত্ব', ডাক্তার হিরণ্ময়ী সেনের 'সরল হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা', সুখলতা রাওয়ের 'স্বাস্থ্য', প্রবোধশশী দেবীর 'সহজবুনন শিক্ষা', উমা দেবীর 'সনাতন পাক প্রণালী', ননী রায়ের 'অভিনব ভূগোল'।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, কাঞ্চন মালা, ইন্দিরা দেবীর অল্প পরবর্ত্তী কালে প্রভাবতী দেবী, আমোদিনী ঘোষ, আশালতা সিংহ, আশালতা দেবী প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

ছোট গল্পের ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে সীতা দেবী শান্তা দেবীর শক্তি নিতান্ত সামান্য নয়, দুই ভগ্নীর সাহিত্যিক দান ও প্রচুরতর।

"অন্তঃপুর" 'পরিচারিকা', 'ভারত মহিলা', 'সাহিত্য মহিলা', প্রভৃতি অনেকগুলি মাসিক পত্রিকা উঠে গেলেও লীলা নাগ এবং তাঁর পর শকুন্তলা দেবী প্রভৃতি সম্পাদিত "জয়শ্রী" এবং হেমলতা দেবী সম্পাদিত 'বঙ্গলক্ষ্মী' এ সময়ে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল।

ইতিমধ্যে প্রকাশিত যে সব বইয়ের সময় দেওয়া গেল না, তার মধ্যে হেমাঙ্গিনী দস্তিদারের 'গৃহিণীর হিতোপদেশ', ভক্তিলতা ঘোষের ছেলেদের উপযোগী ক'রে লেখা 'দেবীচৌধুরাণী', 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রতিভা-শালিনী কবি 'বাতায়ন' লেখিকা উমাদেবীর অকালমৃত্যুতে

(১৯৩২) বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পরবর্ত্তী যুগে কবিতার ক্ষেত্রে রাধারাণী দেবীকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা যেতে পারে। নিরুপমা দেবীর এবং মৈত্রেয়ী দেবীর নাম ও কবি হিসেবে এ সময়ে উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে লাবণ্যপ্রভা সরকারের 'কবি কাব্যের কথা', দেশী বিদেশী কবি ও লেখকের সম্বন্ধে সমালোচনা। লতিকা মুখোপাধ্যায়ের—"গানের বই", বিমলাগুহর "পুনর্ম্মিলন", সুধাংশু হালদার ও ইলাদেবীর লিখিত গল্পের বই "সপ্তক", অনামা মহিলা লিখিত উপন্যাস "মহিলা-মঙ্গলিকা", শকুন্তলা দেবীর ভ্রমণকাহিনী 'স্বদেশ ও বিদেশ', সুরুচিবালা চৌধুরাণীর "কাজের নেশা", কনকলতা ঘোষের "পত্রলেখা", সরলা দেবীর ধর্ম্মবিষয়ক 'ব্রহ্মার্পণম্', অনুরূপা দেবীর "নাট্যচতুষ্টয়"।

প্রাচীনা লেখিকা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর উপন্যাস "জীবন সমস্যা", পূর্ণশশী দেবীর "মেয়ের বাপ", অপরাজিতা দেবীর "আঙ্গিনার ফুল",—শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর "বুকের বীণা" বইএর ছাপার তারিখ জানা না থাকলেও গ্রন্থটী একটী সম্পূর্ণ নূতন ভাবের নারী লিখিত কবিতার বই, সেই হিসাবে এই পুস্তকের উল্লেখ করার প্রয়োজন। রচনায় পুরুষোচিত ভাব ও ভাষা ব্যবহৃত হওয়াতে অচেনা লেখিকাকে কেহ কেহ নাকি লেখক বলেও সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু আমরা তাঁকে কোন পূর্বপরিচিতা লেখিকা বলেই স্থির করেছি। শৈলবালা ঘোষজায়ার "স্নিগ্ধ ও শুচি"।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে উমাদেবীর শিশুপাঠ্য 'বালিকাজীবন', সফুরা বেগম বা মিসেস্ রহমানের উপন্যাস 'মুক্তির মূল্য', মহামায়া

দেবীর 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা মাহাত্ম্য', অনুরূপা দেবীর উপন্যাস "বিবর্ত্তন", প্রভাবতী দেবীর উপন্যাস 'মুক্তিস্নান', এবং মায়ের আশীর্বাদ', শৈলবালা ঘোষজায়ার উপন্যাস 'থিয়েটার দেখা', গিরিবালা দেবীর উপন্যাস 'মুকুটমণি', অম্বুজাসুন্দরী দেবীর ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকেলিরসালাপ', প্রীতিকণা দত্তজার জীবনী 'কৃষ্ণকুমারী' এবং 'পদ্মিনী', সুধা দেবীর অহল্যাবাই', ইন্দিরা দেবীর বহু কবিতার মধ্য হ'তে কয়েকটীমাত্র নির্বাচিত করে তাঁর পুত্র সুকবি ও সুলেখক প্রভাতমোহনের সম্পাদনায় কাব্যগ্রন্থ "গীতিগাথা" প্রকাশিত হয় !

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রভাময়ী মিত্রের নাটক 'দেউল' বহুপরিশ্রমের ফলে কোনারক মন্দির রচনার ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহ ক'রে লেখা। জগত্তারিণী দেবীর 'কবিতা মালা', গীতা দেবীর "বিপর্যয় নাটক এবং 'জনা' প্রবন্ধ, চামেলিবালা মজুমদারে 'ত্যাগের প্রতিদান' উপন্যাস, প্রভাবতী দেবীর 'পথ ও পান্থ', আভাবতী মিত্রের শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'এস্কিমো,' রাজলক্ষ্মী দেব্যার 'কেদারভ্রমণ কাহিনী,' ও অমলানন্দীর 'সাতসাগরের পারে' নামক ভ্রমণ কাহিনী, সরলা দেবীর গীতি নাট্য 'চিত্রা', গিরিবালা দেবীর উপন্যাস 'কুড়ানো মাণিক', কৃষ্ণভাবিনী দেবীর 'লক্ষ্মীর পাঁচালি', শান্তিলতা দেবীর 'কুমারী ব্রতের ছড়া' প্রভৃতি সংগ্রহ, অণিমা দেবীর শিশুপাঠ্য বই 'অবাক কাণ্ড' এবং 'লক্ষ্মীবাই', প্রীতিকণা দত্তজায়ার শিশুপাঠ্য জীবনী 'কর্মদেবী রাজ্যশ্রী', অনুরূপা দেবীর "সর্ব্বাণী", মায়া বসুর উপন্যাস "ত্রিধারা"।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রমদাবালা সেনের স্কুলপাঠ্য 'কিশোরশিক্ষা,' কুমুদিনী বসুর জীবনী 'কৃষ্ণকুমার মিত্র', প্রভাবতী দেবীর

উপন্যাস 'ছন্নছাড়া' ও হারানোস্মৃতি', জ্যোতিঃপ্রভা দেবীর শিশুপাঠ্য 'আনন্দের ফোয়ারা', সুজাতা দেবীর 'ওমরখৈয়াম', তমাললতা বসুর উপন্যাস 'কথার দাম', আশালতা দেবীর 'পাওয়ার বেদনা', প্রীতিকণা দত্তজায়ার শিশুপাঠ্য জীবনী 'অরুন্ধতী', 'দুর্গাবতী', 'রাণী ভবানী', অনুরূপা দেবীর (দেরাদুন, মুসৌরী হইতে কেদার-বদরীভ্রমণের সঙ্গে মোটামুটি উত্তরাখণ্ডের সমস্ত কিম্বদন্তী এবং ইতিহাস সম্বলিত) ভ্রমণকাহিনী 'উত্তরাখণ্ডের পত্র' প্রকাশিত হয়। এই সময়ের খুব কাছাকাছি গল্প-লেখিকাদের মধ্যের কয়েকজন লেখিকার বলিষ্ঠ পুরুষোচিত ভাষা ও নারী-অসাধারণ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও লিপিচাতুর্য প্রশংসনীয়। এর মধ্যে একজন বাণী রায়, অপর নিঃসন্দিগ্ধ ছদ্মনাম্নী অমলাদেবী, —"মনোরমা" "সরোজিনী" "সুধার প্রেম" প্রভৃতির লেখিকা অথবা লেখক।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে পুষ্পলতা দেবীর "পুষ্পচয়ন" নামক গল্পসংগ্রহ, প্রতিভা সেনের 'ভারতের শাসনপদ্ধতি', প্রভাবতী দেবীর উপন্যাস 'বাংলার বউ', উমা দেবী কাব্যনিধির কাব্য 'মানস বেণু,' সরলা দেবীর 'ইন্দ্রজাল', গিরিবালা দেবীর উপন্যাস 'দান প্রতিদান', ইলারাণী মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস "পল্লীর মেয়ে", গীতা দেবীর 'মেয়েলি ব্রতকথা', জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'বারোমেসে লক্ষ্মী দেবীর পাঁচালী', সুকবি রাধারাণী দেবীর "বনবিহগী" সম্ভবতঃ এই সালেই ছাপা হয়েছিল। শ্রীমতী লীলা দেবীর "রক্তকমল মানিকের" ছাপার তারিখ জানা যায় নি, এখানি ছোট্ট একটী নাটিকা। তাঁর "ধ্রুবা" "কিসলয়" এবং রূপহীনার রূপ ইতিপূর্বেই ছাপা হয়। তাঁর লেখায় একটা মিষ্টিক ভাব দেখা যায়,

রবীন্দ্রনাথ এবং হেমলতা দেবীর লেখার মধ্যের এই বিশেষ একটা পদ্ধতি তিনি অনুকরণ করেছেন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী সুরজবালা দেবীর জীবন কাব্য 'সুরাঙ্গগাথা', রাজলক্ষ্মী দেব্যার "তীর্থচিত্র" নামক ভ্রমণ বৃত্তান্ত। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, এম-এ, (এক্ষণে ইন্দ্রাণী দেবীর) ছোট গল্প ও কবিতা ও শ্রীমতী ইলা হালদারের "যে ঘরে হলো না খেলা" এবং আরো বহু রচনা বিচিত্রা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নিষ্ঠুর কাল তাঁকে অকালে জীবন-কোরক থেকে ছিন্ন ক'রে না নিলে তিনি একজন শক্তিমতী লেখিকা বলে গণ্য হতে পারতেন। তাঁর কয়েকটী মাত্র গল্প "সপ্তকে" সন্নিবেশিত এবং দুইখানি মাত্র পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল, তা'তেই তাঁর উদীয়মান শক্তির প্রাচুর্য চাপা থাকে নি।

অনেক ছোট বড় মাঝারি লেখিকাদের সমস্ত বই প্রকাশের সাল তারিখ সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। তার জন্য দায়ী অনেকটা তাঁদের পাবলিসারেরা। কোন্ সালে কোন্ বই ছাপা হ'ল তার কোন পরিচয়ই ইদানীংকার ছাপা বইয়ে থাকে না। একে ত প্রস্তরলিপি, তাম্রশাসনের স্থান নিয়েছে একান্ত স্বল্পজীবী ছাপার কাগজ, তার উপর দু' দশ বছরের খবর পর্যন্ত বই দেখে পাওয়া যায় না, কাজেই তাঁদের বইগুলির মধ্যে যে সব বই-এর জন্মতারিখ উল্লিখিত হয় নি, সেগুলি যতদূর সম্ভব একত্র ক'রে এক স্থলে উল্লেখ করা হবে। বহু গল্প-উপন্যাসের রচয়িত্রী ও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী, শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, শ্রীমতী আশালতা দেবী ও আশালতা সিংহ এবং শ্রীমতী সীতা ও শ্রীমতী শান্তা

দেবীদের সম্বন্ধেই আমি ত্রুটীর কথা নিবেদন করছি, যেহেতু বাংলা সাহিত্যে সংখ্যাধিক পুস্তক এঁরাই লিখেছেন। অতঃপর নূতন সংস্করণে প্রথম ছাপার তারিখটিরও যদি উল্লেখ করবার ব্যবস্থা করা হয়, তা' হ'লে ভবিষ্যৎ সাহিত্যের ইতিহাস লেখকরা যে তাঁদের কাছে বিশেষ ঋণী হবেন তা' বলাই বাহুল্য।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ছাপা হয় হেমলতা দেবীর গল্পের বই "দেহলী"। ইঁহার বহু পুস্তক পূর্বে ও পরে বাহির হয়েছে। হয়ত সবগুলির নাম সময়মত করা হয় নি, ছোট গল্পগুলি "মিষ্টিক" ধরণের এবং বাংলা সাহিত্যে সত্যই অভিনব। কবিতা, গানগুলিও সুললিত।

"মেয়েদের কথা", "শ্রীনিবাসের ভিটা", "অকল্পিতা", "দুনিয়ার দেনা", "জ্যোতি", "দু' পাতা", "শিশু সাহিত্য", "জল্পনা", "সার কথা", 'কথিতা' এইগুলি এঁর লেখা।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের উল্লেখযোগ্য বই,—আভা দেবীর নাটিকা 'আধুনিকা', প্রফুল্লময়ী দেবীর উপন্যাস "এষা", "নির্য্যাতিতা ধরণী", অমলা দেবীর "সুধার প্রেম" উপন্যাস, গীতা ঘোষের "নিজেরে হারায়ে খুঁজি", পূর্ণশশী দেবীর 'পথে বিপথে', জ্যোতির্ময়ী দেবীর "রাজ যোটক", সরলা দেবীর 'শিবরাত্রি পূজা', আশাপূর্ণা দেবীর "জল ও আগুন", "ছোট ঠাকুরদার কাশী যাত্রা", সরলা বসু রায়ের "চিত্তপ্রদীপ", শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবীর "নীলিমার অশ্রু" সুবৃহৎ উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে অন্নপূর্ণা গোস্বামীর "সঙ্গোপনে" নামক গল্প-সংগ্রহ, আশাপূর্ণা দেবীর গল্পের বই 'রঙীন মলাট', 'হাফ্ হলিডে', প্রভাবতী দেবীর উপন্যাস 'পথপ্রান্তে', শ্রীমতী দুর্গাবতী ঘোষের "পশ্চিম যাত্রিকী" (ইউরোপ ভ্রমণ কাহিনী)এর কাছাকাছি

সময়েই ছাপা হয়। নিরুপমা দেবীর উপন্যাসদ্বয় "অনুকর্ষ" ও "যুগান্তরের কথা" এই বৎসরে কলেবর পরিগ্রহ করে।

"সাগরপারের কথাগুচ্ছ" নামক সমুদ্রপারের সাহিত্য থেকে সংগৃহীত ছোট গল্পের বইটি শ্রীমতী পুষ্পরাণী ঘোষের দ্বারা লিখিত হ'য়ে প্রকাশিত হয় এই বৎসর বা এর পূর্ব বৎসরে।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে অন্নপূর্ণা দেবীর কাব্য 'হৃদি উচ্ছ্বাস', চিন্ময়ী করের গল্পসংগ্রহ 'দুমুখী', 'গৌরী মা' (নাম না থাকলেও আমরা জানি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্যা ও পরম সাধিকা সারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী গৌরী দেবীর এই পুণ্যময় জীবন-কথার সুরচিত কথা-চিত্রের লেখিকা তাঁর শিষ্যা ও সারদেশ্বরী আশ্রমের অধুনাতন কর্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী দুর্গা দেবী, এম-এ শাস্ত্রী)।

হাসিরাশি দেবী ও প্রভাবতী দেবীর একত্রে লেখা 'দায়ী', সুরুচিবালা চৌধুরাণীর 'ফাঁকির নেশা', হাসিরাশি দেবীর 'মানুষের ঘর', শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীর 'মাটির দেবতা'র জন্মতারিখ জানা যায় নি। শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবীর 'বিনিময়' উপন্যাস এরই নিকটবর্তী কালে মাসিক বসুমতী থেকে পুস্তকাকৃতি ধারণ করেছে।

১৯৪২ বা নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশিত কুমারী অলোকা রায়ের "ধরা যেথা অম্বরে মেশে", ১৯৪৩-৪৪ রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে", "প্রাথমিক শিক্ষা", "সহজ পড়া" (বর্ণপরিচয় পুস্তক)।

১৯৪২ 'ঝরা ফুল' উপন্যাস প্রতিমা মিত্র, "পরিচিতি" মল্লিকা মিত্র।

১৯৪৩-এর প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে প্রশস্তি দেবীর গল্পগ্রন্থ "তমসাবৃতা", অমলা দেবীর "চাওয়া ও পাওয়া", গিরিবালা

দেবীর "খণ্ড মেঘ", আমোদিনী ঘোষের "ফস্কাগেয়ো"।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে স্নেহলতা দেবীর 'অঞ্জলী' এবং আভা দেবীর 'অর্চ্চনা' কাব্য, বাসন্তী চক্রবর্ত্তীর কুমুদিনী বসুর 'জীবন চরিত', অন্নপূর্ণা গোস্বামীর "স্রষ্টা", মায়া দেবী বসুর 'ত্রিধারা' উপন্যাস, সুজাতা দেবীর "ওমর খৈয়াম", মহমুদা সিদ্দিকির 'পূজারিণী', স্নেহময়ী রায়, বি-এর "বাংলার রাণী ও বেগম", জীবন-কথা, শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুরের 'নির্ব্বাণ' (রবীন্দ্র-কথা), শ্রীমতী রাণী চন্দের 'ঘরোয়া' (রবীন্দ্র-কথা), শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ", বীণাপাণি দেবীর "ছেলেদের পিকনিক" ও "মেয়েদের পিকনিক" এই বৎসর বা পূর্ব বৎসর ছাপা হয়েছে।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বই ডক্টর রমা চৌধুরীর "বেদান্ত দর্শন", ইতিমধ্যে "নিম্বার্ক দর্শন" লিখে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

শ্রীমতী বাণী রায়ের 'জুপিটার' কবিতা পুস্তক, বাণী গুপ্তা এম্-এ, বি-টির 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' শ্রীমতী অপরাজিতার 'শালবন' ও শ্রীমতী পুষ্পলতার 'মরুতৃষা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে তাঁদের সাহিত্যিক যশ বৃদ্ধি করেছে।

কিন্তু এই বৎসর ও ইহার পূর্ববর্ত্তী বৎসরে ছাপার কাগজের অভাবে বহু লেখক ও তথা লেখিকার পুস্তক প্রকাশের দারুণ বিঘ্ন উপস্থিত করেছে। এর মধ্যে কয়েকজন লেখিকা আছেন, যাঁদের লেখা ছাপা হ'লে বঙ্গসাহিত্য সত্যই লাভবান্ হ'তে পারত। তাঁদের মধ্যের দু'জনকার নাম উল্লেখ করবো, একজন শ্রীমতী অরুণা সিংহ ও অপরা পুষ্প মুখোপাধ্যায়। দু'জনেই ডবল এম্-এ

এক্ষণে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিনী কর্মী। অরুণার একটি ছত্র মনে পড়ছে ;

'উৎসবের রাত্রিশেষে তোমার আকাশে মেশে,
আমার বিচ্ছেদ পারাবার।"

১৯৭৫ সালে বই ছাপার বিঘ্ন বর্ধিত হ'লেও সুলেখিকা শ্রীমতী রাণী রায়ের 'পুনরাবৃত্তি' গল্পের বই, বীণা দেবীর 'পুরুষের মন' গল্প, প্রতিভা বসুর "মনোলীনা", 'বিচিত্র হৃদয়', 'সুমিত্রার অপমৃত্যু', রাধারাণী দেবের "মিলনের মন্ত্রমালা", আশাপূর্ণা দেবীর 'সাগর শুখায়ে যায়', প্রফুল্লবালা দেবীর 'বয়নিকা', সরোজকুমারী বন্দোপাধ্যায়ের 'সুরের মায়া' (ইঁহার 'দ্বন্দ্ব' উপন্যাস পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল) ও শ্রীমতী প্রভাময়ী মিত্রের কবিতা পুস্তক 'সায়াহ্নিকা' ছাপা হয়েছে। সামান্য একটু নমুনা দিচ্ছি :

"মৃত্যু, তোমারে বরিয়াছি আমি, ডরি নাই কোন দিন,
ভাবনা আমার অতি লঘুভার উন্মুখ উদাসীন।"

* * *

বিশাল ললাটে বিভূতির টিকা আননে গভীর ক্ষান্তি,
প্রসন্ন দিঠি বিতরে প্রসাদ আয়ত নয়নে শান্তি।
অঙ্গদ ভূষা, বাহুতে কনক-দণ্ড ঝলসি উঠে
বিপুল বক্ষে বৈজয়ন্তী উপবীত পড়ে লুটে,
শ্যাম সুন্দর শোভন কান্তি পীত উত্তরী ঘিরে,
শুচি সুন্দর চিত্ত পাবন এস হে কান্ত ধীরে।"

—"লোকান্তরের" লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের সহধর্মিণীর যোগ্য পরিচয়।

"ঘর ছেড়ে যারা বাহিরের পথে অসময়ে চলে গেছে,
ভালবেসে তারা নিশিদিন ফিরে কাছে হতে আরও কাছে।

ইহলোকের সঙ্গে "পরলোকের" আর যেন "অজানা রহস্য" নেই! উভয় জগতের অধিবাসী পরস্পরের মিলন-সূত্র হাতে নিয়ে যেন একান্ত কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে; তাই লেখিকা পরম আশ্বস্ত চিত্তে বলতে পেরেছেন;—

"যারা কাছে আর যারা দূরে আছে জনে জনে দিনু সঁপি।"

পূর্বেই বলেছি বর্তমানযুগের লেখিকাদের মধ্যে অনেকেরই পুস্তকপ্রকাশের তিথি-তারিখ জানা না থাকায় তাঁদের লেখা অনেক পুস্তকের পরিচয় যথাস্থানে হয়ত দেওয়া হয় নি, যাঁদের পুস্তকসংখ্যা বেশী তাঁদের ক'জনের মাত্র লিখিত পুস্তকের (১৯১৭-৪৬) একটী করে তালিকা দিচ্ছি;—শ্রীমতী শান্তা দেবী ও সীতা দেবীর একত্রে "উদ্যানলতা" উপন্যাস, "নিরেট গুরুর কাহিনী", "হুক্কু হুয়া", 'সাত রাজার ধন'। এই "উদ্যানলতা" সেদিনে সাহিত্য-কাননে একটা নূতনত্বের সমাবেশ করেছিল। তারপর তাঁরা তাঁদের ধরণে বহু গল্প উপন্যাস বঙ্গ-সাহিত্যকে দান করেছেন এবং বলা বাহুল্য এ দান বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই গ্রহণ করেছে।

শ্রীমতী শান্তাদেবীর "উষসী", "স্মৃতির সৌরভ", "শোক ও সান্ত্বনা", "চিরন্তনী", "সিঁথির সিঁদুর", "বধূবরণ", "অলখনিরঞ্জন", "দুহিতা", 'পথের দেখা', "রামানন্দ ও অর্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা", শ্রীমতী সীতা দেবী লিখিত পুস্তকাবলী "বন্যা", "মাতৃঋণ", "পরভৃতিকা", "তিনটী গল্প", "পুণ্যস্মৃতি", "জন্মস্বত্ব", "আজবদেশ", "ছায়াবীথি", "বজ্রমণি", "সোনার খাঁচা", "সাত রাজার ধন",

"আলোর আড়াল", "রজনীগন্ধা", "ক্ষণিকের অতিথি",... শ্রীমতা অপরাজিতা দেবীর "আঙ্গিনার ফুল", "বুকের বীণা", "পুরবাসিনী", "বিচিত্ররূপিণী", রচনাপদ্ধতি নবীনত্বে ভরা, তড়িৎ শক্তিসম্পন্ন।

শ্রীমতী অনুরাধার "কপোত-কপোতী" শ্রীমতী অপরাজিতারই অনুসরণ বা অনুরণন।

শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা সোমের "সতীসঙ্গিনী", "পঞ্চ সতী" 'সতীসোহাগ", "শুভমিলন", বঙ্গলক্ষ্মী", "কুলনারী", 'বৌ", "বিবেকানন্দ মাহাত্ম্য", "শ্রীরামকৃষ্ণ"। শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর "শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মার জীবন-কথা"। বঙ্গশ্রীতে ধারাবাহিক উপন্যাসদ্বয় "বঙ্গরমণী" এবং "অনির্ব্বাণ" পুস্তকাকারে না দেখা দিলেও আমরা ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করছি। লেখিকার দৃষ্টি-প্রদীপ সমুজ্জ্বল, তিনি একজন যথার্থ শক্তিমতী সুলেখিকা তা'তে কোনই সন্দেহ নেই। জ্যোতির্ম্মালা দেবীর "রক্ত গোলাপ", 'বিলাত দেশটা মাটির', 'ইরাবতী' রচনাশক্তি ভাল। অনুরূপা দেবীর "ঋতুচক্র" নাটিকা এবং "সাহিত্য ও সমাজ" প্রবন্ধ পুস্তক ছাপা হ'য়ে বের হয়েছে।

শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণীর "শতগান" বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখকদের লেখা বাছাবাছা একশোটী সঙ্গীতের স্বরলিপি। "নববর্ষের স্বপ্ন" গল্পের বই, "চিত্রা" গীতিনাট্য, "জীমূতোৎসব" ক্ষুদ্র নাটিকা ; বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ও যুব-জাগরণে সরলা দেবীর অবদান সামান্য নয়। তাঁর "বীরাষ্টমী" ব্রত একদা তরুণ-সমাজকে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ ক'রে স্বদেশ সেবায় টেনে এনেছিল। শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী দাসীর প্রবর্ত্তিত "ভারত স্ত্রী

মহামণ্ডলের" পরিচালনা তিনিই করেছেন। বাঙ্গালী মেয়েদেরও বর্ত্তমান যুগের উপযোগী কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করে পথ চলবার বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করে এসেছেন, আজও এই পরিণত বয়সেও তা' থেকে নিবৃত্ত হন নি।*

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষজায়ার "দীপের দাহ", "ডায়রীর দৌত্য", "চিত্রাঙ্গদা", শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর "নারীর উক্তি ও অসংখ্য স্বরলিপি"।

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর "রঙ্গিণ মলাট" "জল ও আগুন" হাফ্ হলিডে (সচিত্র গল্প) "ছোট ঠাকুরঝি" "কাশী যাত্রা"।

শ্রীমতী সুরমা সুন্দরী ঘোষের "সঙ্গিনী" (১৩৩১), রঙ্গিনী কবিতাপুস্তক, (১৩৩৯) সুনীতিশিক্ষা (১৩৪১) সুধাপাঠ (১৩৩২) "দিদিমার কথা", "পরলোকাঞ্জলী" (১৯৩০) শ্রীমতী উমাদেবী "বাতায়ন" কবিতাপুস্তক, 'ঘুমের আগে" শিশুসাহিত্য, "কাজলী" উপন্যাস (১৩৩৮)।

আশালতা সিংহের "স্বয়ম্বরা" উপন্যাস, "একাকী" "সহরের নেশা", "বাস্তব ও কল্পনা", 'ক্রন্দসী", "কলেজের মেয়ে", "অভিমান", "পরিবর্ত্তন", মুক্তি', 'অমিতার প্রেম', 'আবির্ভাব'।

* বিগত ১৯৪৬ সালে তাঁর দেহান্ত হওয়ায় আমরা একান্ত মর্ম্মাহত হয়েছি, দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য যাঁরা অগ্রবর্তী হয়েছিলেন, এই শক্তিময়ী নারী তাঁদের মধ্যেরই একজন। কংগ্রেস সভা লাউড-স্পীকারের পূর্ববর্তী যুগ তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে সম্মোহিত থাকতো। "জনগণ" "অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী" "অয়ি ভুবন মনমোহিনী" এসব গান তাঁর কণ্ঠে যাঁরাই কংগ্রেস-সভায় শুনে ধন্য হয়েছেন, তাঁরাই জানেন, যে সে স্বরমূর্চ্ছনার কি অপূর্ব প্রভাব।

শ্রীমতী আশালতা দেবীর মোট বই এই কয়খানি, লেখিকা অকালে ইহলোক থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন জেনে আমরা দুঃখিত হয়েছি। "পাওয়ার বেদনা", "কাঞ্চনদীঘির মেয়ে", 'বাংলার মেয়ে", "অনিলার প্রেম", "যে ঢেউ ভাসিয়া গেছে", "জনতা", "কালের কপোলতলে", "পুনশ্চ", "পথ ও প্রসাদ", "বিপথের অন্তরালে", "সাথী", "দুইনারী", "মন নিয়ে খেলা", "ছন্দপতন", "অন্তঃপুরে", "যৌবনের সিন্ধুতলে", "কলঙ্কের ফুল"।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত পুস্তকাবলী

১। ঘূর্ণি হাওয়া
২। তীর্থ যাত্রী
৩। পথের শেষে
৪। মরুর পথে
৫। ঘরের লক্ষ্মী (১৯৪২)
৬। পথের সম্বল
৭। ব্যথিতা ধরিত্রী (১৯৩৯)
৮। প্রতিষ্ঠা
৯। যুগান্তর
১০। আমার কথা
১১। পথ ও পান্থ
১২। মুক্তিস্নান
১৩। জাগৃহি
১৪। মুক্তির আহ্বান
১৫। মুক্তির আলো
১৬। আয়ুষ্মতী
১৭। উদয় অস্ত
১৮। পারের আলো
১৯। তরুণের অভিযান (প্রথম প্রকাশিত)
২০। অন্ধা (১৯২৩)
২১। ঢেউয়ের দোলা
২২। লক্ষ্মীবরণ (১৯৪৩)
২৩। বিসর্জন
২৪। পথের উদ্দেশে (১৯৪২)
২৫। পথের দিশা
২৬। ছন্নছাড়া
২৭। রাতের পথিক (১৯৩৮)
২৮। দূরের আশায়
২৯। প্রতীক্ষায়
৩০। প্রাণের টান
৩১। শেষের দাবী

৩২। পাথেয়
৩৩। স্নেহের মূল্য
৩৪। বিজিতা
৩৫। বোধন
৩৬। নিশীথের আলো
৩৭। জাগরণ
৩৮। বাংলার বউ
৩৯। দীপের আলো
৪০। মানুষ ও পৃথিবী
৪১। রাতের স্বপন (১৯৪৩)
৪২। প্রেম ও পূজা (১৯৪২)
৪৩। আগে ও পরে
৪৪। ব্রতচারিণী
৪৫। মাটির দেবতা
৪৬। পথপ্রান্তে (১৯৪৩)
৪৭। প্রাণের টান
৪৮। নিশীথের চাঁদ (১৯৪৩)
৪৯। বঙ্গপল্লী
৫০। তর্পণ
৫১। নূতন যুগ
৫২। মুক্তার অতীত (১৯৭২)
৫৩। চলার পথে
৫৪। খেয়ার শেষে
৫৫। দানের মর্য্যাদা
৫৬। পরদেশী
৫৭। মুক্তিস্নান
৫৮। মাটির মায়া
৫৯। সংসারপথের যাত্রী
৬০। মাটির প্রেম
৬১। সাঁজের প্রদীপ (১৯৪১)
৬২। ধূলার ধরণী
৬৩। জীবন দেবতা (১৯৪৪)
৬৪। সোণার সংসার (১৯৪০)
৬৫। মায়ের আশীর্ব্বাদ
৬৬। শতাব্দীর স্বপ্ন (১৯৪৫)
৬৭। শতাব্দীর প্রতীক
৬৮। প্রেমময়ী
৬৯। হৃদয়ের চাঁদ
৭০। জাগরণ
৭১। নীড় ও বিহঙ্গ
৭২। ধ্রুবতারা
৭৩। দায়ী (হাসিরাশি ও প্রভাবতী দেবী)
৭৪। সুখের সংসার
৭৫। দুনিয়ার দান
৭৬। ঝড়ের পরে
৭৭। অন্তরালে
৭৮। সহধর্ম্মিণী

নাটক

১। বাংলার মেয়ে
২। ব্রতচারিণী
৩। মধুরেণ সমাপয়েৎ

ফিল্‌ম

১। সহধর্ম্মিণী
২। বাংলার মেয়ে
৩। জননী
৪। রাঙা বউ
৬। ইন্দ্রনাথ (গৃহীত)

গল্প পুস্তক

১। জীবন সঙ্গিনী
২। গৌরী
৩। অপরাধের জের
৪। লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল
৫। ঝরা ফুলের সৌরভ
৬ স্মৃতির দংশন
৭। বিধবার কথা
৮। ঘন মেঘের তলে
৯। চোখের জলের পিছল পথে
১০। পাঁকের ফুল
১১ অভিযান
১২। জীবনের স্বপ্ন
১৩। বন্ধু
১৪। শুভ্রা
১৫। নূতন অতিথি (১৯৪৫)

শিশু উপন্যাস

১। অ্যাটলান্টিকের তীরে
২। আরব অভিযান(১৯৪৫)
৩। গুপ্ত ঘাতক
৪। হত্যার প্রতিশোধ
৫। বন্দী জেগে আছ ?
(১৯৪৫) অপ্রকাশিত (গৃহীত)
৬। মৃত্যু মঙ্গল
৭। কংগো সীমান্তে
৮। পশ্চিম আফ্রিকায়
৯। কৃষ্ণার বাহাদুরী
১০। অ্যাটলান্টিকের মোহানায়
১১। মুক্তি দূত

প্রভাবতীর ৭৮খানি উপন্যাস, ১৫খানি গল্পপুস্তক, ৮খানি নাটক এবং ১১খানি শিশু-উপন্যাস, সর্বসমেত মোট ১১০খানি গ্রন্থ এ পর্যন্ত (১৯৪৫ খৃঃ) প্রকাশিত হয়েছে। ইহা সমস্ত পৃথিবীর নারী-সমাজের পক্ষেই গৌরবের বিষয়।

শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী প্রণীত

১। মানুষের ঘর (১৯৪১)
অপ্রকাশিত (গৃহীত)
২। রাজকুমার—জাগো
৩। বিতর্দিকা
৪। চক্রবাল
৫। প্রান্তর—কবিতা

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবার পুস্তকগুলি এইভাবে ছাপা হইয়াছে :—

১। স্নেহময়ী (উপন্যাস) ১৩৩৩ সালে দেবসাহিত্য কুটীর হইতে প্রকাশিত।

২। মেয়ের বাপ (উপন্যাস) ১৩৩৪ সালে ভূদেব পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

৩। ফল্গুধারা (উপন্যাস) ১৩৩৪ সালে ভূদেব পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

৪। রূপহীনা (উপন্যাস) ১৩৩৫ সালে ভূদেব পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

৫। প্রেমের বায়না (উপন্যাস) ১৩৩৬ সালে ভূদেব পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

৬। অনুরাগ (উপন্যাস) ১৩৩৯ সালে দেবসাহিত্য কুটীর হইতে প্রকাশিত।

৭। দিশেহারা (উপন্যাস) ১৩৪০ সালে জ্ঞান পাবলিশিং হাউস, ৪৪, বাদুড়বাগান হইতে প্রকাশিত।

৮। নিশীথবাদল (উপন্যাস) ১৩৪১ সালে জ্ঞান পাবলিশিং হাউস, ৪৪, বাদুড়বাগান হইতে প্রকাশিত।

৯। মহিলা-মজলিস (উপন্যাস) ১৩৪১ সালে জ্ঞান পাবলিশিং হাউস, ৪৪, বাদুড়বাগান হইতে প্রকাশিত।

১০। রাতের ফুল (উপন্যাস) ১৩৪২ সালে কলিকাতা ট্রেডিং কোম্পানী হইতে প্রকাশিত।

১১। আঁধারে আলো (উপন্যাস) ১৩৪২ সালে প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

১২। অভিশপ্তা (উপন্যাস) ১৩৪৫ সালে ফাইন আর্ট প্রেস ৬০নং বীডন ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

১৩। ঝড়ের পথিক (গল্পের বই) ১৩৪৬ সালে ইণ্ডিয়ান্ বুক্ ষ্টোর্স, ৯৯।১।F কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

১৪। পথে বিপথে (উপন্যাস) ১৩৪৭ সালে শিশির পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

১৫। সাদা কালো (উপন্যাস) (অপ্রকাশিত)

১৬। অভাগীর স্বপ্ন (ছোট গল্পের বই) ১৩৫১ সালে কবিতাভবন ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ হইতে প্রকাশিত।

১৭। মনে পড়ে (জীবনস্মৃতি) ১৩৫০ সাল হইতে 'প্রভাতী' পত্রিকায় ১ম খণ্ড ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছে এবং ২য় খণ্ড সচিত্র শিশিরে বাহির হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন যে সকল ছোট গল্প ও কবিতা বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও মাসিকে বাহির হয়েছে, তা' আর পুস্তকাকারে পরিণত হয় নি এ পর্যন্ত—সুযোগ অভাবে।

আজকাল অনেক নূতন নূতন লেখিকার নাম প্রত্যেক মাসিকেই দেখা যায়, মহিলা-পরিচালিত মহিলা সঙ্ঘেই বিশেষ করে নানা বিভাগে তাঁরা লিখছেন, এ খুব আশার কথা। কয়েক-জনের নাম দিচ্ছি, এ ভিন্ন বহু লেখিকা আছেন, এঁদের মধ্যে

প্রতিমা গাঙ্গুলী ও অনসূয়া দেবীর গল্প-উপন্যাস লেখার হাত ভালই বলতে হবে, ভবিষ্যতের আশা যথেষ্ট।

মন্দির-সম্পাদিকা কমলা দাসগুপ্তা, অনসূয়া দেবী, ইন্দিরা গুপ্তা, চিত্রিতা গুপ্তা, আরতি দত্ত, বেলা দে, শকুন্তলা, মৃণালিনী দেবী, পূর্ণিমা বসাক, বীণা মজুমদার, সুকৃতি দেবী, ধীরা গাঙ্গুলী, সুলেখা সেন, প্রতিভা চট্টোপাধ্যায়, সুলেখা মিত্র, গৌরী দেবী, বীণা সরকার, লিলি দত্ত, ইলা দেবী, ইলা মিত্র, সুষমা মিত্র, হেনা হালদার, লীলা মজুমদার, প্রতিমা বসু, শ্রীতুর্গা গঙ্গোপাধ্যায়, শেফালী গুপ্ত, স্বর্ণময়ী দেবী, রাণী দেবী, দীপিকা পাল, অনুকা গুপ্ত, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, কাত্যায়নী দেবী, নন্দিতা দাশগুপ্ত, অমিতা বসু, প্রমীলা রায় চৌধুরী, নীলিমা সরকার, কৃষ্ণসুচিত্রা দেব, কিরণশশী দে, ক্ষান্তিলতা দেবী, শোভা দেবী, বিভাবতী বসু, সুজাতা রায়, সুলেখা মুখোপাধ্যায়, বেলা মিত্রা, বেলা হালদার, গীতা মিত্র, সুষমা সেন। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে আরও কয়েকটী নাম করার মত নাম আছে, যথা; সুলেখিকা সুফিয়া কামাল, এস, রহমান, বেগম সারা তৈফুর, সাকেছা খাতুন, সেলিমা বেগম, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, শামসুন্নেসা মাহমুদ, নাজমা বেগম, বেগম জেবু আহমদ, সাইদা বেগম, সুরতুন্নিসা, জামসেদ উন্নিসা, রাজিয়া খাতুন, আনোয়ারা চৌধুরী, বেগম সামসুল নাহার, মাজমাকোন লিলি আহমদ, সাহজাদী বেগম, জাহানারা আরজু, সুলতান, বেষম, আছিয়া খাতুন প্রভৃতি বহু মুসলিম লেখিকার ছোঁয়া আমরা মধ্যে মধ্যে হঠাৎ পেয়ে থাকি, এঁদের মধ্যে তু' তিন জন সত্যকারই সুলেখিকা।

তুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান যুগের বাঙালী আমরা, বিদেশী সাহিত্যের

সংবাদ যতখানি রাখি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যের সম্বন্ধে তা'র দশ ভাগের এক ভাগ সংবাদও রাখি না। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মহত্তম দান বাঙালীর চিন্তার ক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলিয়েছিল, বাংলা সাহিত্য ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যকে ছাড়িয়ে আজ বহু দূর অগ্রসর হয়েছে; তবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অতীত সাহিত্যে অনেক বড় জিনিষ আছে—এ কথা অস্বীকার করা যায় না এবং সেই সব সাহিত্যে নারীর দানও উপেক্ষণীয় নয়। পূর্বেই বলেছি এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অল্প, তবু যতটুকু সম্ভব আলোচনা ক'রব। বলা বাহুল্য খুব বেশী বিখ্যাত ব্যক্তি ছাড়া অন্যের নাম উল্লেখ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

বাংলার পাশেই আসাম। প্রাচীন আসামের নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা কামরূপ। পূর্বে সেখানে অসুরবংশীয় যে রাজারা রাজত্ব করতেন, তাঁদের অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ছিল; বাণরাজকন্যা ঊষা এবং তাঁর সখী চিত্রলেখার বৈদগ্ধ্যের পরিচয় আমরা মহাভারতের যুগেও পেয়েছি। মধ্যযুগে কামরূপের তন্ত্রবিদ্যা বাংলা দেশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, কামরূপের ডাকিনীরা যে হতভাগ্য বাঙালী পুরুষদের ভেড়া বানিয়ে রাখত, তা'র মূলে তাদের অলৌকিক তন্ত্রমন্ত্র ছাড়া লৌকিক বৈদগ্ধ্য বিদেশীকে আকৃষ্ট ক'রতে কতটা সাহায্য করত তা' আজ বলা সম্ভব নয়। বাংলা দেশের ঝাড়ফুঁক, সাপে কামড়ানো, ভূত ছাড়ানো প্রভৃতি পল্লীগ্রামের নানা গুরুতর ব্যাপারে আজও কামরূপের কামাখ্যার দোহাই অপরিহার্য। ধর্মমঙ্গলের যুগে গৌড়েশ্বরের বাহিনীকে যিনি সম্মুখ-সংগ্রামে বাধা দিয়েছিলেন

সেই রাজকন্যা কানাড়া—শুধু বীরনারী ছিলেন না, সুশিক্ষিতা এবং ধর্মপ্রাণা ছিলেন। আসামী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রভেদ খুবই অল্প. আসামী বিদুষীদের মধ্যে যাঁরা বাঙালী নন, তাঁদের মধ্যেও অধিকাংশই বাংলার সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত। চৈতন্যের যুগে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের স্ত্রী রাজা নরনারায়ণের সভায় পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কথিত আছে, তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রঘুনন্দনকে স্বামীর অনুপস্থিতিতে বেদ এবং স্মৃতির বিচারে পরাস্ত ক'রে রাজার কাছে বৃত্তিলাভ করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পদ্মাবতী ফুকনানী প্রথম আসামী ভাষায় গল্প লিখে নাম করেন। তার পর যমুনেশ্বরী খাতোনিয়ার সুলেখিকা ব'লে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁর অকাল মৃত্যুতে আসামী সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে আসামের সব চেয়ে বিখ্যাত লেখিকা নলিনীবালা দেবী এবং ধর্মেশ্বরী দেবী। নলিনীবালার লেখায় মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবি এবং মরমীয়া সাধকদের প্রভাব খুব বেশী। ছোটো গল্প এবং উপন্যাস লিখে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে স্নেহলতা ভট্টাচার্য এবং চন্দ্রপ্রভা সাইখিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

উত্তর ভারতের সর্বপ্রধান দু'টি ভাষার নাম করতে গেলে বাংলা এবং হিন্দীর নাম করতে হয়। হিন্দী সাহিত্যে নারীর দান বাংলার তুলনায় অল্প হ'লেও একেবারে নগণ্য নয়।

মধ্যযুগের মারাঠী নারী-কবিদের মধ্যে দু'জনের নাম আমরা জানি ; দু'জনেই সাধিকা এবং দু'জনেই মরমীয়া কবি। এঁদের মধ্যে প্রথমা মুক্তাবাই ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর সাধকপ্রবর

জ্ঞানেশ্বরের ভগ্নী এবং সুপণ্ডিতা। কখনো তাঁর ভাষা খুব সরল, কখনো তাঁর ভাষা হেঁয়ালিতে ভরা। মুক্তা বাইয়ের রচনার একটু নমুনা দিচ্ছি : বলা বাহুল্য প্রথম কবিতাটির অর্থ সহজবোধ্য নয়, এটি ভক্তিমার্গেরও কথা। (১) আশ্চর্য্য (মুঙ্গি উড়তি আকাশি······ইত্যাদি)

'পিঁপড়ে আকাশে উড়ে গিলিয়াছে সুর্য !
বন্ধ্যার হ'ল ছেলে, এ কি আশ্চর্য !
বৃশ্চিক মথিতেছে পাতালের কুণ্ডে !
শেষ নাগ তার কাছে আছে হেঁট মুণ্ডে !
মাছির উদরে হ'ল ঈগলের সৃষ্টি !
মুক্তা বাঁচে না হেসে দেখে অনাসৃষ্টি !

একবার লোকের অত্যাচারে নিন্দাবাদে বিরক্ত হয়ে জ্ঞানেশ্বর কুটীরের দ্বার বন্ধ করেছিলেন, তিনি বোনকেও ঘরে ঢুকতে দেবেন না স্থির করেছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে মুক্তা এই কবিতাটি রচনা করেন—

(২) (মজবরী দয়া করা...ইত্যাদি)

দয়া করো ভাই, দুয়ার খুলিয়া দাও মোরে ঘরে স্থান !
সেই তো সাধক, যে পারে সহিতে দুনিয়ার অপমান।
সেই তো মহান্, অভিমান যার নিঃশেষে হ'ল লয়,
সেই মহাপ্রাণ যার ভালোবাসা সবার উপরে র'য়।
তুমি যে ব্রহ্ম, বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিছ অহরহ,
তোমার হৃদয়ে ক্রোধ পাবে ঠাঁই কেমন করিয়া কহ ?
প্রজ্ঞা তোমার স্থির হোক ভাই, ভ্রম হোক অবসান।
খোলো খোলো দ্বার, ভগিনী তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান।

মুক্তা বাইয়ের বহু অভঙ্গ আজও মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত, সাত শ' বছরেও সেগুলির জনপ্রিয়তা কমে নি। তাঁর পরবর্তী জনাবাই খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে জন্মেছিলেন এক দরিদ্রগৃহে; ভক্ত নামদেবের কাছে তিনি স্বেচ্ছায় দাসীত্ব স্বীকার করেন তাঁর ভক্তি-সাধনার স্পর্শ পেয়ে ধন্য হ'বার জন্য। জনাবাই পণ্ডিতা ছিলেন না, সারাদিন গৃহকার্যে এবং দেবপূজায় কাটিয়ে তিনি যে কবিতাগুলি রচনা ক'রে গেছেন, তার মধ্যে গভীর ভাবদ্যোতক বহু কবিতা আছে, একটি নমুনা দিলাম :

(দেব খাতে, দেব পিতে···ইত্যাদি)

'দেবতা খাই, দেবতা করি পান,
দেবতা মোর শয়ন উপাধান ;
যা কিছু দিই, যা কিছু লই, কিছুই নহে দেবতা বই,
দিবস রাতি স্বজনসাথী আমার ভগবান।
এখানে তাঁরে সেখানে তাঁরে পাই,
দেবতাহীন নাইকো কোনো ঠাঁই।
ভরি ভুবন পাত্রখানি, তাঁহারে আমি রেখেছি আনি,
আমার মিঠা দেবতা 'বিঠা'* কোথায় তিনি নাই !'

বর্তমান যুগের মারাঠী লেখিকাদের মধ্যে শ্রীধর রাণাডের পত্নী সুকবি মনোরমা রাণাড়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তার পর আরও বহু লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন। ছোটো গল্প রচনায় যাঁরা নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণাবাই।

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে গুজরাত। সংস্কৃত সাহিত্যে গুজরাতী নারী কবি প্রভুদেবী লাটী একদিন ভারতের শ্রেষ্ঠতম

* বিঠোবা—বিষ্ণু।

কবিদের মধ্যে অন্যতম ব'লে বিবেচিত হয়েছিলেন, সে কথা পূর্বে বলেছি। গুজরাতের চরম উন্নতির যুগে, আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে, সিদ্ধরাজ জয়সিংহের মা 'মীনল-দেবী' অনহিল্‌বাড়ার রাজসিংহাসনে উপবিষ্টা ছিলেন। নাবালক পুত্রের নামে এই বিদুষী ধর্মপ্রাণা নারী কেবল দীর্ঘকাল রাজ্য শাসনই করেন নি, গুজরাতের শিল্পে সাহিত্যে ধর্মে তিনি যে প্রেরণা দিয়ে গিয়েছিলেন তার জন্য গুজরাতবাসী আজও তাঁকে দেবী জ্ঞানে পূজা করে। তাঁর পর দ্বাদশ শতাব্দীতে মহারাজ অজয়পালের বিধবা মহিষী 'নায়িকা দেবী' সিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত ক'রে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। নায়িকা দেবী শুধু অসিচালনায় সুপটু ছিলেন না, ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয় রাজনীতির কূটকৌশল তাঁর সম্যক্ রূপে জানা না থাকলে দিগ্বিজয়ী ঘোরীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হ'ত না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহারাজাধিরাজ বিশালদেবের মন্ত্রী তেজপালের পত্নী অনুপমা দেবী এবং বাস্তুপালের পত্নী ললিতা দেবী তাঁদের ধর্মানুরাগ, শিল্পানুরাগ এবং সাহিত্যানুরাগের জন্য অমর খ্যাতি লাভ করেছেন। আবুপর্বতের মর্মর মন্দির আজও তাঁদের সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে, কিন্তু তাঁদের অন্যান্য কীর্তির কথা অনেকেই জানেন না। তেজপালের পত্নী অনুপমা রাজ্যশাসনে স্বামীর দক্ষিণহস্তস্বরূপা ছিলেন, মুসলিম প্রজাদের জন্য মসজিদ নির্মাণ তাঁর মহাপ্রাণতার এবং সংস্কারমুক্ত সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার পরিচয় দেয়। বাস্তুপাল বিদুষী পত্নী ললিতা দেবীর অনুপ্রেরণায় আঠারো কোটি মুদ্রা ব্যয়ে তিনটি গ্রন্থাগার নির্মাণ

করেছিলেন এবং শত শত পণ্ডিত এবং কবিকে বৃত্তি দিয়ে আশ্রয় দিয়ে সাহিত্যচর্চায় সাহায্য করেছিলেন। হিন্দুরাজত্বের অবসানে গুজরাতে স্ত্রীশিক্ষা কিছুদিনের জন্য ব্যাহত হয়েছিল, তবে জৈন সন্ন্যাসিনীরা শাস্ত্রচর্চার ধারা সেদিনও মঠে মঠে রক্ষা ক'রে স্ত্রীশিক্ষা অব্যাহত রেখেছিলেন। বাংলার শ্রীচৈতন্য এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রভাব ষোড়শ শতাব্দীতে যখন সমস্ত ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করে, তখন পশ্চিম ভারতের এক বিদুষী ধর্মপ্রাণা নারী বৃন্দাবন থেকে তাঁর অন্তরের হোমশিখা দ্বারকার সমুদ্রতীর পর্যন্ত নিয়ে গেছলেন, তাঁর নাম মীরাবাই। মীরাবাইয়ের কথা আমরা পূর্বে সামান্য কিছু বলেছি, তাঁর ভাষা ছিল পশ্চিম রাজস্থানী, তখনও সেই ভাষাই গুজরাতের দেশভাষা; সুতরাং মীরাবাইকে রাজপুতানা এবং গুজরাত নিজের লোক ব'লে সমভাবেই দাবী করে। মীরাবাইয়ের সম্বন্ধে এইটুকু ব'ললেই যথেষ্ট হবে যে, তাঁর চেয়ে বড় কবি পশ্চিম ভারতে আজ পর্যন্ত জন্মাননি। 'বোড়া' নামক গুজরাতী মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরবর্তী যুগে 'রতনবাই' নামক সুকবির আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁর ভজনগুলিতে মীরারই প্রভাব দেখা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসে গুজরাতী সাহিত্য নূতন ভাবে গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। গত শতাব্দীতে শিক্ষিতা গুজরাতী নারীদের মধ্যে শ্রীমতী বিদ্যাগৌরী নীলকণ্ঠ প্রথম গ্র্যাজুয়েট হন। তিনি নিজের বহু প্রবন্ধ রচনা ছাড়া তাঁর স্বামী রমণ ভাই নীলকণ্ঠের 'হাস্যমন্দির' রচনায় সাহায্য করেছেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীমতী সুমতি ত্রিবেদী (মৃত্যু ১৯১১) ও বিজয়লক্ষ্মী ত্রিবেদীর (মৃত্যু ১৯১৩)

অকালমৃত্যুতে গুজরাতী সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুকবি 'দীপক' বা দেশাইয়ের 'স্তবনমঞ্জরী', 'কুন্দকাব্য' কবিতার বই এবং মারাঠীর অনুবাদ 'সঞ্জীবনী' নাটক খ্যাতি লাভ করেছে। 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদিকা হংস মেটার তিনটি নাটক 'ত্রণ নাটক,' গল্পচ্ছলে দেশবিদেশের ইতিহাস 'অরুণ নুঁ—অদ্ভুত স্বপ্ন' এবং গলিভারের ভ্রমণের অনুবাদ জনপ্রিয় হয়েছে। "হিন্দুকোড্" বিষয়ক একখানি পুস্তিকা তিনি ছাপিয়েছেন!

শ্রীমতী প্রিয়মতী শুক্লা 'জ্যোৎস্না' ছদ্মনামে 'চেতনা' নামক মাসিক এবং 'সুদর্শন' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। তিনি বহু প্রবন্ধ এবং কবিতা রচনা করেছেন, তার মধ্যে তাঁর জাতীয় সঙ্গীতগুলি বিশেষভাবে প্রশংসা লাভ করেছে। মারাঠী থেকে গুজরাতীতে দু'খানি উপন্যাস তিনি সুন্দরভাবে অনুবাদ করেছেন। শ্রীমতী কানুবেন দাভে এবং শ্রীমতী চৈতন্যবালা মজুমদার অল্পবয়সেই গুজরাতী সাহিত্যে নাম করেছিলেন, তাঁদের অকাল-মৃত্যুতে গুজরাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শ্রীমতী লীলাবতী মুন্সী 'গুজরাত' পত্রিকার অন্যতমা সম্পাদিকা ছিলেন, তাঁর বহু প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতি-কথা, গল্প, উপন্যাস গুজরাতী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। 'রেখাচিত্র', 'বিজা লেখো', 'কুমার দেবী', 'জীবন মাঁখি', 'জাদেলি', 'বধূ', 'রেখাচিত্র—আনেঁ', 'বিজুবধূঁ', প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে এবং দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করায় বর্তমানে তাঁর সাহিত্যসাধনা ব্যাহত হয়েছে। শাণিত ভাষা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সাবলীল রচনাভঙ্গীতে লীলাবতী দেবীর প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ আজ গুজরাতী পুরুষ লেখকদের মধ্যেও দুর্লভ।

পাঞ্জাবী ভাষার প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। সংস্কৃত ভাষার লেখিকাদের মধ্যে বৈদিক ব্রহ্ম-বাদিনীদের থেকে আরম্ভ ক'রে মধ্যযুগের বহু নারী কবির কথা ইতিপূর্বে বলাই হয়েছে। মুসলমান প্রাধান্যের সময় পাঞ্জাবে উর্দু এবং পারসীর বহু প্রচলন ছিল এবং স্ত্রীশিক্ষার বহু বাধা ছিল।

বর্তমান যুগে পাঞ্জাবী ভাষায় লেখিকার সংখ্যা অল্প হ'লেও সেই অল্পসংখ্যক লেখিকার মধ্যে কয়েকজন রীতিমত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সুকবি অমৃত প্রীতমের লেখা থেকে আধুনিক পাঞ্জাবী কবিতার তিনটি নমুনা দিলাম :

(১) (পৃথিবী ব'লছেন) :

"হে রবি, আমারে তুমি বাসিয়াছ ভালো,
মোর দেহে প্রতি রোমকূপে জ্বলে তোমার প্রেমের আলো!
তবু মোরা দূরে আছি,
কোনো দিন তবু দাঁড়াতে পা'ব না এ উহার কাছাকাছি!"

(২) "কালের প্রাচীর দর্পণ দিয়ে গড়া ;
দেখা যায় তা'তে যুগযুগান্ত, দূর অতীতের সুদূর প্রান্ত,
আমাদের ছবি দেখা যায় সবি,—যায় না কিছুই ধরা!

(৩) "সহসা পেশীতে তার উন্মাদ স্পন্দন উঠে জেগে,
বন্দীর শৃঙ্খলে পড়ে টান।
শতাব্দীর মোহবন্ধ ছিঁড়ে যায় বিদ্যুতের বেগে,
অন্যায়ের হয় অবসান।"*

---

* কবিতার অনুবাদ সুকবি প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। এই পুস্তকের বহু কবিতার অনুবাদই বহু ভাষাভিজ্ঞ উক্ত কবিই সযত্নে করিয়া দিয়াছেন।

এই ভাষার শক্তি এবং সৌন্দর্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা যা'ও বা জানি, দক্ষিণ ভারতের সম্বন্ধে তা'ও জানি না। দাক্ষিণাত্যে প্রধানতঃ চারটি ভাষা চলে, কর্ণাটকে কানাড়ী, অন্ধ্রদেশে তেলুগু, তার দক্ষিণে তামিল দেশে তামিল এবং তারও দক্ষিণে, ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে কেরল দেশে মালয়ালম্। এর মধ্যে কর্ণাট এবং অন্ধ্রের সঙ্গে প্রাচীন যুগে বিশেষ ক'রে পাল এবং সেন রাজাদের আমলে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। পাল রাজাদের অনেক রাণী কর্ণাট এবং অন্ধ্র থেকে এসেছেন, সেন রাজারা তো জাতেই কর্ণাটী ছিলেন। কর্ণাটকের সুদূর অতীতের সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু জানি না, তবে সংস্কৃতে বিখ্যাত নারী কবিদের মধ্যে বহু কর্ণাটী নারীর নাম পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলিতে সংস্কৃত প্রভাব পরবর্তী যুগে পড়লেও সেগুলি মূলতঃ দ্রাবিড় ভাষা, সুতরাং উত্তর ভারতের সংস্কৃতমূলক ভাষাগুলির চেয়ে তাদের ইতিহাস অনেক পুরাতন,— একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সংস্কৃত কবিদের সমসাময়িক যে সব কর্ণাটী নারী কবি কানাড়ী ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের নাম আমরা জানি না। মহিসুরে দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হয়শালারাজ বিষ্ণুবর্ধনের মহিষী শান্তলা দেবী (নটন সরস্বতী) বেলুড়ে কেশব স্বামীর মন্দিরে দেবতার প্রীত্যর্থে প্রতিদিন গান গেয়ে নৃত্য করতেন। তাঁর নৃত্যের খ্যাতি আজও তাঁর স্বদেশে লুপ্ত হয়নি, কিন্তু তাঁর স্বরচিত গানগুলি আজ আর পাবার উপায় নেই। শান্তলার স্বামী মহারাজ বিষ্ণু

বর্ধনের সভায় নারী কবি 'কান্তি' খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কানাড়ী রামায়ণের রচয়িতা নাগচন্দ্র বা 'অভিনব পম্পা' ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, সভামধ্যে তাঁর বহু কবিতার পাদপূরণ ক'রে 'কান্তি' রাজসম্মান লাভ করেন। নাগচন্দ্রকে দেশবিদেশের লোক মহাকবি ব'লে স্বীকার করলেও কান্তি করতেন না, তিনি তাঁর সঙ্গে সমপদস্থের মতোই ব্যবহার করতেন। অবশেষে তাঁর কাছে প্রশংসা আদায়ের অন্য কোনো উপায় না পেয়ে নাগচন্দ্র একদিন সহসা সভামধ্যে মৃত্যুর ভান ক'রে মাটিতে পড়ে গেলেন। চারিদিকে হাহাকার উঠল, কান্তি দয়াপরবশ হ'য়ে সেদিন নাগচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে শ্লোক রচনা করলেন। নাগচন্দ্র বাজি জিতলেন, কান্তিকে অবাক্ করে দিয়ে সহসা তিনি বেঁচে উঠলেন। এমন অপ্রস্তুত কান্তি জীবনে কখনও হননি।

প্রসিদ্ধ কানাড়ী বৈয়াকরণ নাগবর্মা দশম শতাব্দীতে তাঁর 'ছন্দোম্বুধি' গ্রন্থ স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনচ্ছলে রচনা করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীর কানাড়ী জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্যপত্নী (কোনমতে কন্যা) লীলাবতীর মতো বৈয়াকরণ পত্নী উত্তর ভারতে খ্যাতি লাভ না ক'রলেও তাঁর ছন্দ এবং ব্যাকরণ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য অল্প ছিল না, ঐ বইখানিতে তার প্রমাণ আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা চিক্কদেব রায়ের রাণীর তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী 'হোন্নি' বা 'হোন্নাম্মা' সুপণ্ডিতা ছিলেন; 'নারীর কর্তব্য' সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি গ্রন্থ আজও পাওয়া যায়।

কর্ণাটকের বর্তমান যুগের লেখিকার মধ্যে কয়েকজন ইতি-মধ্যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক কানাড়ী সাহিত্য যাঁদের রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত

কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। কুর্গের শ্রীমতী গৌরাম্মা, অঞ্জনগড়ের শ্রীমতী তিরুমালাম্মা, বাঙ্গালোরের শ্রীমতী থিরুমালাই রাজম্মা বা 'ভারতী', কলকাতা প্রবাসিনী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী পদকোণে, বাঙ্গালোরের 'সরস্বতী' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী কল্যাণাম্মা এবং ধারোয়ারের 'জয় কর্ণাটকের' সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী শ্যামলা দেবী বেলগাউমকার। এ ছাড়া 'বাণী' এবং 'জৈন মহিলা' ছদ্মনামে দু'জন শক্তিশালিনী লেখিকা কানাড়ী সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেছেন। কর্ণাটী মেয়েদের মধ্যে প্রাচীনপন্থী লেখিকার সংখ্যা এখনও বেশী, তবে প্রগতিপন্থীরাও দেখা দিতে আরম্ভ করেছেন। 'বাল সরস্বতীর' ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস থেকে আরম্ভ করে ছোটো বড়ো গল্পে, প্রবন্ধে, কবিতায় এবং নাটকে কানাড়ী মেয়েরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

কানাড়ীর পর তেলুগু সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার। খৃষ্টের বহু সহস্র বৎসর পূর্বে অন্ধ্রদেশে বিশেষ শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল ব'লে সে দেশের প্রাচীন পন্থীরা বিশ্বাস করেন, যদিও আধুনিক পণ্ডিতেরা তা বিশ্বাস করেন না। এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত এখনও কিছু হয়নি। অতীতের উল্লেখযোগ্য অন্ধ্রদেশীয় লেখিকাদের মধ্যে সংস্কৃত কবিদের বাদ দিলে প্রথমেই 'কারিক্কল অম্মৈয়ারে'র নাম করতে হয়। জনশ্রুতি, তিনি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, আধুনিক পণ্ডিতেরা তাঁকে খৃষ্টের তৃতীয় চতুর্থ শতকে ফেলেন। যাই হোক, তিনি যে অন্ধ্র দেশের প্রাচীনতম যুগের একজন শক্তিশালিনী লেখিকা, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই। অম্মৈয়ার অনেক গান রচনা করেছেন, তেলুগু গীতি-সংগ্রহগুলির মধ্যে

তাঁর বহু রচনা এখনও পাওয়া যায়। এক জায়গায় তিনি বলেছেন :

"প্রভু আমাদের স্বর্গে আছেন কেহ বা বলে ;
তিনি মহাদেব, দেবরাজ তিনি দেবতা দলে।
বিশ্বভুবন করিছে শাসন যে ভগবান,
আমি জানি তিনি আমারি বক্ষে বিরাজমান॥"*

এমনি সরল দ্বিধাহীন ভাষায় তিনি অনেক বড়ো বড়ো ধর্মের কথা, জ্ঞানের কথা বলে গেছেন, যা চিরপুরাতন হ'য়েও চিরনূতন, দুই সহস্র বৎসরেও যার মূল্য কমে নি। অতি প্রাচীন যুগে দক্ষিণ ভারতে সুপণ্ডিত এবং সু-কবিদের একটি সমিতি ছিল, তার নাম ছিল 'সঙ্গম' বা সঙ্ঘ। এই বিদ্বন্মণ্ডলীর সভায় সমসাময়িক প্রত্যেক লেখক-লেখিকাকে তাঁদের লেখা বিচারের জন্য দিতে হ'ত। লেখা যোগ্য বিবেচিত হ'লে গ্রন্থে সঙ্গম্-স্বীকৃতির ছাপ দেওয়া হ'ত, খুব বেশী ভালো লেখা হ'লে কবিকে মণ্ডলীতে স্থান দেওয়া হ'ত। কয়েক হাজার বছর ধরে এই 'সঙ্গম'-গুলি দক্ষিণী সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তার বাছাই করা রত্ন-গুলিকে কাব্যসংগ্রহের মধ্যে স্থান দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। বলা বাহুল্য অভ্বৈয়ারের লেখাগুলি সঙ্গমের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল এবং সঙ্গমের কৃপাতেই সেগুলি দীর্ঘজীবন লাভ করেছে।

এর পর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একজন সুকবির নাম পাওয়া যায়, তিনি বালবিধবা 'কুপ্পামাম্বা'। বালবিধবার জীবনে স্বভাবতঃই দুঃখ আছে, তার ওপর সমাজের অবিচার তাঁর মর্মবেদনাকে শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর গানগুলিতে

* ভাবানুবাদক শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজের ব্যর্থ জীবনের অব্যক্ত ক্রন্দনকে তিনি সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন, আজও তার করুণ সুর শ্রোতার মর্ম স্পর্শ করে। তবে কুপ্পামাম্বার রচনায় একঘেয়ে করুণ রসের প্রবাহ এবং নারীসুলভ বিলাপ আজকালকার সকল শ্রোতার ভালো না'ও লাগতে পারে। যাই হোক, কুপ্পামাম্বা তেলুগু সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে অতীতের সম্মান পেয়ে গেছেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

মুসলমান আক্রমণের পর দক্ষিণ-ভারতে অবনতির যুগ আরম্ভ হয়। তেলুগু সাহিত্যে এর পর দুই শতাব্দীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারী কবির সাক্ষাৎ আমরা পাই না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে আরও কয়েকজন বিদুষীর রচনা পাওয়া যায়, তাঁরা সকলেই সংস্কৃতে কবিতা লিখেছেন। এ যুগের মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেই সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখতেন, তাঁদের নিয়ন্ত্রিত ক'রবার জন্য কোনো সঙ্ঘও ছিল না, দেশভাষার সমাদরও কমে গেছল। রাজসভায় তেলুগু ভাষা সমাদর লাভ করে আবার বিজয়নগরের স্বাধীন হিন্দুরাজত্বে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে একদিকে বাংলাদেশ থেকে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিরসের বন্যা দক্ষিণ ভারতকে চঞ্চল করে তোলে, অপরদিকে বিজয়নগরের রাজাধিরাজ কৃষ্ণদেব রায়ের সহায়তা এবং পৃষ্ঠ-পোষকতায় দক্ষিণী কবিরা নূতন প্রেরণা লাভ করেন। এই যুগের দু'জন ক্ষণজন্মা নারী তেলুগু সাহিত্যকে তাঁদের রচনাসম্ভার দ্বারা সমৃদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন গ্রামবাসিনী দরিদ্র কুম্ভকার-কন্যা, আর একজন রাজাধিরাজ-দুহিতা। একজন জীবিতকালে যেমন সুপ্রসিদ্ধা ছিলেন, আজও ঠিক তেমনি

সুপ্রসিদ্ধাই আছেন, আর একজন জীবিতকালে বহু খ্যাতি লাভ করলেও আজ সে খ্যাতি নামমাত্রে পর্যবসিত। এঁদের মধ্যে একজনের নাম 'মোল্লা' আর একজনের নাম 'মোহনাঙ্গী'। নেলোর জেলায় গোপবরম্ গ্রামে এক দরিদ্র কুম্ভকার পরিবারে 'মোল্লার' জন্ম। ছোটোবেলা থেকে তিনি ছিলেন কল্পনা-বিলাসিনী। সঙ্গিনীদের নিয়ে পৌরাণিক নাটক অভিনয় করায় ছিল তাঁর সব চেয়ে আনন্দ। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে তিনি সংস্কৃত রামায়ণ পড়েন এবং রামায়ণের রসধারা তাঁর দরিদ্র অশিক্ষিত দেশবাসীকে পরিবেশন করবার জন্য তাঁর চিত্ত ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। দরিদ্রের সংসারে অবসরের একান্ত অভাব, প্রতিদিন স্নানের পর চুল শুকোতে গিয়ে তিনি যেটুকু সময় রোদে বসতে পেতেন, সেইটুকু সময় লেখনী-পরিচালনা ক'রে কবিতায় রামায়ণের মত মহাকাব্যের তেলুগু অনুবাদ শেষ করলেন। মোল্লার রামায়ণ সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, তাঁর নিজের ভাষায় নিজের ভঙ্গীতে লেখা এক অপূর্ব সৃষ্টি। বিদেশী সমালোচকেরাও তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার করেছেন। মোল্লার ভাষা সরল এবং মধুর, উপমা, ব্যঞ্জনা, বর্ণনাশক্তি সমস্তই তাঁর অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচায়ক। তেলুগু ভাষায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী লেখিকা আজও কেউ জন্মান নি, অন্ধ্রদেশের ঘরে ঘরে মোল্লার রামায়ণ আজও পঠিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় বিখ্যাত লেখিকা 'মোহনাঙ্গী' মহারাজ কৃষ্ণদেব রায়ের কন্যা। স্নেহময় বিদ্যোৎসাহী পিতার চেষ্টায় তাঁর শিক্ষা সে যুগের পক্ষে যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। বিদুষী রাজকন্যা ছিলেন রাজসভার 'অষ্টদিগ্‌গজ'দের

প্রিয়পাত্রী, দরিদ্র কবিদের আশ্রয়দাত্রী। তাঁর 'মরীচী-পরিণয়' কাব্য সে যুগের শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে মোহনাঙ্গীর 'মরীচী-পরিণয়' আজ লুপ্ত হয়ে গেছে, অন্ততঃ এ পর্যন্ত তার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নি।

এঁদের পরবর্তী প্রতিভাশালিনী তেলুগু লেখিকা 'মুড্ডুপলনি' অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঞ্জোরের রাজা প্রতাপ সিংহের সভায় নর্তকী ছিলেন। তাঁর 'রাধিকাসান্ত্বনম্' এবং 'এলাদেবীয়া' কাব্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার আড়ম্বর কোথাও কোথাও তাঁর ভাবকে ছাড়িয়া গেছে, কোথাও কোথাও কুরুচির পরিচয়ও আছে, তবু 'মুড্ডুপলনি'কে অন্ধ্র দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতমা ব'লে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠা তেলুগু লেখিকা 'ভেঙ্কমাম্বা' কুড্ডাপা জেলায় তারিগোণ্ডা গ্রামে মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মে-ছিলেন। অল্প বয়সে স্বামী হারিয়ে তিনি ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করেন, গ্রামের মন্দিরে দিনরাত আপন মনে বসে ধ্যান ধারণা করাই ছিল তাঁর কাজ। ধর্মচর্চার মধ্যে তিনি নিজের ব্যক্তিগত শোক ভোলবার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, তাঁর লেখায় তাই হতাশার বা বিষাদের সুর নেই, জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং আত্মনিবেদনের জ্যোতিতে তাঁর রচনা সমুজ্জ্বল। গ্রামের কুৎসা-রটনাকারীরা শেষ পর্যন্ত তাঁর ধর্মচর্চার মধ্যে কু-অভিসন্ধি আরোপ করায় তিনি বিরক্ত হ'য়ে স্বজন-সমাজ ত্যাগ করে পুরাপুরি সন্ন্যাসিনী হলেন এবং ভেঙ্কটাচলের তীর্থে আশ্রয় নিলেন। তাঁর 'ভেঙ্কটাচল-মাহাত্ম্য' 'মুক্তিকান্তিবিলাসম্' এবং 'ভাগবত' ভক্তের অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়ে লেখা বহুপ্রশংসিত কাব্য।

বিংশ শতাব্দীর তেলুগু লেখিকাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন তামিল লেখিকাদের মধ্যে অভৈয়ারের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। অভৈয়ার নামধারিণী কয়েকজন কবির পরিচয় আমরা পাই, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথমা জীবনের অধিকাংশ সময় 'আদি গমান নেডুমান আঞ্জি' নামক রাজার সভায় কাটিয়েছেন। তিনি জাতিতে 'পানার' এবং বিখ্যাত গায়িকা ছিলেন, প্রায় দু' হাজার বছর আগে এই আকৌমার ব্রহ্মচারিণী নারী সমস্ত দক্ষিণ ভারতে খ্যাতি লাভ করেন। মহারাজ 'আঞ্জি' তাঁকে রাজদূত ক'রে কাঞ্চিরাজ 'টোণ্ডাইমানের কাছে পাঠান, কাঞ্চিরাজের সাহায্য প্রার্থনা ক'রে। চের, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজসভায় শত্রুমিত্রের কাছে সমান সম্মান লাভ ক'রে পরিণত বয়সে 'আঞ্জি'র মৃত্যুর পর অভৈয়ার পরিব্রাজিকা হন। দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরে এখনও পাহাড়-কাটা মন্দিরে দেবীরূপে তিনি পূজা পাচ্ছেন। দশম শতাব্দীতে আর একজন অভৈয়ার খ্যাতি লাভ করেছিলেন। 'কুরি এয়িনি' নাম্নী আর একজন লেখিকার নাম এবং লেখা পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর আবির্ভাব কাল ঠিক করে বলা যায় না। পাণ্ড্যরাজ বল্লভ দেবের সময়ে মহাসাধক পেরিয়া আলোয়ার ছিলেন শ্রীবিল্লীপুত্তুরের পূজারী। এই বিষ্ণুমন্দিরের পুরোহিতের ঘরে দক্ষিণের 'মীরা', তামিলদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী কবি আণ্ডাল ৭১৬ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন। তাঁর প্রধান রচনা 'নাচ্চিয়ার তিরুমোলি'। এতে কবি নিজেকে 'তিরুমল' বা নারায়ণের পত্নীরূপে কল্পনা করেছেন এবং তাঁর কাছে মান-অভিমান, বিরহবেদনা প্রভৃতি জানিয়েছেন। দক্ষিণ বিষ্ণুমন্দিরের

আজও বৈষ্ণব মহাগুরুদের মধ্যে অন্যতম 'আলোয়ার' (আলবার) রূপে তিনি পূজা পাচ্ছেন। অতি অল্প বয়সে প্রথম যৌবনে আণ্ডালের মৃত্যু হয়। লোকলজ্জায় তাঁর পিতা তাঁর বিবাহ দিতে বদ্ধপরিকর হলে আণ্ডাল দৃঢ়ভাবে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরই জয় হয়, কৃষ্ণার্পিত দেহ মন নিয়ে অন্য কোনো মানুষকে স্বামী বলে স্বীকার করা তিনি অসম্ভব বিবেচনা করায় স্বপ্নাদেশ অনুসারে তাঁকে শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণু-মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়, সেইখানে জনশ্রুতি অনুসারে তিনি বিষ্ণুর দেহে বিলীন হয়ে যান। আণ্ডালের রচনার একটি নমুনা দিলাম :

"কে কোথা শুনেছে কবে, যাজ্ঞিকের যজ্ঞহবি
ভোগ ক'রে ফেরু মরুচারী ?
যৌবনপুষ্পিত মোর এই অনিন্দিত তনু
রাখিয়াছি পূজা লাগি তাঁরি।
শঙ্খচক্রধারী যিনি, তিনি মোর প্রাণেশ্বর,
তাঁরে ছাড়ি পরিণয়-ডোরে
বন্দী হ'য়ে ;—মর্ত নরে আমারে ভজিতে হবে ?
তার আগে মৃত্যু দাও মোরে !"

বাঙালী মুসলিম নারীদের মধ্যে সাহিত্যিক ব'লে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের ভিতর "মতিচুর" রচয়িত্রী শ্রদ্ধেয়া রকেয়া হোসেনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই বাঙালী নারীর সঙ্গে বিহারী রাজকর্মচারী সৈয়দ সখাওয়াৎ হোসেনের পরিণয় হয়েছিল। স্বামীর দেহান্তের পর ইনি দীর্ঘজীবন হিন্দু সতী নারীর মতই নৈষ্ঠিক ও কৃচ্ছ্র বৈধব্যব্রত পালন করেছিলেন।

তিনি শুধু নিজে বিদ্যাচর্চ্চায় সন্তুষ্ট হ'তে পারেননি, অবরোধ-বাসিনী মুসলিম নারীগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য পরলোক-গত স্বামীর নামে "সখাওয়াৎ মেমোরিয়েল" বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে তার জন্য নিজের সম্পত্তি এবং জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। "পদ্মরাগ" নামক তাঁর আর একখানি পুস্তকও পাঠক-সমাজে আদৃত হয়েছিল। তা' ছাড়া তাঁর আরও কতকগুলি পুস্তক আছে।

এইখানে কয়েকজন আধুনিক মুসলিম লেখিকার নাম দিলাম। মুসলিম সমাজমধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবার জন্য এবং হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার তুর্দ্দিনে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনের আলো জ্বালাবার জন্য বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখে বেগম সোফিয়া খাতুন সমস্ত বাঙ্গালী জাতির শ্রদ্ধার পাত্রী হয়েছেন। বেগম শামসুন নাহার, সুফিয়া হুসেন, মাহ্‌মুদা সিদ্দিকা, নাজমা বেগম, জাহানারা বেগম চৌধুরী, এঁরা সকলেই সুলেখিকা। জাহানারা চৌধুরী কয়েক বৎসর ধ'রে একখানি সাহিত্য-বার্ষিকী সম্পাদন দ্বারা বহু হিন্দু মুসলিম লেখক-লেখিকাকে এক সাহিত্যিক সম্মিলন তীর্থক্ষেত্রে সমবেত ক'রে, সকলেরই ধন্যবাদের পাত্রী হয়েছিলেন। হিন্দু মুসলিম রাজনৈতিক প্যাক্টে'র মত স্বার্থময় বিষয়বস্তু নয়, এই নিঃস্বার্থ অসাম্প্রদায়িক পূজা-মণ্ডপই যথার্থ সর্বজাতির মিলনমন্দির, এই সত্য তাঁর তরুণচিত্তে প্রতিভাত হয়ে তাঁকে এই মহৎকার্যে প্ররোচিত করেছিল। সম্প্রতি হিন্দু-মুসলিম মিলন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত 'গুলিস্তাঁ' পত্রিকায় কয়েকজন লেখিকার নাম দেখা গেল, তাঁদের সুনাম বর্দ্ধিত হোক। লুৎফা সাহারুণ বেগম, জেবু আহমদ সাদদা বেগম প্রভৃতি।

হিন্দু-মুসলিম শিক্ষিতা মেয়েদের আমরা এই পথেই চলতে অনুরোধ করি, ক্ষুদ্র “স্বকে” বৃহত্তর স্বার্থে নিমজ্জিত ক'রে দেওয়াই যথার্থ স্বার্থ ত্যাগ, মায়েরা বোনেরা যদি এই শিক্ষা তাঁদের রক্তের ভিতর দিয়ে, শিক্ষার ভিতর দিয়ে সন্ততি-শরীরে সঞ্চারিত করতে পারেন, তবে কোন শক্তি তাকে নিজ স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে সমর্থ হবে না। ইসলামের বাণী, গীতার বাণীর সঙ্গে মিলে গিয়ে আসমুদ্র হিমাচলে জীমূত-মন্দ্রে ধ্বনিত হবে। পরাধীন জাতির সমস্ত গ্লানি ও সমুদয় জড়তাকে পরিহার করে সমগ্র ভারতবর্ষ এক সঙ্গে সমকণ্ঠে উচ্চারণ করে, আত্মোপলব্ধি করবে, এমন কি সমগ্র জগৎবাসীকেই ডেকে এনে এই মহা-মিলনের মহা-বাণী শোনাতে পারবে :

“শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা”

এ সম্বোধন হিন্দুর জন্য নয়, উপনিষদকার ঋষি বিশ্বের সমুদয় “অ-মৃতের পুত্রদেরই” এই অপূর্ব তথ্য শ্রবণ করবার জন্য আহ্বান করেছেন, জাতি নীতি কুল গোত্র বাছেননি।

“ভগবান এক ও অদ্বিতীয়ই শুধু ন'ন, মানুষও তার পিত্রৈশ্বর্যের পরিপূর্ণ অধিকারী, এই কথাই হিন্দু মুসলমানের আত্মিক প্রেরণার মহত্তর বাণী, মন্দর-মথিত বাসুকির ক্লান্তশ্বাস-সমুত্থিত বিষবাষ্পাচ্ছন্ন পৃথিবীতে দুই বিভিন্ন ভঙ্গীতে উচ্চারিত এই একই বাণী শোনাবার সময় তাদের সম্মুখে এগিয়ে এসেছে, এই শুভ লগ্নকে সে যেন মূঢ় সঙ্কীর্ণতার দ্বারা ভ্রষ্ট হ'তে না দেয়। এই শুভ কার্যের সম্পূর্ণ ভার বিশ্ব-সন্তানদের জননীদেরই প্রধানতঃ, যেহেতু ঐ অমৃতের পুত্ররা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁদেরই ত পুত্র। তাঁরাই তাঁদের অমৃত-পরিবেশনের পূর্ণ স্বত্বাধিকারিণী।

আধুনিক হিন্দী মহিলা লেখিকাদের মধ্যে সকলের নাম আমরা জানি না। যাঁরা খুব বিখ্যাত তাঁদের ভিতর প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষা শ্রীমতী মহাদেবী বর্মার নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর "নীহার", "যামা", "সান্ধ্যগীত" প্রভৃতি কবিতার বই হিন্দী সাহিত্যে বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীপ্রেমচন্দের পত্নী শ্রীমতী শিবরাণী দেবী কবিতা লিখে, দিল্লীর শ্রীমতী সত্যবতী মল্লিক, মিরাটের শ্রীমতী হোমবতী দেবী এবং কাশীর শ্রীমতী উষা মিত্র গল্প লিখে হিন্দী সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেছেন। এঁদের পূর্ববর্ত্তী যুগে শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী নামে আর একজন বঙ্গনারী হিন্দীতে লিখে যশস্বিনী হয়েছিলেন। কাশীর শ্রীশ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত আর্যমহিলা হিতকারিণী মহাপরিষদের এবং মহিলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সংস্থাপিকা এবং সর্বাধ্যক্ষা শ্রীমতী বিদ্যা দেবী কবিতা এবং সমাজ, শিক্ষা ও ধর্মনীতি সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক উচ্চাঙ্গের পুস্তকের রচয়িত্রী। এই উচ্চশিক্ষিতা দৃঢ় নিষ্ঠাবতী বালবিধবা বহু পুস্তিকা, ধার্মিক রচনা এবং শিক্ষা প্রচারেই তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গিত করেছেন।

যুক্তপ্রদেশের শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে দেশসেবিকা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নাম সর্বাগ্রগণ্য। এদেশে তিনিই সর্বপ্রথম মহিলা মন্ত্রী। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি বহুবার নির্যাতিতা এবং কারারুদ্ধা হয়েছেন। আজও দুর্ভাগ্য দেশের পক্ষ হয়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে তিনি যে সকল জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছেন, তার ফলে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সেখানকার লোকেদের আর কোন কথা জানতে বাকী

নেই।* শাসকবৃন্দ শত বিরুদ্ধ প্রোপাগাণ্ডা করেও তার বেগকে রুদ্ধ করতে পারছেন না।† নেহরু পরিবারের মধ্যে আরও অনেকে,—যেমন শ্রীমতী কমলা নেহরু, কৃষ্ণা নেহরু, মিসেস উমা নেহরু, মিসেস ব্রিজলাল নেহরু, শ্রীমতী শ্যামকুমারী নেহরু বিদ্যাবত্তায়, দেশসেবায় এবং সামাজিক প্রচেষ্টায় খ্যাতি লাভ করেছেন।

পূর্বেই বলেছি, বোম্বাই অঞ্চলে মিসেস হংসা মেহতা একজন খ্যাতিসম্পন্না লেখিকা। প্রস্তাবিত হিন্দু কোড সম্বন্ধে তাঁর পুস্তকখানি উল্লেখযোগ্য। কোন পুরুষ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবার পূর্বেই তিনি হিন্দু আইন সংস্কার সম্বন্ধে পুস্তিকাটীতে আলোচনা করেছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তিনি হিন্দী, উর্দ্দু এবং ইংরাজীতে কবিতা রচনা ক'রে এবং অজস্র বক্তৃতা দিয়ে "বুলবুল-ই-হিন্দ" আখ্যা লাভ করেছেন। তাঁর দেশসেবার কথা বিশেষভাবে এখানে বলতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়ও দক্ষিণ ভারতে সুপণ্ডিতা ও সুবক্ত্রী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। শ্রীমতী এণাক্ষী রামা রাও, দর্শন কাব্য এবং নৃত্যগীত সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখে খ্যাতি পেয়েছেন। বোম্বাই-এর সরলা দেবী সংস্কৃতজ্ঞা এবং সুপণ্ডিতা।

সিন্ধু প্রদেশে কিকি বেন "ইত্তিহাদ" লিখে এবং গুলি সাদারঙ্গানি বিভিন্ন গ্রন্থ লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন। মধ্য

---

* ১৯৪৫-৪৬।

† আজ স্বাধীন ভারতে তিনি প্রথম নির্বাচিতা বৈদেশিক রাজদূত।

প্রদেশের হিন্দী কবিদের মধ্যে শ্রীমতী সুভদ্রাকুমারী চৌহানের নাম উল্লেখযোগ্য। ভূপালের ভূতপূর্ব বেগম সাহেবারও শিক্ষিতা নারীপ্রসঙ্গে নাম করতে হয়। শ্রীমতী অনসূয়া বাই কালে ব্যবস্থাপক সভার প্রথম মহিলা সদস্য। তাঁহার পরে অবশ্য বিভিন্ন প্রদেশে আরও অনেক মহিলা উক্ত পদ লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ পরিষদের ডেপুটি স্পিকার বা প্রেসিডেন্টের পদও সমলঙ্কৃত করেছেন, যেমন মান্দ্রাজ প্রদেশে মিসেস রুক্মিণী লক্ষ্মীপতি, মধ্যপ্রদেশে মিসেস কালে, আসামে মিসেস জুবেদা আতাউর রহমান। আসাম প্রদেশে বর্তমানে একজন মহিলা মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিতা আছেন, তাঁহার নাম মিস সেভিস ডান লাইংডো। ইনি জাতিতে খাসিয়া, খৃষ্ট ধর্মাবলম্বিনী।*

সুপণ্ডিতা মুসলিম নারী বেগম সাহ নওয়াজ পূর্বে দেশভক্ত ও কংগ্রেসপন্থী ছিলেন; এক্ষণে সম্প্রদায়গত স্বার্থের খাতিরে মুসলিম লীগের পক্ষপাতী হয়েছেন। বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৩০-৩২ খৃঃ) তিনি, মিসেস রাধাবাই সুব্বারাওন এবং একজন ব্রহ্মদেশীয়া মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় নারীর ভোটাধিকার লাভের জন্য ইহঁাদের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। এর পূর্ববর্তী যুগে অর্থাৎ মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড রিফর্মের সময় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হ'তে পার্সী মহিলা মিসেস হীরাবাই টাটা এবং তাঁহার কন্যা মিস মিঠম্ টাটা ভারত নারীর ভোটাধিকার লাভের জন্য আন্দোলন করতে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। এখানে বলা

* স্বাধীন ভারতে রাজকুমারী অমৃত কাউর, মিসেস স্বামীনাথম্ আরও অনেকে বহুতর উচ্চপদে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন।

প্রয়োজন যে, মিস টাটাই প্রথম ভারতীয়া মহিলা ব্যারিষ্টার। বর্ত্তমানে তিনি বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যবসায় রত আছেন। তাঁর পূর্ব্বে মিস কর্ণেলিয়া সোরাবজী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রশংসার সহিত আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও এবং ব্যারিষ্টার হ'লেও তাৎকালীন প্রথামত প্রাক্‌টিস করতে অধিকারিণী ছিলেন না। এদেশের কোর্ট অব ওয়ার্ডের পর্দানসীন মহিলাবৃন্দের আইন-বিষয়ক পরামর্শদাত্রী রূপে দীর্ঘকাল তিনি কৃতিত্বের সহিত কাজ করে গেছেন। ইংরাজীতে কবিতা রচনা করেও তিনি যশ লাভ করেছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দেও কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করবার অনুমতিলাভ মিস রেজিনা গুহর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু বিগত মহাসমরের অবসানের পর বাধা অপসারিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন প্রদেশে অনেকগুলি মহিলা ব্যারিষ্টার বা উকিল হ'তে পেরেছেন।—মিস সীতা দেবদাস, মিসেস ধরমশীলা লাল (বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ব্যারিষ্টার পরলোগত কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল মহাশয়ের কন্যা), বেগম ফরুকি, মিস টিওস্তুন কিম, আভা মেহেতা, ভিখু বাটলিওয়ালা এঁরা ব্যারিষ্টার এবং শ্রীমতী সুধাংশুবালা হাজরা, শ্যামকুমারী নেহরু, বেগম সখিনা মুঈদজাদা, আনা চণ্ডী, মিস কর্থি অম্মল, বিমলা দেশমুখ এঁরা হলেন উকিল।

ভারতকে ভালবেসে ভারতবাসীকে আপনার করে নিয়ে যে কয়েক জন মনস্বিনী বিদেশিনী মহিলা ভারতের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মধ্যে মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি, ভগিনী নিবেদিতা, এনি বেসান্ত এবং মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যা মিস স্লেড বা মীরা বেনের নাম উল্লেখযোগ্য। শুধু স্বামী

বিবেকানন্দের শিষ্যা বা রামকৃষ্ণমিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা বলে নয়, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রমুখ আধুনিক বাংলার শ্রেষ্ঠ পুরুষদের জীবনে ভগিনী নিবেদিতার প্রভাব এবং প্রেরণা অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন ; 'তাঁর কাছে যে প্রেরণা পেয়েছি তা আর কারো কাছে পাইনি। তাঁর চরিত্র স্মরণ ক'রে তাঁর প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব ক'রে প্রচুর বল পেয়ে থাকি।'

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পর বিদেশী সাহিত্যের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের ইংলণ্ডের কথা মনে পড়ে। ইংলণ্ডের সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতোই নারীর আবির্ভাব খুব বেশী দিনের নয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্রীমতী বেন্ আফ্রা নাম্নী একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহিলা দ্বিতীয়চার্ল্‌সের গুপ্তচর ছিলেন। ওরুনোকো (১৬৭৮) নামক উপন্যাসখানিতে তিনি নিগ্রোদের কথা প্রথম লেখেন এবং তারা যে মানুষ সে কথা সভ্য শ্বেতাঙ্গ-সমাজকে স্মরণ করিয়ে দেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মিসেস অ্যান্-র‍্যাড্‌ক্লিফের "উডল্‌ফোর অলৌকিক রহস্য" (১৭৯৪) একখানি বিখ্যাত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। এই ধরণের দু'চারখানি বই এবং খুব প্রাচীন কালের পল্লীগাথা ছাড়া ইংরাজী সাহিত্যে ওযুগে নারীর কোনো লেখা আমরা পাই না ; এর কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অন্যান্য দেশের মতো ইংলণ্ডের মেয়েদেরও বেশী লেখাপড়া শেখার প্রথা ছিল না, বই লেখা তো দূরের কথা। ইংলণ্ডের প্রথম সুলেখিকা ফ্যাণি বার্ণির জন্ম

১৭৫২ সালে। বাল্যে অত্যন্ত নির্বোধ বলে কুখ্যাত ছিলেন, আট বছর বয়সে বর্ণমালা শিখ্‌তে না পারায় তাঁকে আত্মীয়-বন্ধু অনেকেরই গঞ্জনা সহ্য কর'তে হয়েছে। তারপর তিনি যখন পড়তে শিখ্‌লেন, তখন বই পড়া তাঁর নেশা হ'য়ে দাঁড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নিজের রচনাও আরম্ভ হ'ল। যখন তাঁর ষোলো বছর বয়স তখন তিনি এক রাশ গল্প-উপন্যাস লিখেছেন এবং আরও লেখার চেষ্টায় আছেন দেখে তাঁর সৎমা বিরক্ত হয়ে তাঁকে বোঝালেন, উপন্যাস লেখা ভদ্রমহিলার পক্ষে অমর্যাদাকর। ফ্যাণি সেদিন মনের দুঃখে সমস্ত লেখাগুলি আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন এবং 'ভদ্রমহিলা' হ'বার জন্য কিছুদিন উঠে পড়ে লাগ্‌লেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা বজায় রইল না, আবার তাঁকে লিখ্‌তে হ'ল! এবার অবশ্য খুব গোপনে, বাবার এবং সৎমার অজ্ঞাতসারে। তাঁর প্রথম গল্প "ভেলিনা" সংগোপনে একজন প্রকাশককে নামমাত্র মূল্যে বিক্রী করা হয়, কিন্তু তাঁর প্রতিভা গোপন রইল না। ডাক্তার জনসন বইখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, রাণী শার্লোট তাঁকে রাজবাড়ীতে চাকরী দিলেন, তাঁর বাড়ীতে সে যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সভা বসল। "সিসিলিয়া" "ক্যামিলা" "ভ্রাম্যমাণ" প্রভৃতি বইতে সে যুগের ধনী ও দরিদ্র সমাজের বাস্তবচিত্রগুলি সহজ ভাষায় অতি সুন্দর ফুটেছে। পরবর্তী জীবনে দেশত্যাগী ফরাসী সেনাপতি দার্‌ব্লে'কে বিবাহ করে ফ্যাণি মাদাম দার্‌ব্লে নামে পরিচিতা হন। পরবর্তী সুবিখ্যাতা লেখিকা মারিয়া এজওয়ার্থ ছিলেন ফ্যাণির পিতৃস্বসা। ছোটো বেলায় তাঁর বাবা তাঁকে বাধা না দিয়ে সাহায্য করতেন, দু'জনের জীবনে এই যা' তফাৎ।

মারিয়ার প্রথম বই "কার্যোপযোগী শিক্ষা" তাঁর বাবার সঙ্গে একত্রে লেখা। তার পর তাঁর অনেক প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস বেরিয়েছে, তার মধ্যে 'র‍্যাক্রেণ্ট প্রাসাদ, 'অনুপস্থিত' এবং 'অরমণ্ড' বিখ্যাত। তাঁর লেখা আইরিশ জীবনের ছবিগুলি তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির এবং সহৃদয়তার পরিচায়ক। বিরাশী বছর বয়সে তিনি স্প্যানিস্ ভাষা শিখ্‌তে আরম্ভ করেন, তাঁর জ্ঞান-পিপাসা এমনি তীব্র। সেই বছরই মৃত্যু এসে তাঁর সাধে বাদ সাধ্‌লো। শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'ল না। এর পরবর্তী লেখিকা জেন অষ্টেনের নাম পৃথিবী-বিখ্যাত। এঁর পিতা ছিলেন রেক্‌টর, তাঁর ছাত্রদের এবং ভাইয়েদের সঙ্গে জেনও বাল্যে সুশিক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁর সময়ে তাঁর মতো বহু ভাষাবিৎ নারী ইংলণ্ডে বেশী ছিল না, লেখার শক্তিও ছিল তাঁর অসামান্য। ঘরে অনবরত অতিথিসমাগম, তাঁদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে জেন অবলীলাক্রমে লিখে যেতেন। তাঁর সমস্ত লেখার মধ্যে অনাবিল হাস্যরসের যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা বয়ে চলেছে তার তুলনা বিরল। তাঁর একুশ বছর বয়সের লেখা "চিন্তা ও ভাবালুতা" তাঁর প্রথম বিখ্যাত রচনা। তাঁর সব চেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস "গর্ব ও কুসংস্কার" এবং আর দুটি বই—"এমা" এবং "ম্যান্সফিল্ড" তাঁর জীবিত কালেই ছাপা হয়, তাঁর শেষ দুখানি বই 'নর্দ্যাঙ্গারের মঠ' এবং "প্ররোচনা" তিনি মুদ্রিত দেখে যেতে পারেন নি। বেঁচে থাক্‌তে তিনি কোনো বইয়ে তাঁর নাম দেন নি, কারণ খ্যাতিতে তাঁর লোভ ছিল না। শতবর্ষ পূর্বের ইংলণ্ডের গ্রাম্য চিত্র তাঁর বইয়ে যেমন জীবন্ত হ'য়ে দেখা দিয়েছে এমন আর কোথাও নয়।

সার ওয়াল্টার স্কট তিনবার তাঁর 'গর্ব ও কুসংস্কার' পড়েছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন বড় বড় ঘটনা নিয়ে বড় বড় কথা আমি কারো চেয়ে মন্দ লিখি না, কিন্তু অতি সাধারণ বিষয়-বস্তু এবং চরিত্রকে যে নিপুণ স্পর্শ শুধু সত্যনিষ্ঠা এবং সহৃদয়তার জোরে অপূর্ব আকর্ষণীয় বস্তু করে তোলে, সে শক্তি আমার নেই। খৃষ্টীয় আঠারোশ' সতেরো সালে মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে জেনের মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের মানসক্ষেত্রে এক যুগপরিবর্তন হয়ে গেছে। জেন পোর্টার নাম্নী এক লেখিকা শুধু নারী বলেই তাঁর 'ওয়ারস্ নগরের থ্যাড্ডিয়ম' লিখে আঠারোশ' তিন খৃষ্টাব্দে প্রচুর সম্মান লাভ করেন। উর্টেমবের্গের গ্রাণ্ড ডিউক তাঁকে সেণ্ট জোয়ালিসের 'পূজারিণী' উপাধি দেন। আজ তাঁর বইয়ের পূর্বসমাদর না থাকলেও স্কটের বহুপূর্বে তিনি 'স্কটল্যাণ্ডের নেতা' লিখে পথ দেখিয়েছেন, একথা মানতে হয়। তাঁর বোন 'আনামারিয়া' সে যুগে যথেষ্ট সম্মান পেয়েছিলেন। কিন্তু আজ তাঁর বই কেউ পড়ে না। এঁদের পরবর্তী লেখিকা মেরী মিটফোর্ড কবিতা, নাটক, গ্রাম্যচিত্র সব রকম লেখাই লিখেছেন। লেখাই ছিল তাঁর জীবিকা উপার্জনের উপায়। খৃষ্টীয় সতেরোশ' সাতাশি সালে জন্মে আঠারোশো পঁচাশি সালে তিনি মারা যান। তাঁর দশবছর বয়সে তাঁর নামে লটারির টিকিট কিনে তাঁর বাবা তিনলক্ষ টাকা পেয়েছিলেন। সে টাকা তিনি দু'দিনে উড়িয়ে দেন। এদিকে সুদীর্ঘ জীবন মেরীকে কাটাতে হয়েছিল তাঁর লেখনীর উপর নির্ভর করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বিখ্যাত লেখিকা মিসেস এলিজাবেথ গ্যাস্কেলের

'মেরী বার্টন' তাঁর আটত্রিশ বছর বয়সে প্রথম প্রকাশিত হয়। এঁর লেখার বিশেষত্ব এঁর বস্তু-তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। এঁর পূর্ব-বর্তিনীরা জীবনের বর্ণনায় কল্পনায় রং ফলিয়েছেন, ইনি যা' স্বচক্ষে দেখেছেন তার বাইরে এক পা যাননি। এঁর লেখা "শার্লোট ব্রঁতে"র জীবনীর মতো সুলিখিত জীবনী ইংরেজী সাহিত্যে বেশী নেই, কিন্তু এই লেখার জন্য এত লোক তাঁর কাছে এত রকম অভিযোগ করেছে, যে বিরক্ত হয়ে মরবার আগে অনুরোধ করে গেছেন, যেন তাঁর জীবনী লেখা না হয়। পরবর্তী লেখিকা এলেন প্রাইস বাল্যে লেখিকা হ'বার কোন লক্ষণই দেখাননি। অল্পবয়সে বিধবা হয়ে তিনি ফ্রান্স থেকে ফিরে আসেন এবং সময় কাটাবার জন্য লিখ্‌তে আরম্ভ করেন। ছেচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম গল্প "ডেন্সবেরী হাউস" ছাপা হয়, এক মদ্যপান-নিবারিণী পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য। পরবৎসর তাঁর 'ইষ্টলিন' বার হল'। এই করুণ কাহিনী পঞ্চাশ বৎসর ধরে ইংরাজী সাহিত্যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার ক'রে আজ অনেকটাই অনাদৃত। মানুষের রুচি বদলেছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বদলেছে। ঘরে ভাত, মনে শান্তি এবং সংসারে সুখ থাকলে মানুষ বই পড়ে কেঁদে মুখ বদল কর'তে পারে, জীবন যখন অশান্তিতে দৈন্যে অশ্রুতে ভরে উঠে, তখন বিয়োগান্ত কাব্য-নাটকের মূল্য থাকে না। তখন অশ্রু-সজল মন হাসানর জন্য প্রয়োজন হয় মিলনান্ত কাব্য-নাটকের লেখকদের। যাঁরা বুদ্ধিমান্ তাঁরা চিরদিনই তাই মধ্যপন্থী, তাঁদের বাজার দর খুব বেশী না উঠুক, খুব বেশী নেমেও পড়ে না কোনদিন। মিসেস উডের "ইষ্টলিন", "চানিংস্", "রোল্যাণ্ড ইয়র্ক"

"পোমরয় অ্যাবি" "লর্ডহালিবার্টনস্ ডটার্স্" প্রভৃতি করুণ কাহিনার উপন্যাসগুলি স্বদেশে অপাংক্তেয় হ'বার পরেও বাংলা দেশে বহু শিক্ষিত নারী পুরুষকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে এ কথা আদৌ অস্বীকার করা যায় না। এঁর লেখা বিস্তর বই আছে, অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশের কম সংখ্যার হবে না। মিসেস্ উডের পর তিন জন বিখ্যাত লেখিকা ছিলেন, তিন ভগ্নী, শার্লোট ব্রঁতে, এমিলি ব্রঁতে এবং অ্যানব্রঁতে। তিনটি বোনই ছিলেন চিররুগ্না। অল্প বয়সে মাতৃহীনা এই মেয়েরা দরিদ্র এবং গম্ভীরপ্রকৃতি পিতার সাহচর্যে, আ-মৃত্যু গ্রাম্য জীবন যাপন করেছেন। একবার তাঁদের বেলজিয়মে যাবার সুযোগ হয়েছিল এবং কিছুদিন ধরে বোর্ডিংএ বাস করবার সৌভাগ্য হয়েছিল. এ ছাড়া বহির্জগতের সংশ্রব তাঁদের জীবনে বড় একটা ছিল না। এঁরা বেনামীতে লিখতেন, শার্লোটের "জেন আয়ার" প্রসিদ্ধি লাভ করবার পরেও অনেকের ধারণা ছিল ঐ বইটীর লেখক "কুরার বেল" একজন পুরুষ। শার্লোটের "জেন আয়ার" ছাড়া "শার্লি" এবং "ভিলেট" "অ্যাগনেস্" "অ্যানেস গ্রে" "এমিলি উথেরিং হোইট্স্" ইংরেজী সাহিত্যের সম্পদ্। শার্লোটের একমাত্র জীবিত ভাই এবং এমিলি ও অ্যান একবৎসরের মধ্যে মারা গেলেন, বৃদ্ধ শোকার্ত্ত পুরোহিত পিতাকে নিয়ে বাড়ীতে শার্লোট একা পড়লেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত, বহু সম্মান এবং বহু সুখ তাঁর ইঙ্গিতমাত্রে সেদিন করতলগত হ'তে পারত, কিন্তু সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। মৃত্যুর পূর্ববৎসর তিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর পিতার সহকারী

পুরোহিতকে। জীবনে কয়েক মাসের জন্য মাত্র তিনি সুখী হয়েছিলেন। উনচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। এর পরবর্তী লেখিকা মরিয়াম ইভান্স শুধু সুলেখিকা এবং সুগায়িকা বলে নয়, সুপণ্ডিতা বলেও বিখ্যাত ছিলেন। বাইশ বছর বয়সে জার্মান ভাষা থেকে "যীশুর জীবন" অনুবাদ করে তাঁর সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হয়। কভেন্ট্রি'তে বাল্য জীবন কাটিয়ে পিতার মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিন বিদেশ ভ্রমণ ক'রে লণ্ডনে আসেন। তাঁর পুরুষোচিত চালচলন এবং মতামত সে যুগে বিস্ময়ের বস্তু ছিল। এবারে লেখা এবং অনুবাদ করা তাঁর জীবিকা হয়েছিল। সাঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম গল্প "অ্যামোস্ বার্টনের দুর্ভাগ্য" বাহির হয়। তাঁর ছদ্মনাম 'জর্জ ইলিয়ট' দেখতে দেখতে দেশবিখ্যাত হ'য়ে উঠে। তাঁর "অ্যাড্যাম বিড্" চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত হয়। এর পর অনেক উপন্যাস তিনি লিখেছেন। "ফ্লস্ নদীতীরের কলবাড়ি", (মিল অন দি ফ্লস্) "সাইলাস মার্ণার" "রমোলা" প্রভৃতি উপন্যাসে যে পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শন, যে অপূর্ব চরিত্র-চিত্রণ-শক্তি এবং যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তার তুলনা যে কোনো সাহিত্যেই দুর্লভ। ইংলণ্ডে তাঁর আগে বা তাঁর পরে তাঁর চেয়ে বড় লেখিকা আজ পর্যন্ত কেউ জন্মাননি। উপন্যাসকে একাধারে আনন্দ বিতরণে এবং মানব-চরিত্র ও মানব-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণে তিনি সর্ব প্রথম কাজে লাগান, সেদিক দিয়েও তাঁর নাম চিরস্মরণীয়। জর্জ ইলিয়টের পরবর্তী লেখিকারা কেউই শার্লট, ব্রঁতে, জেন অস্টেন বা ইলিয়টের সঙ্গে একাসনে স্থান পাবার যোগ্য নন। তাঁদের সংখ্যাও

যেমন বেড়ে গেল, শক্তিও তেমনি ক'মে গেল দেখা যায়। মিসেস লিন্‌লিপ্টন, শার্লোটইয়ং, মারিয়া মলক, মিসেস অলিফ্যাণ্ট, এড্‌না লায়েল এবং মারীকরেলির নাম এই সমস্ত লেখিকাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শার্লোট ইয়ং "রেডাক্লফের উত্তরাধিকারী", "কীর্তি কথা", প্রভৃতি যে সব বই লিখে বিখ্যাত হন, তার লাভের অধিকাংশ টাকাই ধর্মপ্রচারের সাহায্যের জন্য ব্যয় করতেন। "ডেজিফুলের মালা" লিখে তিনি ত্রিশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন, সেই সমস্ত টাকা নিউজিল্যাণ্ডে এক মিশনারি কলেজ স্থাপন করতে খরচ হয়। তিনি মোট একশ' কুড়িখানি গল্পের বই লেখেন, সব কটিরই যথেষ্ট বিক্রি ছিল সে সময়ে। মারিয়া মলকের বিখ্যাত বই "জনহ্যালিফ্যাক্স্‌-ভদ্রলোক" তাঁকে স্মরণীয় ক'রে রাখবে। প্রবন্ধ এবং কবিতা লেখাতেও তাঁর দক্ষতা কম ছিল না। মিসেস অলিফ্যাণ্টের বহু গল্প উপন্যাস এক সময় ইংলণ্ডের সাময়িক পত্রকে সমৃদ্ধ করেছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি পথে দাঁড়ান; তিন হাজার টাকার জীবন-বীমা এবং পনেরো হাজার টাকা দেনা রেখে তাঁর স্বামী মারা যান। কারো দয়া ভিক্ষা না করে শুধু নিজের লেখনীকে সম্বল করে তিনি এই বিপুল ঋণ শোধ করেছেন, সংসার চালিয়েছেন, সকলের প্রতি সব কর্তব্য করেছেন। তাঁর ভাষায় মাধুর্য ছিল। ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লেখবার সুন্দর শক্তি ছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর নাম হয়তো চিরস্মরণীয় হবে না, কিন্তু মনুষ্যত্বের সম্মান যতদিন আছে ততদিন এই তেজস্বিনী নারী সমস্ত শিক্ষিতা মহিলার আদর্শ স্বরূপা হ'য়ে থাকবেন। মারী করেলি নামক লেখিকার (১৮৬৪-১৮২৪) "বারাব্বাস",

"শয়তানের দুঃখ", "স্বর্গের ঐশ্বর্য", "ইটারনাল লাইফ", "মাইটী অ্যাটম্" প্রভৃতি উপন্যাস এর পরবর্তী স্থান লাভ করে। এই প্রসঙ্গে ইংরেজী গীতি-কবিতা রচয়িত্রীদের দু'চারজনের নাম উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে লেডী অ্যান লিণ্ডসের "বুরো রবিণ গ্রে" যখন দেশবিখ্যাত হ'ল, তখন লেখিকার নাম কেউ জান্ত না, এডিনবার্গের এক সাহিত্য-পরিষদ্ এই গানের রচয়িতার সন্ধান করবার জন্য তিনশ' টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। শেষে লিণ্ডসে ধরা পড়ে কৈফিয়ৎ দিলেন এই বলে, "যারা লিখতে পারে না তাদের লজ্জা দিতে ভালবাসি না বলেই আমি লিখতে ভয় পাই।" সে যুগে আমাদের ইদানীন্তন শত বর্ষ পূর্বের মতই সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের লেখা ছাপা হওয়া লজ্জার কথা ছিল। এই যুগে স্কচ লেখিকা লেডি সেয়ার্ণ "যুবরাজ চার্লি" সম্বন্ধে কয়েকটি বিখ্যাত গান এবং "লিলের দেশ" প্রভৃতি লেখেন এবং আইরিশ লেখিকা মিসেস্ ক্রফোর্ড "ক্যাথলিন মাভুর্নিন" লিখে বিখ্যাতা হন। এই গানটির কপিরাইট কিছুদিন আগে ন'হাজার টাকায় বিক্রি হ'য়েছে। লেডি জন স্কটের 'অ্যানি লরি' গানটি একটি পুরানো গানের নবরূপ মাত্র।

ইংলণ্ডের নারী কবিদের খুব পুরাণো ইতিহাস আমরা জানি না। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে নারী কবিরা নিজেদের লেখা কবিতা প্রথম সাধারণের পড়বার জন্য ছাপাতে সাহস করেন। কবি হিসাবে যাঁরা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে মিসেস্ ফেলিসিয়া হিম্যান্স্, এলিজাবেথ

ব্যারেট ব্রাউনিং, অ্যাডেলেড প্রক্টার, জিন ইঞ্জেলো, ক্রিষ্টিনা রসেটি, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মিসেস্ হিম্যান্সের জন্ম হয় ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে চৌদ্দ বছর বয়সে ছেপে তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রশংসা পায় নি। উনিশ বছর বয়সে এক আইরিশ ক্যাপ্টেনকে এই বীর পূজারিণী বরমাল্য দান করেন, কিন্তু স্বামী তাঁর প্রেমের মর্যাদা রাখেন নি। ছ' বছর পরে পাঁচটি শিশু সন্তান সহ ফেলিসিয়াকে ছেড়ে তিনি ইতালিতে পালিয়ে যান, আর ফেরেন নি। পিতৃশোক, ভ্রাতৃশোক প্রভৃতি সহ্য করে এই পতিপরিত্যক্তা নারী শুধু কবিতা লিখে সংসার চালাতে আরম্ভ করেন, নিজেকে নিঃশেষ ক'রে তিনি সন্তানদের সুখী করতে চেয়েছিলেন। তাঁর "কাসাবিয়াঙ্কা", "এক পরিবারের বিভিন্ন সমাধি", "শিশুর প্রথম দুঃখ", "ইংলণ্ডের সমৃদ্ধ সংসার" প্রভৃতি শত শত কবিতা সেদিন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল; মধুর এবং করুণ রসে অসামান্য কৃতিত্ব দেখালেও তাঁর কাব্যে শক্তি সঞ্চার এবং গভীরতার অভাব ছিল, অতিরিক্ত পরিশ্রমে অল্প বয়সেই ইনি মারা যান।

পরবর্তী বিখ্যাতা কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংয়ের খ্যাতি সমসাময়িক বহু পুরুষ-কবিকে ঈর্ষান্বিত করেছিল। তাঁর "দেবদূত" ও অন্যান্য কবিতা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বার হয়। তার দু' বছর পরে তিনি অসুস্থ হ'য়ে ছ' বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউনিংয়ের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ও সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দশ দিনেই দু'জনে প্রেমে পড়েন। বাবা বিয়েতে মত না দেওয়ায় এলিজাবেথ পালিয়ে গিয়ে ব্রাউনিংকে বিয়ে করেন। মিসেস ব্রাউনিংএর "পর্তুগীজ

হইতে সনেট” এই যুগের লেখা। প্রেমের কবিতা লিখেই তিনি বিশ্বসাহিত্যে অমর হ'য়ে আছেন। ইটালি প্রবাস কালে অষ্ট্রিয়ার শাসনে জর্জরিত ইটালির প্রতি সহানুভূতি তিনি তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেছেন। আ-মৃত্যু স্বামী সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী এই চিররুগ্না নারীর ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে ফ্লোরেন্সে নগরে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বিখ্যাত “শেষ কবিতা” প্রকাশিত হয়েছিল। দৈহিক দুঃখ এবং মানসিক সুখের বিচিত্র সংঘাত তাঁর জীবনে ছিল, কাব্যেও তা' প্রতিফলিত হয়েছে। এর পরবর্তী নারী কবিদের মধ্যে এলিজাকুকের “পুরাণো আরাম-কেদারা”, “রাজাক্রুস”, “মাকড়সা” প্রভৃতি কবিতা এবং মিসেস আলেকজাণ্ডারের “সকল পদার্থ সুন্দর উজ্জ্বল” প্রভৃতি লেখা বিখ্যাত।

ইংলণ্ডের পরেই আমেরিকার নারী লেখিকাদের কথা বলা দরকার, কারণ তাঁদের লেখাও ইংরেজী সাহিত্যেরই অন্তর্গত। ইংলণ্ডের সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর আমেরিকার ভাষার ঐক্য থাকলেও দেশের অবস্থার কোনো দিক দিয়েই মিল্ ছিল না। চারিদিকে অজ্ঞাত অরণ্য, হিংস্র শ্বাপদ এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণ আদিম অধিবাসীরা যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। ভালো পথঘাটেরও একান্তই অভাব। এ সময়ে যে সমস্ত দুঃসাহসিক পরিবার সে দেশে বাস করতেন, তাদের পুরুষদের বাইরের কাজের পর অবসর কম ছিল, মেয়েদের গৃহকার্যেরও তেমনি ছুটি ছিল না। এরই মধ্যে সেলাই, কাপড় বোনা, রান্না প্রভৃতির ফাঁকে দু' চারজন যে কিছু লিখতেন না তাও নয়; তবে তার ধারাবাহিক ইতিহাস আমাদের জানা নেই। লেখার আগে

বই পড়ার রেওয়াজ খুবই ছিল, কেন না নির্জন দেশে বইয়ের চেয়ে ভাল সঙ্গী বেশী মিলে না। যাঁরা সময় পেতেন ক্রমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখতেও আরম্ভ করলেন। এই প্রথম যুগের লেখিকাদের মধ্যে এমা সার্তদয়র্থ সব চেয়ে প্রসিদ্ধ। তাঁর বইয়ে বিচিত্র রোমাঞ্চকর ঘটনা সমাবেশ এবং ভাবপ্রবণতার পরিচয় থাকলেও মানব-চরিত্র সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টির অভাব ছিল, তাই আজ তাঁর উপন্যাসগুলির আদর কমে গেছে। তাঁর কুমারী বয়সের নাম ডরথি এলিজা সেভিউ। জন্ম হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে, অল্প বয়সে দু'টি ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার চালাবার জন্য তাঁকে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিতে হয়। সাময়িক পত্রিকায় ক্রমে তাঁর লেখা ছাপা হ'তে থাকে। পাঠকের উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে অর্থাগমও সুরু হয়। চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তিনি তখন লেখাই পেশা করেন। একে একে আটষট্টিটি উপন্যাস লেখেন। "পরিত্যক্তা স্ত্রী", "ক্লিফটনের অভিশাপ", "হারাণো উত্তরাধিকারিণী" প্রভৃতি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর দেশের, তাঁর সময়ের পাঠকের জন্যই লিখেছিলেন, এ কথা মনে রাখলে আমরা তাঁর প্রতি সুবিচার করতে পারব। তাঁর সমসাময়িক সুপণ্ডিতা মার্গারেট ফুলার দশ বছর বয়সে ল্যাটিন এবং তেরো বছর বয়সে গ্রীক শিখেছিলেন। প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে তাঁর চিঠি লেখারও নিপুণতা ছিল। সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারতেন, বহু সাহিত্যিক নিয়ে মজলিস করতেন। এই অসাধারণ শক্তিমতী নারী ইটালীয় এক কাউন্টকে বিবাহ ক'রে প্রবাসী হন এবং ফেরার পথে জাহাজডুবি হ'য়ে মারা যান। আজ তাঁর নাম পর্যন্ত লোপ পেতে বসেছে। এই সময় একজন লেখিকার নাম

আমরা পাই,—যাঁর দান শুধু সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হ'য়ে থাকবে। মিসেস হ্যারিয়েট ষ্টাউয়ের জন্ম ১৮১১ খৃষ্টাব্দে। বিবাহের পর এই আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতা গৃহকার্যের পর অবসর খুবই কম পেতেন, সেই বিরল অবসরে তিনি "ড্রেড্", "পুরাণো সহরের লোক" প্রভৃতি বই লিখে যশোলাভ করেন। দাস জীবনের দুঃখ নিয়ে তিনি "টমকাকার কুটীর" বইখানি লিখেছিলেন, অন্তরের সমবেদনা দিয়ে। সেই একখানি বই ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ খণ্ড বিক্রি হয়, পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হ'য়ে সর্বত্র সহৃদয় মানুষকে দাস-প্রথার বিরুদ্ধে সচেতন ক'রে তোলে। এর দ্বারা যে আন্দোলন আরম্ভ হয় তার পরিসমাপ্তি হয় প্রায় সমস্ত পৃথিবী থেকে দাসত্ব প্রথার বিলোপে, বিভিন্ন দেশে কোটি কোটি চির-পরাধীন নির্যাতিত নরনারীর পরিত্রাণে। এত বড় পুণ্যকার্যের মূলে একজন মাত্র সহৃদয়া নারীর প্রেরণা ছিল, একথা ভাবলেও গভীর আনন্দ হয়।

সে যুগের আমেরিকার মেয়েরা গল্পের চেয়ে কবিতাই বেশী লিখতেন, কিন্তু কবিতা লিখে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে কেউই বড় একটা পারেন নি। যে দু'চার জনের স্থান আজও ইংরেজী-সাহিত্যে আছে, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অ্যালিস কেরীয়া। তাঁদের অল্প বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়, বিমাতা এসে সব সময় সদয় ব্যবহার করেননি, দিনের বেলা কাজ ছিল, রাত্রে বাতি জ্বেলে কবিতা লেখা নিষেধ ছিল। ফেলে দেওয়া চর্বিতে ছেঁড়া কাপড়ের সল্‌তে জ্বালিয়ে তাঁরা প্রয়োজন মতো লেখা পড়া করতেন। অ্যালিসের যখন বত্রিশ বছর এবং কিরির আটাশ

বছর বয়স, তখন তাঁরা নিউ ইয়র্কে ভাগ্যানুসন্ধানে আসেন। কাগজে গদ্য পদ্য লেখা ছাপিয়ে এবং বাড়ীতে সাহিত্য-সভা বসিয়ে তাঁরা অল্প দিনেই বিখ্যাতা হন। তাঁদের লেখার মধ্যে উপাসনার স্তোত্রগুলিই প্রধান, অ্যালিসের আঠারো বছর বয়সের রচনা "একটি মধুর গভীর চিন্তা"এর মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কিরির মৃত্যু হয়, অ্যালিস ভগ্নীশোকে অল্পদিন পরেই মারা যান। তাঁদের ধর্মভাবদ্যোতক কবিতা ও প্রার্থনার গানগুলি এখন পর্যন্ত ইংরেজী-ভাষাভাষী জগতে বহু শোকার্তকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। বর্তমান যুগে আমেরিকায় নারী কবির অভাব নেই,—তবে পৃথিবীব্যাপী যশের অধিকারিণী—তাঁরা কেউই এখনও পর্যন্ত হন নি, সুতরাং আমরা তাঁদের কথা বলতে পারলাম না। গল্প উপন্যাস লিখে আর যে ক'জন ঊনবিংশ শতাব্দীতে খ্যাতি লাভ করে গেছেন তাঁদের মধ্যে মারিয়া সুসানা ক্যাথিডোর বিখ্যাত বই "মশাল্‌চি" (Lamp lighter) ১৮৫৪ সালে ছাপা হ'বার দু'মাসের মধ্যে চল্লিশ হাজার খণ্ড বিক্রয় হয়। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় আজও এই বইখানির সমাদর আছে। অগষ্টা ইভা বই লিখে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তাঁর "সেণ্ট এলমো" "টাইরিফসের কবলে" "বিউলা ইনফেলিত" প্রভৃতি বই প্রকাশকরা প্রচুর টাকা দিয়ে কিনেছিলেন। একমাত্র "বস্তি" বইখানির জন্য তিনি পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা পান। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় ইনি সোবাইল সহরে আহত সৈনিকদের জন্য একটি বেসরকারী হাঁসপাতাল নিজ ব্যয়ে স্থাপন করেছিলেন এবং নিজে সেখানে পরিচর্যার অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সমসাময়িক সুলেখিকা ম্যারিয়ন হার্ল্যাণ্ডের আসল

নাম মেরী ভার্জিনিয়া। আঠারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম বই "একাকী" ছাপা হয়। তারপর অনেক বই-ই তিনি লেখেন; কিন্তু সেগুলির জন্য খ্যাতি তাঁর চিরদিন থাক্‌বে না। কুড়ি বছর বয়সে তিনি এক পাদ্রীকে বিবাহ করেন এবং পঞ্চাশ বছর পরমানন্দে গৃহকর্ত্রীত্ব করেন। তাঁর স্বামী এই বিদুষী নারীর গৃহকর্মের দক্ষতা দেখে বিস্মিত হতেন, তিনি বলতেন, তাঁর "সংসারে সহজ বুদ্ধি" নামক গৃহকর্ম এবং রন্ধন-বিষয়ক বইটি পৃথিবীর যত উপকারে লাগবে, অন্য সব বইগুলি মিলিয়েও তা লাগবে না। এই যুগের আর একজন বিখ্যাত লেখিকা ছিলেন সুসান ওয়ার্নার। তাঁর বিখ্যাত লেখা "বিস্তীর্ণা ধরণীর মাতার" মত জগৎব্যাপী খ্যাতি 'টমকাকার কুটির' ছাড়া আর কোন বই পায় নি। তাঁর বাবা ছিলেন ধনী, আইন ব্যবসায়ী। হেডসান নদীর মধ্যে কনষ্টিটিউসন দ্বীপটি ছিল তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি। সুসান জীবনের অধিকাংশ সময় সেই দ্বীপে কাটিয়েছিলেন, অর্থাভাব তাঁকে ভোগ করতে হয় নি। তাঁর দ্বিতীয় বিখ্যাত উপন্যাস "কুইচির" নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকায় শিশুপাঠ্য বই লিখে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে লুইসাসে অলকট সর্ব প্রধান। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। এঁর "ক্ষুদ্রা নারী", "ক্ষুদ্র পুরুষ", "সেকেলে মেয়ে", "আট ভাই" প্রভৃতি পড়ে আজও কোটি কোটি ছেলে মেয়ে আনন্দ পাচ্ছে। বাবা ছিলেন দার্শনিক পণ্ডিত, উপার্জনের জন্য মা'কেই খাটতে হ'ত। বাড়ীতে অনেক সময় অন্নাভাব হ'ত। পুতুলের পোষাক তৈরী ক'রে জামা সেলাই ক'রে মাষ্টারী ক'রে রান্না ক'রে লুইসা মা'কে সাহায্য করতেন।

হাঁসপাতালে সেবিকার নানান্ কাজ নিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য জন্মের মতো ভেঙ্গে যায়। যেখানে যে অবস্থায় এবং যে কাজেই থাকুন, তিনি ছেলেদের জন্য সুন্দর সুন্দর গল্প লিখতে পারতেন। তাঁর হাঁসপাতালের গল্পগুলিরও সে যুগে তুলনা ছিল না। শেষ জীবনে ইনি মোটের উপর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে গেছেন। শিশু-সাহিত্যের অন্যতম লেখিকা মেরী সেপস্ বা মিসেস্ ডজ্ জন্মেছিলেন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে। অল্প বয়সে বিধবা হ'য়ে দু'টি ছেলে নিয়ে ইনি পিতৃভবনে ফিরে আসেন। ছেলেদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা নিয়ে তিনি গল্প লিখতেন। সঙ্গীতে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, বার বারে তিনি সমভাবে দক্ষতা দেখিয়ে গেছেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ থেকে দীর্ঘকাল সেণ্ট নিকোলাস্ নামক সাময়িক পত্রের সম্পাদনা করেছেন। ১৯০৫ সালে তাঁর মৃত্যুতে শিশু-সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ সহৃদয় বন্ধু হারিয়েছে। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে সহানুভূতিপূর্ণ রচনা আমরা প্রথম পাই হেলেন হাণ্টজ্যাকসনের কাছে। এই অত্যাচারিত জাতির স্বপক্ষে তিনি তীব্র ভাষায় সরকারকে আক্রমণ ক'রে "শতাব্দীর অপমান" লেখেন। সরকার তাঁকেই এ বিষয়ে অনুসন্ধানের ভার দেন, তিনি সাধ্যমতো এই দুরূহ কর্ত্তব্য পালন ক'রে অনেক অন্যায়ের প্রতিকার ক'রে গেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "র‍্যামোনা" এই লাল মানুষদের নিয়েই লেখা। পরবর্তী লেখিকা ফ্রান্সেস্ হজসনের জন্ম ইংলণ্ডে, তাঁর পনেরো বছর বয়সের সময় তাঁর বাবার মৃত্যু হ'লে তাঁর মা এসে আমেরিকায় বাস করেন। শৈশবেই তিনি চমৎকার গল্প বলতে পারতেন, অল্প বয়সে অর্থাভাবে অনেক লেখা তাঁকে ব্যবসায় হিসাবে

ছাপাতে হয়। তাঁর প্রথম বিখ্যাত বই "শার্লি চিনের ঝঞ্ঝাট", তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বই "লৌরীর মেয়ে" এবং সব চেয়ে বিখ্যাত বই "ছোট্টো লর্ড ফন্টলরয়"। "লৌরীর মেয়ে" বইখানি কুলি মজুরদের সুখ-দুঃখ নিয়ে লেখা। এঁর পরবর্তী লেখিকা অ্যামেলিয়ার জন্ম ইংলণ্ডে, বিয়ের পর তিনি স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায় যান। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পীতজ্বরে স্বামীকে এবং তিন ছেলেকে হারিয়ে ভাগ্যান্বেষণে তিনটি মেয়ে নিয়ে নিউইয়র্কে গিয়ে বই লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সত্তরখানি উপন্যাস তিনি একে একে লেখেন এবং সবগুলিই তৎকালে সমাদৃত হয়। এই যুগে এলিজাবেথ ষ্টুয়ার্থ ফেল্‌স্‌ পরলোকের কথা নিয়ে "খোলা দরজা" উপন্যাসখানি লেখেন। তেরো বছর বয়স থেকে তিনি লিখতে আরম্ভ করেন, ছোটো গল্প এবং উপন্যাস দু'য়েতেই তাঁর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল তিনি বহু সাময়িক পত্রের লোকপ্রিয় লেখিকা ছিলেন, "অ্যাডিসের গল্প", "টারসের ম্যাডোনা", "একটি জীবন" প্রভৃতি উপন্যাসে আর্ত মানুষের, এমন কি পশুর প্রতি তাঁর আশ্চর্য সমবেদনা দেখা যায়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে "সাধারণ তন্ত্রের রণ-সঙ্গীত" নামে যে গানটির সুর সহস্র সহস্র সৈনিকের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করত, তার লেখিকা জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ বহু গল্প কবিতা লিখেছেন, বহু সৎকার্যে শক্তি এবং অর্থ ব্যয় করেছেন এবং সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়েছেন। গৃহে তিনি মাতা এবং আদর্শ-পত্নী ছিলেন। এর পরবর্তী লেখিকা সারা ওর্ণ জুয়েটের "ডিপ হেভেন", "গ্রামের গলি", "সূচগ্র দেবদারুর দেশ" প্রভৃতি পড়লে সে যুগের সমুদ্রতীরবাসী মৎস্য-

জীবী ; বণিক প্রভৃতির এবং তাদের মেয়েদের নিখুঁত ছবি আমরা দেখতে পাই। প্রতিদিন যে সব দৃশ্য আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় তাই নিয়ে সুলেখক কি অপূর্ব সৃষ্টি করতে পারেন, সারার বইগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অ্যালিস ব্রাউনের ছোটো গল্পের বই "টাইভারটনের গল্প", "মেঠো ঘাস", "পাড়া গাঁয়ের পড়শী" প্রভৃতি এই জাতীয় স্বগ্রামের ঘরোয়া ঘটনা নিয়ে লেখা। চার্লস্ এগবার্ট ক্র্যাডকের "বিশাল ধূমল পর্বতের প্রেরিত পুরুষ"। "টেনেস পর্বতে" প্রভৃতি বই এমনি পাহাড়ীদের জীবনযাত্রার নিখুঁত ছবি। লেখিকা মেরী নোয়াইল্‌স্ "মরফ্রি" এই পুরুষের ছদ্মনামে লিখতেন। শৈশবে একটা দুর্ঘটনায় একটা পা খোঁড়া হ'য়ে যায়, সুতরাং কোনো পরিশ্রমের কাজ তাঁর দ্বারা চলত না, প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে তাঁরা পাহাড়ে বেড়াতে যেতেন, তাঁর গল্প উপন্যাসগুলির চরিত্র সেই সব স্থানে বাসের সময়ে সংগ্রহ করতেন।

"আশার বন্দী" "পাওয়া ও রাখা" প্রভৃতি উপন্যাসের লেখিকা মেরী জনষ্টন চিররুগ্না ছিলেন। ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের বাস্তব জগৎ মিলিয়ে তাকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তুলতে তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। তাঁর লেখা আমেরিকার যুদ্ধের দুটি রোমাঞ্চকর গল্প "গুলি ছোঁড়া বন্ধ করো", "দীর্ঘ উপস্থিতি গণনা" বিশেষ বিখ্যাত। ভার্জিনিয়া প্রদেশের বর্ণনা ইনি ছাড়া আর একজন শক্তিমতী লেখিকার পল্লী-উপন্যাসে পাওয়া যায় তাঁর নাম এলেন গ্লাসগো। এলেনের আমেরিকান গৃহযুদ্ধের গল্পগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ, তার মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী রচনা তাঁর "জাতির মর্মবাণী"। এর পর শিশু-সাহিত্যের

সুলেখিকা কেট ডগ্‌লাস্‌ উইগিনের নাম করতে হয়। তাঁর সখীদের খৃষ্টোৎসবের গান "টিম্‌থির সন্ধান" "সানিব্রুক ফার্মের রেবেকা" প্রভৃতি শুধু গল্প বইয়েই নয়, অভিনয়েও খুব নাম করেছে। তাঁর "পেনিলোপির অগ্রগতি" পড়ে অনেক শিশু আজও কল্পনায় দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। লেখিকা নিজে সতেরো বৎসর বয়সে শিশুশিক্ষা-প্রণালী শেখবার জন্য সান-ফ্রানসিস্‌কো যান এবং নিজে কিণ্ডার গার্টেন ট্রেনিং স্কুল ক'রে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে আনন্দময় করবার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছেন। তাঁর লেখায় শিশুদের প্রতি তাঁর আন্তরিক কল্যাণ-বুদ্ধি ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। এরপর মিসেস মার্গারেট ডেল্যাণ্ডের লেখা বইয়ে পেনসিল ভেনিয়ার মধুর গ্রাম্য চিত্রগুলির, মিসেস্‌ ফ্রিম্যানের লেখা নিউ ইংলণ্ডের কলের কুলিদের করুণ কাহিনী-গুলির, গ্রেস্‌ কিংয়ের লুসিয়ানার ঐতিহাসিক গল্পগুলির, হেলেন রাইসেন স্নাইডেনের সেনো নাইট সম্প্রদায়ের বিচিত্র চরিত্র-চিত্রগুলির উল্লেখ প্রয়োজন। এরপর একজন শক্তিশালিনী হাস্যরসের লেখিকার দর্শন পাওয়া যায়, তাঁর নাম অ্যালিস হিগ্যান রাইস। তাঁর বিখ্যাত "মিসেস্‌ উইগ্‌স্‌" বইটি বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। "রুথ এশোরি ষ্টুয়ার্টে"র নিগ্রোদের চরিত্র-চিত্রগুলি তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা;— হতভাগ্য নিপীড়িতদের কাহিনী। জুলিয়া ম্যাগ্রুডারের "রাজকুমারী সোনিয়া" "মৃত সেলভেস" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জোসেফাইন ডজ ডাস্কার তাঁর "ভিলিপের পাগলামি" দিয়ে, তাঁর শিশু-চরিত্র দিয়ে হাস্যরসাত্মক বই লেখা সুরু করেন এবং এই ধরণের বই বড়দের লেখাতে এর শক্তির

পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি এখনও জীবিতা আছেন। মিসেস্ অ্যাটউড মার্টিন "জর্জ ম্যাডন মার্টিন"- এই ছদ্মনামে "এমিলু" প্রভৃতি কয়েকখানি বিখ্যাত বই লিখেছেন। তাঁর বই একটি ছোটো মেয়ের স্কুল-জীবন নিয়ে। এ বইটা পড়ে অনেক অভিভাবক শিশুদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতে প্রেরণা পেয়েছেন। বর্তমানে আমেরিকায় এত লেখিকা এত রকম বিষয়ে লিখছেন যে, তাঁদের হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। তার মধ্যে ছ' চারজনের কথা বলা চলে। মেরী রেমণ্ডের কানাডার জঙ্গলে গ্রীষ্ম যাপনের গল্প, মেরী রবার্ট রাইন হার্টের রহস্যমূলক উপন্যাস এবং মহাযুদ্ধের কাহিনী, এডিথ হোয়ার্টনের করুণ রসাত্মক "আনন্দময় গৃহ" প্রভৃতি উপন্যাস, গারট্রড্ অ্যবহার্ট লেকের দেশবিদেশের কথা বিখ্যাত। বর্তমান ইংরেজ কবিদের মধ্যে এডিথ সিটওয়েলের নাম আছে।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় বর্তমান যুগের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান লেখিকাদের মধ্যে মেরী ওয়েবের "স্বর্ণ শায়ক" (১৯১৬), "মৃত্তিকাগত" (১৯১৭), "বহু মূল্য বেন" (১৯২৪), শীলা কে স্মিথের "সাসেক্স গস্" (১৯১৬), "কাঁচা আপেলের ফসল" (১৯২০), "জোয়ানা গডেন" (১৯২১), "আলার্ড বংশের শেষ" (১৯২৩) "জর্জ এবং রাষ্ট্র" (১৯২৫) নামক উপন্যাস এবং "ইংলণ্ডের শাশ্বত মত", (১৯২৫) নামক প্রবন্ধ পুস্তক উল্লেখযোগ্য। নায়োবি মিচিসনের অধিকাংশ গল্প উপন্যাসের পটভূমিকা প্রাচীন গ্রীস বা য়ুরোপ। তাঁর প্রধান বই "মেঘ কোকিলের দেশ" (১৯২৫) "কালো স্পার্টা" (১৯২৭) ও "শস্যের রাজা" এবং "বসন্তের রাণী" (১৯৩১)। সিলভিয়া

টাউনশেণ্ড ওয়ার্নারের "ললি উইলোজ্" (১৯২৬) 'মিষ্টার ফরচুনের ম্যাগট (১৯২৭), "ট্রু হার্ট" (১৯২৯) বিখ্যাত বই। তিনি গায়িকা ব'লেও বিখ্যাতা, টিউডরদের সময় "ধর্ম সঙ্গীত" বইটির তিনি অন্যতম সম্পাদিকা। রেবেকা ওয়েষ্ট বা মিসেস্ অ্যাণ্ড্রুজ "বিচারক" (১৯২২) "চিন্তাশীল রীড্" (১৯২২) প্রভৃতি উপন্যাস এবং হেনরী জেম্স, ডি, এইচ, লরেন্স এবং আর্নল্ড বেনেটের সমালোচনা লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। বর্তমান যুগের সব চেয়ে বিখ্যাত লেখিকা মিসেস ভার্জিনিয়া উলফের প্রধান বিশেষত্ব তিনি কোনো চরিত্রের একটা বিশেষ সমগ্র রূপ ধরে বেঁধে দেন না, খণ্ড খণ্ড ভালোয় মন্দয় ছোটো ছোটো কাজ ও কথার সমষ্টিরূপে তাঁর প্রত্যেক চরিত্রই জটিল এবং স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর বিখ্যাত রচনা "জলযাত্রা" (১৯১৫), "দিন ও রাত্রি" (১৯১৯), "জ্যাকবের ঘর" (১৯২২), "মিসেস্ ডলওয়ে" (১৯২৫), "বাতিঘরে" (১৯২৭), "অর্লাণ্ডো (১৯২৯), "ঢেউ" (১৯৩১), "বৎসরগুলি" (১৯৩৭)। তাঁর সমালোচনা বিষয়ক বিখ্যাত বই "সাধারণ পাঠক" (১৯২৫) "নিজের একখানি ঘর" (১৯২৯)। এ যুগের আর একখানি সুপ্রসিদ্ধ এবং সুবৃহৎ উপন্যাস "গন্ উইথ দি উইণ্ড"। এই বইখানি প্রকাশ হওয়া মাত্র, লক্ষ, লক্ষ খণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল আমেরিকান গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় এই বইখানি লিখিত। আশ্চর্য এইরূপ শক্তিশালিনী লেখিকা প্রায় ১১৩০ পৃষ্ঠার অপূর্ব্ব উপন্যাসখানি লিখিয়াই তাঁহার লেখনি সম্বরণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অকলঙ্ক যশো রশ্মিতে পাছে কলঙ্ক স্পর্শ করে সেই ভয়ে! এঁর নাম মার্গারেট মিচেল।

বর্তমান কবিদের মধ্যে এডিথ্ সিট্‌ওয়েলের "কবিতা সংগ্রহ" (১৯৩০), "ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ড" (১৮৮৮-১৯২৩), তাঁর ছোটো গল্প সংগ্রহ "আনন্দ" (ব্লিস), ১৯২১ খৃষ্টাব্দে 'ফেমিনাভি হোরোজ' পুরস্কার পায়। তাঁর দ্বিতীয় বিখ্যাত গল্প সংগ্রহ "কপোত-নীড়" ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রোজ সেকালে তাঁর "বিপজ্জনক যুগ" নামক উপন্যাস লিখে (১৯৩২ সালে) পূর্বোক্ত পুরস্কার পান। "পটারিজ্‌ম্" (১৯২০) "মূর্খের দ্বারা কথিত (১৯২৩) এবং "তারা হেরে গেল" (১৯৩২) তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কনষ্ট্যান্স হোম্‌সের "নিঃসঙ্গ লাঙ্গল" (১৯২৪) উপন্যাসে তিনি বন্যার দুর্দিনে উত্তর ইংল্যাণ্ডের প্রজার প্রভুভক্তি এবং অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। উইলা ক্যাথারের "আর্ক বিশপের কাম্য মৃত্যু এল" (১৯২৭) একখানি বিখ্যাত বই।

আমেরিকার ক্যানেডিয়ান লেখিকা মাজো ত্ব লা রোশ্ এর "নীচ জীবন" এবং অন্যান্য অভিনয় (১৯২৫) এবং "ভ্যাল্‌না" (১৯২৭) "হোয়াইটোক্‌স্" (১৯২৯), "ফিঞ্চের ঐশ্বর্য" (১৯৩১), "জানার প্রভু" (১৯৩৩), "নর্মান দুর্গের ধারে" (১৯৩৪) বিখ্যাত বই। ষ্টেলা বেনসনের "আমি সেজে দাঁড়ালুম" (১৯১৫), "নিঃসঙ্গ জীবন" (১৯১৯), "টাবিট্টকে নেড়ে বসালো' (১৯৩১), খ্যাতি লাভ করেছে। ভারতবর্ষ, চীন, আরব, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার বাইরে অন্যান্য দেশের লেখিকাদের সঙ্গে আমাদের সম্যক্ পরিচয় নেই; তবে যতদূর জানা যায়, তা'তে ফ্রান্সে এবং জার্মানীতে ইংলণ্ডের অনেক আগেই নারীরা সাহিত্য সেবায় যোগ দিয়েছিলেন, ইটালিতে প্রাচীন রোমক সংস্কৃতির

ধারা তো চলছিলই। ফরাসী বিদুষীদের মধ্যে একাদশ শতাব্দীতে এলোয়াজ, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্গে-রিৎ দ্য বুর্গোঞ্, পঞ্চদশ শতাব্দীতে লুইজ্ দ্য সাভোয়া (১৪৭৬-১৫৩১) ষোড়শ শতাব্দীতে লুইজ্ শার্লি লাবে (১৫২৬-১৫৬৬) মাদাম ক্যারোলিন অলিভিয়েরের নাম শোনা যায়।

মাদাম গিয়ঁ, মাদাম মৎভিল্ এবং মাদাম দ্য লাফায়েৎ প্রধানতঃ ধর্মোপদেশ এবং স্মৃতি কথা লিখে বিখ্যাতা হন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সোফি দ্য লা লিভ্, দ্য বেলগার্দ্ বা কঁতেস্ হুদ্‌তো (১৭৩০-১৮১৩) মাদাম সাবিন্ ট্রাস্ত (১৭৯৫), মারী জোসেফিন, রোজ টাসে' বা সাম্রাজ্ঞী জোসেফিন (১৭৬৩-১৮১৪) তাঁর কন্যা এবং তৃতীয় নাপোলেয়ঁরের মা অর্তাঁস্ ইউজেনি দ্য বোআর্নে (১৭৮৩-১৮৩৭), মার্শিয়নেস্ দ্য ত্রোভান্, এমে দ্য কোয়াঞ্যি, মার্সেলিন দেবোর্দ্ ভালমোর (১৭৮৭-১৮৫৯) কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অঁর্তাস্ সকল কলা-নিপুণা, সোফি বহু শাস্ত্রজ্ঞা, গিয়ঁ পুণ্যবতী এবং ধর্মজ্ঞা, লুইজ্ লাবে রণনিপুণা এবং এমে দ্য কোয়াঞ্যি (ফ্লোরির ডাচেস্) রাজনীতিজ্ঞা ব'লে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনীতিজ্ঞা বীর নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা মাদাম রোলাঁ ফরাসী বিপ্লবের অন্যতমা নেত্রী ছিলেন। দলগত বিরোধে তাঁদের পক্ষ-ভুক্ত জির্দিষ্ট্ দলের আধিপত্য নষ্ট হ'লে, তাঁর স্বামী মন্ত্রীত্ব ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন, কিন্তু মাদাম রোলাঁ শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবার জন্য পারীতে থেকে শত্রুর হাতে বন্দিনী হন এবং শেষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতা হ'য়ে গিলোটিনে প্রাণ দেন, তাঁর স্বামী ও তাঁর মৃত্যুর কথা শুনে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর পূর্বে

কারাবাসকালে লেখা তাঁর "ভবিষ্যদ্বংশীয়দের প্রতি আবেদন" নামক প্রবন্ধটি তাঁর দেশপ্রেমের এবং মহানুভবতার নিদর্শন স্বরূপ আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সুবিখ্যাত বাণী, "হায় স্বাধীনতা, তোমার নামে কত পাপই না সংঘটিত হয়।" ঐ যুগের আর একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞা এবং রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখিকা মাদাম দ্য ষ্টায়েল্ (১৭৬৬-১৮১৭) তাঁর "রুশোর সম্বন্ধে চিঠি" বইখানির জন্য ফরাসী বিদ্রোহের প্রাক্কালে খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন। বিদ্রোহীদের অনাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে, তিনি কিছুদিনের জন্য দেশ থেকে নির্বাসিতা হন। সম্রাট নাপোলেয়ঁর সময়ে দেশে ফিরে তিনি কিছুদিন পরেই তাঁর বিরুদ্ধে লিখতে আরম্ভ করেন এবং আবার নির্বাসিতা হন, তাঁর এই সময়কার লেখা "কোরিণ", বিখ্যাত গ্রন্থ। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী লেখিকাদের মধ্যে আমাঁদিন লুসিল্, ওরোর্ দুপাঁা (১৯০৪-১৮৭৬), জর্জ স্যাণ্ড, এই ছদ্ম নামে নাটক এবং উপন্যাস লিখে জগদ্বিখ্যাত হন।

ফ্রান্সের বর্তমান শতাব্দীর বিখ্যাত কবি এবং বিদুষী কঁতেস নোয়াইয় কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিতা ছিলেন। আজকের দিনের ফরাসী নারী কবিদের সঙ্গে আমাদের একেবারেই পরিচয় নেই।

জার্মানীর প্রথম সুবিখ্যাত নারী কবি আভার পর বহু নারী সাহিত্য সেবার এবং পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ ক'রে গেছেন।

শুরম্যান ছিলেন একাধারে বিখ্যাত কবি এবং বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, জার্মানীতে তাঁর সময়ে তাঁর মতো সুপণ্ডিত পুরুষও অল্পই ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ব্যারনেস ফন ক্রুড্নের নাম্নী একজন জার্মান বিদুষীকে রুষ সম্রাট গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন। ফরাসী সম্রাট নাপোলেয়ঁর বিরুদ্ধে য়ুরোপের রাজন্যবর্গ যে "পবিত্র" সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, তার মূল খসড়া তিনিই করে-ছিলেন। রুষ সম্রাট আলেকজাণ্ডারের রাজ্য শাসন এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত অনেক গুরুতর কাজ ক্রুডনেরের উপদেশ অনুসারে পরিচালিত হ'ত ব'লে শোনা যায়।

গান লিখে যাঁরা বিখ্যাত হ'য়েছেন, তাঁদের মধ্যে "স্কটল্যাণ্ড অ্যানিলার" লেখিকা লেডী জন্ স্কট, লেডী "অল্ড রবিন গ্রে' লেখিকা অ্যান্লিণ্ডসের লেডী নেয়ার্সের "ল্যাণ্ড অ লিল" বিখ্যাত।

স্পেনে ষোড়শ শতাব্দীতে সেণ্ট টেরেসা "আত্মার প্রাসাদ" "পরিপূর্ণতার পথ" প্রভৃতি বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে মিসেস্ হামফ্রি ওয়ার্ড (১৮৫৮-১৯২০) ১৮৮৮-তে "রবার্ট এসফের" লেখেন।

নোবেল পুরস্কার লাভ ক'রে বর্ত্তমান জগতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা আসন লাভ করেছেন, তাঁদের নাম, সেলমা লাগেরলফ, গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা, সিগ্রিড উণ্ডসেট ও পার্লবাক। এরা প্রত্যেকেই আদর্শবাদী এবং মানবহিতৈষী, এঁরা প্রত্যেকেই নারী-লেখিকাদের গৌরব। এঁদের মধ্যে পার্লবাক ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়ে এবং কার্য্যক্ষেত্রে ভারতে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদেশে জনমত গঠন করে, প্রত্যেক ভারত-নারীর শ্রদ্ধার পাত্রী হয়েছেন। সময়ের হিসাবে এঁদের অগ্রণী সেলমার

জন্ম ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সুইডেনে মারবাকায় ; তাঁর বাবা লেপ্টেন্যাণ্ট লাগেরলফ মজলিসী লোক ছিলেন, মা ছিলেন খুব হিসেবী এবং ভারিক্কি মেজাজের। ছোটোবেলায় একবার পুকুরের ঠাণ্ডাজলে স্নান ক'রে সেলমার পক্ষাঘাত হয়, বহু চিকিৎসায় তিনি রোগমুক্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর শরীর জন্মের মতো দুর্বল হয়ে গেছল। ছোটবেলা থেকে সুইডেনের বনজঙ্গল, জীবজন্তু, রূপকথা, ক্ষেতখামারের গল্প, প্রাচীন বীরত্বগাথা প্রভৃতি তিনি ভালোবাসতেন, চিরদিন তাঁর বইয়ের মধ্যে এইসব বিষয়ে লিখেছেন। ষ্টকহ'ল্‌ম্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপাধি নিয়ে তিনি ল্যাণ্ড্স্ক্রোনা শহরে মাষ্টারী আরম্ভ করেন। ক্লাশের কাজে এত সময় দিতে হ'ত যে ইচ্ছাসত্ত্বেও লেখবার সময় পেতেন না। তবু তিনি সে সময় ছাত্রীদের অনেক গল্প বলতেন মুখে মুখে। ১৮৯০ সালে "ইডুন" পত্রিকার পুরস্কার প্রতিযোগিতায় যখন তিনি লেখা পাঠান, তখন এলোমেলোভাবে লেখা ব'লে সেগুলি সম্বন্ধে প্রথমে বিবেচনার অযোগ্য এইরূপ মন্তব্য আসে। তারপর লেখাটি শুধু যে গৃহীত হয়েছিল তাই নয়, গল্পটিকে উপন্যাসের আকারে লিখে দেবার অনুরোধও এসেছিল। এরপর ব্যারনেস আল্‌ভেসকারের সহায়তায় তিনি চাকরী থেকে ছুটি পান এবং লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৪ সালে "অদৃশ্য গ্রন্থি", লিখে তিনি অ্যাকাডেমি এবং রাজপরিবারের সহায়তায় একটি বৃত্তি লাভ করেন। এই সময় ইটালি, সিসিলি প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফেরেন এবং "খৃষ্টশত্রুর অলৌকিক কাণ্ড", বইটি প্রকাশ করেন। তাঁর "পর্তুগালিয়ার সম্রাট", "জেরুজালেম", "গোষ্টা বেলিঙ্গের গল্প", "সুইডেনের গৃহ

হইতে", "নিল্‌সের আশ্চর্য্য রোমাঞ্চকর অভিযান", "নিল্‌সের আরও অভিজান" প্রভৃতি বই তাঁকে আবালবৃদ্ধবনিতার আপন জন করেছে। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ "নিল্‌সের অভিযান" নিয়ে তাঁর অদ্বিতীয় শিশুপাঠ্য উপন্যাস "বুড়ো আংলার গল্প", লিখেছেন। জেরুজালেমে সুইডেনের এক উপনিবেশ ছিল : সেখানকার দুর্নীতি, অবিচার প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা গুজব শুনে সুইডিশ সরকার সেলমাকে সন্ধান নিতে পাঠান। সেলমা সকল দিক বিবেচনা ক'রে শুধু একটি সুন্দর রিপোর্ট দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, এইখানের সংগৃহীত মালমসলা নিয়ে "জেরুজালেম" নামক উপন্যাস ও "খৃষ্ট কাহিনী" নামক গল্প সংগ্রহ করলেন। আপশালা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমতঃ তাঁকে এল, এল, ডি, উপাধি দেন্ তারপর সুইডিশ অ্যাকাডেমী তাঁকে প্রথম নারী সভ্যারূপে মনোনীত করেন। একান্ন বছর বয়সে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। গত মহাযুদ্ধের সময় নিরর্থক নরহত্যা তাঁকে পীড়িত করেছিল, ১৯১৮ সালে "পতিত" নামক উপন্যাসে মনুষ্যজীবনের মহার্ঘতা তিনি দেখিয়েছেন। ঈশ্বরপ্রেম, দেশ-ভক্তি, পরলোক সম্বন্ধে চিন্তা, প্রকৃতি-প্রীতি, সর্বজীবের সুখে-দুঃখে সমবেদনা এবং করুণ ও হাস্যরসের মিলিত প্রবাহ তাঁর লেখাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

সেল্‌মার পর যে নারী সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার পান তার নাম গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা, তিনি ইতালির এক মধ্যবিত্ত আইনজীবী এবং কৃষিজীবী পরিবারের মেয়ে। বারো বছর বয়সে এক প্রবন্ধ লিখে তিনি পঞ্চাশ লিরা পুরস্কার পান। তারপর "ঘৃণা" নামক তাঁর একটি নাটিকা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত

হয়। তাঁর "ভস্ম" নামক উপন্যাসখানি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁকে বিখ্যাত করে। তাঁর "দুইটি অলৌকিক ঘটনা" নামক বিখ্যাত গল্প পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মুসোলিনির নেতৃত্বে ইটালির অমরগণের সভায় তিনি সভ্যা রূপে গৃহীতা এবং নোবেল পুরস্কার লাভ করে পৃথিবীর কাছে পরিচিতা হন। তাঁর চুয়াল্লিশ খানা বইয়ের মধ্যে মাত্র পাঁচ খানা ইংরাজিতে অনুদিত হয়েছে। তিনি নিজে স্বীকার করেন, নিজের তৃপ্তির জন্যই তিনি লেখেন, সাধারণ পাঠকের রুচির দাবী মেনে লেখা তাঁর পোষায় না। তিনি ধর্ম্মের জয়ে বিশ্বাসী তাঁর মতামত আধুনিক উদ্দাম প্রগতি যুগের সঙ্গে ঠিক মেলেনা, তথাপি তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার না ক'রে প্রগতিবাদিনীদেরও উপায় নেই।

গ্রাৎসিয়া নোবল পুরস্কার পাবার দু'বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সিগ্রিও উণ্ডসেট ঐ সম্মানে সম্মানিতা হন। তিনি ডেনমার্কের ভাস্কর মার্টিন উণ্ডসেটের কন্যা এবং শিল্পী সোয়ার্ষ্টেডের পত্নী। 'ওলোর' কলেজের পাঠ সমাপ্ত করে ইনি বাড়ীতে বসে ডেনমার্কের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। অর্থাভাবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে চাকরী নিতে হয়, চাকরী করে সংসারের কাজ কর্ম সেরে অনেক সময়ে রাত জেগে তিনি সাহিত্য চর্চা করতেন। তাঁর লেখায় সর্বত্র মধ্যযুগের বর্ণনা এবং দারিদ্র্যগ্রস্ত মধ্যবিত্ত সমাজের স্বাভাবিক ছবি দেখতে পাওয়া যায়। উণ্ডসেটের সব চেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস "ক্রিষ্টিন ল্যাভ্রান্সডাটার" এবং "হেষ্টভিকেনের প্রভু" ইংরেজীতে অনুদিত হয়েছে। নিজের জীবনের সমস্যা ;—অর্থাৎ মেয়েদের যদি চাকরী

করেই খেতে হয়, তাহলে তাদের বিয়ে করার প্রয়োজন কি? স্বাধীন থাকলে তারা তো ঢের বেশী আমোদে থাকতে পারে। এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজের লেখার মধ্যেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ;—"একলা কাজে আমোদ আছে, কিন্তু সে আমোদ বেশীদিন ভালো লাগে না, শীঘ্রই তা'তে অবসাদ এসে যায়। অপরকে সুখ দুঃখের অংশীদার করতে পারলে জীবনে তখনই প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়, সেই জন্যই নরনারীর মনোমত সঙ্গীর প্রয়োজন।

উণ্ডসেটের সব বই ইংরাজীতে অনুদিত হয় নি। তিনি তাঁর বইগুলিতে তাঁর প্রগাঢ় ঐতিহাসিক জ্ঞান, সহজ এবং সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছেন, তিনি দেখিয়েছেন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা দু' পাঁচশ' বছরে কিছুই বদলায় নি।

আমেরিকার বর্তমানের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখিকা পার্ল বাক ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর "মঙ্গলময়ী ভূমি" (গুড্ আর্থ্) পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। লেখিকা পিতা এবং স্বামীর কার্যোপলক্ষে দীর্ঘকাল চীনদেশে ছিলেন, চীনের সামাজিক চিত্রই তিনি বইটিতে নিখুঁতভাবে এঁকেছেন অত্যন্ত সহানুভূতি নিয়ে।

পরাধীন ভারতের প্রতি সমবেদনায় ইনি ইংরাজ শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বহু প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং আজও জানাচ্ছেন, এর জন্য এদেশের শুধু নারীই নয়, নারী পুরুষ-নির্বিশেষে সকলেই তাঁর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে।

পৃথিবীর সাহিত্যে দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলির দান খুবই সামান্য। প্রাচীন পেরুর ইঙ্কারাজাদের সূর্যোপাসক প্রজারা

সভ্যতার পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু উত্তরের মায়া-সভ্যতার সঙ্গে তার কোনো যোগ ছিলনা। আমেরিকার ঐ সর্ব সুপ্রাচীন সভ্যতার শেষ চিহ্ন স্বরূপ কতকগুলি দেবমন্দির ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, বাকি সমস্তই কালের এবং ততোধিক ক্রূর স্পেন দেশীয় বর্বরদের করালকবলে বহুদিন হ'ল নিপতিত হয়েছে। এক সময়ে খৃষ্টান ধর্মযাজকেরা ইঙ্কাদের আমলের সমস্ত সাহিত্য ও শিল্প ভেঙে পুড়িয়ে শেষ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের চেষ্টা অনেকটা সফল হলেও সম্পূর্ণরূপে সফল হয়নি, এদিকে ওদিকে দুচারটে গল্প-গাথা ছড়িয়ে পড়ে র'য়েই গেছে। স্পেনের পুরুষ যারা দস্যুতা এবং লুণ্ঠনের জন্য সে দেশে গেছল, তারা অনেকেই পরিবার নিয়ে যায়নি, সেই দেশের মেয়ে বিয়ে করে সেই দেশেই বাস করেছে। পরে পোর্তুগীজ ফরাসী প্রভৃতি অনেকে সে দেশে যায়, তারাও অনেকেই মিশ্র-জাতির মেয়ে বিয়ে করে। বর্তমান মেক্সিকো, পেরু. আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ লোকই মিশ্রজাতীয়। তারা স্পেনের অধীনতা পাশ ছিন্ন করার পর থেকেই দেশের প্রাচীন শিল্প সাহিত্যের দিকে ক্রমেই আকৃষ্ট হচ্ছে। অনেকে নূতন গল্প ও কবিতা পুরাতন গাথার বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা আরম্ভ করেছে। সে দেশের অধিকাংশ লোক বর্তমানে স্পেনীয় ভাষায় কথা বলে এবং লেখে, সুতরাং বর্তমান সাহিত্য সেই ভাষাতেই রচিত হয়। বিদুষী নারী সে দেশে বর্তমানে অনেক আছেন, স্কুল কলেজও অনেক হয়েছে, তবে দেশের বাইরে যাঁদের খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছে তেমন নারী বেশি নেই। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের কোর্টেজ

নামক যে ভাগ্যান্বেষী অতর্কিত আক্রমণ ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ক'রে পেরু দখল করেন, তাঁর একজন বিদুষী 'দোভাষী' ছিলেন তাঁর নাম 'ডনা মারিয়ানা'। বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ যখন নিমন্ত্রিত হ'য়ে সে দেশে গিয়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়েন, তখন একজন বিদুষী শিল্প-সঙ্গীত-নিপুণা নারী প্রাণপণে তাঁকে সেবা ক'রেছিলেন, তাঁর নাম সিন্‌য়রা ভিক্টোরিয়া ছ এষ্ট্রাডা। কবির "পূরবী" নামক কাব্যখানি তাঁকে উৎসর্গিত। "বিজয়া" এই নামে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অমর ক'রে রেখে গেছেন।

বর্তমানে দক্ষিণ আমেরিকার লেখিকাদের মধ্যে ভেনিজুইলার টেরেসা ছ লাপারা সব চেয়ে বিখ্যাতা, তাঁর আধুনিক নারী-চরিত্র নিয়ে লেখা উপন্যাস "ইফিজেনিয়া" (১৯১৪) এবং "মানারাস্কা" (১৯২৮) মাদ্রিদ ও পারীতে সমাদর লাভ করেছে।

উত্তর আমেরিকার ইংরেজী সাহিত্যের আধুনিকতমা লেখিকাদের মধ্যে বর্তমানে সুবিখ্যাতা কুমারী উইলা ক্যাথারের "মাই অ্যান্টোনিয়ার" লিখনভঙ্গী প্রাচীনপন্থীদেরই মতো।

রাজনৈতিক মন্তব্য লিখেই যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিখ্যাতা ডরথি টম্‌সন।

শুধু ব্যর্থ প্রেমের কবিতা লিখে ডরথি পার্কার ও কুমারী এড্‌না সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট মিলে খুব নাম করেছেন।

আমেরিকার ইংরেজী সাহিত্য আলোচনার সময় অনেকেই একদল সাহিত্যিকের কথা ভুলে যান, তারা অবজ্ঞাত অত্যাচারিত নিগ্রো। একশতাব্দীর অনধিক কাল আগে তারা নামে মাত্র স্বাধীনতা পেয়েছে, কিন্তু তাদের দাবিয়ে রাখবার জন্য শ্বেতাঙ্গরা ঘরেবাইরে কোনো চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। এই নিগ্রোদের

জোর করে তাদের স্বদেশ আফ্রিকা থেকে কুলি খাটাবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আজও তুলোর খেতে কুলি-গিরি এবং লোকের বাড়ীতে বা কারখানায় কুলি-খাটাই তাদের প্রধান উপজীবিকা। শিক্ষায় এবং সভ্যতায় শ্বেতাঙ্গের সমান তারা আজও হতে পারে নি। তবু তাদের মধ্যেও কয়েক জন বিখ্যাত সমাজসেবক এবং শিক্ষকের অক্লান্ত চেষ্টায় নব জীবনের সাড়া পৌঁছেচে। এদেশে ছবি আঁকা, কবিতা রচনা, বিশেষ করে সঙ্গীতে তারা কেউ কেউ শ্বেতাঙ্গদের সমপদস্থ বলে স্বীকৃতও হয়েছে। নিগ্রো নারী কবিদের মধ্যে ক্রীতদাসী ফিলিস হুইট্‌লি (১৮৫৩-৮৪) সর্বপ্রথম কাব্যরচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। তারপর শ্রীমতী ফ্রান্সেস্-ই হার্পার তাঁর কাব্যে মুক্তির আহ্বান এবং ন্যায়বিচারের দাবী জানান ;—স্বাধীনতা লাভের ঠিক পরবর্তী যুগে। বিখ্যাত নিগ্রো কবি ডানবারের পত্নী অ্যালিস্ নেলসন সুবক্তা, সুকবি এবং বিখ্যাতা সম্পাদিকা ছিলেন (১৮৭৫)। অ্যান্ স্পেন্সর (১৮৮২), জর্জিয়া জন্‌সন (১৮৮৬) ও জেসি রেডমণ্ড ফসেট্‌কে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ নিগ্রো নারী কবি বলা চলে। দক্ষিণ আমেরিকার নিগ্রো কবিরাও স্পেনীয় ভাষায় কাব্য লিখেছেন, তবে তাঁদের নাম আমার জানা নেই।

জাপানের কথা আমার কাছে অজ্ঞাত, তাই বলে অত বড় উন্নতিশীল দেশে নারী সাহিত্যিকা ও সুপণ্ডিতার আদৌ অভাব হয়নি, একথা নিঃসন্দেহেই বল্‌তে পারি।

পরিশিষ্ট

কবি এবং মনীষীরাই সকল যুগে তাঁদের সম সাময়িক মানবসমাজকে পথ প্রদর্শন করে এসেছেন। এর মধ্যে মাতৃজাতি নারীর দায়িত্ব তাঁদের মানব-সন্তানদের পথ নির্দ্দেশ সম্বন্ধে অধিকতর। সন্তানপালনে মাতৃ-কর্ত্তব্য পিতৃ-কর্ত্তব্যেরও উপরে। আমরা অনেক নারী-চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখেছি সে শক্তি তাঁদের মধ্যে আছে। প্রতি যুগেই যুগ-বিধাতার মত যুগ-নিয়ন্ত্রী নারীরও উদ্ভব হয়েছে। তাঁদের দেহ-মনের পরিস্থিতি মত কার্য্যপ্রণালী পুরুষের সঙ্গে ঠিক সমান হ'তে পারে না, আদর্শ মূলতঃ এক হলেও বাহ্যতঃ বিভিন্ন।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং,
নৃনামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"

তাঁরা নিজ জীবনের মহত্তম ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের দ্বারা নিজ জাতিকে উন্নত করে গেছেন, কোথাও স্বদেশপ্রেম, কোথাও সধর্ম্ম প্রেম, কোথাও বাৎসল্য, কোন খানে পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে স্বদেশে এবং বিশ্বে অমরতা লাভ করেছেন। কত অখ্যাত অজ্ঞাত মহিলা যুগ যুগ ধ'রে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে তাঁদের অন্তরের অবদান দিয়ে জাতীয় জীবন ও তার জীবনী-শক্তির উৎস-স্বরূপ লিখিত এবং অ-লিখিত সাহিত্যের সৃষ্টি করে রেখেছেন, তার কতটুকুই বা আমরা জানতে বা জানাতে পেরেছি। আজও আমরা যত কিছু ভাল কাজ করতে যাই কোথাও পূর্ব দৃষ্টান্তের অভাব হয় না।

আজ আবার তাঁদের সামনে যে সমস্যাপূর্ণ দিন এসেছে, তাতে নারীকে শুধু সাহিত্যিকা অথবা সুপণ্ডিতা হলেই তাঁদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ পালন করা হবে না, তাঁকে উভয় ক্ষেত্রেই সম্মিলিত দায়িত্ব পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করতে হবে। নিজ নিজ জাতীয় শিক্ষার রক্ষাবীজ তাঁরই আঁচলে বাঁধা আছে, ধর্ম্মের কর্ষিত ক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গের জল সিঞ্চনে সেই বীজ বপন তাঁরই জন্য প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছে।

জাতি স্বাধীন নয়,* পুরুষেই সর্ব্ববিধ উচ্চাধিকারে বঞ্চিত। অনিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্ম্ম বিষয়েও তাদের স্বাধীন অধিকার নেই, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ো" এ বাণী আজ তাদের কাছে কুসংস্কাররূপে প্রতিপন্ন করবার জন্য চক্রান্ত চলেছে। অপর দিকে গূঢ় রাজনৈতিক কারণ-পরম্পরায় নিজ ধর্ম্মের ব্যবহারিক স্বাধীনতা ব্যাহত হচ্চে!† মেয়েরাই এতকাল পারিবারিক জীবনক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ বপন ও ধর্ম্মবৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ করে সযত্নে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, বর্ত্তমানে নারীর পুরুষের সঙ্গে সমশিক্ষা এবং পরানুকৃতির মোহ প্রবলরূপ ধারণ করায় সেই ধর্ম্মতরুর মূলোচ্ছেদ হ'বার উপক্রম করেছে। এই দারুণ দুর্দ্দৈব থেকে জাতিকে বাঁচাবার জন্য শুধু এদেশেরই নয়, পৃথিবীর নারীকে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে হবে। তাঁরাই জীব-জননী। তাঁদের

* আজ দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষ কার্য্যতঃ না হ'লেও বাহ্যতঃ স্বাধীনতার কাঠামো ফিরে পেয়েছে। (১৯৪৮)

† নিতান্ত দুঃখের বিষয় স্বরাজ প্রাপ্তিতেও জাতির ধার্ম্মিকশিক্ষা ব্যাহত হয়েই রইল, বরং নব-বিধানে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থই হ'ল !!

লেখিকা (১৯৫৮)

সৃষ্টি আজ স্বার্থান্ধ মানুষের লোভ-জর্জ্জরতায় ধ্বংস হ'তে বসেছে। বেশীদিন এই হিংস্র পাশবতা চলাতে দিলে, পৃথিবীর যে মূর্ত্তি প্রকট হবে, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের চেয়েও তা' ভয়াবহ। সৃষ্টি কর্ত্তার সৃষ্টি করবার নিশ্চয়ই তা' উদ্দেশ্য ছিল না।

রুদ্রের প্রলয়-বিষাণ স্তব্ধ হোক। মহাপ্রকৃতি সু-স্রিয়মাণা হোন।

"কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে" ভুলে গিয়ে, আচরণ দিয়ে, আদর্শ দিয়ে, মৃতসঞ্জীবনী মহাবাণী দিয়ে তাঁরা নিজ নিজ সমাজকে পুণ্যের সমাজ, ত্যাগের সমাজ, পবিত্রতার সমাজ, ধর্মের সমাজ তৈরী করতে বদ্ধপরিকর হোন। নারী পুরুষের যথাযথ সাম্য তাঁরা নিজ চরিত্রবলে জয় করে সংস্থাপিত করুন। জোর ক'রে, ভিক্ষা ক'রে, অ-দূরদর্শী আইন ক'রে তা' লাভ করা যায় না। সে অধিকার হতে পারে;—সমান সম্পত্তি লাভের, সমান যৌন ভোগের, সমান উচ্ছৃঙ্খলতার। ক্লীবের সঙ্গে, দীনের সঙ্গে, না হয় নৃশংস-দানবের সঙ্গে ধ্বংস-শক্তির সমান অধিকার সে যেন পেতে চায় না,—সে যেন তা' পায় না,—জোর ক'রে স্বার্থের খাতিরে তার মাথায় চাপিয়ে দিলেও সে যেন মাথা ঝেড়ে ফেলে দেয়,—যেন সে তা' নেয় না। সে যেন খুঁজে পায় তার নিজের সত্যকার সত্তাকে, সে যেন তার পূর্ণ মহিমায় নব যুগের অরুণ-রাগ-বিমণ্ডিতা উষারূপে সমুদিতা হয়ে জগতের এই ব্যাত্যা-বিক্ষুব্ধ জীবন-সিন্ধুর প্রলয় অন্ধকার বিদূরিত করতে পারে, যেমন আদিম সৃষ্টিতে একদিন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বসৃষ্টি সহায়িকা রূপে করেছিল। তাকেই বলি, নারী-জাগরণ,—নারী-প্রগতি,—অন্যথায় অধোগতি ও দুর্গতির চরম।

সাহিত্যে নারী চরিত্র:

স্রষ্টী ও সৃষ্টি

(২)

সাহিত্যে নারী চরিত্র সৃষ্টি—

সচরাচর উপমার ছলে সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলা হয়। সাধারণ ভাবে এ কথা সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। কোনো বিশেষ সময়ের সাহিত্যে সমসাময়িক সমাজের ছায়া পড়ে, এবং সেই সাহিত্য প'ড়ে আমরা সেই যুগের সমাজের যে ছবি দেখতে পাই তার তথ্যে অসম্পূর্ণতা থাকলেও ইতিহাসের চেয়ে অনেক বেশী স্পষ্ট ক'রে এবং সত্য ক'রে আমরা সেই গত যুগকে তার মধ্যে ফিরে পাই। অথচ সাহিত্যে যে সব সময়ে কেবল সমাজের প্রতিলিপি এবং অনুলিপিই আমরা পাই তাও নয়, সমাজের বাস্তব জীবনের বাইরে তার চিন্তাধারার, তার অবরুদ্ধ আশা-আকাজ্ক্ষার অব্যাহত প্রসার, আমাদের চোখে পড়ে। যা' ঘটেনি কিন্তু ঘটা উচিত ছিল, তাহা, যা' ঘটেছে তারই পাশাপাশি বসে যায়, অর্থাৎ সাহিত্যিকের কাছে আমরা অনেক সময়ে সমাজের অগ্রলিপি বা ভবিষ্যদ্বাণীও পাই।

দর্পণের সঙ্গে তুলনা না দিয়ে সাহিত্যকে চন্দ্র এবং সমাজকে সূর্য ব'ললেই বোধ হয় উপমা সার্থক হয়। আমরা জানি, সূর্যের আলোই চাঁদের গায়ে প্রতিফলিত হ'য়ে চাঁদের আলো হ'য়ে আমাদের কাছে ফিরে আসে, তবু এও জানি, যে সে এক হয়েও এক নয়। অন্ধকারের সমুদ্রগর্ভে সমাজের সূর্য যখন ডুবে যায়, দৈন্যে, দ্বন্দ্বে, বিদ্বেষে, ক্লান্তিতে জীবন যখন অসহনীয় হ'য়ে ওঠে, তখন সাহিত্যের চন্দ্র সেই নিবিড় অন্ধকারকে তার স্নিগ্ধজ্যোতি দিয়ে সহনীয় এবং মনোরম ক'রে তোলে! অর্জুনের লক্ষ্যভেদে আমরা বরমাল্য লাভ করি, রামায়ণের সীতার ও মেঘদূতের যক্ষপত্নীর অশ্রুজলে আমাদের ব্যক্তিগত শোকাশ্রু ধুয়ে যায়। একদিকে সমাজের সূর্যের আলোয় আমরা তথ্যের জগৎকে আগাগোড়া সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাই, দৈনন্দিন জীবনের প্রতি প্রান্তের প্রতি ক্ষুদ্র বস্তুটি তার ভালো মন্দ, ঐশ্বর্য, দৈন্য এবং মালিন্য নিয়ে একসঙ্গে আমাদের চোখে পড়ে, সমাজের সূর্যালোক আমাদের কর্মক্ষেত্রে কঠিন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'তে আহ্বান করে, অপরদিকে সাহিত্যের চন্দ্রালোক তার অপরূপ মায়াপ্লাবনে সেই তথ্যের জগতকে সৌন্দর্যে স্নান করিয়ে নিয়ে আসে,—তার সমস্ত বিকৃতি, বিরোধ, দৈন্যকে অস্পষ্ট ক'রে, আবৃত ক'রে তার অন্তর্নিহিত মহিমাকে এবং সৌন্দর্যকে স্ফুটতর ক'রে তোলে, এক অনির্ব্বচনীয় উপায়ে আমাদের মানব-জীবনের গূঢ়তর সত্যের সম্মুখীন ক'রে দেয়। তার শীতল কৌমুদী-ধারায় আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়, আমাদের শ্রান্ত উদ্বিগ্ন চিত্ত শান্তি লাভ করে। তবে, পরিপূর্ণ দিবালোকেও চাঁদ সূর্যকে আবৃত ক'রে গ্রহণ ঘটাতে পারে এই যা' তার দোষ।

কুসাহিত্যিকের লেখা কল্পিত সহিত্য কু-চিত্র দিয়ে সমসাময়িক স্বদেশের এবং সজ্জন সমাজেরও মুখ কালো ক'রে দিতে পারে, শুধু আজকের জন্য নয়, চিরদিনের জন্যই তাকে কলঙ্কিত করতে পারে।

বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে যে সব নারী-চরিত্রগুলি আমরা দেখতে পাই, তার মধ্যে অধিকাংশই পুরুষের সৃষ্ট। কোথাও তাঁরা ঐতিহাসিক চরিত্রকে নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি ও রুচি অনুযায়ী নূতন ক'রে ঢেলে সেজেছেন, কোথাও যতদূর সম্ভব বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চ'লতে চেষ্টা করেছেন। যে চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত সেগুলিতে সমসাময়িক সমাজ-চিত্র এবং লেখকের পছন্দ-অপছন্দ স্পষ্টই বোঝা যায়, কোনো চরিত্রে প্রথমটি কোনো চরিত্রে দ্বিতীয়টি বেশী ফুটেছে। বস্তুতান্ত্রিক লেখক যেখানে নির্ম্মমভাবে তথ্য প্রকাশ করতে গিয়ে নারীর মনের আস্তাকুঁড় ঘেঁটেছেন, আদর্শবাদী লেখক হয়তো সেইখানেই সহৃদয় ভাবে সত্য সন্ধান করতে গিয়ে দেবমন্দিরের সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়েছেন। এই দু'দলের মধ্যেই প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মেছেন, তাঁদের প্রতিভার তারতম্য অনুসারে তাঁরা সমাজের হিত এবং অহিত দুইই করেছেন।

সাহিত্যে নারী-চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে গিয়ে আমরা প্রথমেই দেখতে পাই অপ্রাকৃত এবং অতিপ্রাকৃত দেবী এবং অপদেবীর ভিড়। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্যে যে সব কল্পলোক-বাসিনীদের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে অনেকেই মানবী নন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কয়েক জন নিঃসন্দেহ বাস্তবলোক-চারিণী ঐতিহাসিক ব্যক্তি হ'লেও কবি কল্পনা তাঁদেরও ওপর অবাস্তব মহিমার রং চড়িয়ে তাঁদের দেবী এবং অপদেবীদের

স্বগোত্র ক'রে ছেড়েছে। এ না হ'লে বোধ হয় তাঁরা সেযুগের ধর্ম্মসাহিত্যে পাংক্তেয় হ'তেন না। এই দেবীকৃত মানবীরা ছাড়া ঋষি এবং কবিদের মনঃকল্পিত দেবী-অপদেবীদের ঘিরেই বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। মানব-মনের শৈশবাবস্থায় সেদিনে নদী-পর্বত, বৃক্ষ-লতা, পশুপক্ষী থেকে আরম্ভ ক'রে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির মধ্যে মানুষ স্বতঃই দৈবীলীলা প্রত্যক্ষ ক'রত। ভাবুকের কল্পনায় এঁরা কেউ পুরুষ, কেউ বা নারীমূর্ত্তি ধারণ ক'রে মানুষের শুভাশুভ নিয়ন্ত্রণ করতেন। এই সব দেবী বা অপদেবীদের চরিত্র পার্থিব নারী-চরিত্রের ছাঁচেই গড়া,—কেউ বা স্নেহময়ী, অন্নদা, জ্ঞানদা, সুখদা,—কেউ বা ভয়ঙ্করী, কোপনা, নররক্তলোলুপা। কাউকে পূজা দেওয়া হ'ত ভক্তিতে, কাউকে পূজা দেওয়া হ'ত ভয়ে। বিভিন্ন দেশের পুরাণের দেবী, দানবী, অপ্সরী, কিন্নরী, গন্ধর্বকন্যা, নাগকন্যা, বনদেবী, জলদেবী, ভূমিদেবী, যক্ষিণী, রাক্ষসী, পিশাচী, ডাকিনী থেকে আরম্ভ ক'রে রূপকথার পরী, হুরী, পেত্নী, শাঁখচুন্নি পর্যন্ত বহু বিভিন্ন স্তরের বহু বিচিত্র রূপের শুভাশুভকারিণীর সন্ধান আমরা পৃথিবীর প্রাচীন লিখিত এবং অলিখিত অভিজাত এবং গণ-সাহিত্যে দেখতে পাই। এঁদের মধ্যে কেউ বহুদর্শী ঋষির মানসী প্রতিমা, কেউ বা কুসংস্কারান্ধা গ্রাম্যবধূর কপোল-কল্পনা, স্রষ্টার বা স্রষ্টীর জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে কেউ বা মহিমাময়ী রাজরাজেশ্বরী, কেউ বা গ্রাম্য কুরুচি ও কুনীতির কুৎসিত প্রতিমূর্ত্তি। সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের স্থান নিতান্ত ন-গণ্য নয়, সেইজন্য এঁদের সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রসঙ্গতঃ এখানে একটা কথা ব'লে রাখা দরকার। ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয়

দেবদেবীদের মধ্যে একটা বড় প্রভেদ আমাদের প্রথমেই চোখে পড়ে, সেটা এই যে ;—ভারতের বাইরের দেবদেবীদের ব্যক্তিত্ব যেমন স্পষ্ট পৃথক্ এবং সুনির্দিষ্ট, ভারতের দেবদেবীদের ব্যক্তিত্ব কোনোদিনই তেমন নয়। গ্রীসের দেবরাজ-পত্নী হীরা, যুদ্ধ ও জ্ঞানদেবী আথেনা, প্রেমদেবী আফ্রোদিতি, শিকারের দেবী আর্তিমিস্ প্রভৃতির জীবনকাহিনী বিভিন্ন, পার্থক্য সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট। ভারতের বৈদিক দেবী ইড়া, ভারতী, সরস্বতী, অদিতি, বাক্‌দেবী, দুর্গা, গায়ত্রী, সাবিত্রী প্রভৃতির পার্থক্য সে রকম সুস্পষ্ট নয়। কোথাও তাঁরা বিভিন্ন ন'ন, মূলে তাঁরা একই চিন্ময়ী শক্তির নামান্তর মাত্র। ঐশী শক্তির একত্বে বিশ্বাস, বহুর মধ্যে একের প্রকাশকে স্বীকার ও পূজা নিবেদন ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য ; তাই ভারতীয় চিন্তাধারা একেকে বহুরূপে ভাবতে কোথাও কোনো বাধা পায় না, এর মধ্যে কোনো অসঙ্গতি লক্ষ্য করে না। আপাত-বিরোধী বহুর মধ্যে একেকে উপলব্ধি করা তার কাছে স্বভাবসিদ্ধ।

ভারতবর্ষের বৈদিক সাহিত্যকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সুলিখিত সাহিত্য বলা যেতে পারে। বেদের দেবতা মোট তেত্রিশ জন* ব'লে উল্লেখ থাকলেও যোগ করলে তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশী হয়, কারণ একই দেবী কোথাও তিন নামে, কোথাও পাঁচ নামে বিভিন্ন রূপে পূজা পাচ্ছেন। দু'একটা নমুনা দিই :—ইড়া দেবী মনুর কন্যা এবং পুরুরবার মা, ভরত বংশের আদি মাতা বা কুলদেবতা ব'লে তিনি ভারতী নাম নিলেন ; এ দিকে পুণ্যতোয়া সরস্বতী নদী তার তীরবাসী ঋষিগণের কৃতজ্ঞ চিত্তের সমর্থন

* যেস্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশশ্চ।

পেয়ে দেবীপর্যায়ে উন্নীত হ'য়ে ভারতীর সঙ্গে একার্থক হ'লেন। অম্ভৃণ-ঋষিকন্যা দেবীসূক্ত-রচয়িত্রী বাক্ দেবীও এঁদের সঙ্গে একীভূতা হ'য়ে গেলেন! অর্থাৎ একটি কল্পলোক বাসিনী জ্ঞানরূপিণী বিদ্যাদায়িনী চিন্ময়ী দেবতার নাম এবং রূপ-গুণের খোরাক যুগিয়েছেন দু'জন ইতিহাসপ্রসিদ্ধা মানবী এবং একটি জনপদকল্যাণী নদী! ঋষি-কবির কল্পনায় অনুরঞ্জিত হ'য়ে এই ইড়া বা সরস্বতী কোথাও সর্বব্যাপিনী সর্বেশ্বরী ব্রহ্মস্বরূপিণী ব'লে সম্পূজিতা হয়েছেন, কোথাও সোমরস চুরি করে এনে দেবলোককে অমরত্ব দান করায় অমরত্বকামী মানুষের প্রার্থনা তাঁর উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হচ্ছে, ঘি মাখানো পুরোডাশের টুকরোয় তাঁকে আবাহন ক'রে ঋত্বিক্ এবং যজমানে মিলে ভক্ষণ করছেন। বৈদিক যুগের যজ্ঞকুণ্ড যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ দক্ষের নাম থেকে 'দক্ষতনয়া' নাম নিলেন, ক্রমে তিনি যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে অভিন্না বিবেচিতা হ'য়ে 'কালী, করালী মনোজবা, সুলোহিতা' প্রভৃতি সাতটি জিভ বার করে হব্য-বাহিনী দুর্গারূপে বলি গ্রহণ করতে লাগলেন (গৃহ্য সংগ্রহ ১।১৭।১৪)। দুর্গার অর্চনায় সামবেদের অগ্নিপূজার মন্ত্র; "ওঁ অগ্ন! আয়াহি" প্রভৃতি আজও তার সাক্ষী দিচ্ছে। বৈদিক-রুদ্রের সঙ্গে অগ্নি ছিলেন অভিন্ন। বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রের ভগ্নী, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উমা রুদ্রের স্ত্রী, আবার দুর্গা বৈরোচনী অর্থাৎ সূর্য বা অগ্নির স্ত্রী। ক্রমে দুর্গা দক্ষকন্যা এবং কেনোপনিষদের হিমবৎকন্যা হৈমবতী উমা এক হয়ে গেলেন। অনার্য দেবতা 'শিব' আর্য দেবতা রুদ্রের সঙ্গে অভিন্ন হ'য়ে যাবার পর শবর পূজিতা বিন্ধ্যবাসিনী, বৌদ্ধদেবী চণ্ডী প্রভৃতিও সর্বশক্তি-সমন্বিতা শিবঘরণী দুর্গাদেবীর

সঙ্গে ক্রমে একার্থিকা হ'য়ে গেছেন। শত শত গ্রাম্য অনার্য দেবতা এই ভাবে আর্য দেবতাদের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গেছেন, তাঁদের বিভিন্ন জীবনেতিহাস এবং পূজাপদ্ধতি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আজও প্রায় অক্ষুণ্ণ আছে, কিন্তু তাঁদের একত্বে কেউ কখনও ভুলেও অবিশ্বাস করে না। বৈদিক যুগেই তাঁরা ঋষিদের দয়ায় এবং দূরদর্শিতায় আর্যসমাজে স্থান পেতে আরম্ভ করেন, পৌরাণিক যুগে ক্রমে বৈদিক দেবতাদের স্থানচ্যুত ক'রে অথবা তাঁদের নাম মাত্র অবশিষ্ট রেখে তাঁরা হিন্দুসমাজের অমরাবতীতে একচ্ছত্র অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে নিয়েছেন। যাই হোক বৈদিকযুগের এই সব দেবীচরিত্রের মধ্যে আমরা তদানীন্তন নারী চরিত্রের ছবি স্পষ্টই দেখতে পাই, এ কথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। ঋষি-কবিদের কাব্যপ্রেরণার মূল উৎস বাস্তব বা কাল্পনিক জড় প্রকৃতি বা জীবন্ত মানুষ যাঁরাই হোন, তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলির রূপ-চিত্রণে মাধুর্য ও মহিমার যে অপরূপ সমন্বয় আমরা দেখতে পাই, তার তুলনা জগতে বিরল। তাঁদের মানসী প্রতিমাগুলি পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির বিরচিত রূপসৃষ্টির পাশে সগৌরবে স্থান পেতে পারে। দু'একটি উদাহরণ দে'ব। হোতা ইড়া দেবীকে ডেকে বলছেন :—"অয়ি দেবি! তোমার রূপ সুন্দর, বর্ণ সুন্দর, বর্ষণশক্তি সুন্দর. তুমি এস,—আমাদের এই সুসজ্জিত যজ্ঞ-গৃহের অভিমুখে এস,—আমাদের ব্রতের প্রতি অনুকূল হ'য়ে অমাদের শীর্ষে কল্যাণ হস্ত অর্পণ করো। তুমি ইড়া, তুমি অদিতি, তুমি সরস্বতী, তুমি আনন্দময়ী, তুমি আনন্দদায়িনী, তুমি সুন্দরী,*

* রন্তিরসি রমতিরসি ॥

আমরা তোমার পূজা করি তুমি, আমাদের প্রীতি দাও ;—আমরা তোমাকে ডাকছি, তুমি আমাদের ডেকে নাও,* এই যজ্ঞে যে আশীর্বাদ চাইছি, তা' সত্য হোক।†……অগ্নি ইড়ে! তুমি আমাদের প্রিয়া, তুমি বিঘ্নঘাতিনী, কল্যাণদায়িনী, তুমি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করো।”

ঊষা দেবীর আহ্বান-সঙ্গীতে গাম্ভীর্য এবং মাধুর্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। কবি বর্ণনা করেছেন, কি ভাবে রাত্রি-শেষে ঊষার আগমনে জীবজগৎ জেগে ওঠে। তাঁর প্রতি আগমনে জীব দিনে দিনে জরার দিকে এগিয়ে চলে, কিন্তু চিরযুবতী ঊষার সৌন্দর্যের বিন্দুমাত্র হানি হয় না। তাঁর রমণীয় কান্তি অন্ধকার দূর করে, তিনি জ্যোতি দিয়ে আকাশের দ্বার খুলে দেন। সুন্দরী যুবতীর মতো তিনি সূর্যের কাছে এসে দাঁড়ান। গৃহকর্ত্রী যেমন নিজে জেগে বাড়ীর সকলকে জাগিয়ে তোলেন, তেমনি ঊষা সকলের আগে জেগে জগতের সকলের চোখ থেকে ঘুমকে দূর করে দেন। তিনি একহাতে ফুলের কুঁড়ির পাপ্‌ড়ি খুলে খুলে তাদের ফুটিয়ে তোলেন, আর এক হাতে মৌমাছিদের মধু খেতে আসবার জন্য ইঙ্গিতে আমন্ত্রণ জানান। কোথাও পৃথিবীর বন্দনায় ঋষি বলছেন :—“আমি পৃথিবীর পুত্র,—এই ধরণী আমার মা!” কোথাও বর্ণনা করেছেন, “পৃথিবী এবং তাঁর দুহিতা দ্যুলোক ক্ষীরদায়িনী ধেনুর মতো অন্তরীক্ষে মিলিত হ'য়ে পরস্পরকে রসপান করাচ্ছেন।”‡

* উপহুতে উপহবং তে অশীয় ॥

† সত্যা আশীরস্য যজ্ঞস্য ভূয়াৎ ॥

‡ মাতা চ যত্র দুহিতা চ ধেনু সর্বদুধে ধাপয়তে সমীচী ।৩।৫।১২

বাগ্দেবীর রচিত দেবীসূক্তে যে মহিমময়ী মূর্তি প্রত্যক্ষ করি, যিনি রুদ্রের ধনু বিস্তার করে যুদ্ধ করেন, ঊর্দ্ধলোকে পিতা দ্যৌকে যিনি প্রসব করেছেন, সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে যাঁর গর্ভ, বিশ্বভুবনে যিনি অনুপ্রবিষ্টা, দ্যুলোক স্পর্শ ক'রে যাঁর দেহ উঠেছে, বিশ্বভুবন নির্মাণে প্রবৃত্তা হ'য়ে বায়ুর মত যিনি সর্বত্র প্রবহমানা, ভূলোকে দ্যুলোকে সর্বত্র সর্বভূতে যিনি আপন মহিমায় বিরাজিতা, সেই মহাদেবীর মহাকল্পনা সুদূর অতীতের এক আর্যনারীর কীর্তি ;—এ কথা স্মরণ করলে আজও আমরা গৌরব অনুভব না ক'রে পারি না। ইড়া, উষা, ইন্দ্রাণী, সরমা, যমী, সাবিত্রী, সার্পরাজ্ঞী, সরণ্যু, প্রভৃতি দেবী-অপদেবী ছাড়া বেদে মানবী-চরিত্রের বর্ণনাও বড় অল্প নেই। বেদরচয়িত্রী ব্রহ্মবাদিনীদের নাম আমরা অন্যত্র বলেছি, ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা, শাশ্বতী, লোপামুদ্রা, বাক্, শ্রদ্ধা, রোমশা প্রভৃতি পার্থিব নারীর যে প্রত্যেকেই একদিন ভারতে সশরীরে বর্তমানা ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁদের রচিত বেদমন্ত্রগুলি। তাঁদের বর্ণনায় কবির কৃতিত্ব অল্প। বৃহদ্দেবতায় উক্ত সাতাশ জন ব্রহ্মবাদিনীর মধ্যে দেব-যোনি, সর্প-যোনি, কুক্কুর-যোনি-ধারিণীও আছেন, তবে তাঁদের কথাবার্তায় আচার-আচরণে মনুষ্যসুলভ দোষগুণই প্রকাশ পেয়েছে, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে মানুষের চেয়ে হীনতাও প্রকটিত হয়েছে। বেদের যুগে যে সব কাহিনী প্রচলিত ছিল, তাদের মধ্যে সত্যের সঙ্গে কল্পনা এমনভাবে মিশেছে যে, ওর মধ্যের অনেকগুলি চরিত্র বাস্তব না কাল্পনিক তা' আজ জোর ক'রে বলা শক্ত। যেমন কদ্রু-সুপর্ণীর বিবাদের গল্পে আমরা দেখি, পরাজিতা সুপর্ণীকে কদ্রু এই

সর্তে দাসীত্ব থেকে মুক্তি দেবেন যে, তাঁর সন্তান তৃতীয় দ্যুলোক থেকে সোম নিয়ে আসবে। সুপর্ণীর কন্যা গায়ত্রী পক্ষীরূপে গিয়ে সোম আনলেন, কৃশানু গন্ধর্বের বাণে ক্ষত বিক্ষত হ'য়েও ছাড়লেন না। তার্ক্ষ্য পক্ষী তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন। অন্যত্র দেখি গন্ধর্ব বিশ্বাবসু গায়ত্রীকে পথে আটকালেন, তখন সরস্বতী স্বয়ং গন্ধর্বদের ছলনা ক'রে সোম নিয়ে এলেন। পরবর্তী যুগে সুপর্ণী বিনতা, সোম অমৃত এবং তার্ক্ষ্য ও গায়ত্রী মিলে 'গরুড়' হয়েছেন, বলা বাহুল্য। শতপথব্রাহ্মণে উর্বশী পুরূরবার গল্প আমরা প্রথম পাই, মহাভারতের এবং কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীর' নায়ক-নায়িকার মূল রূপ এইখানেই পাওয়া যায়। অতীত ভারতের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ ভরতের মাতা শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের প্রণয়কাহিনীও শতপথব্রাহ্মণে মেলে। দুষ্মন্তের মূল চরিত্র সত্যই ঘৃণ্য, অবোধ তাপস বালিকার সর্বনাশ সাধন ক'রে রাজ্যে ফিরে এসে তিনি যে কেবল সজ্ঞানে সভামধ্যে তা' অস্বীকার করেছিলেন তাই নয়, সতী নারীকে অপমান করতেও কুণ্ঠিত হননি'। বৈদিক এবং পৌরাণিক শকুন্তলা ও কালিদাসের শকুন্তলার মতো শুধু মাধুর্যের প্রতিমূর্তি 'ললিত-লবঙ্গলতা' জাতীয়া নারী ছিলেন না, সভামধ্যে দৃপ্তস্বরে রাজাকে ধিক্কার দিয়ে তিনি স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। অবশ্য অভিজ্ঞান হারানোর কৈফিয়ৎ দিয়ে কালিদাস এঁদের দুজনের চরিত্রকেই যে সুন্দরতর করেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

কুক্কুরমাতা সরমা ইন্দ্রের দূতী হ'য়ে 'পনিদের' কাছ থেকে গরু আদায় করতে গেছেন, সূর্যকন্যা সূর্যার জন্য নাসত্য বা অশ্বিনীকুমারেরা দেবতাদের সঙ্গে বাজি রেখে সূর্য পর্যন্ত রথ

ছোটাচ্ছেন, অর্চনানা ঋষির ছেলে শ্যাবাশ্ব যজ্ঞ করতে গিয়ে রথবীতি রাজার মেয়েকে দেখে প্রেমে পড়েছেন এবং সন্ন্যাসী হ'য়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মুদ্গল ঋষির গোধন শত্রুতে হরণ করতে এসেছে দেখে মুদ্গলপত্নী ইন্দ্রসেনা রথে চড়ে তাদের আক্রমণ করে পরাজিত করছেন, লেখরাজপত্নী বিশ্পলার পা যুদ্ধক্ষেত্রে পাখীর পালকের মতো শত্রুর অস্ত্রাঘাতে খসে যাচ্ছে, বিবাহরাত্রে ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যু বিবাহসভা থেকে পালিয়েছেন, তার বদলে নকল 'কন্যা' দান ক'রে সূর্যকে ভোলানো হ'চ্ছে, এই রকম কতই না বিচিত্র চিত্র বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়! ঐ সবের মধ্যে শর্যতি রাজার মেয়ে সুকন্যার বিয়ের গল্পটি উল্লেখযোগ্য। আদরিণী রাজকন্যা তাঁর পিতার সঙ্গে মৃগয়ায় গেছেন, এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এক বল্মীকস্তূপে লতাগুল্মের ফাঁকে দুটি চক্চকে জিনিষ দেখে কৌতূহল বশে কাঠি দিয়ে খোঁচা মারলেন। ধ্যানস্থ চ্যবন ধ্যানভঙ্গে সুকন্যাকে দেখছিলেন, তিনি অন্ধ হলেন। অনুতপ্তা রাজকন্যা অজ্ঞানকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সেই অন্ধ বৃদ্ধ বনবাসীকে বিয়ে ক'রে বনবাসিনী হ'য়ে রইলেন। অবশেষে অশ্বিদ্বয়ের পুজা করে তিনি স্বামীর দৃষ্টিশক্তি এবং যৌবন ফিরিয়ে এনেছিলেন। পরমরূপবান্ অশ্বিনীকুমারেরা তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য প্রলোভন দেখিয়েছিলেন, তাতে কালিদাসের উমার মতোই মহীয়সী সতী নারী ঘৃণাভরে তাঁদের দূর হ'য়ে যেতে বলেন, তাঁর অন্ধ কুরূপ বৃদ্ধ স্বামীর চেয়ে জগতে তাঁর কাছে কাম্য কেউ নেই, এই কথা দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেন। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের প্রথম দিকে এইরকম অনেকগুলি মহীয়সী নারী-চরিত্র আমরা দেখতে পাই। একদিকে কুষ্ঠ-

রোগাক্রান্তা ঋষিকন্যার রোগমুক্তির জন্য এবং স্বামীলাভের জন্য আকুল প্রার্থনা, অপরের বিয়ে দেখে দেখে ধৈর্যহীনা অবিবাহিতা নারীর রূপযৌবন-সম্পন্ন স্বামীর জন্য দেবারাধনা, ইন্দ্রপত্নীর সপত্নীবিদ্বেষ এবং দাম্পত্যরহস্য জ্ঞানের গর্ব, তুক্‌তাক্, ছলনা, বশীকরণ, স্বার্থের জন্য বিত্তের জন্য, হানাহানি এবং দেবকৃপা-লাভের প্রচেষ্টা, আর একদিকে রাজকন্যাদের কোথায়ও পিতৃ-কল্যাণ কামনায়, কোথাও আবার স্বেচ্ছায় নির্ধন বনবাসী তপস্বীদের বরণ করে চির-দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ, পতির জন্য পত্নীর অপূর্ব আত্মত্যাগ এবং সুদীর্ঘ সাধনা পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায়। সূর্যকন্যা সূর্যার রচিত অনেকগুলি বৈদিক মন্ত্র আজও হিন্দুরা বিবাহের সময় ব্যবহার করেন, তার মধ্যে সে যুগের বধূর সম্মান ও সেদিনের সমাজের ছবি আমরা সুস্পষ্ট রূপেই সুব্যক্ত দেখতে পাই। ঋগ্বেদের ঋষি নববধূকে আশীর্বাদ ক'রে বলছেন ;—"তুমি শ্বশুরের কাছে সম্রাজ্ঞী হও, শাশুড়ীর কাছে সম্রাজ্ঞী হও, ননদ দেবর সকলের কাছে সম্রাজ্ঞী হও।* সংসারের কর্ত্রী হ'য়ে তুমি সংসারে প্রবেশ করো।† এই সংসারকে পরিচালনা ক'রবার জন্য সর্বদা সতর্ক থেকো।‡ সুমঙ্গলী নববধূর জন্য সকলের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে তার সৌভাগ্য কামনা করা হয়েছে, তাঁকে আশীর্বাদ করা হয়েছে ;—"ইন্দ্রাণীর মতো নিত্য শোভন বোধনে প্রবুদ্ধ

---

* সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব, ননান্দরি সম্রাজ্ঞী, সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু ॥ ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।২৭।

† গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো ॥ ঋ, ১০।৮৫।২৬

‡ অস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি ॥ ঋ, ১০।৮৫।২৭

হ'য়ে জ্যোতির্ভূষিতা উষার সঙ্গে তুমি নিত্য প্রতি-জাগরিতা থেকো।* সিন্ধু যেমন দাক্ষিণ্যগুণে নদীদের সাম্রাজ্য পেয়েছে, তুমিও তেমনি আপন মহত্ত্ব ও দাক্ষিণ্যগুণে পতিগৃহে সম্রাজ্ঞীর পদ লাভ কোরো।+" নারীর এই "সম্রাজ্ঞী-রূপ" সেদিন কেবল গৃহমধ্যে আবদ্ধ ছিল না, ঘরে বাইরে পুরুষকেও মহত্ত্বে বীরত্বে প্রেরণা দিয়ে ভারতের পুরুষকে জগতের শীর্ষস্থানীয় ক'রে তুলেছিল। ঋষিপত্নীরা শুধু বেদরচনা এবং অধ্যাপনাই করতেন না, প্রয়োজন হ'লে রথারূঢ়া হ'য়ে সৈন্য পরিচালনা ক'রে "সহস্র-জয়িনী" হতেন। শত্রুর অস্ত্রে বীর নারীর পা' উড়ে গেলে, দেবতারা তাঁকে লোহার পা' গড়িয়ে দিয়েছিলেন। উপনয়ন, ব্রহ্মচর্য পালন প্রভৃতি সকল নারীর জন্য সেদিন বিহিত ছিল, তবু যাঁর যেদিকে সামর্থ্য ছিল তাঁর কোথাও কোনো বিষয়ে বাধা ছিল না। ভালোমন্দের মিশ্রণে বৈদিকযুগের চরিত্রগুলির সঙ্গে আধুনিক ভারতের নারী-চরিত্রের খুব বেশী অমিল নেই। সপত্নীবিদ্বেষিণী কদ্রু, স্বামীপরিত্যাগিনী সূর্যপত্নী সরণ্যুর মতো মেয়েও সেযুগে একান্ত দুর্লভ ছিল না।

বেদের পরে স্মৃতির যুগে এবং রামায়ণ-মহাভারতের যুগে আমরা যেসব নারী-চরিত্রের পরিচয় পাই, তার মধ্যে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা, চিন্তা, বিহুলা, দ্রৌপদী, কুন্তী, গান্ধারী প্রভৃতি রাজকন্যা রাজবধূদের এবং সুলভা, মৈত্রেয়ী, গার্গী,

---

* ইন্দ্রাণীব সুবুধা বুধ্যমানা জ্যোতিরগ্রা উষসঃ প্রতিজাগরাসি ॥ অথর্ববেদ, ১৪।১।৭০।

+ যথা সিন্ধুর্নদীনাং সাম্রাজ্যংসুষুবে বৃষা। এবা ত্বং সাম্রাজ্ঞ্যেধি-পত্যুরস্তংপরেত্য ॥ অথর্ব্ব, ১৪।২।৭৫।

অরুন্ধতী, অনসূয়া, লোপামুদ্রা প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী বা ঋষিপত্নীদের আমরা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক চরিত্র বলেই মনে করি। পাণ্ডিত্যে, তেজস্বিতায়, মহত্ত্বে, ত্যাগে, বীর্যে ভারতীয় পুরাণের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কেরা পৃথিবীর যে কোনো দেশের সাহিত্যে নারীর আদর্শ বলে গৃহীতা হ'তে পারেন। তবে আমাদের বিশ্বাস এই চরিত্রগুলি বাস্তব আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে আছে বলেই এদের সৃষ্টির সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ব্যাস-বাল্মীকির নয়! কবিরা তাঁদের স্রষ্টা নয়, প্রচারক মাত্র, তাঁদের যশোগাথাকে ছন্দোবদ্ধ ক'রে স্থায়িত্ব দিয়ে তাঁরা নিজেদের গুণগ্রহিতার পরিচয় দিয়ে ধন্য হয়েছেন মাত্র।

ভারতবর্ষের বাইরে মিশর, বাবিলন প্রভৃতি দেশের সভ্যতাকে ভারতের বৈদিক সভ্যতার সমসাময়িক ব'লে অনুমান ক'রলে খুব অসঙ্গত হবে না। ঐ সব দেশের প্রাচীন সাহিত্যে রাজনৈতিক চিঠি-পত্র, অনুশাসন, দিগ্বিজয়ের কাহিনী প্রভৃতির বাইরে আমরা যে পৌরাণিক কাহিনী এবং রূপকথাগুলি পাই, তার মধ্যেও প্রথমতঃ দেবী এবং অপদেবীদের প্রাধান্যই দেখতে পাওয়া যায়। এঁদের পর দেবীকৃত মানবীদের স্থান। মিশরে আকাশ দেবী 'নুাট্' পৃথিবীদেবের ঔরসে চারটি সন্তানের জন্ম দেন, তা'র মধ্যে তাঁর কন্যা 'আইসিস স্বামী ওসিরিস কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেটের হস্তে নিহত হলে, মন্ত্রপ্রভাবে তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং পুত্র হোরাসকে স্বামী হন্তাকে বিনাশ করতে প্ররোচিত করেন। এই আইসিস মিশর দেশের মহাশক্তির প্রতীক। আইসিস তাঁর ভাই ওসিরিস্কে বিয়ে ক'রে পৃথিবী শাসন করেছিলেন, ব'লে প্রথিত আছে। ওসিরিস তাঁর ভাই সেটের হাতে নিহত হ'লে, আইসিস মন্ত্রপ্রভাবে স্বামীকে পুনর্জীবন দান ক'রে পাতালপুরীর

রাজা করে দেন, তারপর গোপনে পুত্র 'হোরাস্'কে প্রসব এবং পালন ক'রে উপযুক্ত বয়সে তাঁকে স্বামীহন্তা সেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রতে পাঠান। 'হোরাস' সেটকে পরাজিত ক'রে পৃথিবীর সাম্রাজ্য কেড়ে নিলেন, সেট দেবসভায় তাঁর জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেও কিছু ক'রতে পারলেন না। হোরাস এবং ওসিরিসের সঙ্গে 'আইসিস্' অতীতে যে কেবল মিশরে এবং গ্রীস, রোম ও পূর্ব এসিয়ায় পূজা পেয়েছেন, তাই নয়, আজও বিভিন্ন-রূপে পৃথিবীর দেশে দেশে পূজা পাচ্ছেন। পণ্ডিতেরা বলেন, যে যীশুখৃষ্ট জীবিতকালে তাঁর গর্ভধারিণী মায়ের চেয়ে ধর্ম-বন্ধুদের বেশী আপন জন ব'লে স্পষ্টবাক্যে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর সেই অনাদৃতা মা মেরী যে আজ স্বর্গের রাণী', 'ঈশ্বরজননী' প্রভৃতি নাম নিয়ে সহস্র সহস্র খৃষ্টীয় ধর্মমন্দিরে ভক্ত ক্যাথলিকের পূজা-অর্ঘ্য লাভ করছেন, এ সেই আইসিস্ দেবীর দয়া ছাড়া আর কিছুই নয়! তিনি তাঁর পিতৃ-পরিচয়হীন পুত্র হোরাসকে নিয়ে খৃষ্ট এবং খৃষ্টমাতারূপে আজও অর্ধ-পৃথিবীর হৃদয়-সিংহাসনে অটল ভাবে বিরাজ করছেন। আইসিস ছাড়া 'হাথর', 'নিট' সর্পদেবী 'বুটো', শকুনি দেবী 'নথবেট, প্রভৃতি বহু পশু এবং পক্ষী প্রতীক দেবী সেদিন মিশরবাসীর কল্পনা থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন। সম্রাটরা তাঁদের জন্য আকাশ-চুম্বী মন্দির তুলে-ছিলেন, সেই সব মন্দিরে বহু নারী-পুরোহিতা এবং দেবদাসী সেদিনে তাঁদের চিত্তবিনোদনের এবং পূজার জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করতেন। দেবদেবীদের পর ছিল দেবীকৃত মানবীদের স্থান। সম্রাজ্ঞী হাটসেপ্সুট বা হাত্তাশু, নেগরতিতি, ক্লিওপেট্রা প্রভৃতি জীবিতকালেই প্রজাদের কাছে দেবত্ব অর্জন চেষ্টা

করেছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই ভিত্তিচিত্রে নিজেদের কিছু না কিছু কাহিনী লিখে রেখে গেছেন, তবে ঐ সব নারীদের কারো কারো পার্থিব দেহ পর্যন্ত আজকের দিনে আমরা পাচ্ছি, সুতরাং তাঁদের সাহিত্যের সৃষ্টি ব'লে ধরা চলে না। এঁদের বাদ দিলে যে সব পার্থিব নারীর সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁরা অনেকেই রূপকথার নায়িকা। 'সিনুহির ভ্রমণবৃত্তান্তে' 'হতভাগ্য রাজপুত্রের নাহরিন রাজকন্যা লাভের গল্পে' আরও অনেকের মধ্যে মাঝে মাঝে কবিকল্পনার অপরূপ সৃষ্টি দেখতে পাওয়া যায়।

এই সব লিখিত সাহিত্য ছাড়া শিল্প-সাহিত্য সেদিনের মিশর নারীকে আমাদের কাছে সুপরিচিতা করেছে, তাদের জীবনযাত্রার সহস্র উপকরণ, ভিত্তিচিত্রে, ভাস্কর্যে, ক্রীড়াপুত্তলিকায় তাঁদের বিচিত্র ভঙ্গীতে বহু সহস্র বৎসরের পুরাতনী নারীকে আমাদের আত্মীয় করে তুলেছে। চিত্রলিপির অনুশাসনে আজও আমরা সেদিনের নারীর সম্মানের,—মাতার সম্মানের আভাস পাচ্ছি ; – "মায়ের আহার বিহার সম্বন্ধে যত্ন নিয়ো। ছোটোবেলায় মা তোমাকে সযত্নে মানুষ করেছেন, তুমিও তেমনি সযত্নে তাঁকে প্রতিপালন করবে। তিনি দশমাস তোমায় গর্ভে ধারণ করেছেন, তিন বৎসর স্তন্যসুধাপান করিয়েছেন, সে কথা ভুলো না। যৌবনে যখন সংসারী হবে, নিজে যখন পুত্রকন্যার পিতা হবে তখনও নিজের শৈশবের কথা মনে রেখো। মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া প্রত্যেক সন্তানেরই কর্তব্য।"

মিশরের পরেই বাবিলন আসিরিয়ার স্থান। বাবিলনে এক সময়ে অরুরু, ইস্থার প্রভৃতি দেবীর পূজার বহুল প্রচলন ছিল। ঐ দেশে 'গিল্‌গামেস্‌' নামক মহাকাব্য রচিত হয় ;

তা'তে দেবী ইস্‌থারের কোপে পড়ে 'ইরেক' রাজ্যের রাজা গিল্‌গামেশের যে দুর্গতি হয় তারই কাহিনী লিখিত আছে। দেবী "ইস্‌থার" সুপুরুষ গিল্‌গামেস্‌কে দেখে প্রেমে পড়েছিলেন, কিন্তু গিলগামেসের কাছে তাঁর প্রার্থনা নিষ্ফল হওয়ায় দেবীর শাপে গিল্‌গামেস রূপযৌবন হারিয়ে পথের ফকির হলেন। শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের রাণী "সবিতু" দেবীর দয়ায় শান্তিদ্বীপে গিয়ে পূর্বপুরুষ-প্রদত্ত মন্ত্রপূত অন্নাহার করে গিল্‌গামেস্‌ রূপযৌবন ফিরে পেলেন এবং দেশে ফিরে দেবীকে পূজা-অর্চনায় সন্তুষ্ট ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করতে লাগলেন। "ইস্‌থারে"র প্রণয়-পাত্রদের অনেককেই অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল, এই খামখেয়ালী কোপনা দেবীটিকে তুষ্ট করবার জন্য সে দিন অনেক ছন্দোবদ্ধ স্তবের উদ্ভব হয়েছিল, যার মধ্যে চাটুবাদের সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বের অভাব নেই।

এর পর আসে গ্রীকসাহিত্যের কথা। ট্রয়যুদ্ধের অনেক পরে —আনুমানিক আটাশ শ'বৎসরের আগে মহাকবি হোমার তাঁর অমর কাব্য "ইলিয়াড" এবং "ওডিসিউস্‌" রচনা করেন। তার অনেক পূর্বেই গ্রীসের কল্পনারাজ্যে বহু দেবী দানবী বাসা বেঁধে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দেবরাজপত্নী 'হীরা' প্রণয়দেবী 'আফ্রোদিতে', জ্ঞান এবং যুদ্ধের দেবী 'আথেনা' মৃগয়ার দেবী 'আর্তিমিস্‌', 'ভূমিদেবী ডিমিটার', উষার দেবী 'অরোরা' এবং গার্হপত্য অগ্নির দেবী 'হেষ্টিয়া'। "হীরা" চরিত্রহীন দেবরাজ "জিউসে"র সদা-সন্দিগ্ধ-চিত্তা প্রতিহিংসা-পরায়ণা পত্নী, জিউস যে সব দেবী এবং মানবীর সঙ্গে প্রেমে পড়েন, হীরা তাদের সঙ্গে ক্ষমাহীন সংগ্রাম ঘোষণা করেন। জিউস রাজহংসরূপে স্পার্টার

রাজকন্যা লিডার সঙ্গে প্রণয় করেছিলেন, তাঁর শিশু পুত্র "হিরা-ক্লিস"কে হত্যা করবার জন্য হীরা অজগর পাঠিয়েছিলেন ;—গাভীরূপিণী "ইয়োকে" অস্থির ক'রে দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়ে-ছিলেন, অ্যাপোলো এবং আর্তিমিসের মা "লাটোনা" হীরার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে শেষে ডেলস্ দ্বীপে আশ্রয় পান। জিউস্ অন্য দেবীদের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হ'লে "ইকো" নাম্নী এক ছলনাময়ী বনদেবী হীরাকে ভুলিয়ে রাখতেন ; হীরা তাঁর ষড়যন্ত্র ধরতে পেরে তাঁর বাকশক্তি হরণ করলেন, কেবল অন্যের কথার প্রতিধ্বনি কর্বার শক্তি রইল তাঁর। 'নার্সি-সাসে'র নিষ্ফল প্রেমে শেষে এই ইকোর তনুক্ষয় হ'ল, অতনু প্রতিধ্বনিরূপেই তিনি র'য়ে গেলেন জগতে। হীরা, আফ্রোদিতে প্রভৃতির মধ্যে সোনার আপেল নিয়ে ঝগড়া হ'ল, কথা হ'ল যিনি শ্রেষ্ঠা সুন্দরী তিনিই আপেলটা পাবেন। ইলিয়াসের রাজপুত্র প্যারিস আফ্রোদিতের পক্ষে রায় দিয়ে তাঁর কৃপায় মেনিলাস পত্নী অপূর্ব সুন্দরী হেলেনের প্রণয় লাভ করলেন ঘৃণ্য উপায়ে, সঙ্গে সঙ্গে হীরার কোপে তাঁর স্বদেশ ইলিয়াসের সর্বনাশ সাধিত হ'ল। এই হীরার চরিত্রও তাঁর স্বামীর চেয়ে খুব ভাল ছিল না। তাঁকে ইক্সিয়নের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত দেখে দেবরাজ ছলনা ক'রে তার অনুরূপ মায়ামূর্তি ইক্সিয়নের কাছে পাঠান, সেই মায়ারূপিণীর গর্ভে সেন্টারদের জন্ম হ'লে দেবরাজ ইক্সিয়নকে অনন্তকালের জন্য নরকের ঘূর্ণ্যমান বহ্নিচক্রে বেঁধে দেন। দেবতাদের সঙ্গে মানব-মানবীদের প্রেম তখনকার নিত্য ঘটনা ছিল, এ বিষয়ে ভারতীয় পুরাণের সঙ্গে গ্রীকপুরাণেব বিশেষ প্রভেদ নেই। বহুদিনের সংসর্গের ফলে ভারতীয় পুরাণে

গ্রীকপুরাণের কুৎসিততর দেব-চরিত্রের ছাপ পড়াও অসম্ভব নয়। তবে সুখের বিষয় দেব-চরিত্রকে পুরাণকাররা জননীমূর্ত্তিতেই বরাবর উর্দ্ধে অবস্থিতা রেখেছেন। ইন্দ্রের গৌতমরূপে অহল্যা-গমন জিউসের 'ইলেট্রিয়ন' বেশে 'অ্যাল্কমিনি' গমনের রূপান্তর হওয়া অসম্ভব নহে। 'ডানাইর' দেব-যোনিজ পুত্র মাতামহকে হত্যা করবে এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বিচলিত হয়ে আর্গসরাজ 'আক্রিসিউস্' কন্যাকে দুর্গে বন্দিনী করে রাখলেন, সেখানে সে যখন 'পার্সিউস'কে প্রসব ক'রল, তখন মাতা-পুত্রকে সিন্ধুকে ভরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হ'ল। দৈবক্রমে বহু বিপদ উত্তীর্ণ হ'য়ে পার্সিউস্ মাতামহকে হত্যা করলেন। এর সঙ্গে ভারত-বর্ষের, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মাতুল কংসের হত্যার চৌচাপটে মিল দেখা যায়। সুপুরুষ 'এণ্ডিমিয়ন'কে তার অজ্ঞাতসারে চুম্বন করবার জন্য তাকে পর্বত-সানুদেশে ঘুম পাড়িয়ে চন্দ্রদেবী সেলিনের প্রেমনিবেদন, প্রণয়দেবী আফ্রোদিতের মানুষ আডোনিসের কাছে ও আদ্বিসিসের কাছে আত্মনিবেদন, পাতালপুরীর রাজা প্লুটো কর্ত্তৃক পার্সিফোনি হরণ, ক্রীতদাস মহাবীর হিরাক্লিসের কাছে রাণী ও স্কার্লির প্রণয় জ্ঞাপন, ইলিয়াম রাজকুমারী কাসাণ্ড্রাকে কামনা ক'রে না পেয়ে অ্যাপোলোর অভিশাপ, আরিয়াড্নির কাছে ব্যাকাসের প্রণয়-প্রার্থনা, জিউসের ঈগল বেশে অ্যাষ্টিরিয়ার কাছে ও বৃষরূপ য়ুরোপার কাছে প্রণয়ভিক্ষা, নেপচুনের পতিঘাতিনী অ্যামিয়োনির কাছে ও আনি'র কাছে প্রেম নিবেদন, মানুষ ইউলিমিস্‌কে ভালবেসে নিস্তব্ধতার দেবী ক্যালিপ্সোর তাঁর দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা হ'য়ে তাঁকে সাত বৎসর বন্দী ক'রে রাখা

প্রভৃতি গ্রীকপুরাণের সাধারণ ঘটনা। মৃগয়া দেবী আর্তিমিসের যেমন কোনো প্রণয়ঘটিত দুর্বলতা ছিল না, তেমনি কোনো দয়ামায়াও ছিল না। এক হতভাগ্য শিকারী অসতর্ক অবস্থায় তাঁকে দেখে ফেলার অপরাধে হরিণে রূপান্তরিত হ'য়ে নিজের পোষা কুকুরদের মুখে খণ্ড বিখণ্ড হ'য়ে প্রাণ হারিয়েছিল। সেদিনের গ্রীসের সমাজ যেভাবে গঠিত ছিল, তার দেব-দেবীদের মধ্যে তার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাই। শৈশবে পরিত্যক্ত পিতৃঘাতী ইডিপাস্ তাঁর গর্ভধারিণী মা জেকোষ্টাকে না জেনে বিয়ে করেছিলেন, পরে সমস্ত জানতে পেরে জেকোষ্টা আত্মহত্যা করলেন। ব্যাকাস্ দেবতার পুরোহিত 'কোরিস্কুস্' সুন্দরী ক্যালিরোয়ে'কে প্রণয় নিবেদন ক'রে প্রত্যাখ্যাত হ'লেন। ক্রুদ্ধদেবতার অভিশাপে মহামারী এল, ভবিষ্যদ্বাণী হ'ল, 'ক্যালিরোয়েকে' বলি না দিলে দেবরোষ শান্ত হবে না। হতভাগিনীকে দেশের লোক ধরে নিয়ে এল, বলিদানের ভার পড়ল 'কোরিস্কুসের' ওপর। কোরিস্কুস্ প্রেম-পাত্রীর রক্তপাত না ক'রে বেদীর সামনে নিজেই আত্মহত্যা করলেন, ক্যালিরোয়ে অ্যাটিকায় পালিয়ে গেলেন, শেষে অনুশোচনায় নিজেও আত্মঘাতী হলেন। একদিকে দুর্নীতির বন্যা, আর একদিকে গভীর প্রেমের এবং ত্যাগের পুণ্যধারা ভারতীয় পুরাণের মতো গ্রীকপুরাণেও ওতপ্রোত ভাবে প্রবহমান। অর্ফিউসের বীণার তানে চরাচর মোহিত হ'ত, তাঁর পত্নী ইউরিডিস্ সর্পদংশনে নিহত হ'লে শোকোন্মত্ত অর্ফিউস্ মৃত্যুপুরীতে গিয়ে প্রেতলোকপতি প্লুটোকে বীণাস্বরে মোহিত ক'রে পত্নীর জীবন ভিক্ষা পেলেন, শুধু সর্ত্ত রইলো মৃত্যুপুরীর

সীমানা ছাড়িয়ে নরলোকে না পৌঁছানো পর্য্যন্ত অর্ফিউস্ অনুগামিনী পত্নীর দিকে ফিরে চাইতে পারবেন না। ধৈর্যহীন অর্ফিউস্ নরলোকে পৌঁছাবার পূর্ব মুহূর্ত্তে 'ইউরিডিস্' আসছেন কি না দেখবার জন্য পিছন ফিরে চাইলেন এবং তাঁকে জন্মের মতোই হারালেন। ব্যাকাস দেবের পূজার উৎসবে উন্মত্ত থ্রেসের নারীরা অর্ফিউসের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে, তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। এই সব প্রকৃত প্রেমিকদের পাশে পতিব্রতা লাওডামিয়া এবং আল্‌সিষ্টিসের কাহিনী স্মরণযোগ্য। দুর্দ্দান্ত বন্যজন্তু-বাহিত রথে চড়ে এসে মহাবীর অ্যাড্‌মিটাস্ আল্‌সিষ্টিসের পাণিগ্রহণ করেন। ভাগ্যদেবতারা ব'লেছিলেন অ্যাড্‌মিটাসের জন্য অন্য কোনো মানুষ স্বেচ্ছায় যদি জীবন দেয়, তবে অ্যাড্-মিটাসের মৃত্যু হবে না। আল্‌সিষ্টিস্ স্বামীর জন্য স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করলেন, কিন্তু হিরাক্লিস তাঁকে পুনর্জীবন দান করেছিলেন। লাওডামিয়ার সকরুণ প্রার্থনায় দেবতারা তাঁর স্বামী প্রোটিসিলাউস্‌কে তিন ঘণ্টার জন্য পুনর্জীবন দান করেন, স্বামীর দ্বিতীয়বার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সতীর স্বেচ্ছামৃত্যু হয়। পার্থিব প্রণয়ের বহু মধুর এবং করুণ কাহিনীর মধ্যে হিরো, ডিডো, আরিয়াড্‌নি এবং থিসবির কাহিনী উল্লেখযোগ্য। থিস্‌বি পিরামুসকে ভালবেসেছিলেন, বাপ মা তাঁদের বিয়ের মত দিলেন না। থিস্‌বি প্রণয়ীর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু সিংহ দেখে ভয় পেয়ে বস্ত্র ত্যাগ ক'রে ফেলে পালিয়ে আসেন; পিরামুস্ তাঁহার কাপড় এবং সিংহের পায়ের ছাপ দেখে তাঁকে মৃত মনে করে আত্মহত্যা করেন। থিসবি সেই স্থলে প্রত্যাবৃত্তা হয়ে পিরামুসের মৃত দেহ দেখে আত্মঘাতিনী হ'ন। আবিডস্ নিবাসী

লিয়াণ্ডার সেষ্টসের পূজারিণী হিরোকে ভালবেসেছিলেন, দিনের বেলা তাঁদের দেখা-সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল না, হেলেসপণ্টের জলপ্রণালীর দু'পারে দু'জনের বাস। এসিয়ার যুবক রাত্রে সাঁতার কেটে সমুদ্রের পরপারে য়ুরোপে প্রণয়িনীর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, আবার রাত্রেই সাঁতার কেটে ফিরে আসতেন। হিরোর জানলায় প্রদীপ জ্বলত, বহু দূর থেকে তার আলো তাঁকে পথ দেখাত। একদিন ঝড়ের রাত্রে হিরোর জানালায় দীপ নিভে যায়, লিয়াণ্ডার মধ্যপথে পথভ্রষ্ট হ'য়ে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ডুবে মারা যান। হিরো সেই সংবাদ পেয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। কাহিনীটি হয়তো সত্য, কারণ আবিড্‌সে আজও তাঁদের কথা লোকে ভোলেনি, তবে কাহিনীটি কোনো কবির কল্পনা হ'লেও আশ্চর্য্য হ'বার কিছুই নেই। 'ডিডো' কার্থেজের স্থাপয়িত্রী, টায়ারের অসমসাহসিকা রাজকন্যা, অকুলসমুদ্রে পাড়ি দিয়ে উত্তর আফ্রিকায় নূতন উপনিবেশ স্থাপন ক'রে তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেছেন। ভার্জিলের 'ইনিড্' কাব্যে দেখা যায় ডিডো রোম সম্রাটদের পূর্ব্বপুরুষ ইলিয়ামের রাজকুমার ইনিয়াসের প্রণয়ে প্রত্যাখ্যাতা হ'য়ে তাঁর বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করছেন। কাব্যের সৃষ্টি হিসাবে 'ডিডো'র কাহিনী আমাদের মর্ম্মস্পর্শ করে, যদিও তলিয়ে দেখলে কবির নীচতায় স্তম্ভিত হ'তে হয়। সে যুগের কার্থেজ ছিল রোমের প্রতিদ্বন্দ্বী, জ্ঞানে বিজ্ঞানে বাণিজ্যে তার চেয়ে বহু প্রাচীন গৌরবের অধিকারী, সেই কার্থেজের মহীয়সী স্থাপয়িত্রীকে এক অজ্ঞাতকুলশীল রোমক সম্রাটের দেবানুগৃহীত পূর্ব্বপুরুষের কাছে প্রণয়ভিখারিণীরূপে চিত্রিত করে তাকে

চিরদিনের জন্য অপমানিত করবার যে চেষ্টা ভার্জিল রাজানুগ্রহ-লোভে করেছিলেন, তার তুলনা কেবল ভারতবর্ষের ভারতচন্দ্রেই মেলে! 'ভারতচন্দ্র' আশ্রয়দাতা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ধমান-রাজকে হেয় করবার জন্য এক পুরাতন কাহিনীর কলঙ্কিনী নায়িকাকে বর্ধমানের রাজকন্যা 'বিদ্যায়' রূপান্তরিত ক'রে শুধু বর্ধমানেরই নয়, বাংলার কবিপ্রতিভার অবমাননা করেছেন।

ক্রীটের রাজকুমারী আরিয়াড্‌নি এবং কলচিস্ রাজকুমারী মিডিয়া যথাক্রমে বিদেশী গ্রীক যুবক থিসিউস এবং জ্যাসনের রূপমোহে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের জন্য ভ্রাতৃহত্যা এবং পিতার অপমানের কারণ হয়েছিলেন, পরে দু'জনেই পতি-পরিত্যক্তা হ'ন। অ্যারিয়াড্‌নিকে থিসিউস্ প্রত্যাবর্ত্তনের পথেই স্যাক্সস-দ্বীপে পরিত্যাগ করেন। সুরাদেবতা ব্যাকস্ তাঁকে গ্রহণ করায় তাঁর বিশেষ ক্ষতি হয়নি। যাদুকরী মিডিয়াকে ভ্রাতৃহত্যা এবং পিতৃদ্রোহিতার জন্য ঘৃণা করলেও জ্যাসন প্রথমে তাঁকে ত্যাগ করতে সাহস করেননি, ভয়ে এবং কৃতজ্ঞতায় তিনি তাঁকে পত্নী বলে স্বীকার করেছিলেন, তাঁর গর্ভে জ্যাসনের কয়েকটি সন্তানও হয়েছিল। কিছুদিন পরে গ্লাউস নাম্নী এক সুন্দরীর মোহে জ্যাসন মিডিয়াকে ত্যাগ করলে মিডিয়া নিজ হস্তে জ্যাসনের ঔরসজাত নিজের সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করেন এবং বিষদিগ্ধ পরিধেয় পাঠিয়ে গ্লাউসকে নিহত করেন। জ্যাসন শোকোন্মত্ত অবস্থায় আত্মহত্যা ক'রে মিডিয়ার প্রতিহিংসা থেকে মুক্তি পান। গ্রীসের মহাকাব্যের নায়িকা ভুবনমোহিনী হেলেন ছিলেন রাজা মিনিলাসের পত্নী, ইলিয়াসের রাজকুমার প্যারিসের প্ররোচনায় তিনি গৃহত্যাগিনী হ'ন। প্যারিসকে শাস্তি দেবার জন্য

গ্রীকরাজারা সসৈন্যে সমবেতভাবে ইলিয়াস আক্রমণ করেন, দীর্ঘকাল অবরোধ ও যুদ্ধের পর ছলনার সাহায্যে ট্রয় ধ্বংস করে মিনিলাস হেলেনকে উদ্ধার করেন। ইলিয়াসের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা, তার ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়; হেলেনও নিঃসন্দেহ ঐতিহাসিক চরিত্র। তবে বাস্তবের ওপর কল্পনার রং যে চড়েনি একথা বলা চলে না। হোমারের 'ইলিয়াড" কাব্যকে প্রায়শঃই রামায়ণ এবং মহাভারতের সঙ্গে তুলনা করা হয়, কিন্তু এদের মধ্যে আকাশ-পাতালের মতই প্রচণ্ড প্রভেদ! ইলিয়াডে যুধ্যমান উভয় পক্ষে সাহায্যকারী দেবদেবীদের প্রচুর সংখ্যক দেখতে পাই, যোদ্ধাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন দেব বা দেবীপুত্র এবং দেবানুগৃহীত ব্যক্তিবর্গ। রামায়ণের সঙ্গে "ইলিয়াডে"র মিল যৎসামান্য, অমিলটাই প্রকাণ্ড। রামায়ণে এক সত্যসন্ধ মহাত্যাগী রাজকুমার তাঁর সাধ্বী-পত্নীর উদ্ধারের জন্য রাক্ষসপুরী ধ্বংস করেছেন, আবার সেই লক্ষ্মীস্বরূপা পুণ্যবতী নারীকে লোকাপবাদের ভয়ে বারম্বার প্রত্যাখ্যান করেছেন, এমন কি নিরপরাধিনী জেনেও অসহায় অবস্থায় লোকাপবাদে তাঁকে বর্জ্জন করতেও বাধ্য হয়েছেন। ইলিয়াডে এক দুশ্চরিত্রা স্বেচ্ছাচারিণীর জন্য গ্রীকরাজারা ইলিয়াস বিধ্বংস করেছেন, হেলেন প্রথমে প্যারিসকে, তারপর তাঁর মৃত্যু হ'লে ডিইফোবাসকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করেছেন, তারপর যখন গ্রীকপক্ষের জয় নিশ্চিত বুঝেছেন, তখন ডিইফোবাসকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক ধরিয়ে দিয়ে নিজে নিরীহ নির্দোষী সেজে স্বামীর ক্ষমা লাভ করেছেন এবং অবশিষ্ট জীবন তাঁর সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে গেছেন। আদর্শ বটে! গ্রীক পক্ষের প্রধান

বীর একিলিস একটি রূপসী বন্দিনীকে না পেয়ে অভিমান করে যুদ্ধ ছেড়ে বসে আছেন এ দৃশ্যও দেখা যায়। এই কাহিনীর সঙ্গে রামায়ণের একত্র নাম করতেও আমরা লজ্জিত হই। মিনিলাসের ভাই গ্রীকপক্ষের প্রধান সেনাপতি আগামেম্‌নন্‌ যুদ্ধজয়ের পর দেশে ফিরে দুশ্চরিত্রা পত্নী ক্লিটেমনেষ্ট্রার হাতে প্রাণ হারান, আবার ওডিসিউসের সাধ্বী পত্নী 'পেনিলোপি' দীর্ঘ বিশবৎসর ধ'রে সহস্র প্রলোভন এবং দুর্দ্দান্ত পাণিপ্রার্থীদের উন্মত্ত আবেদন অগ্রাহ্য করে স্বামীর পথ চেয়ে আছেন। এই রকম ভালো মন্দ শত সহস্র ছোটো বড়ো বাস্তব এবং কল্পিত-চরিত্র গ্রীকপুরাণ এবং প্রাচীন গ্রীকসাহিত্যে দেখতে পাই। প্রমিথিউস মানবের কল্যাণের জন্য স্বর্গ থেকে অগ্নিকে চুরি করে মর্ত্তে নিয়ে এলেন, প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবরাজ মানুষকে শাস্তি দেবার জন্য সৃষ্টির প্রথমা নারী 'প্যাণ্ডোরা'কে পাঠালেন সর্বগুণান্বিতা সুন্দরী রূপে। 'এপিমিথিউসে'র অনুরোধে প্যাণ্ডোরা তাঁর পাণিগ্রহণ করলে তাঁর সঙ্গের দেবদত্ত যৌতুকের পেটিকাটি খোলা হ'ল। জগতের যত কিছু রোগ, শোক, ঘৃণা, বিদ্বেষ, লোভ, মোহ তার ভিতর সঞ্চিত হয়েছিল, বেরিয়ে এসেই দেখতে দেখতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বাক্সর তলায় একমাত্র পড়ে রইল আশা, তার মাধুর্য্য দিয়ে মানুষের দুঃখ-কষ্ট একটুখানি লাঘব করবার জন্য। প্রাচীন গ্রীসের ভ্রাতৃ-প্রেমের আদর্শ দেখা যায় রাজকন্যা আন্টিগনির মধ্যে। রাজরোষ উপেক্ষা করে তিনি ভাই পালিনিসিসকে কবর দিয়েছিলেন, সেজন্য তাঁকে জীবন্ত সমাহিত হ'তে হয়। গ্রীকপুরাণে সপত্নীপুত্রকে হত্যার জন্য থিসিউস্‌-পত্নীর তার নামে কুৎসিত কলঙ্ক আরোপ,

কুহকিনী সার্সির পতিহত্যা, সাইরেনদের মধুর কণ্ঠস্বরে ভুলিয়ে নিরীহ নরহত্যা উল্লেখযোগ্য কদর্য চিত্র। একদিকে স্বামীর উপর প্রতিহিংসা নে'বার জন্য 'প্রোকু' নিজের ছেলেকে কেটে তার মাংস স্বামীকে খাওয়াচ্ছেন, এই লোমহর্ষণ চরিত্র-চিত্র যেমন দেখা যায়, তেমনি আর একদিকে সন্তানগর্বে দেবতাকে অবজ্ঞা করে 'নায়োবি' দেবরোষে তেরোটি সন্তানের মৃত্যু দেখে কেঁদে কেঁদে পাথর হ'য়ে গেছেন, সেই পাথরে শুধু নিরন্তর অশ্রুর ঝরণা ঝরছে, এই করুণ কথা-চিত্রও পাই। ভারতীয় পুরাণের সঙ্গে তুলনায় গ্রীক পুরাণে 'মন্দ চরিত্র' অনেক বেশী এবং তা' অতি কদর্য! পিতৃঘাতিনী 'স্কাইলা', পতিঘাতিনী 'আসিওনি', 'ক্লিটেমনেষ্ট্রা' প্রভৃতির দল গ্রীসে যত সুলভ, ভারতে তেমন নয়, বরং তুলনাই হয় না। উর্বশীর অভিশাপও ভারতে বার বার ঘটেনি! বঙ্গ-সাহিত্যের ছোটখাট দেবীরা ভক্তদলের পতন অবস্থার সহায়তা নিয়ে পূজালোভে অনেকের উপর অত্যাচার করলেও মানবের রূপমোহে গ্রীকদেবীদের মতো কদর্য্য মনোবৃত্তির আদৌ অধিকারিণী ছিলেন না। চণ্ডী, মনসা, শীতলা যিনিই হোন না কেন, নিজ নিজ সতীধর্ম্মে অচলা থেকেই শুধু প্রতিহিংসাবৃত্তিরই চরিতার্থতা করেছেন, নিজের পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে; এই পর্য্যন্ত! এদেশে চরিত্রহীন ইন্দ্রের পত্নী পতিব্রতা ইন্দ্রাণী।

রোমান কল্পনারাজ্যে গ্রীসের প্রভাব এত বেশী এবং অনুকরণ-স্পৃহা এত প্রবল যে, তাকে গ্রীক কল্পনারাজ্যেরই অক্ষম রূপান্তর-বলা চলে। দেবদেবীরা তো অধিকাংশই গ্রীস এবং মিশরের, এমন কি পারস্যের আমদানী। জিউস্‌কে জুপিটার, হীরাকে

জুনো, আর্তিমিসকে ডায়ানা, আথেনাকে মিনার্ভা, আফ্রোদিতেকে ভিনাস প্রভৃতি রোমান নাম দিয়ে রোম নিজস্ব করে নিয়েছিল মাত্র, সেই জন্য এঁদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'কামিনা' প্রভৃতি সুপ্রাচীন দেশজ দেবীদের রোম গ্রীক 'মিউজ'দের রূপান্তর বলে স্বীকার করে প্রকারান্তরে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রীসের দাসত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। রোমের মহাকাব্য 'ইনিয়ার্ড' আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বৎসর আগের রচনা, তাকে নিছক কবিকল্পনা বললে অত্যুক্তি হবে না। ইনিয়াস রোমক সম্রাটদের পূর্বপুরুষ, তিনি ইলিয়াসের রাজকুমার, গ্রীকদের আক্রমণে স্বদেশ ধ্বংস হওয়ায় তিনি দেশে দেশে ঘুরে শেষে সাত বৎসর পরে একদিন টাইবার নদীর তীরে রাজা ল্যাটিনাসের রাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন। রাজকন্যা ল্যাভিনিয়ার মা—'আমাতা' তাঁর সঙ্গে 'টার্ণাসে'র বিয়ের ঠিক করেছিলেন, রাজা ইনিয়াসকেই কন্যা দান করতে সম্মত হলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে টার্ণাসকে হত্যা করে ইনিয়াস রাজ-কন্যাকে লাভ করলেন! রাণী আমাতা ইনিয়াসকে জয়ী হ'তে দেখে তাঁর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ক্ষোভে আত্মহত্যা করলেন। এই যুদ্ধে ভলসিয়ান বীর নারী ক্যামিলার মৃত্যু বর্ণনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। গ্রীসের অগ্নিদেবী হেষ্টিয়া রোমে 'ভেষ্টা'রূপে পূজা পেতেন, তাঁর মন্দিরে অনির্বাণ অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে রাখার জন্য কুমারী দেবদাসীর দল নিয়োজিত ছিলেন। রোমের সমাজ যখন প্রচণ্ড ঐশ্বর্যমদে অন্ধ এবং বিলাসস্রোতে মগ্ন হ'য়ে অত্যন্ত কলুষিত হয়েছিল, সেদিনও সেই চিরকুমারী পূজারিণীরা তার সামনে ত্যাগের এবং পুণ্যের দীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। রোমের পরবর্তী যুগের বহু ভালোমন্দ নারী-

চরিত্রের সন্ধান আমরা জানি, যাঁরা সম্পূর্ণ ইতিহাসের বিষয়ীভূত, তাঁদের কথা এ প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়।

সমসাময়িক আর দু'একটি জাতির প্রাচীন সাহিত্যের উল্লেখ না করলে কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকবে। ইহুদীদের 'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট' ইতিহাস এবং উপকথার অপূর্ব সমন্বয়, খৃষ্টীয় এবং মুসলিম সমাজের লোকেও এই বইখানিকে তাঁদের নিজেদের সাহিত্য বলে মনে করে থাকেন, অন্ততঃ তার প্রাচীন কাহিনীকে সত্য ব'লে স্বীকার করেন। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের গোড়ায় সৃষ্টি'র প্রারম্ভে আদিমাতা 'ইভ্' বা 'হাওয়া বিবিকে' দেখতে পাই, শাস্ত্রমতে তাঁর অনুরোধে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে আদি পিতা 'আদম' সস্ত্রীক স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছিলেন। তারপর থেকে বিভিন্নযুগের কাহিনীর মধ্য দিয়ে ইহুদী নারীর বহু চিত্র ঐ বইখানিতে দেখা যায়, মাত্র কয়েকটি উল্লেখ ক'রব। রাজা ডেভিডের প্রপিতামহী 'রুথ্' তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর শাশুড়ী 'নাওমি'র জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, পুত্রহীনা বৃদ্ধা তার পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে এক বৃদ্ধ জ্ঞাতির বাড়ী পাঠিয়ে তাঁর হৃদয় জয়ের কলা-কৌশল শিখিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছেড়েছিলেন। স্যামসনের প্রিয়া 'দেলিলা' সেই মহাবীরকে বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুহস্তে সমর্পণ করেছেন। নারীর জন্য পুরুষ মহাপাপ করছে এবং ইন্দ্রিয়সংযমের অভাবে নারী শ্বশুর এবং পিতাকে পর্যন্ত কামনা করছে, রাজ্যলাভের জন্য পুত্রহত্যা করছে, এ-সব দৃশ্য সেদিনের চরম নৈতিক অবনতিরই সাক্ষ্য দেয়! নিঃসন্তানা হানা'র দেবতার কাছে সন্তান উৎসর্গ করার মানত এবং পুত্র স্যামুয়েলকে দান, তারই মধ্যে একটু ভিন্ন আদর্শের আভাস দিয়েছে। ইহুদী

পুরাণের দুটি বিখ্যাত চরিত্র 'বাথসেবা' এবং 'সেবার রাণী'। 'বাথসেবা'কে পাবার জন্য রাজা ডেভিড বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁর স্বামীকে হত্যা করান। সেবার রাণী ডেভিডের পুত্র সলোমনের সঙ্গে দেখা করতে এসে স্বেচ্ছায় তাঁকে আত্মদান করেন। ইথিওপিয়ার রাজারা আজও সেবার রাণীর বংশধর বলে পরিচয় দেন এবং দিতে লজ্জিত হ'ন না।.

গ্রীক রোমানদের পর যে সব জাতি পাশ্চাত্যজগতে প্রাধান্য লাভ করেছে তাদের অর্থাৎ ইংরাজ জার্মান প্রভৃতি জাতির মূল পুরাণকে নরওয়ের পুরাণ বলা চলে। তা'তে যে সব দেবী এবং মানবীদের দেখা পাই, তাঁদের মধ্যে স্বর্গের রাণী 'ফ্রিয়া' বা সৌন্দর্য-দেবী 'ফ্রিয়া' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর রণরঙ্গিনী সঙ্গিনী ভ্যাল্‌কির্‌'দের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন এবং সম্মুখসমরে যে সব বীর প্রাণ দিত, তাদের নিজের সভায় নিয়ে এসে 'হাইড্রুন' ছাগলের দুধ এবং 'সেহ্রিম্‌নি' শূকরের অক্ষয় মাংস খাওয়াতেন। ফ্রিয়ার এক ছেলে আলোকদেবতা 'বল্‌ডার', আর এক ছেলে অন্ধকারের অন্ধদেবতা 'হোডার'। হোডার খেলাচ্ছলে 'মিস্‌ল্‌-টোর' তীর ছুড়ে ভাইকে হত্যা করলে তাঁকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা হয়েছিল। অদৃষ্টদেবী 'ভলা', মৃত্যুদেবী 'হেলা' প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণা দেবীদের সঙ্গে এই সূত্রে আমাদের পরিচয় হয়। হেলা বললেন, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী যদি বল্‌ডারের জন্য কাঁদে, তবে তাকে ফিরিয়ে দেবেন, কিন্তু দানবী 'থক্‌' বা ছদ্মবেশী দেবতা 'লোকি' বল্ডারের জন্য কাঁদতে রাজি না হওয়ায় তিনি জীবন ফিরে পেলেন না। শেষে পৃথিবীদেবী 'রিণ্ডার' গর্ভে দেবরাজ ওডিনের 'ভ্যানি' নামক পুত্র জন্ম নিলে, সে অন্ধকারের

দেবতা বৈমাত্রেয় ভাই হোডারকে হত্যা করে বলডারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিলে। বলা বাহুল্য ভারতীয়, এমনকি,—গ্রীক পুরাণের পাশেও এই সব বর্বর জাতির কাহিনী নিতান্তই বাল-সুলভ বলে মনে হয়।

এর অনেক পরের যুগে আরব পারস্যের কবি-কল্পনায় ধরা-পড়া একটি নারীরত্নের কথা এই সঙ্গেই আমরা উল্লেখ করছি।

ভারতের বাইরে যে কয়েকটি কল্পিত নারীচরিত্র পৃথিবীর সকল দেশের মানব মানবীর আপন জন রূপে অভ্যর্থিত হয়েছে. তার মধ্যে বহু অভিজ্ঞ পণ্ডিতের মতে বিশ্ব সাহিত্যে আরব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দান "আলফ লয় লহবা" বা একাধিক সহস্র রজনী। 'আরব্য উপন্যাসে'র 'শাহার জাদী' চরিত্র সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠ নারীদের অন্যতমা। পারস্যরাজ শাহরিয়র নিজের প্রিয়তমা পত্নীর দুশ্চরিত্রতায় সমস্ত নারীজাতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রতি রাত্রে একটি সুন্দরীকে বিয়ে করতেন এবং সকাল বেলা তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেন। সমগ্র নারীজাতিকে এই ভাবে হত্যা করে তিনি রাজ্যের ব্যভিচার দূর কর্বার দুশ্চেষ্টায় নিরত ছিলেন, কিন্তু বুদ্ধিমতী মন্ত্রিকন্যা শাহার জাদী তাঁর এই মহদুদ্দশ্যে বাধা প্রদান করলেন। তিনি স্বেচ্ছায় রাজাকে বিবাহ করলেন এবং তাঁর ভগ্নী "দীনার জাদী"কে লক্ষ্য ক'রে এক হাজার এক রাত্রি ধরে কত বিচিত্র কাহিনীর রস রচনা দিয়ে নারীঘাতী রাজাকে নারী-মহত্ত্বে মুগ্ধ করলেন, ও শেষ পর্যন্ত তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে রাজার মধ্যের দুর্দ্ধর্ষ প্রতিহিংস্র বুদ্ধি পরাভূত হয়ে তাঁর কাছে নতি স্বীকার করল।

প্রাচীন পারস্যের লেখিকাদের সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু

জানি না, আরবের প্রাচীন কবি 'খান্‌শা'র মতো খ্যাতিলাভ অন্ততঃ তাঁরা কেউ করেন নি। 'রাবেয়া'র পরে বহু সুপণ্ডিতা ধর্মজ্ঞা নারী পারস্যে দেখা দিয়েছিলেন, তাঁদের নামও এখানে দেওয়া গেল না। আধুনিক লেখিকাদের মধ্যে যাঁরা সব চেয়ে বেশী খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের নাম 'পারবীন খানুম এ'তে শামী' এবং 'ফজলেবাহার খানুম ইরান-উদ্দৌলা' তাঁর কবি নাম 'জান্নৎ'। শামীর ভাষা সরল এবং ভাব সহজবোধ্য, ফজলেবাহার বা 'জান্নতের গজল্‌গুলিতে মধ্যযুগের মরমীয়া সাধকদের অন্তর্গূঢ় প্রকাশভঙ্গী একদিক দিয়ে সেগুলিকে যেমন মর্মস্পর্শী করেছে, অপর দিকে সাধারণের পক্ষে সেগুলিকে খানিকটা দুষ্পাচ্য করেছে। দু'জনের লেখা থেকে দু'টি নমুনা দে'ব। শামীর লেখাটি স্থিরবুদ্ধি এবং চিন্তাশীলতার পরিচায়ক :

শামী—

"জানো কি তোমরা-নারী ও পুরুষ—কার কি কাজের ভার ?
একজন এর তরণী, বন্ধু, অপরে কর্ণধার।
কাণ্ডারী যদি হয় হুঁসিয়ার, তরী যদি দৃঢ় হয়,
ঝঞ্ঝাতুফানে জলাবর্তেতে বলো তবে কিবা ভয় ?
কালসমুদ্রে উঠুক ঊর্মি,—কি করিবে, এরা দোঁহে,
নিজ নিজ কাজ, যদি করে আজ অবিচল আগ্রহে ?
আজ যে কন্যা-সেই হবে জেনো আগামী দিনের মাতা।
সুসন্তানের মহিমা-সৌধ জননীরই হাতে গাঁথা।"

জান্নৎ—

"একদা প্রভাতে বুল্‌বুল, কাঁদি' কহিল মোরে,
যদি বসন্ত এসে থাকে আজি ভুবন ভ'রে,—

বনে-বনান্তে যদি লেগে থাকে খুশীর ঢেউ,—
'লালা'* কেন লুটে বুকে ল'য়ে ক্ষত—বলো না কেউ?
যদি এসে থাকে সুখের সময় সবারি,—তবে
কেন 'বানাপ্স'† শোকবাস পরি' সরিয়া র'বে?"

জগতে একসঙ্গে যে সবাইকে সুখী করা সম্ভব নয়, উৎসবের' আনন্দের পাশে দুঃখের অশ্রু যে চিরদিন অপরিহার্য এই সহজ সত্যটিকে কবি মর্মস্পর্শী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। আধুনিক পারস্য নারীর কাব্যপ্রতিভার পরিচয়স্বরূপ এই দুইটি কবিতাই যথেষ্ট ব'লে মনে হয়।

অহল্যা দেবযানী প্রভৃতির কর্মোত্তর ফলাফলের মধ্যেই তাদের কৃত কর্মের প্রত্যুত্তর দেওয়া রয়েছে। শেষ প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা না করে শেষ উত্তর বজ্রানলে লিখা হয়ে গেছে। "দময়ন্তী" "চিন্তা" "সুনীতি" শর্ম্মিষ্ঠাও আছেন, "উর্ব্বশী" "রম্ভা" "তিলোত্তমা"দেরও অভাব নেই, কিন্তু মহীয়সী মহাভাগারাই সর্ব্বত্র পূজনীয়া। দার্শনিকদের মধ্যে সাংখ্যকার নিষ্ক্রিয় পুরুষকে বৃহন্নলারূপে নির্বাসিত রেখে প্রকৃতির উপরেই পূর্ণ দায়িত্ব চাপিয়েছেন। আবার বৈদান্তিক;—"অব্যক্তনাম্নী পরমেশ-শক্তি অনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরাঃ।"

কার্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া যয়া জগৎ সর্বমিদং প্রসূয়তে।"

এইরূপে তাঁর "মায়ামূর্ত্তি"কে সর্বদোষাকর বলে তাঁর অস্তিত্বই

* টিউলিপ ফুল, লালরং, মাঝে কালো দাগ সেই দাগটিকে ক্ষত বলা হয়েছে।

† 'ভায়োলেট' ফুল বেগুনি রং। উহাকে মুসলিম ও খৃষ্টান জগতের কালোরঙের শোকবস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

বিলুপ্ত করেই দিয়েছেন। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীরা তো ভূত ছাড়াবার মন্ত্রোচ্চারণের মতই ;—"নার্য্যা পিশাচ্যা" "দ্বারং কিমেকং নরকস্য নারী" "প্রাণভৃতা শৃঙ্খলা" প্রভৃতি কটু-কাটব্যের শেষই রাখেন নি ! তাঁরা তা' না কর্ব্বেনই বা কেন ? মাতৃত্যাগী, কুমার-সন্ন্যাসীরা পত্নীর প্রেম ও পুত্রীর শ্রদ্ধা লাভ না করে, প্রলোভিকার পরিচয়ই হয়ত জীবনে একমাত্র পেয়ে থাকবেন, কিন্তু গৃহী-ঋষিরা বা বৈদিক আচার্য্যেরা রীতিমত নারী-পূজা মাতৃ-পূজার সাধনা করে গেছেন। বেদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে আজও তা' সুস্পষ্ট হয়ে থেকে হিন্দুর 'সমাজ' 'ধর্ম' নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষের জীবনে নারীর প্রয়োজনীতা ও সাহচর্য্য যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, সে কথা তাঁদের প্রবর্তিত সমুদয় গার্হস্থ্য বিধানে ও আইনে কোথায়ও তাঁরা এতটুকু বিস্মৃত হননি। "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—মহাপ্রকৃতিকে এইরূপে বিশ্লেষণ করে গার্হপত্য স্থাপয়িতারা তাঁকে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃ-রূপেণ সংস্থিতা," বলে সভক্তি বন্দনা করেছেন। তাঁদের মতে "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে", তাঁদের মতে পত্নী পতির শুধু সহধর্মিণীই নন, তিনি,—"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলা-বিধৌ।"

তাঁরা বলেছেন ;—সতী স্ত্রীর এত তেজ যে, দুর্বৃত্ত স্বামীকেও,

"ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালান্ বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তদ্বৎ পতির মাদায় স্বর্গেণ সুখমেধতে।"

সাপুড়ে সাপকে যেমন গর্ত্ত থেকে টেনে বার করে, তেমনি করে তাঁকে অধর্ম থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ। নারীকে তাঁরা বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে, বার্ধক্যে কোন অবস্থায় নিরাত্মীয়

হয়ে জীবিকার্জনের জন্য পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দাঁড়াতে দিতে একান্তই নারাজ ! পিতা পতি পুত্র ব্যতিরেকেও আত্মীয়েরা এই জন্যই তাঁদের ভরণভার গ্রহণ করতে আইনতঃ বাধ্য। নারীকে এত মর্যাদা অন্য কোন সমাজ কোনদিন দেয়নি। চীনে জাপানে ইউরোপে প্রাচীন রোমে গ্রীসে বিশেষ করে ইংলণ্ডে নারী বহুস্থানে অমর্যাদার মধ্যেই এই সেদিন পর্যন্ত আইনতঃ বদ্ধ ছিল। কোথাও পুরুষের সম্পত্তিরূপে, কোথাও তার অধীনা সেবিকারূপে। আবার কোন কোন সমাজের ধর্মগুরু নারীর পৃথক্ আত্মা আছে বলেই স্বীকার করেন না।

বৌদ্ধনিরসনকারী কুমারিল ভট্টই "অহল্যা" "দ্রৌপদী" "কুন্তী" প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অস্বাভাবিক অনার্যোচিত পরিস্থিতির প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রচার করে নারীমর্যাদার কলঙ্ক মোচন করেছিলেন। বুদ্ধ সাধারণত নারীবিদ্বেষী বলে প্রখ্যাত হলেও নারীকে ধর্মরাজ্যে সমানাধিকার দিয়ে শ্রমণী ভিক্ষুণীরূপে বহু মহীয়সী নারীর দীক্ষিত হ'বার সহায়তা তিনি করেছিলেন। মহম্মদও নারীকে নিজের আত্মার মত ভালবাসতে নির্দেশ দিয়েছেন। যিশু নর-নারীকে পৃথক করেননি, বৌদ্ধবাদের মধ্যেও বহু বাস্তব ও কল্পনা কল্পিতাদের মহত্তর ও নিকৃষ্টতম পরিচয় "থেরিগাথা" ও অবদানের মধ্য দিয়ে পাওয়া গেছে। তার মধ্যে বহু দেবী, বহু মানবী, বহু দানবী, এমন কি নর-কল্পনার নিকৃষ্টতম সৃষ্টিও দেখা দিয়েছে।

সংস্কৃত কাব্য নাট্য সাহিত্যের পূর্বে আমাদের ব্যাস-বাল্মীকির স্রষ্টাদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করতে হবে। ঐতিহাসিক ভিত্তি ছেড়ে দিয়ে আমরা তাঁদের সাহিত্যিক ভিত্তির উপরেই

আলোচনা স্তব্ধ করছি। রামায়ণের প্রত্যেকটি চিত্র যে মহা কবির যাদু তুলিকায় তুলিত হয়েছিল, আজও তার তুলনা নেই। কৌশল্যা পত্নীত্বে মাতৃত্বে সত্যসন্ধ পতির সত্যার্থ-গ্রহণে সর্বত্রই পরিপূর্ণ নারীচিত্র। পতির অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে তাঁর সত্যকে নিজ সত্য বলেই স্বীকার করে নিয়ে প্রাণাধিক পুত্রকে বনবাসী হ'তে অনুমতি দান,—এ নারীচিত্র কোন্ কবি-কল্পনায় স্থান পেয়েছে? কৈকেয়ীর অন্ধ পুত্র-বাৎসল্য সংসারের মহা অকল্যাণকর হলেও মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সুমিত্রা ছায়ানুগা;—পুত্রকে সপত্নীপুত্রের হাতে নিঃস্বার্থ ও নিঃস্বত্ব হয়েই তিনি দান করেছেন। বধূ ঊর্মিলারা, নিতান্তই শান্তশীলা, তাই 'কাব্যে উপেক্ষিতা'। সীতা কিন্তু তা' ন'ন। তাই আদর্শের দিক দিয়ে হিন্দু নারীর চিরবরণীয়া। সমাজ যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়েছে কিন্তু বাল্মীকির সীতা মহিমার সূর্যমণ্ডলে চির অবস্থিতা অথচ কর্ত্তব্য পরায়ণা সীতা তাঁর পতির উপদেশেও পতির অনুবর্তন থেকে বিরতা থাকেন নি, রীতিমত তর্ক ক'রে নিজ মত বজায় রেখেছেন। কিন্তু প্রজার ইচ্ছায় ঐ সম্রাজ্ঞী-সীতাই আবার পতির কর্ত্তব্যকে তাঁর সম্পর্কে অন্যায় হচ্ছে জেনেও তাঁর প্রদত্ত রাজ-দণ্ডকে সামান্য প্রজার মতই নির্বাধে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

সে যুগের অনার্য জগতেরও সুষ্ঠু ইতিহাস দুদিক থেকে দুই ভাবের নারীচরিত্রে ফুটে উঠেছে, রাবণের ও বালির সংসারে অসংযম ও শক্তিমদ-মত্ততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে এবং তারই অনিবার্য ফলে চরম উত্থান-পতনের ইতিহাসে। দেখা যায়, রাবণ-পরিবারে এই দৃষ্টান্ত চরম পরিণতি লাভ করেছিল, যাকে লক্ষ্য করে দূরদর্শী নীতিকার বলেছেন ;—

"অতোঽসপত্নান্ জয়তে, সমূলেন বিনশ্যতি।"

বালি-পরিবারেও প্রায় ইহারই অনুরূপ দৃশ্যই দেখা যায়, যথা;—বিতাড়িত কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী 'রুমা'কে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বলবান্ রাজা গ্রহণ করেছেন, ত'াতেও লোকনিন্দা বা প্রজাদ্রোহ ঘটেনি! অপর পক্ষে সুগ্রীব রাজা হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-জায়া বিদুষী ও রাজ-নাতিজ্ঞা 'তারা'কে তার পাটরাণী করাতেও রাজ্যের প্রজাবৃন্দ নির্বিচারেই সেই অনাচার মেনে নিয়েছে। এখানে স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে, সে দেশের ও সেই সমাজের সেইরূপই প্রথা ছিল।

আজও ভারতের দক্ষিণ-পূর্বদিকে কোন কোন সমাজে এই প্রথা বর্তমান আছে। অথচ ঠিক সেই একই সময়ে লক্ষ্মণ ভ্রাতৃজায়া সীতা দেবীর চরণপদ্ম দর্শনে ধন্য হচ্ছেন, মুখ দর্শন করতেও কুণ্ঠানুভব করে থাকেন।

পূর্বে বলেছি, কল্পিতা-পারস্যের নারী তাঁদের কল্পিত-সর্বনাশের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচলো একটা নারীর বুদ্ধিকৌশলে! এই জগৎ বিখ্যাত পুস্তকটী* প্রাচীন আরবের মরুবাসী মূর থেকে প্রাচীন ও নবীন ধর্মের সংমিশ্রিত ও আরব্য পারস্য সভ্যতার বহু চিত্র ও বিচিত্রতর তাদের পূর্বতন সমাজ, রাষ্ট্র, বাণিজ্য প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। "পারস্য সুন্দরী" "বেদৌরা", "আবুর পত্নী", এবং আলিবাবার সুবিখ্যাতা "মর্জিনা" "ইবনেহোসেনের" পত্নী খলিফা কন্যা রোসেনা প্রভৃতি পতিপ্রাণা কূটবুদ্ধিশালিনী উচ্চাঙ্গের নারীদের দেখা ওর মধ্যে আমরা পাই, আবার অতি হীনচরিত্রারাও যে সে যুগে কিছু কম ছিলেন

* আরব্য উপন্যাস।

না, তা'ও ওতে দেখা যায়। "মায়াবিনী রাণী" একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! "পারস্য উপন্যাসে" নারীর অ-কল্যাণী মূর্তিই আমরা বড় বেশী দেখি, তবে সর্বদেশে সর্বকালে ও সর্বজাতির মধ্যেই ভালমন্দ পাশাপাশি বর্তমান আছে। সমাজ-পরিস্থিতি যখন যেরূপ থাকে, ভাল বা মন্দের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় মাত্র।

মহাভারতের বিরাট সমাজে বহু রাজবংশ ব্রাহ্মণকুল এবং আর্যেতরেয় জাতির ঐতিহাসিক ও সমাজিক চারিত্রিক পরিচয় আমরা পেয়েছি। কিন্তু সে যুগ রামায়ণের যুগের চেয়েও রূপকের জটিল জালে সমধিক কুহেলিকাচ্ছন্ন। সত্যবতীর জন্ম ও কুন্তীর মাতৃত্ব একান্তই অবিশ্বাস্য! সেদিনে এবং তার বহু দিন পরেও এমন কি, এই সেদিনেও শক্তিমানের জন্মকথা কোথাও প্রায় নৈসর্গিক আকারে থাকতে পায়নি!

দেবতা ও ঋষি মানব ও মানবীকে তাঁদের স্বেচ্ছা-সুখে শাপ বর এবং ত্যাগ গ্রহণ যথেচ্ছ ভাবেই করে গেছেন দেখা যায়। ঐ উদ্ভট ব্যাপার গুলি যদি সত্য হতো, তা' হলে তা'কে লুকিয়ে রাখাই হতো স্বাভাবিক। সগর্বে সুপ্রচারিত করা হ'ত না। পূর্ণ-যৌবনা দ্রৌপদীর যজ্ঞকুণ্ডের আহুতাগ্নির মধ্য থেকে জন্মও যেমন বিশ্বাস্য, পঞ্চপতিত্বও তেমনি প্রামাণ্য! একটা মানতে গেলে আর একটাকে ছাড়া চলে না। দেখা যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরেরই ধর্মপত্নী তিনি। 'ভিক্ষান্নের মত' কুরু-রাজবংশের শ্রেষ্ঠ স্থানীয়রা তিব্বতীয় বর্বর প্রথা গ্রহণ করলেও প্রবল সমাজ ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ তা' মেনে নিতেন না। বিশেষতঃ অতবড় শত্রুপক্ষ যেখানে বর্তমান! তবে দ্রৌপদী যে কবির একটি অতুলনীয়া নারীসৃষ্টি একথা একটুও অত্যুক্তি

নয়! তাঁর পূর্বে বা পরে আর কেহ এ চিত্র অঙ্কিত করতে পারেন নি। যেমনি দৃপ্তা সিংহিনীর মত তেজস্বিতা, তেমনি সর্বশাস্ত্রে ও কূট রাজনীতিতে অখণ্ড অধিকার, তেমনি আবার নারীধর্মে ভগবদ্‌ভক্তিতে এবং অতিথিসেবায়, রন্ধনাদিতে অসাধারণ পারদর্শিতা দশভূজা দুর্গার মতই যেন এ মেয়ে দশকর্মান্বিতা।

পাণ্ডবের সমস্ত সুখ-সম্পদে দ্রৌপদী তাঁদের সর্বোত্তম ঐশ্বর্য, শ্রীকৃষ্ণের মতই কৃষ্ণাকেও যেন তাঁর সম পর্যায়ে ধরা চলে।

সুভদ্রা গান্ধারী কুন্তী সত্যবতী ভারত-চিত্রের বরণীয়া নারী। কর্তব্যের অটুটতায় পরোপকার বৃত্তির চরমোৎকর্ষে, সুদৃঢ় ধর্মবিশ্বাসে এই সকল নারীরা জগতে আদর্শস্থানীয়া। গান্ধারীর মত কুন্তীর মত মা-ই যথার্থ জননীপদবাচ্যা।

মাতৃচরিত্র অঙ্কনে মহাভারতকার জগতের সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রকৃত মাতৃপদবাচ্যা ভারতনারীদের যে সব পরিচয় পৌরাণিক সাহিত্যে পাই, তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয় এবং যাঁরা অখ্যাত-পরিচয়া থেকে গেছেন, নিশ্চয়ই তাঁরা আরও বহুতরাই ছিলেন। মদালসা সর্ববিদ্যা বিশারদা, তিনি পুত্রগণকে অধ্যাত্ম-বিদ্যা দান ক'রে পরলোকে উচ্চ স্থানাধিরোহণের সহায়তা করেছেন।

পরপুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য কুন্তীর নিজের পুত্র ভীমকে রাক্ষসের মুখে প্রেরণ করার মধ্যে কত বড় মহত্ত্ব নিহিত রয়েছে আজকের দিনের মা আমরা তার কি বুঝবো!

গান্ধারী দুর্মদ সমর সাগরে ঝম্পপ্রদানোদ্যত মাতৃ-আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী পুত্রকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন; "যতো

ধর্মস্ততো জয়ঃ”—অর্থাৎ ধর্মহীনের পক্ষে জয় লাভ সম্ভবপর নহে। অথচ তাঁর নিজ পুত্রের পক্ষই যে অধার্মিক পক্ষ সে কথা তিনি ভালই জানতেন।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যুগের সাহিত্যে আমরা আরও বহু মহীয়সী নারীর সাহিত্যিক চিত্র দেখতে পেয়েছি। ভবভূতির সীতা তার মধ্যে অন্যতমা। ভবভূতির শ্রীরামচরিত্র রামায়ণের রাজধর্মের অমোঘ শাসনে শাসিত রাজা রাম নহেন, তাঁর রাজবেশের অন্তরালে এই রূপটী তিনি তাঁর কাব্যে প্রকটিত করেছেন ;—

অনির্ভিন্নগভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ।”

সীতা বিরহ জনিত রামের শোক পুটপাকের মত হৃদয়কে দগ্ধ করলেও তাঁর একান্ত স্থৈর্য স্থির গম্ভীর প্রকৃতির জন্য তাঁর অন্তরের কঠিন নিগূঢ় বেদনা বাইরে কেউ জানতে পারে না। মুরলার মুখোচ্চারিত ভগবতী লোপামুদ্রার রামচরিত্রের এই গভীর অনুভূতি এবং পূর্বস্মৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হ'লে অকস্মাৎ হয়ত তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ধ্বসে পড়ে কোন সর্বনাশই ঘটিয়ে ফেলবে, সহানুভূতিপূর্ণ চিত্তের এমনও আশঙ্কাঙ্কিত প্রেমিক শ্রীরামচন্দ্র। তাই তাঁর সহধর্মিণীকেও আমরা তাঁরই অনুরূপ বিরহ-বেদনার মূর্ত-প্রতীকরূপেই রামচন্দ্রের নিকট অদৃশ্যা হলেও আমাদের নিকট দৃশ্যমানা শরীরধারিণী বিরহব্যথা এবং মূর্তিমতী করুণ রস স্বরূপা দেখি এবং গভীরতর সহানুভূতি অনুভব ক'রে থাকি। কবি তাঁকে এইভাবে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন ;—

"পরিপাণ্ডু দুর্বল কপোল সুন্দরম্, দধতী বিলোলকবরীকমাননম্,
করুণস্য মূর্তিরথবা শরীরিণী, বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী।"

কবি তমসার মুখে অটুট রাজধর্মপরায়ণ, প্রজারঞ্জনার্থ পত্নী-ত্যাগী শ্রীরামচন্দ্রকে ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা বলেই অভিমান-ভরে সীতার কাছে উল্লেখ করেছেন, এ'ও যেমন স্বাভাবিক, আবার মেঘনিনাদে উৎকণ্ঠিতা ময়ূরীর মত শ্রীরামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শুনে উচ্চকিতা সীতা দেবীর কণ্ঠোচ্চারিত, "আমি কণ্ঠ-স্বরেই বুঝিয়াছি আর্যপুত্রই কথা কহিতেছেন!" এই নিরভিমান সম্বন্ধ স্বীকারসূচক বাক্যও তেমনই তাঁরই পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছে। এখানে মানবচিত্তবৃত্তিতে অভিজ্ঞ কবি অতি সুন্দর দুটি ভাব প্রকাশ করে দেখিয়েছেন, প্রেমাস্পদের পদধ্বনি কণ্ঠস্বর অন্যের কাছে তুচ্ছ হলেও প্রেমিকার পক্ষে যতদিনেরই অদর্শন হোক, অতি পরিচিতই থেকে থাকে। আর একটি প্রকৃত উচ্চমনা আর্যমহিলার চারিত্রিক অভিজ্ঞতা তাঁর লেখায় দেখা যায়, সেটী এই, পতিগতপ্রাণা উদারহৃদয়া ক্ষমাশীলা সতী পতির প্রতি যতই অভিমান পোষণ করুন না কেন, তাঁর সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেন না। অবচেতন চিত্তের মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারে গভীর ভালবাসার বারিধি পোষণ করে বসে থাকেন।

এতটুকু ধ্বনিতেও সেখানে প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে, তরঙ্গ-হিল্লোল প্রবাহিত হয়।

এর পর যখন তমসার মুখে "ইক্ষ্বাকু বংশীয়" ইত্যাদি শুনলেন, তখন যেন তাঁর সংসাই মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ, তা' বটে, তাঁরও ত' ওই লোকটির প্রতি নিগূঢ় অভিমানের যথেষ্ট কারণ বর্তমান

রয়েছে, অতটা হর্ষোচ্ছ্বসিত হয়ে 'আর্যপুত্র' বলে সম্বোধন করাটা ত' ঠিক হয়নি! তখন যেন ভেবে চিন্তেই বল্লেন, "দিট্টিআ অপরিহীন রাঅ ধর্মোক্‌খু সো রাঅ।" "সেই রাজার রাজধর্ম পালনের ব্যতিক্রম হয়নি।"

এখানেও নারী চিত্তবৃত্তির কিরূপ গূঢ় রহস্যময় পরিচিতি সূক্ষ্মদৃষ্টি কবির দ্বারা সম্ভবপর হয়েছে! যাঁর রাজধর্মের অমোঘ দণ্ডতলে নিজে তিনি পিষ্ট হচ্ছেন, তাঁর সেই ধর্মপালনে যে তিনি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করছেন না, এই অভিব্যক্তিতে শুধু অভিমান প্রকাশই নয়, আত্মসান্ত্বনাও প্রচুরতর রূপেই নিহিত রয়েছে।

জননী ধরিত্রীও একবার তাঁর নির্যাতিতা দুহিতাকে;—"হা আর্যপুত্রকে মনে পড়িল", এই খেদোক্তি শুনে সকোপে ধমক দিয়েছিলেন;—"আঃ কস্তবার্যপুত্র" ?

"কে তোর আর্যপুত্র?"

পঞ্চবটীর পূর্বস্মৃতি স্মরণে শ্রীরামচন্দ্র "হা দেবি দণ্ডকারণ্য-বাসপ্রিয়সখি!" বলে অবসন্নবৎ পতিত হ'লে বিপদ আশঙ্কিতা সীতা তমসার চরণ ধরে কাতর হয়ে বলে উঠেছেন;—"ভগঅদে তমসে! পরিত্তাহি পরিত্তাহি জিআয়েত অজ্জউত্তং।" "ভগবতী তমসে! আর্যপুত্রকে বাঁচাও বাঁচাও।"

আর তখন "রাজা" বলবার কথা মনে পড়েনি। পরক্ষণেই সীতা হস্তস্পর্শে সম্বিৎ প্রাপ্ত রামচন্দ্রের নিকট থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন, সন্দিগ্ধ অভিমানে বলছেন, "ভগবতি তমসে! এস আমরা সরে যাই, বিনা অনুমতিতে আমি তাঁর সম্মুখবর্তিনী হয়েছি দেখলে মহারাজা আমার প্রতি কুপিত হবেন।"

এখানে আবার স্বামীর রাজপদটাই প্রবল অভিমান মিশ্রিত হয়ে দেখা দিল, যে রাজপদ তাঁকে তাঁর থেকে বিযুক্ত করেছে তার প্রতি তাঁর স্বতই একটা তীব্র অভিমান থাকা স্বাভাবিক। রাম-চন্দ্রকে "প্রিয়ে জানকি!" বলে শোক করতে দেখেও অসহায় অভিমানে তীব্র করেই বলেছিলেন,—"আর্যপুত্র! নিশ্চয়ই এ অ-সদৃশ কথা সেই সেই ব্যাপারের পর,"—এই কথা কয়টি সতী স্ত্রীর একান্ত সুসঙ্গত লজ্জাভিমান-প্রণোদিত, কিন্তু স্বামীকে "প্রিয়ে জানকি"! উচ্চারণ করতে শুনেই "মহারাজা" "আর্যপুত্রে" পুনঃপ্রত্যাবর্তন করেছে! আবার নিজের অভিমানকে ধিক্কার দিয়ে সাশ্রুনেত্রে বলে উঠেছেন ;—

"হায়! আমি বজ্রময়ী, জন্মান্তরে দুর্লভ এমন প্রিয়ভাষী স্নেহময় আর্যপুত্রের প্রতি কি নির্দয় হলেম!"

সংস্কৃত কাব্য-নাটকের চরিত্র নিয়ে আলোচনা দু'চার কথায় করা যায় না। এই সব অমূল্য রত্নরাজি সদৃশ চরিত্ররত্নের বিশ্লেষণ আবহমান কাল ধরে অসংখ্যবার হয়ে গেছে, আরও হবে, আমি শুধু এইটুকুই বলবো যে নারী চরিত্র সংগঠনে বিশ্লেষণে দূরদর্শী ও মনীষী পুরুষ কবিরা যে অদ্ভুত সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় রেখে গেছেন, যুগযুগান্ত ধ'রেই লোক তার অনুবর্তন করতে বাধ্য হবেই হবে।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলে'ও কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টি যথাযথ চরিত্র সংগঠন কার্যে নিপুণতার পরিচয় দিয়ে দেখিয়েছেন, তিনটি তরুণী নারীর মধ্যে অপ্সরা-সম্পর্কিতা শকুন্তলাই সংযমচ্যুতা হয়েছিলেন, মুনিকন্যাদ্বয় স্বরূপ রাজার প্রতি প্রেমাসক্ত হননি।

রক্তসম্পর্ক যে কত প্রবল ঐ ইঙ্গিতেই তা' পরিস্ফুট হয়েছে। অপ্সরীকন্যা বলে তার এই সংযমহীনতা একথা স্পষ্ট

করে বলবার অপেক্ষা রাখেনা। অথচ দেব ও ঋষি সম্পর্কিতা বলে শকুন্তলার মধ্যে সতী-তেজ সামান্য ছিলনা। আমরা কবি বর্ণিত পতিত্যক্তা শকুন্তলার এই বেশ বাসের মধ্য দিয়েই সে পরিচয় পেয়েছি।

'বসনে পরিধূসরে বসানাং নিয়ম ক্ষাম মুখী ধৃতৈকবেণী,"

পতিবিরহিণী যক্ষবধূ কাব্যজগতের অনবদ্য সৃষ্টি! সত্যই যেন "সৃষ্টিরাদ্যা বিধাতুঃ"।

বর্ষমাত্র কালের জন্য নির্বাসিত পতি বিরহে সেই যক্ষ ললনার যে বিরহ বিধূর পরিম্লান পদ্মিনীর মত অশ্রু আবিল করুণ ক্লান্ত মুখখানি আমাদের চোখে ভেসে ওঠে, তার সঙ্গে তুলনা করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কঠোর প্রভু আজ্ঞায় নির্বাসিত ও বন্দীকৃত পতিদের পত্নীরূপে সমস্ত আর্যাবর্ত ও দাক্ষিনাত্য-বধূদিগের অবস্থা স্মরণ করে আমাদের অশ্রু সম্বরণ করা দুরুহ হয়ে ওঠে।*

জানিনা তাদের জীবনের উপর এই অভিশাপ ভার কত যুগ ধরেই নিদারুণ রূপে চেপে থাকবে।†

রত্নাবলী নাটকের বাসবদত্তা রাজা উদয়নের পট্টমহিষী বা পট্টমহাদেবী। নারী জনোচিত কর্ত্রীজনোচিত সতী জনোচিত একটি অপূর্ব সৃষ্টি! রাজা তাঁর রূপের প্রশংসা করে চাটু বাক্য প্রয়োগ করেন, তিনি ভ্রুক্ষেপ ও করেন না, এই পরিজন বৎসলার প্রত্যেক আজ্ঞাটি সযত্নে সুপালিত হয়, বাজী রেখে হেরে গিয়েও উত্তেজিত না হয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে থাকেন, "আর

* এই প্রবন্ধ লেখার সময় ১৯৪৩—৪৪।

† এত শীঘ্র শাপমুক্তি হবে তখন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

নবমল্লিকা দেখবার প্রয়োজন নেই, তোমার হাসি মুখই আমার পরাজয় সূচিত করছে !" এমন কি স্বামীকে অন্যাসক্ত জেনে কুপিতা হলেও তৎক্ষণাৎ মুখ নত করে আত্মগোপন ও বাষ্প ব্যাকুল নেত্রকে অসীম মনোবলে শুষ্ক করে নে'ন। কটূকথা ওষ্ঠাধর ভেদ করে না। ঈষৎ ভেদকারী দৃষ্টিপাত মাত্র ক'রেই মাথা ধরার ছল করে সরে চ'লে যান। এ চরিত্র কাব্য ছেড়ে জগতেই দুর্ল্লভ ! এমন আত্মদমনশীলা, ধৃষ্টতায় উপেক্ষাকারিণী, অনুগ্রহপরায়ণা পরিজনবৎসলা মানুষী-দেবী,—যাঁর চরণ স্পর্শ করে পরিজনেরা শপথ গ্রহণ করে ;—সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে না দেখতে জানলে এ চরিত্র সৃষ্টি করা যার তার পক্ষে সম্ভবপর নয়।*

তবে কথা এই যে এ চরিত্র শ্রীহর্ষের নিজস্ব পরিকল্পনা নহে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মহা কবিদের পদাঙ্কানুসরণ প্রচেষ্টা তাঁর প্রত্যেক চরিত্রেই পরিস্ফুট এবং হয়ত সেটা একেবারেই অসঙ্গত ব্যাপারও নয়, যুগ-পতিদের কর্ম্ম-প্রভাব মানুষের জীবনে এবং যুগকবিদের কাব্য-প্রভাব পরবর্ত্তীদের রচনার মধ্যে জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে ছায়াপাত করবেই। মহাকবি ভাসের 'স্বপ্ন বাসব দত্তা'র সুস্পষ্ট আভাষ আমরা পরবর্ত্তী মহাকবি কালিদাসের "মালবিকা অগ্নিমিত্রে" দেখতে পাই। আবার কালিদাসের সঙ্গে শ্রীহর্ষ-কবি "ছায়েব" অনুবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। 'মালবিকা' "ধারিণী দেবী" প্রভৃতি "রত্নাবলী"তে আরও বিকাশ প্রাপ্ত হলেও ভিতরের কাঠামো সেই একই। অথবা এই সব আর্য সমাজের আদর্শভূতা নারীচরিত্রে স্বাভাবিক ক্রমেই কতকটা সমপর্যায়ে এসে পড়তে বাধ্য, যদি একই বিষয়-বস্তু নিয়েই কবি তাঁদের

* বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগ—ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

চরিত্র-চিত্রণে আত্ম নিয়োগ করেন। সংস্কৃত নাট্যেও বর্তমান কালের চিত্র-নাট্য কলায় যেমন দেখা যায়,—মনে হয় দর্শকেরা এক ঘেয়েমীই পছন্দ করতেন!

রত্নাবলী চরিত্রে কবি কতকগুলি জটিলতার সমাবেশ করে তাকে সাধারণ প্রলুব্ধা নায়িকার শ্রেণীতে অবনমিত করেননি। সিংহল রাজকন্যা রত্নাবলীকে রাজনৈতিক কারণে কৌশাম্বী রাজ-মন্ত্রী কূটনৈতিক যৌগন্ধারয়ণ কৌশাম্বীরাজ উদয়নের জন্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু সিংহল পতি তাঁর ভাগিনেয়ী অবন্তীরাজ-দুহিতা বাসবদত্তার রূপ গুণ তেজস্বীতার কথা স্মরণ করে তাঁর হাতে কন্যা দান করতে সম্মত হননি, কিন্তু পরে যৌগন্ধরায়ণের প্রচারিত বাসব দত্তার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদে নিজ মন্ত্রীকে সঙ্গে দিয়ে জল পথে সুন্দরী কন্যারত্নটিকে বিয়ে দে'বার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। দৈব বশে জাহাজ ডুবিতে রত্নাবলী আত্ম জন বিযুক্তা হয়ে দাসীরূপে পট্টমহিষীর নিকট প্রেরিতা হলেন। প্রেরক তাঁকে সমুদ্রতীরে কুড়িয়ে পাওয়ার কথা লেখাতে তাঁর নাম রাখা হলো সাগরিকা। পরিচয় তাঁর কেউ নে'য়ওনি, তিনি দে'নওনি।

সাগরিকা দেখলেন যে ঘরে তিনি রাণী হ'তে পারতেন সেই ঘরেই তিনি দৈব দুবিপাকে দাসীরূপে প্রবিষ্টা হয়েছেন। "দত্তা-কন্যা" মনে মনে পূর্ব থেকেই উদয়নকে পতিরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন, এখন চোখে দেখে তাঁর সেই অ-দেখা প্রেম সত্যকার গভীরতা লাভ করা কিছুই এমন বিচিত্র নয়।

তথাপি স্বভাব কোমলা দুর্ভাগিনী রাজকন্যা গোপনে দর্শন পিপাসা মিটাবার আশায় উদয়নের ছবি আঁকেন, আর আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন, ছবি আঁকতে আঁকতে ঐ সর্বকলা

বিশারদা নৃপসুতা আপন মনেই সঙ্গীত রচনা করতে করতে গুঞ্জন স্বরে গান করেন ;—

"দুল্লভ জন অনুরায়ো লজ্জা গুরুই পরবশো অপ্পা
পিঅ সহি বিসমং পেম্মং মরণং স্মরণং বরিঅ মেক্কং ।*"

সুশিক্ষিতা সারিকার মধ্য দিয়ে রত্নাবলীর এই ভীরু সকরুণ প্রেমকাহিনী প্রেমাস্পদের কর্ণগোচর না হ'লে নীরবেই তা' তার হৃদয়গুহার গোপন অন্ধকারে চির নিরুদ্ধ থেকেই যেত।

সংস্কৃতকাব্যে এমন সব নারীচরিত্র কতই আছে, তাদের সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। ভাসে কালিদাসে ভবভূতিতে মাঘে বাণভট্টে শ্রীহর্ষেই নয়, আরও কত ছোট বড় খ্যাত অখ্যাত লেখকের লেখনী কত ক্ষুদ্র বৃহৎ চরিত্রই না সৃষ্টি করে তদানীন্তন ছোট বড় সমাজের একটি একটি আলেখ্য আমাদের সঙ্গে সুদূর অতীতের সম্বন্ধ সূত্র দিয়ে বেঁধে রেখে গেছেন। আমরা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে আজও আমরা তাঁদের সেই অমোঘ প্রভাব থেকে নিজেদের বিমুক্ত করতে পারিনি। অথচ কেন পারিনি, এর সন্ধান করতে গেলে দেখা যায় ;— তাঁদের সৃষ্টি নরনারীর সম্বন্ধীয় পরিকল্পনায় কোনখানে অসম্পূর্ণতা রেখে দেননি, যেখানকার পাদপূরণ একান্ত নূতন করে করা যাবে।

রাজা রাজড়া ছেড়ে জনসাধারণের জীবনচিত্র আমরা দেখতে পাই ভাসের চারুদত্তে এবং তারই বিশদ রূপ ব্যাখ্যা পরবর্তী শূদ্রক রচিত মৃচ্ছকটিক নাটকে। নায়িকা বসন্তসেনা নানা কলাবতী ও অশেষ গুণবতী। বঙ্কিম চন্দ্রের "হীরার" ন্যায় পদ্মপলাশলোচনা, মহাভারতের কৃষ্ণার ন্যায় সম্ভবতঃ নব

* বিবিধ প্রবন্ধ—ভূদেব।

কিশলয়শ্যামা সুন্দরী, এই গণিকাকন্যা মাতাকর্ত্তৃক পুরুষান্তর ভজনে আদিষ্টা হ'লে উত্তর দেন ;—"মা যদি আমার বেঁচে থাকা চান, তবে এমন কথা যেন আর না বলেন।" বসন্তসেনা চারুদত্তকে ভালবাসে, সে অপবিত্র কুলে জন্ম নিলেও সুপবিত্রা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কতকগুলি বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে যাঁদের বহুতর চিত্র দিয়েছেন, সেই "সতী-অসতী"দের আদি জননী হলেও নিজস্ব গুণে এই বসন্তসেনা একটি অনবদ্য নারী চরিত্র !

"আকরে পদ্মরাগানাং জন্ম কাচমনেঃ কুতঃ" এই প্রবাদ বাক্যকে ব্যর্থ করে পঙ্কোত্থিতা পঙ্কজিনীর মত সে বিকশিত ও সুরভিত হয়ে আছে। কিন্তু না ! তাই বা বলি কি করে ?

বসন্তসেনার মা ব্যবসার দিক দিয়ে কন্যাকে উৎসর্গ করতে অনিচ্ছুক না থাকলেও তার চিত্তবৃত্তির দিকে একটুও উদাসীন ছিল না, তার কয়েকটি কথার মধ্য দিয়েই তা' প্রকাশ পেয়েছে। এমন কি নিজের অসাধারণ রূপগুণবতী লোক ললামভূতা দুহিতার হত্যাপরাধে ধৃত চারুদত্তকে বিচারালয়ে দেখে বলে উঠেছে "আমার কন্যা উপযুক্ত পাত্রেই হৃদয়দান করেছে।"

তাঁকে নিজকন্যার হত্যাপরাধ থেকে বাঁচাবার জন্য বসন্ত-সেনার অঙ্গচ্যুত অলঙ্কারগুলি চিনতে পেরেও না চেনার ভাণ করেছে এবং বিচারককে সুস্পষ্ট বলেছে ;—"আমার কন্যার জন্য আমারইত বাদী হ'বার অধিকার, আমি এই মামলা পরিচালনা করতে চাই না, চারুদত্তকে মুক্তি দিন।"

পরিশেষে সেই দীর্ঘশ্বাস ;—"বাছারে আমার !"—অপূর্ব এবং বিচিত্র ! একেই বলে চিত্রণ ! কত ক্ষুদ্রের মধ্যে তুচ্ছের মধ্যে কত বড় বড় প্রাণ যে লুকান রয়েছে, তাদের সেই গোপনতা

থেকে লোক-লোচনের গোচরে এনে সকলের জন্যই আদর্শ স্থাপন করা বড় লেখকের কর্ত্তব্য। শুধু ক্ষণিকের ক্ষীণধারা রসসৃষ্টির মূল্য কতটুকু? কাদম্বরীর উপনায়িকা মহাশ্বেতা বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যের একটি অনবদ্য সৃষ্টি। আত্মানারীর মতই শুভ্র পবিত্র জ্যোতিস্নাত অনবদ্যঃ। এ চিত্রের প্রতিলিপি বা অনুলিপি আমরা পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। তার পত্রলেখাও বিচিত্র চরিত্রা। এই যুবরাজ-বান্ধবী মাটীর না পাষাণের? এমন নারী ত কখন কেহ দেখেছে বলে মনে হয় না। আগুনের পার্শ্ববর্ত্তিনী এই ঘৃতভাণ্ড-স্বরূপা নারী জন্মান্তরীণ কোন উগ্র তপ প্রভাবে এমন সুসংযত নির্বিকার! এই তরুণী সত্যই বিশ্বের সবিস্ময় শ্রদ্ধাকর্ষণ কর্বার উপযুক্তা? সংস্কৃত কাব্যনাট্যে তৎকালিক নর-নারীদের কবি-কল্পনার ছাঁচে ঢালা বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্রচিত্র আমরা সাগ্রহে পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, মানব মানবী যুগধর্মকে গ্রহণ করতে স্বভাবক্রমে বাধ্য হলেও তাদের আকৃতির মত প্রকৃতিও সেই চিরন্তনীই থেকে থাকে।

বত্রিশ সিংহাসনে, বেতালপঞ্চবিংশতিতে বহু নিকৃষ্ট চরিত্রের নারীর সৃষ্টি দেখা যায়, ভালমন্দ চিরদিনই আছে, একথা খুবই সত্য, তথাপি মন্দর প্রভাব সমাজে না বাড়লে সাহিত্যে কুচরিত্রের আমদানী মনে হয় কম থাকে। উপদেশও দৃষ্টান্তের তখনই বেশী দরকার হয় যখনই পূর্ববর্ত্তীদের নৈতিক শাসন অক্ষুণ্ণ থাকছে না দেখা যায়।

বিদ্ধশালভঞ্জিকা, প্রবোধচন্দ্রোদয় প্রভৃতি আধ্যাত্মিক চরিত্র নিয়ে লেখা। কালিদাসের কুমারসম্ভবের "উমা" "মেনা" "রতি" মেঘদূতের বিরহিণী "যক্ষ-যায়া" এঁদের কথা নিয়ে অনেক

আলোচনা হয়েছে এবং চিরদিনই হবে। প্রতি ক্ষুদ্র নরনারী ও তাঁর অমর তুলিকায় অমর হ'য়ে রয়েছে।

ভারতীয় সাহিত্যের তপোবনে ও উপবনে, সংস্কৃতে, পালিতে, প্রাকৃতে ও বাংলায় এবং পারিভাষিক অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় এ পর্য্যন্ত বহু নারীচরিত্র নিছক্ নরকল্পনায় প্রসূত হয়েছে ; তার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কোন্ ভক্ত-হৃদয়-সরসীতে, কোন কবি-কল্পনার মানসসরোবরে শ্রীরাধারূপিণী রাধাপদ্মটী ফুটে উঠেছিল, জানা নেই, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব সৃজনী-শক্তির আন্তরীক প্রশংসা না করে থাকা যায় না। এই রাধা দেবী নহেন, তিনি মানবী। গোপ-রাজকুলে এঁর জন্ম,—জন্ম অবশ্য মানবীয় ক্রমে নয় ; রাধা-পদ্মের মধ্যে অযোনিজা-কন্যারূপেই। সীতা প্রভৃতির সঙ্গে এঁর জন্মসূত্রে মিল থাকলেও কর্ম্মসূত্রে মিল আদৌ নেই। গোবিন্দ-দাসের মতে তিনি—

"ব্রজরমণীগণমুকুট মণি",

অনন্তদাসের মতে,—

"কনকলতা জিনি, জিনি সৌদামিনী"—

উদ্ধবদাসের মতে তাঁর রূপ,—

"অবনী উয়ল থির বিজুরি জিনি"—

জয়দেবের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে এই বলে তোষণ করছেন ;—

"ত্বমসি মম ভূষণম্ ত্বমসি মম জীবনম্, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী তত্র মম হৃদ রমতি যত্নম্॥"

রাধা ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির প্রতিমূর্ত্তি ; পুরুষ-বিযুক্তা প্রকৃতির গভীর রহস্যময় স্বরূপ সন্ধান ভক্তসাধক রাধার মধ্যেই কি অপূর্ব্ব ইঙ্গিতে প্রদান করেছেন ! বিশ্ব-সাহিত্যের উচ্চতম

বহু অধ্যায় প্রেম সাধনায় চির-বিজয়িনী 'থির বিজুরি কাঁতি' 'নমুঞা বদনী ধনি', যিনি কথা কইলে মনে হয় ;—'অমিয় বরষে যেন শরদ পূর্ণিমা নিশি',—যাঁকে ইক্ষণ করে সহস্র গোপিনীর প্রার্থিততম শ্যামচন্দ্র কবি বিদ্যাপতির মুখ দিয়ে বলেছেন ;—

"যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই, তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই,
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ, তাঁহা তাঁহা বিজুরি তরঙ্গ।
কি হেরল অপরূপ গোরি, পৈঠল হিয়া মাহা মোরি ॥"

তাঁকে উপলক্ষ করে রচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ত কথাই নেই ; ব্রজবুলির কল্যাণে ভারতীয় সাহিত্যেরও ইনি অপূর্ব গৌরবোজ্জ্বল এক সম্পদ। সেই সর্বসমাদৃতা কিশোরী, কবি শিরোমণি চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা "শ্যাম" এই নামটুকুই গুরুমন্ত্রের মত যেন কার কাছ থেকে শুনতে পেয়েছেন,—সম্ভবতঃ মন্ত্রসিদ্ধ গুরুই তিনি হবেন, নতুবা মন্ত্রশক্তির এমন অব্যর্থ প্রভাব হয় কি করে ? সখির গলা ধরে বলছেন।—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম!"
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ,
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে,
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে ?"

আবার জল আনতে গিয়ে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ ঘটতেও বাকি রইল না। আর কি রক্ষা আছে! ব্যাকুল বিস্ময়ে জানাচ্ছেন ;—

"সই, কি হেরিনু যমুনারি কূলে,—
ব্রজকুলনন্দন হরিল আমার মন, ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে।"

বিদ্যাপতির রাধা প্রিয়-সন্দর্শন-সুখে উচ্ছ্বসিতা হয়ে বলেন ;—

"আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়িনু, পেখনু পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানিনু, দশদিক ভেল নিরদন্দা।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানিনু আজু মঝু দেহ ভেল দেহা,
আজু বিহি মোরে অনুকূল হোয়ল, মিটল সবহুঁ সন্দেহা।"

আবার ক্ষণপরেই মন খুঁৎ কাড়ছে ;—

"সজনি, ভাল করি পেখন না ভেল,
মেঘমালা সঞে তড়িৎলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল।"

বিরহ অবস্থায় গোবিন্দদাসের রাধা প্রকৃতির যে সমস্ত সুখময় উপাদানকে উপদ্রব ভেবে সাভিমান তিরস্কার জানিয়েছিলেন ;—

"সেই মুখচাঁদ নয়নে নাহি হেরল, নয়ন দহন ভেল চন্দা,—
সেই মধুর বোল শ্রবণে না শুনলু মধুকর ধ্বনি ভেল মন্দা।"

সেই তিনিই এখন আনন্দে ভরে গিয়ে কেমন উদারতার ছড়াছড়ি করছেন, দেখুন ;—

"সেই কোকিল অব লাখ ডাকই লাখ উদয় করু চন্দা,—
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ মলয় পবন বহু মন্দা"

এই গভীর প্রেম যখন অনাদৃত হয়েছে বলে মনের মধ্যে সন্দেহ জাগে, তখন প্রেমিকার অভিমানের সীমা থাকে না। জ্ঞানদাসের রাধা বিশ্বাস হন্তা প্রেমিকের সন্দেহজনক ব্যবহারে ভগ্নচিত্তে আত্মাভিব্যক্তি করছেন,—

"বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিনু লোকে অপযশ কয়,
এ ধন আমার লয় অন্যজনা ইহা কি পরাণে সয় ?
সই, কত না ধরিব হিয়া,
আমারই বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায়, আমারই আঙিনা দিয়া।
যেদিন দেখিব আপন নয়নে আনজন সঙ্গে কথা,—
কেশ মুড়াইয়া বেশ দূর করি ভাঙিব আপন মাথা।"

কি আশ্চর্য ! এই রাধা মেয়েটীর গ্রাম্য নারীর মত কলহ কাকলীর সঙ্গে গালি দিতেও যে বাধে না ;—

"আমার বন্ধুর হিয়া এমন করিলে, না জানি সে জন কে ?
আমার হৃদয় যেমন করিছে, এমনই হউক সে।"

এ-ও বলেছেন। তা' অভিমান তো হতেই পারে। প্রিয়-মিলনের জন্য কত ক্লেশ, কত বাধাই যে কাটাতে হয়েছে, সঙ্কেত ভূমে আগমনে কি কম কষ্টটা স্বীকার করতে হয়েছে ওঁকে ! কবিশেখরের রাধার ;—

"গগনে অব ঘন, মেহ দারুণ, সঘনে দামিনী ঝলকই,
কুলিশ পাতন, শবদ ঝনঝন, পবন খরতর বহয়ই।
সজনি, আজি দুরদিন ভেল,
হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি. সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল।
তরল জলধর, বহিছে ঝরঝর, গরজে ঘন ঘন ঘোর
শ্যাম নাগর, একলি কৈছনে, পন্থ হেরই মোর।"

এমন কত ঋতুর কত বাধা ঠেলে যদি নরোত্তমদাসের রাধার মত শূন্য কুঞ্জে প্রহর গুণে রাত কাটিয়ে আক্ষেপ করতে হয় ;—

"বন্ধুর সঙ্কেতে আমি এ বেশ বানানু গো",
সকল বিফল হল মোয়।"

তার উপর যদি সমানুভূতিপূর্ণ চিত্ত নিয়ে প্রিয় সখি পাশেই ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে বলরামদাসের রাধা কি করে হতাশচিত্তে না বলেন ;—

"ত্যজ সখি নিঠুর নটবর আশ,
যামিনী শেষ হ'লে সকলই নৈরাশ,
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার, দূরহ ডারয় যামুন পার।"

তা' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধাও ঠিক এই কথাই তো বলেছেন ;—
"এ ধন যৌবন সকলি অসার, ছিণ্ডিয়া ফেলব গজ মুকুতার হার,
মুছিয়া ফেলব সিঁথির সিন্দুর।" ইত্যাদি

আর ঐ সব প্রিয় সম্ভার ত আর সহজে সংগৃহীত হয়নি, বর্ত্তমান কালের ব্ল্যাক্-মার্কেটে কেনার মতই 'কত না যতনে কতনা গোপনে' জোগাড় করে আনতে হয়েছিল! কাজেই একান্ত অসময়ে আসা প্রিয়তমকে বাহুবন্ধনে গ্রহণ না করে বলরাম দাসের রাধা যদি আশাহতার মর্মজ্বালায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে তীব্রকণ্ঠে বলেই থাকেন ;—

"ধিক্ রহুঁ মাধব তোহারি সোহাগ, ধিক্ রহুঁ যো ধনী তাহে অনুরাগ"—তো খুবই অন্যায় করেন নি!

আবার এতেই কি মেটে! এত আর শুধু মুখের প্রেম নয়, প্রাণের যে! তাই রাইয়ের এখন ;—

"মান গিয়ে বিরহ এলো, ধনীর কৃষ্ণ মুখ মনে প'লো"

কিন্তু তখন ও এই অভিমানিনীর মদীয়তার শেষ হয়নি। সখিদের গঞ্জনার উত্তরে চন্দ্রশেখরের রাধা ভ্রুকুটিবদ্ধ ললাটে ঠোঁট ফুলিয়ে প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন ;—

"পায় পড়ল হরি, পায় পড়ল হরি, পায় পড়ল হরি তো'র,
সবে মিলি ঐছন বোলসি পুনঃ পুনঃ, কোইনা বুঝল দুঃখ মোর।
দুঃখ কাহে কহব মায়ী, পায়ে পড়ল বলি, কিয়ে হাম তৈখনে অম্বরে উঠায়ব ধাই ?"

কিন্তু এ মান কতক্ষণই বা থাকে ? প্রাণাধিকের মন-গলান "প্রিয়ে চারুশীলে ! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্" এবং তা'তে ও মানিনীর মান ভাঙ্গাতে না পেরে পরিশেষে সেই সর্ব-কবিজনসম্মত "দেহি পদপল্লবমুদারম্ "বলে চরণতলে লুটিয়ে পড়া ; এতে ও যার দুর্জ্জয় মানের পাহাড় ভাঙ্গেনি, প্রিয়তমের একটুখানি অদর্শনমাত্রেই পুরুষোত্তম দাসের সেই রাধার অবস্থা নিদারুণতর হয়ে উঠলো, আর্তকণ্ঠে বললেন ;—

"কালিন্দী পৈঠি পরাণ ত্যজিতে যব,
এই মনে অভিলাষে, দারুণ হুতাশে,
আপন শির হাম আপনিহি কাটনু,
কাহে করনু হেন মান।"

গোবিন্দদাসের রাধিকা ত আকুল উচ্ছ্বাসে কেঁদেই উঠলেন ;—

"কি ছার মিছার মানের লাগিয়ে বঁধুরে হারায়েছিলাম !"

আবার আকুল ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদছেন, আর বলছেন ;—

"আমার বঁধুর মতন মধুর, এমন বঁধু কার বা আছে ?"

জয়দেবের রাধার খুব কঠিন বিরহ-বিকারের সংবাদ সখি-দূতীরা প্রত্যাখাত প্রার্থিতকে শোনাতে ছুটলো। রাধার অবস্থা তখন উঠে হেঁটে ছুটে যাবার মতই নেই। আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়ে অর্ব্বাচীন কবির রাধা বলছেন ;—

"দারুণ মানের ভরে করেছি তার অপমান।
মানেতে হইয়া হত কুবাক্য বলেছি কত"

সুযোগ্যা সখী গুরু-মন্ত্রদাতা পরম বান্ধবের মতই এই বিরহ-পারের মিলন-সেতু রচনা করে সহানুভূতি উদ্রেককর এই বার্ত্তা গিয়ে শোনাচ্ছেন,—

"রাধিকা বিরহে তব কেশব—
কৃশতনুরিবভারম্।
হরিরিতি হরিরিতি জপতি অশেষম্,—
বিরহবিহিত মরনেন নিকামম্।"

বিরহিনীর বিরহ-দুর্দ্দশা বর্ণনা করতে বিদ্যাপতির সখিরাও বড় একটা কম যান না। তাঁরা কত বিভঙ্গেই তাঁদের সখির অবস্থা বর্ণনা করছেন দেখুন না ;—

"মাধব কত পরবোধব রাধা,
হা হরি, হা হরি, কহতহি বেরি বেরি, অব জিউ করব সমাধা।
ধরণী ধরিয়া ধনি যতন হি বৈঠত, পুনহি উঠতি নাহি পারা।"

ঘনশ্যাম দাসের সখিরাও আবার এইসঙ্গে যোগ দিয়ে দিলেন ;—

"সুচির বিরহে যব ক্ষীণ কলেবর—
বিগলিত ভূষণ বেশ,
আছয়ে তোহারি পরশরস লালসে—
কেবল জীবন শেষ।"

এই ত কাণ্ড! অথচ যেই প্রিয় সন্দর্শন হ'ল, আর মান অভিমান রইল না ; চণ্ডীদাসের রাধা গদ্‌গদ্‌স্বরে বলতে লাগলেন ;—

"বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে,
দেখা না হইত পরাণ গেলে,
এতেক সহিল অবলাবলে,
কাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে।"

বলতে বলতেই মনে হ'ল এ বড় স্বার্থপরের মত কথা বলা হচ্ছে। অমনি সামলে নিয়ে ক্ষীণ হাসিটুকু হেসে অথচ রাধামোহনের দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই দেখতে পাওয়া যাবে,—"দরশনে নয়নে নয়নে বহু লোর", এবং "গদগদ কানু কন নিকসত বাত," তা' কোনরকম ক'রে কুশলবার্ত্তাটা নিলেন ;—

"দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল, মথুরানগরে ছিলে ত ভাল ?"

আবার বলছেন,—

"শুনহে পরাণ বঁধু!
কতদিন পরে পেয়েছি তোমারে, চাহিয়া রহিব শুধু।"

বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধা সাহিত্যোদ্যানের অপূর্ব সৌরভে পরিপূর্ণ গৌরবোজ্জল রাধা-পদ্ম,—বিশ্ব-প্রকৃতির, তথা বিশ্ব-নারীর প্রতীক। এ প্রেম যেমন মধুর তেমনই রহস্যময়। ভক্ত কবিগণ স্বয়ং রাধাভাবে বিভোর হ'তে পেরেছিলেন বলেই তাঁদের লেখনী হ'তে নিঃসৃত হ'তে পেরেছিল সেই সব অমিয়-মধুর মহত্তর বাণী ;—

"বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ
দেহমন আদি তোমারে সঁপেছি কুলশীল-জাতি মান।"

এবং

"অনেক সাধের পরাণ বঁধুয়া নয়নে লুকায়ে থোব,
প্রেমচিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লব।"

মর্ম দিয়ে নারীচরিত্রের নিগূঢ়তম বার্তা না বুঝলে পুরুষ-কবিদের করুণরসাত্মক এই সব অপূর্ব রচনা বহু শতাব্দী ধরে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর চিত্ত বিগলিত করে রাখতে পারত না।

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়া পর রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

বিদ্যাপতির এই পদ অতৃপ্ত মানবাত্মার এবং সর্বস্ব-সমর্পিতা সতীচিত্তের প্রতিধ্বনি।

প্রেমময়ী রাধা প্রেমাস্পদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, মৃত্যুকে বরণ করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই; তিনি জানেন প্রেমই নারীর প্রাণ, তাই বলেছেন ;—

"বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিলে প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া এক মন হইয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।"

প্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ তখনই হয়, প্রেমিক যখন অন্তর থেকে বলতে পারে ;—

"শ্যাম অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু তিল তুলসী দিয়া।"

কৃষ্ণ-বিরহিনী রাধার সমস্ত সংসার শূন্যময়। জীবন যৌবন সমস্তই ব্যর্থ, চোখের সামনে তিনি দেখছেন সমস্তই যেন কৃষ্ণময় হয়ে গেছে ;—

"কৃষ্ণ কাল, তমাল কাল, তাই তমাল বড় ভালবাসি"—

বলে তমাল বৃক্ষকেই নিবিড় আলিঙ্গনে নিবদ্ধ করছেন, কাঁদছেন আর স্বগতই সন্দেহাকুলচিত্তে বলছেন ;—

"কৈছে গোঙাওব হরি বিনা দিন রাতিয়া ?"

আবার ভাবে বিভোর হয়ে বলছেন ;—

"যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চলি যাত,
তাঁহা তাঁহা ধরনী হই মঝু গাত।
এ সখি বিরহ মরণ নিরানন্দ
ঐ ছনে মিলই যব গোকুল চন্দ।"

—তাঁর চরণ যেখানে পড়বে আমার অঙ্গ যেন সেখানকার মৃত্তিকা হয়, মৃত্যুর পর সখি গো, আমি আবার গোকুলচন্দ্রকে ফিরে পাব।

বৈষ্ণব কবি জগতের চিরন্তনী নারীর মধ্য দিয়ে সম-নিষ্ঠ সাধকের ভগবৎ মিলন-মঙ্গলের নীতিমাল্য রচনা করেছেন। নারীপ্রেমের নৈষ্ঠিক একত্মতা তাঁদের অজ্ঞাত থাকলে এ সৃষ্টি সফলতা লাভ করতো না। অন্যত্র অনেক কিছুই সৃষ্টি হয়েছে, কোথাও রাধা সৃষ্টি হয়নি।*

ময়নামতী চরিত্র বাস্তব ঐতিহাসিক চরিত্র বলেই অনেকের বিশ্বাস, তবে সাহিত্যে তাঁর আসল রূপ কিছু বদলেছে কি না

---

* বৈষ্ণব কবি বলতে আমরা সাধারণতঃ যাঁদের বুঝে থাকি তার বাইরে অসংখ্য কবি, নাট্যকার, গীতিকার অজস্র গানে ও কথায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করেছেন, সে যে কত তার হিসাব করা সম্ভব নয়। বিখ্যাত পদকর্তারা ছাড়া হরুঠাকুর, রামপ্রসাদ, রাম বসু, বৈজু বাওরা, গোপাল নায়ক, সুরদাস, দাশরথি রায়, রাসু, নৃসিংহ, গদাধর মুখোপাধ্যায়, রসিক চক্রবর্ত্তী, শ্রীধর কথক, ঈশ্বর গুপ্ত, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, নীলকণ্ঠ, গোবিন্দ অধিকারী, গদাধর, ঠাকুরদাস, এমন কি

বলা শক্ত। তাঁর স্বামী তাঁকে বিশ্বাস করতেন না, সিদ্ধযোগী হাড়িপার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা তাঁর ছেলে বৌ পর্যন্ত ভাল চোখে

ফিরিঙ্গি এণ্টনি, রূপচাদ পক্ষী, মধুসূদন কান, রামানন্দ, রাধামোহন, যদু নন্দন, প্রেমদাস, গিরীশচন্দ্র এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যকে তাঁদের অমৃতনিস্যন্দিনী রচনা দ্বারা সমৃদ্ধতর করতে কুণ্ঠিত হন নি। রূপচাঁদের কতকগুলি হাসির গানের মধ্যে সে কালের ইঙ্গ-বঙ্গভাষার জগাখিচুড়িতে সখিসম্বাদ কি হাস্যরসের স্রোত বইয়েছিল এখনকার অনেকেই তা' জানেন না। তিনি হয়ত বলতে চেয়েছিলেন, রাধিকা ঠাকুরাণী সে যুগে জীবিত থাকলে ঐ রকম ভাষাই না কি ব্যবহার করতেন! একটু নমুনা দি ;—

"আমারে ফ্রড করে কালিয়া শ্যাম তুই কোথায় গেলি ?
আই এম্ ফর ইউ ভেরি সরি, গোল্ডেন বডি হল কালি।
পুওর ক্রিচর মিল্ক গেল, তাদের বুকে মারলি শেল,
নন্‌সেন্স তোর নেই আক্কেল, ব্রিচ অফ কন্‌ট্রাক্ট করলি।"

সখিরাও বড় কম যান্ না! মথুরার দরবারে গিয়ে দ্বারীকে ঐ একই সুরে ও ভাষায় বলছেন :—

"লেট মি গো ওরে দ্বারী, আই উইশ্ টু সি বংশধারী,
ব্রজের রাখাল তোদের কিং, ফ্লুটেতে কর্‌তো সিং,
মজায়ে রাইকিশোরী।"

বঙ্কিমচন্দ্রের "কাহে লো সই জিয়ত মরত কি বিধান ?" "শ্রীমুখ-পঙ্কজ দেখবো বলে", "মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী" প্রভৃতি পদ সর্ব্বজন-পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের "বাঁশরি বাজাতে চাহি" থেকে তাঁর ভানু সিংহের পদাবলীর "সজনি সজনি রাধিকা লো", "শুনলো শুনলো বালিকা, রাখ কুসুম মালিকা, কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে" ইত্যাদি আরও কত না মধুর পদ বঙ্গসাহিত্য-মঞ্জুষায় সঞ্চিত রাখা অমূল্য রত্ন!

দেখেন নি। রাজ্যেশ্বর পুত্রকে তিনি সন্ন্যাস নিতে বাধ্য করেছিলেন, তার মধ্যে মদালসা বা ধ্রুব-জননী সুনীতির মত কোন মহৎ আদর্শ ছিল না। তিনি সুপণ্ডিতা ছিলেন এবং প্রভুত্বের ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে অনিচ্ছুক পুত্রকে রাজ্যত্যাগ করিয়ে হাড়ির অনুচর করেছিলেন, কিন্তু পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেন নি। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের দেবীচরিত্রগুলিকে যদি নারীচরিত্র রূপে ধরা হয়, তা'হলে আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হতাশ হতে হবে। দুর্গা, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবীরা সকলেই ছলে বলে কৌশলে অন্যের ভক্তকে ভাঙ্গিয়ে নিজের পূজা আদায় করতে ব্যস্ত। তার জন্য কোন কিছুতেই তাঁদের আটকায় না। দেবীর ভক্ত মহাপাপী হলেও পার পেয়ে যায় আর যিনি তাঁর পূজা দিতে অস্বীকৃত হন, তিনি ভালো লোক হলেও তাঁর দুর্গতির পরিসীমা থাকে না। এই যুগের মানবী চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত কবিকঙ্কণের চণ্ডী-কাব্যের নায়ক কালকেতুর পত্নী ফুল্লরা এবং ধনপতির পত্নী লহনা ও খুল্লনা, মনসামঙ্গলের লক্ষ্মীন্দরের পত্নী বেহুলা। ধর্মমঙ্গলের লাউসেনের মা রঞ্জাবতী, পত্নী কলিঙ্গা এবং কানাড়া, কানাড়ার দাসী ধুমণসী এবং কালুডোমের পত্নী লখাই,—প্রভুর কার্যে যে দুই পুত্র পতি এবং অবশেষে নিজেকেও উৎসর্গ করেছিল, এই সকল চরিত্রগুলির মধ্যে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে তাৎকালীন সমাজের চিত্র অনেকটাই পাওয়া যায়, তবে অতিরঞ্জনের একটা বিশেষ ছাপ প্রত্যেকটি চরিত্রেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে; যা হলে ভালই হতো, তবে হয়েছিল কি না;—অর্থাৎ যতটা বলা হয়েছে ঠিক ততটাই হয়েছিল কি না;—তাতে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ

বর্তমান আছে। সমস্তটাই অপ্রাকৃত না হলেও অতি প্রাকৃত নিশ্চয়ই।

এ-দেশে ছড়াগানের ছড়াছড়ি, ব্রতকথারও শেষ নেই! "জয়মঙ্গলবারের" জয়াবতীর উপাখ্যানে, "মনসার ভাসানে" লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলার কাহিনীতে ইতুকথার উমনো ঝুমনোর গল্প-গাথায়, বিভিন্ন লক্ষ্মীপূজায় ও ষষ্ঠীপূজায় নারী-দেবী ও নারী-মানবীদের অনেক কীর্ত্তিকলাপ বাংলার ঘরে ঘরে আজও বিঘোষিত হচ্ছে। লহনা ও খুল্লনার কলহ-চিত্রে সে-কালের সতা-সতীনের ঘরকন্নার ছবিগুলি সুপরিস্ফুট। আবার তাদের রাঁধা-বাড়ার খাওয়ান দাওয়ানর ছবিগুলিতে বাংলার নারীর চরিত্র-চিত্র অতি সমুজ্জ্বল। শুভচণ্ডী বা সুবচনীর খোঁড়া হাঁসের কথায় দরিদ্রা বালৃতি বামৃনীর ভক্তিনিষ্ঠায় পরিতুষ্টা দেবী মাহাত্ম্যের এবং সত্যনারায়ণের ব্রতকথায় বণিককন্যা কলাবতীর ভক্তিতে দেবপ্রসন্নতা লাভ প্রভৃতি নানা বিষয়ের মধ্য দিয়ে আমরা তাৎকালীন সমাজকে মধ্যে মধ্যে সুস্পষ্ট রূপে দেখতে পেয়েছি। লহনার সখি লীলাবতী একটি দুমুখো সাপ, দাসী দুর্বলা মন্থরারই সমপর্যায়ের, এঁরা যুগে যুগেই যে অবতীর্ণা হ'ন, তা' আমরা দেখেছি। জলপথে বণিকরা বাণিজ্য করতে যেতেন, ঘরে থাকতেন তাঁদের বিরহিনী তরুণী স্ত্রীরা। তাঁরা মনের দুঃখে "বারমাস্যা" অর্থাৎ বারমাসের দুঃখগাথা তৈরী করে দরদী পেলেই শুনিয়ে দিতেন। এই রকমের অশ্রু-ভেজা বিরহগীতি প্রাচীন সাহিত্যে যথেষ্টই আছে। পল্লী-সাহিত্যের এই সকল গান আধুনিক প্রেমগীতির সঙ্গে একই পর্যায়ের এবং প্রাচীন বৈষ্ণবসাহিত্যের রাধাকৃষ্ণের বিরহগীতির মতই

মর্মব্যথার স্বতঃস্ফূর্তি। জগতের সমস্ত প্রিয় বিরহিতদের অন্তর্বেদনা নিয়ে এরাও সৃষ্ট হয়েছে।

শচীনন্দন দাসের রাধা সখির কাছে তাঁর বিরহী জীবনের বারমাসের অসহ্য কষ্ট ব্যক্ত করছেন, তার সবটাই নয়, আমরা এখানে সামান্য একটুখানি মাত্র তুলে দিচ্ছি ; শুনলে আপনারাও সহানুভূতি না ক'রে থাকতে পারবেন না ;—

"ইহ মত্ত দাদুরী রোল, দামিনী চমকি ঝলকিত কাঁতিয়া,—
মেহ বাদর বরিখে ঝরঝর, হামারি লোচন ভাতিয়া
দেই ছোড়ি নহি, বাহিরায় সো মুখ চাঁদ অবমেহি পেখিয়া।"

সীতার বারমাস্যায় বনবাসের ক্লেশ বর্ণিত হয়েছে, এটি ঠিক অন্যান্য বারমাস্যার লক্ষণাক্রান্ত নয়। সীতা দেবী সখিজনের কাছে অতীত দিনের বনবাসক্লেশের কথা বলছেন ;—

"বৈশাখ মাস হইল বাড়িল দিন আর,—
প্রখর হইল রৌদ্র অতি খরতর।
চলিতে না পারি দেখি কমললোচন,
বৃক্ষ নিচে বৈসে কান্দে দুঃখের কারণ।"

শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহলদেশীয়া পত্নী সুশীলা তাঁহাকে গৃহ প্রত্যাবর্তনে নিবৃত্ত করবার জন্য বারমাসের সুখভোগের নানা প্রলোভন দেখিয়েছিলেন ;—

"বৈশাখে চন্দনাদি তৈল দিব সুশীতল করি,
সাঙালি গামছা দিব ভূষণে কস্তুরি।
জ্যৈষ্ঠে পুষ্পশয্যা করে দিব চাঁদোয়া টাঙ্গায়ে
হাস্যপরিহাসে যাবে রজনী গোঙায়ে।"

কবিকঙ্কণের ফুল্লরা বা খুল্লনার বারমাস্যা এ-জাতীয় নয়। শ্রীরাধার ও খুল্লনার বারমাস্যা প্রকৃত বিরহকাব্য। এদের অনুসরণে বাংলায় বহু বারমাস্যা রচিত হয়েছে। ফুল্লরার বারমাস্যা কোটি কোটি দারিদ্র্য অধ্যুষিত দুর্ভাগিনী ভারতনারীর স্বরূপ চিত্র ;—

ভাঙ্গা কুঁড়্যা ঘর, তালপাতার ছাওনা,—

"ভেরেণ্ডার থাম ওই আছে মধ্য ঘরে,
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।"

"বৈশাখের অগ্নিসম খরা তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা,
পায়ে পোড়ে খরতর রবির কিরণ,
মাথায় দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন।
বৈশাখ হইল বিষ গো বৈশাখ হইল বিষ,
মাংস নাহি খায় সর্বলোক নিরামিষ।
পাষণ্ড জ্যৈষ্ঠমাস, পাষণ্ড জ্যৈষ্ঠমাস,
বেঙচের ফল খাইয়া করি উপবাস।

*

মাংসের পসরা লইয়া ফিরি ঘরে ঘরে
কিছু ক্ষুদ্র কুঁড়া পাই উদর না পুরে।
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল
বৃষ্টি হইলে কুঁড়্যায় ভাস্যা যায় জল।"

অভাগিনী ফুল্লরার দুঃখের সীমা নেই। সবাই দেবীর প্রসাদ খায়, বৃথা মাংসের চাহিদা আশ্বিনে থাকে না। হেমন্তের শীতে ফুল্লরা শ্রেণীর হতভাগ্য নরনারীদের বস্ত্রাভাবে যে কত দুঃখ সে

তারা ছাড়া আর কে বুঝবে? পৌষ মাসের শীতে হরিণ মাংসের বদলা পাওয়া পুরাতন খোস্‌লা তা' এমন ধূলি ধূসরিত হয়ে গেছে, যে গায়ে দিলে চোখ চাইবার উপায় থাকে না। এই তো তাদের দশা। ফাল্গুন চৈত্রেও ঐ একই কাহিনী। পায়ে তাপ, মাথায় রোদ উদরে ক্ষুধার দাহন। বাংলার,—তথা ভারতের মূর্তিমতী দুঃখ ভারাতুরা নারী! চির বুভুক্ষায় কঙ্কাল সার, মৃত্যু-সীমানার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'তে পাদ মাত্র বাকী, অথচ কোন মহামন্ত্রের সিদ্ধিতে লোভ মোহের অতীত বুদ্ধি, অন্তর ঐশ্বর্যে মহীয়সী গরীয়সী। অতুল ঐশ্বর্যের প্রলোভনেও একান্ত অনড়। এরা ধর্মকে পশুমাংসের মত ওজনদরে বেচেনা। পশু বলি দেয় এবং সেই সঙ্গে নিজের পশুত্বকেও এরা বলি দিয়ে দিয়েছে। উচ্চ শ্রেণীর মত, দুলালী ধনীকন্যাদের মত সে শিক্ষিতা হয়নি। তাই বুদ্ধি বুঝি তার এমন অপরিপক্ক? নিজের ভাল বোঝবার সাধ্য হয়ত তার নেই। পতি-পত্নীর সমান অধিকার সে জানেনা। দারিদ্র্যে পিষ্ট হয়েও সে স্বামীকে ছেড়ে পালায়না। উলটে সুন্দরী নারীর প্রলোভনে পড়ে তার ঐশ্বর্যের লোভে পাছে স্বামী ধর্মচ্যুত হয়, সেই ভয়ে কাঁদতে বসে। আবার সেই সজল চক্ষের বাড়বাগ্নি জ্বেলে স্বামীকে কঠোর কণ্ঠে তীব্র ভর্ৎসনা করে;—

"কি লাগিয়া বীর এবে পাপে দিলে মন?
যেই পাপে নষ্ট হইল লঙ্কার রাবণ।
পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে,
কাহার ষোড়শী ভার্য্যা আনিয়াছ ঘরে?"

আবার ছদ্মবেশিনী দেবীকেও উপদেশ দেয়;—

"তোরে আমি বলি ভাল, স্বামীর বসতি চল,
পরিণামে পাবে বড় দুখ।
শুন হের মূঢ় মতি যদি ছাড় নিজ পতি
কেমনে তরিবে লোক মুখ॥

*

স্বামী সন্তোষে বসায়ে খাটে, অপরাধে নাক কাটে,
দণ্ডরাজা বনিতার পতি।
শুন গো শুন গো সই, হিত উপদেশ কই,
ইতিহাসে কর অবগতি॥

*

তোরে দেখি যে উত্তম জাতি, দেবতা সমান কাঁতি
কার্য্য কর নিচের সমান।
ছাড়িয়া পতির পাশ, আইলা পরের বাস
আপনার কি সাধিতে মান !"

ব্যাধ-পত্নী চরিত্রের সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতা আমাদের অতি বিস্ময়ে জানিয়ে দেয়, ভারতীয় সমাজের সর্ব-নিম্নস্তরেও সে সব দিনে সতীধর্মও ধর্ম-প্রাণতা কতখানিই প্রসার লাভ করেছিল।

বেহুলার পাতিব্রত্য ও অসম সাহসিক প্রচেষ্টা সর্বজন সুবিদিত। লক্ষীন্দরের মাতা সনকা সমস্ত সন্তান হারিয়েও স্বামীর ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধতা না করে সহধর্মিণী শব্দের মর্য্যাদা রক্ষা করেছিলেন।

দেবী দত্ত ধন পেয়ে কালকেতু নগর পত্তন করে রাজা হ'য়ে বসেছেন। পাঁচজনের কাণ ভাঙ্গানীতে কলিঙ্গেশ্বর যুদ্ধে কালকেতুকে বন্দী করালে। ফুল্লরা গলায় কুঠার বেঁধে

কোটালের কাছে মিনতি জানাচ্ছেন, সেখানেও তার একটী অতি সুন্দর ছবি দেখতে পাওয়া যায় ;—

"না মার না মার বীরে নির্দ্দয় কোটাল।
গলার ছিঁড়িয়া দিছি শতেশ্বরী হার॥

*

গো মহিষ ধান্য লহ অমূল্য ভাণ্ডার।
সেবক করিয়া রাখ স্বামীকে আমার॥

*

বিচারিয়া দেখ অপরাধ নাহি করি।
নিজে ধন দিয়া চণ্ডী বসাইলা পুরী॥"

বিপদে, সম্পদে ফুল্লরা স্বামীর সত্যকার সহধর্মিণী। আর একটী বাংলার খাঁটী সমাজ চিত্র চণ্ডীকাব্যের ধনপতি সওদাগরের উপাখ্যানে। লহনা খুল্লনা দুই সতীনের ঝগড়া বিবাদে দুর্বলা রূপী মন্থরাদাসীর উভয় পক্ষের কান-ভাঙ্গানী, ফলে প্রবলের হাতে দুর্ব্বলের নির্য্যাতন, পরিশেষে ধর্মের জয়। স্বামী বশ করার ঔষধ পত্র করা, বেশ প্রসাধন, রাঁধা বাড়ার ফর্দ, সব মিলে অনতিক্রান্ত বর্তমানকেই যেন চোখের সামনে দেখা যায়।—

"দু সতীনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া দুর্বলা।
হৃদয়ে ধরিল চেড়ীর কালকূট জ্বালা॥"

এইখানেই রামায়ণের মন্থরার মতই সে গেল লহনার কাছে বিষ ঢালতে ;—

"শুদ্ধমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ।
দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কাল সাপ॥"

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিগণের মধ্যে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর স্বনামধন্য। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক সকল প্রকার ছবিই তিনি এঁকেছেন। বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্যের উত্থানপতন, নদিয়ারাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনী, শিব-শক্তির সম্মিলন গাথা থেকে অতি কুৎসিত নর্ম-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের জঘন্য স্বেচ্ছাচার সমস্তই তিনি নির্বিকারচিত্তে নির্বিচারে বঙ্গভারতীর পদপ্রান্তে প্রদান করেছেন। বহু দেবী ও মানুষী-চিত্রই তিনি দোষে গুণে এঁকেছেন। অতি মধুর ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত ও তাঁর অনেকগুলি আছে।

ভারতচন্দ্রের মধ্যে ভাষার ওস্তাদি যে পরিমাণে ছিল, মৌলিক চরিত্র সৃষ্টির শক্তি সে পরিমাণে ছিল না। বড় আদর্শ সৃষ্টি করতে না পারলেও তিনি বাংলার আদর্শ জননী মেনকাকে, আদর্শ যোগী শিবকে অনেকখানি ছোট করেছেন। যথা মেনকা ;—

"ঘরে গিয়ে মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়,
হাত নাড়ি গলা ছাড়ি ডাক ছেড়ে কয় ;
ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে!
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে ?"

পড়িলে আমাদের চিরপরিচিত "যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী"-র মেনকাকে যেন ভুলে যেতে হয়। ভবানন্দ পত্নীদের বর্ণনায় পূর্ববর্তী কবিকঙ্কনের ছাপ পড়েছে। সেই দু-মুখোসর্প-রূপিণী দাসীর কুমন্ত্রণা দুর্বলাকে মনে পড়িয়ে দেয়। বাঙ্গালীর ঘরের দুঃখের ছবি, বাঙ্গালীর মেয়ের রুদ্ধ অন্তরবেদনা তাঁর বর্ণনায় হরপার্বতীর গার্হস্থ্যচিত্রে, নারীগণের পতিনিন্দায় সুন্দর-

তমরূপে প্রকাশ পেয়েছে। ভারতচন্দ্রের এই চিত্রটিকেই তাঁর রচনার সর্বোৎকৃষ্ট অংশ বলা যায়,—

"অন্নপূর্ণা উত্তরিল গাঙ্গিনীর তীরে,
পার কর বলিয়া ডাকিল পাটনীরে"

ইত্যাদির পর তাঁর আত্মপরিচয়ে—

"গোত্রের প্রধান পিতা মুখ্যবংশজাত,
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যোবংশখ্যাত।
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুণ।
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।"

ইত্যাদিতে প্রকৃতিও পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ পরিচয় একান্ত উপভোগ্য!

কোন কবি তাঁর কালকে অতিক্রম করতে পারেন না। কালের হাওয়া তাঁর রুচিপ্রবৃত্তিকে সংগঠিত করে থাকে; তাই "বিদ্যাসুন্দর" সেদিনে ও তার পরবর্তী অনেকদিন ধরেই বাঙ্গালী সমাজে সমাদৃত ছিল; যাত্রা ও অপেরার প্রধানতম বিষয়বস্তু ছিল। তর্জ্জা এবং কবির লড়াইয়ে সে সময় বহু অশ্লীল রচনা শিক্ষিত সমাজে সমাদৃত থেকেছে। অবশ্য "বিদ্যাসুন্দরের" উপাখ্যান ভারতচন্দ্রের স্বকপোলকল্পিত নয়; তাঁর বহু পূর্ব থেকেই সে কাহিনী বাংলা সাহিত্যে চলে এসেছে; তবে কথা এই আধ্যাত্মিক আবরণ দিলে যে বস্তু সাহিত্যে সমাদৃত হয়, তার নিরাবরণ রূপই কুৎসিত হয়ে ওঠে আত্মিক ব্যাপারে;—

যথা, স্বদেশী ডাকাতি এবং খাঁটি দস্যুবৃত্তিতে যেমন প্রভেদ। তা' সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের বহুমুখীন শক্তিকে তুচ্ছ করা যায় না। শিব বিবাহের বর দেখতে মেয়েদের হুড়াহুড়িতে কুমারসম্ভবের সপ্তম স্বর্গ মনে পড়িয়ে দেয়।

আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে অনেকেরই মনে মনে বিশ্বাস আছে এ দেশে মেয়েরা চির অনাদৃতা। এ অভিমান যে কি রকম ভিত্তিহীন মনু-বিধান থেকে প্রাচীন কবিদের রচনার মধ্য দিয়ে তার বিরুদ্ধ প্রমাণই রয়েছে। নীতিকারেরা বাল্যে কৈশোরে যৌবনে বার্ধক্যে কোন অবস্থাতেই মেয়েদের খেটে খাবার বিধান দেন নি। "ধনরত্নসমন্বিতা বিদুষী কন্যাকে" "বিদ্বান বরে" সমর্পণ পিতা ও ভ্রাতার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আবার বাঙ্গালী কবিরা আগমনীর গানে গানে পতিগৃহবাসিনীদের কি করুণ সুরেই না আহ্বান জানিয়ে শারদাকাশ মুখরিত করে রেখেছেন! যদিও এ সব গান মাতৃহৃদয়েরই অভিব্যক্তি, কিন্তু রামপ্রসাদ, দাশরথী রায়, কমলাকান্ত, রাম বসু প্রভৃতি পুরুষেরাই ত এদের রচয়িতা। পিতৃহৃদয়ের কন্যাবাৎসল্য নারীচিত্তের স্বাভাবিক স্নেহদৌর্বল্যের মধ্য দিয়ে কল্পিত হয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে মাত্র। কচি মেয়ের আদর আবদার থেকে প্রবাসী নন্দিনীর জন্য ভয় ভাবনা, অদর্শন জনিত দুঃখ পরিতাপ এবং দর্শনে বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস, পুনর্বিদায়ের বিচ্ছেদাতঙ্ক সমস্তটা জড়িয়ে নিয়ে আগমনী ও বিজয়ার চিত্রাবলী বঙ্গ-সাহিত্যের আর একটি অপরিমেয় মাধুর্যপূর্ণ অধ্যায়। রামপ্রসাদের গিরিরাণী আদরিনী কন্যার আবদারে অভিভূত হয়ে স্বামীর কাছে অনুযোগ করছেন ;—

"গিরিবর ! আর আমি পারিনা হে, প্রবোধিতে উমারে !
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ।
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে' উহারে ।"

সপ্তমীতে গিরিপুরে পতিগৃহবাসিনী কন্যা আসছেন। কন্যাবিরহকাতরা জননীর কাছে ছুটে গিয়ে পিতা নিজের মুখে সেই প্রার্থিত সন্দেশ বিতরণ করছেন ;—

"আজ শুভ নিশি পোহাল তোমারে,
এই যে নন্দিনী এল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখ রাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ঝরে।"—রামপ্রসাদ।

কমলাকান্তের গিরিপুরেও ঠিক এই একই ব্যাপার ! বাপ মেয়ে আনতে গেছলেন, এসে পৌঁছেছেন, কর্মব্যস্ত মায়ের কাছে ঐ সংবাদ পরিজনেরা দিতে ছুটেছে ;—

"কি কর, কি কর গৃহে দেখ না আসিয়ে গো,
গিরিবর এল গৃহে উমারে লইয়ে গো।"

আবার নিজ কৃতকার্যতায় সানন্দচিত্ত গিরিবরও গৃহিণীকে হাসিমুখে বলছেন ;—

"এই নাও গিরিরাণি তোমার উমারে,
ধর ধর হরের জীবনধন।
কত না মিনতি করি, তুষিয়া ত্রিশূলধারী,
প্রাণ উমা আনিলাম নিজ পুরে।"

তা' গিরি আনন্দ প্রকাশ করবেন না! নিজের মনের ব্যথা মনেই রেখেছেন, পুরুষকারের কিছুমাত্র কমি নেই, কিন্তু কন্যাগতপ্রাণ মায়ের কান্না শুনতে শুনতে যে তাঁর কর্ণ বধির হয়ে গেছে! রোজই মেয়েকে স্বপ্নে দেখেন, দাশরথি রায়ের মেনারাণী কাক-কোকিলের আগে উঠে ঘুমন্ত স্বামীকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে নিত্যই বলেন ;—

"গিরি গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্ত হরিয়ে
চৈতন্তরূপিণী কোথায় লুকাল !"

আবার কোন্ সময়ে ছুটে এসে ব্যগ্র হয়ে বলেন ;—"যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী", বলেন ;—

"গিরি হে, গিরীশপুরে দ্রুত যাও।
সম্বৎসর হল গত, সময় হল আগত,
কণ্ঠাগত প্রাণে বাঁচিনে,—বাঁচাও।"

আবার স্বামীর প'রে দারুণ অভিমান করে রামবসুর মেনকা এ'ও বলে বসেন ,—

"মা হওয়া যে কত জ্বালা যাদের মা বলার আছে, তারাই জানে।
তিলেক না হেরিয়ে মর্ম্মব্যথা পাই, কর্ম্মসুত্রে সদাই টানে।"

দাশু রায়ের উমা-জননী নবম্যাদিকল্পারম্ভে চণ্ডীপাঠে নিযুক্ত পুরোহিত মহাশয়কে সম্বোধন করে দারুণ ক্ষোভে মনের কথা কইছেন ;—

"হে দ্বিজ তোমারে কই, কই এলো মন্দিরে আমার ব্রহ্মময়ী ?
তোমার চণ্ডী সাঙ্গ হ'ল, আমার চণ্ডী কই ?"

এমন সব কত চির-আগমনীর গানে গানে কন্যা মিলনাকাঙক্ষায় ব্যাকুলা জননীদের অভিব্যক্তি ও উদ্‌গ্রীব জনকের প্রতীক্ষা শারদাকাশে চিরপ্রতিধ্বনিত হয়ে এসে আজও মাতৃজাতির অন্তরকে বিমথিত করছে, সে শুধু "মা হওয়ার জ্বালা" যাদের ঘটেছে তারাই জানে !

"কই সে গিরি কই সে আমার প্রাণের নন্দিনী।
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে' এলো রণরঙ্গিনী ?"

শুনলে মনে হয় যেন পল্লীবাসিনী মায়ের সামনে রুজ-লিপষ্টিক-স্নো-পাউডারে ছোপান, 'বব্' করা, ছাগলাস্ত-জুতোর হিলে দীর্ঘাকৃতা, টান জর্জেটসাড়ী গায়ে লপটানো, সহরের সব-চেয়ে ফ্যাসনেবল্ মহিলাটি এসে দাঁড়িয়েছেন ! অথবা ঐ চক্রবেড়ে সাড়ির পরিবর্তে চরম আধুনিকার মত সর্ট সার্টই বা পরে এসেছেন ! তা' মেয়ে যে বেশেই আসুক মায়ের বুকে এলেই হোল। প্রথমটা একটু চমকানি লাগবেই ত ! কিন্তু "তারা-হারা" হয়ে মায়ের "নয়নতারা" ওযে অন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। আবার তাইকি মায়ের প্রাণে স্বস্তি আছে, জামাইয়ের রকম-সকম কোন দিনই ত ভাল নয়, পাঁচজনায় পাঁচ কথা বলতে ত ছাড়ে না ; কেঁদে গিয়ে পতিকে নালিশ করেন ;—

"এই খেদ হয়, সকল লোকে কয়, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
যে দুর্গা নামে দুর্গতি খণ্ডে, সেই দুর্গার দুর্গতি একি প্রাণে সয় ?
লম্বোদর নাকি উদরের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়ায়,
হয়ে ক্ষুধার্ত্তিক সোনার কার্ত্তিক লুটায় ধূলায়।"

তাই মেয়ে আসতে অন্তরে ভরা দুর্বিষহ সন্দেহ জ্বালা হঠাৎ প্রকাশ করে ফেলেন .—

"কেমনে পরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই ?
কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই ।
ছাইভস্ম মেখে অঙ্গে, জামাই বেড়ান ভূতের সঙ্গে,
ওমা তুমিও নাকি তারই সঙ্গে সোনার অঙ্গে মাখ ছাই ?"

বলতে বলতে উত্তেজনা এসে গেল, বড়লোকের গিন্নির মত গরীব জামাইকে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে সরোষে বলে উঠলেন ;—

"এবার নিতে এলে পরে বলবো উমা ঘরে নাই ।"

মায়েরই ত প্রাণ ! মেয়ের মুখে সঠিক সংবাদটী পেতেই সুখ দুঃখের সাথী পতিকে সেই সুসংবাদটী দিতে হর্ষস্মিত মুখে ছুটে গেছেন ;—

"মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুনতে পাই !
উমা অন্নপূর্ণা হয়েছেন কাশীতে, রাজরাজ্যেশ্বর হয়েছেন জামাই।
শিবে এসে বলে মাগো শিবের সেদিন আর নাই ।
যারা পাগল পাগল বলে, বিবাহের কালে সবাই দিলে ধিক্কার,
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বৈভব, কুবেরের ভাণ্ডার ।"

মেয়েজামাইয়ের ঐশ্বর্যের পরিচয় তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিচ্ছেন, আর সবার কাছে তাই ছড়িয়েও দিচ্ছেন ! সাত হাত বুক করে সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদ ও করছেন ;—

"হোক্ হোক্ উমা সুখী হোক্ সদাই হ'ত মনে ।"

এমন কত ছবির পর ছবি, মাতৃহৃদয়ের আনন্দ বিষাদের ক্ষণ-পরিবর্ত্তিত চলচ্চিত্র কত কবিই যে প্রাণের রসে রঙ্গিয়ে এঁকেছেন। মহারাজ নন্দকুমারের মেনকা অভিমানভরে বলছেন ;—

"এ বার মেয়ে হয়ে বুঝাইব মায়ের মায়া কেমন ধারা ।"

বৈষ্ণব সাহিত্যে দুইভাবের নারী-পরিচিতি আমরা লাভ করেছি,—প্রিয়া এবং মাতা। মা যশোদায় আমরা বিশ্বমাতার যে রূপ বিশ্বের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিতা তাঁকেই দর্শন করি। মাতৃ-চিত্তের অমূল্য বাৎসল্য রসকে যশোদার মধ্য দিয়ে ভাবপ্রবণ বৈষ্ণব কবিরা সাহিত্যের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সমগ্র মানব-জননীদের প্রতীকরূপে। মা চিরদিন সন্তানকে কোল ছাড়া, চোখ- ছাড়া করতে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন, পুত্র সঙ্গিদের সঙ্গে পথে বেরুচ্ছেন, এই গ্রামেরই প্রান্তসীমায়,—গোষ্ঠসীমায় হয়ত যাচ্ছেন, তা'তেই ভয় ভাবনার অন্ত নেই। বড় শিংওয়ালা গরুর সামনে যেন না যান, রোদ না লাগান, ক্ষুধা পেলে কোঁচড়ে বাঁধা ক্ষীর ছানা যেন খান, এমন সাতশো কথা মাথার দিব্য দিয়ে বলছেন, ফিরতে একটু দেরী হলেই কেঁদে হাট বাঁধাচ্ছেন। প্রত্যুষ থেকে মায়ের আর কোন্ চিন্তা, কোন্ কাজ? গোবিন্দদাসের যশোদা সকাল বেলা ছেলেকে ডাকছেন ;—

"আলস ত্যজি উঠহ যদু রায়,
আগত ভানু রজনী চলি যায়।"*

এমন সময়—

"অরুণ উদয় বেলা সব শিশু হয়্যা মেলা
সভে গেল নন্দের দুয়ার।"

তখন—

"আনন্দিত নন্দরাণী সাজাইল নীলমণি
নানা আভরণ পীতবাস।"

"যদুরায়" শব্দটা তিনি নিশ্চয়ই ব্যবহার করেন নি

আবার—

"গোষ্ঠে যায় শ্রীহরি চূড়া বান্ধে মন্ত্র পড়ি
পীঠে দিল পাটকি ডোর।
ধড়ার আঁচল ভরি খাইতে দিল ক্ষীর-ননী
কাঁদে রাণী হইয়া বিভোর।"

তা' কান্না পায় বই কি, সারাদিন ছেড়ে থাকতে হবে ত! মায়ের পক্ষে এ ব্যাপারটি ঠিক হাসবার মত নয়, এ নিয়ে অন্যে যতই হাসুক না কেন! সারাদিনই ঘর বার করেছেন, এখন;—

"সাঁঝ সময়ে গৃহে আওত যদুপতি, যশোমতী আনন্দ চিত,
দীপহি জ্বালি, থারিপর ধরকত, আরতি করতহ' গাও ত গীত।"

তার পরে—

"বদন মুছাই, মুছি মুখমণ্ডল বোল ত মধুরিম বাণী,
কতহুঁ যতন করি, যশোমতী সুন্দরী, বসাইল মন্দিরে আনি।
সুবাসিত তৈল, সুশীতল জল দেই, মাজাই যতন হি অঙ্গ।
কুন্তল মাজি, আজি পুনঃ বান্ধল চূড়, তাহে কুসুম সুরঙ্গ।
মৃগমদ চন্দন, অঙ্গে সুলেপন; যতনে পিন্ধাওলি বাস।
সুবাসিত কুসুম হার উরে লম্বিত, ইত্যাদি—"

তার পর ভোজনপর্ব! কিন্তু তৎপূর্বে নরোত্তমদাসের যশোদা স্নেহ-বিহ্বল সহাস্যমুখে ছেলেকে ঈষৎ আদর-গলানো একটু অনুযোগও করে নিলেন;—

"নন্দদুলাল, বাছা যশোদাদুলাল,
এতক্ষণ গোঠে থাকে কাহার ছাওয়াল?"

আবার চুমু খেতে খেতে বলছেন;—

"তোমার মুখের নিছনি লৈয়া মরে যাউক মা।"

এই সব কল্যাণী জননীকে আমরা ঘরে ঘরে নিত্য প্রত্যক্ষ করছি, কিন্তু অতি পরিচয়ে তিনি প্রায় অপরিচিতা হয়েই রয়েছেন। আশ্চর্য এই যে, এই সকল অতিপরিচিত মাতৃ-চিত্রগুলি পুত্র রচিত, মাকে চিনতে তাদের একটুও ভুল হয়নি।

"ক্ষীর ননী ছানা সর, আনিয়াছে থরে থর,
আগে দেই রামের বদনে,
পাছে কানাইয়ের মুখে, দেয় রাণী মহাসুখে,
নিরখিয়ে চাঁদমুখপানে।"

কবিশেখরের রাধাও পক্বান্ন পাঠিয়েছেন, যশোদা মুদ্গসূপ, তা'তে মরিচের সুখদ ঝাল দেওয়া, আরও কি কি সব এবং চিনি-কদলীসংযুক্ত ক্ষীর সরের সঙ্গে সেগুলিও প্রেরিকার পরিচয় সহিত সকৃতজ্ঞ চিত্তে অনুরোধ করে করে ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন। সেজ-বিছানা পেতে, কর্পূর তাম্বুল দিয়ে ছেলেকে সকাল সকাল ঘুম পাড়াচ্ছেন, আবার যে ভোরের বেলায় শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম ডাকতে আসবে, বলবে ;—

"বনে গেল ধেনু, আয়রে কানু বেণু বাজায়ে।"

মায়ের নজর যে সবদিকে সমান সজাগ! পরিতাপের বিষয় প্রিয়-বিরহিতার বিলাপ-উচ্ছ্বাসে যে বৈষ্ণবসাহিত্য কলকল্লোলিত, মায়ের দুঃখ তাঁরাই বা তেমন করে কই বুঝেছেন? পরবর্তীরা ভাঙ্গাবুকের সেই অশ্রান্ত রোদনে তবু একটু কান পেতেছিলেন বলেই মধুকান তবু বলতে পেরেছেন ;—

"গোকুলেতে তুমি যারে ডাকতে মা বলে,
সে কান্দে আজ পথের ধুলায় কৃষ্ণ কই বলে,

অঞ্চলে বাঁধিয়া ননী বলে কোথায় ও নীলমণি
শুনলে তার ক্রন্দনের ধ্বনি পাষাণ সেও গলে।
যতনে তায় পালন, করেছিলাম লালন,
সে করলে না প্রতিপালন,
মধু কয় এ নূতন নয়।*

সত্যই তাই, এ নূতন নয়ই ত! মাকে দরকার হয় তখনই,—যখন খবর আসে,—"গোঠে হতে আইল নন্দদুলাল", যখন সাথীরা এসে আরজি পেশ করে ;—

"ও মা নন্দরাণি, সাজিয়ে দে তোর নীলমণি"।

এখন সেই মায়ের দশা দেখে পাঁচজনে বলাবলি করে ;—

"দেখতে কাঙ্গালিনীর মত, কিন্তু নয় কাঙ্গালিনী তত,
আয়রে গোপাল, গোপাল বলে, করাঘাত হানে কপালে,

* * *

মলিন বেশে এমন বরণ যেন রাজমাতা।
শুনেছি গোকুলে আছেন রাজার এক মাতা।"

তারপর মাতৃচরিত্রের আর এক অভিব্যক্তি দেখতে পাই প্রতিদ্বন্দ্বিনী দেবকীকে চ্যালেঞ্জ করায়।

যশোদা প্রতিবাদিনীকে ডেকে বলছেন—

"এস এস দেবকি! তোমায় গোপাল দেব কি?
এস দু'জনে ডাকি, কারে মা বলে দেখি।
যার গোপাল তার কোলে যাবে, তারে মা বলে ডাকবে,
তার পায়ের ধূলা মাথায় নেবে, সভাজন সাক্ষী॥"

ক্ষীর-সরের সঙ্গে চারটি পছন্দসই গাছের ফলও এনেছেন, স্নেহবিহ্বল স্বরে বলছেন ;—

"নে'রে খা'রে বে'রে বদনে, তো' বিনে আর খাই নাই,
বনফল শুষ্ক হ'ল বনে।"

অবশেষে মৃতকল্পা যশোদার পুত্রবিরহদাবাগ্নির অনির্বাণ দহনে দগ্ধীভূতা মুমূর্ষু জননীর শেষ আর্ত মর্মর ; এ কি শুধু একা তাঁরই বুকফাটা রক্তবিন্দু, না সমুদয় নির্যাতিতা কৃতঘ্ন-পুত্র-জননীদের ? এই যে কথাগুলি অতুলকৃষ্ণ মিত্রের যশোদা বলেছেন ;—

"এলি কি দেখিতে গোপাল এত দিনের পরে ?
তবে দেখ দেখ চেয়ে দেখ ওরে যাদুমণি !
ভূমিতে পড়িয়ে রে তোর যশোদা জননী।"

মধু কানের যশোদা অঝরঝরে কাঁদেন ;—

"আর কি আসিবে সে নীলমণি ?
মা বলে আসিবে কোলে. খাওয়াইব ক্ষীর-ননী।"

মায়ের প্রাণের আশা যে যায় না। নইলে ইতিপূর্বেই ত ঐ কবির শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসী সাথীদের কাতর আবেদনের প্রত্যুত্তরে স্পষ্ট ভাষাতেই বলে চুকিয়েছেন ;—

"আর ত' ব্রজে যাব না ভাই, যেতে প্রাণ নাহি চায়,
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই এসেছি মথুরায়।
বাপ পেয়েছি, মা পেয়েছি, ছেলেখেলা ভুলে গেছি,
তোমরা ক'জন মা বলে ভাই, ভুলিয়ে রেখ মা যশোদায়।"

জগতে এমনিই হয় ! মা চিরদিন মা-ই থাকে, তার কোন পরিবর্তন হয় না ; কিন্তু সন্তান ততদিনই মাতৃ-অনুগত থাকে যতদিন তার মাকে প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলেই মায়ের প্রতি তারও টান যে বড় অল্প নয়, সমস্ত বাংলাসাহিত্য প্লাবিত করে

তার সাক্ষ্যও বড় কম মেলে না। সে অবশ্য পার্থিব জননীর প্রতি আকর্ষণ নয়, যা 'খুঁটে খেতে' শিখলেই শোধ হতে পারে। সে মায়ের আবার দুটি অংশ, এক দেশমাতৃকা অপর জন্মদাতা। দেশমাতাকে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" বলে যুগ-যুগান্তর পূর্বের সাধক কবি তাঁর ভক্তি-অর্ঘ্য দিলেও এবং বাহান্নপীঠ-সমন্বিত বিশাল ভারতবর্ষ সতীদেহরূপিণীর রূপমূর্তি বলে স্বীকৃত হলেও নিজস্ব ভিটা, নিজস্ব গ্রাম বা বড় জোর প্রদেশমধ্যে দেশাত্মবোধ নিবদ্ধ থেকে নিজ জননীর মত দেশ-জননীকেও শুদ্ধান্তঃপুরিকা করা হয়েছিল। কার্যতঃ ইদানীং সুদূর প্রতিবেশীর মাতৃভক্তি সহসা একদিন বিস্মৃতা জননীকে ভাল করে চিনিয়ে দিলে, অমনি জননীর জীর্ণদ্বারে ভক্ত সন্তানদের সমাগম হতে লাগল।

স্বদেশী যুগে বহু স্বদেশী গানের রচয়িতা কবির সাক্ষাৎলাভ ঘটেছিল; সকলের নাম ধাম জানা ও জানানো এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়, কারণ ভারতমাতার সেই ভক্তবৃন্দ নিতান্ত সংখ্যাল্প নহেন। তা'তে ভূদেবের "মাতর্মামি সততং সতীদেহরূপাম্"ও আছে, তারই অনুবর্তনে বঙ্কিমের "বন্দেমাতরম্"ও আছে, রবীন্দ্রনাথের "অয়ি ভুবনমনমোহিনী" থেকে "জনগণমন-অধিনায়ক জয়হে", অশ্বিনী দত্তের "চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে ও ভাই, জীবন-আহবে চল" ও আছে; "দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন," "জননীর দ্বারে ওই শুন গো শঙ্খ বাজে", রজনীকান্তের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে'রে ভাই, দীন দুঃখিনী মা যে মোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই", এ সকলি আছে। এ ছাড়া;—

"শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা অভয়াচরণে নম্রশির
উরিনে রক্ত ঝরিতে ঝরাতে দৃপ্ত আমরা শুক্তবীর।"

প্রভৃতি শক্তি সাধনার চরম মন্ত্রসমূহ বহু হোতা উদ্‌গাতার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়ে, "মা মা" রবে বাঙ্গালীর জীবনে ভাঁটার পরে জোয়ারের মত প্লাবন এনে দিয়েছিল। বাংলাসাহিত্যে বাঙ্গালীর একান্ত নিজস্ব তন্ত্রসাধনা যুগযুগান্তরের বিস্মৃত অতীতকে ঠেলে ফেলে হঠাৎ নিজরূপ প্রকট করেছে। সাধনায় অমরত্ব লাভ না করলে, অকাল-মৃত্যুর অধিকারের বহির্ভূত না হলে কি মহামন্ত্রের—মাতৃমন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায়? এবার আশা দেখা দিয়েছে, উষাও আর অদৃশ্যা নেই। মাতৃযাগের অনুষ্ঠানে একদা মাতৃমন্ত্রের ভৈরবনাদে ভারতের,—বিশেষ করেই বাংলার আকাশ কেঁপে উঠেছিল। ইতিপূর্বে এক মায়েরই সেবা করে এদেশ ষোড়শ মাতৃকার পালে পার্বণে পূজা পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। আজ অকস্মাৎ স্কন্ধ-ধাত্রীদের মত ধাত্রী-মাতা-স্বরূপা অপর মায়ের কথা জনে জনের মনে মনে লজ্জা-সঙ্ঘাত বাধিয়ে দিলে, বাগাম্নপীঠের অধিষ্ঠাত্রীদের উদ্দেশ করে আসমুদ্র-হিমাচল মাতৃনামে গর্জে উঠলো। নূতন নূতন মন্ত্রসাধকরা বুক চিতিয়ে এগিয়ে এলেন, হতাশার গান ছেড়ে দিয়ে বীর্যের গান শৌর্যের গান তাঁরা গাইতে লাগলেন, এঁরা বললেন ;—

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁসিয়ার!"

এঁরা গাইলেন—

"ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল

অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌।"

এ'রা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রশ্ন করলেন না,—"কেন মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি?" সুসঙ্গের মহারাজ কমলকৃষ্ণের মত গাইলেন না ;—

"বিরলে বিজনে বসে কে মা তুমি একাকিনী?
অবিরল নেত্রনীরে ভাসিছে বদনখানি,
আর্যাবর্ত পুণ্যভূমি তার অধিষ্ঠাত্রী তুমি
কোন দুঃখে ম্লানমুখে নয়ননীরবাহিনী?"

হেমচন্দ্রের মত সাবধানতার সঙ্গে বলছেন না ;—

"ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর?
না হলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার।"

গোবিন্দ রায়ের মত অনুপায়া মাকেই ব্যর্থ প্রশ্ন করছেন না ;—

"কত কাল পরে, বল ভারতরে, দুঃখসাগর সাঁতারি পার হবে?"

এ প্রশ্নের উত্তর ছেলের মুখেই ধ্বনিত হ'ল ;—

"আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা
মানুষ আমরা নহি ত' মেষ।
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।"

আনন্দচন্দ্র মিত্র ভারতমাতার প্রতিনিধিত্বে ঘুমন্ত ও অর্ধজাগরিত সন্তানদের জানিয়ে দিলেন ;—

"উঠ উঠ সবে ভারতসন্তানগণ
থেক না থেক না আর মোহনিদ্রা অচেতন।"

আবার ব্যাকুল হয়ে বলছেন ;—

"চেয়ে দেখ দেখ সবে ভারতসন্তানগণ !
জননী জনমভূমি চিরবিষাদে মগন।"

রবীন্দ্রনাথ বল্‌লেন ;—

"একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক
জগত জনের শ্রবণ জুড়াক্।"

কবি অতুলপ্রসাদ সেনও ভারত-ভূষণদের আহ্বান জানিয়ে বিলাপ করলেন ;—

"ভারত-ভানু কোথা লুকালে, ক'বে উদিবে পুনঃ প্রাচীর ভালে ?"

আবার বর্তমানদের উদ্দেশে সঙ্গে সঙ্গেই গভীর প্রেরণা দানের সঙ্গে বলছেন ;—

"বল বল বল সবে
শতবেণু বীণা রবে
ভারত আবার জগৎসভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

অপর এক শ্রেণীর মাতৃপূজার পূজারী যারা তারা ঐ পূজাবেদীর চিরপ্রতিষ্ঠাতা ও নৈষ্ঠিক পূজার চির পুরোহিত। তারাই মায়ের আদরের দুলাল, চোখের মণি, কোলের গোপাল। তারা কোন স্বার্থের কোন ব্যক্তিগত সুখের উদ্দেশ্যে মাকে ভালবাসে নি, শুধু "মা" বলেই মাকে ভালবাসে। অত শত ভেবে চিন্তে বাছা বাছা ভাষা চুনে চুনে মনভুলান কথা তারা কয় না ; যখন যেটা মনে আসে ফট করে বলে বসে, বাক্যসম্বরণ করবার শিষ্টাচারের ধার তাদের নেই। যেমন মায়ের ছেলে যতদিন কচি বাচ্চা থাকে মাকে কি কখন খাতির করে কথা

কয় ? কান্না অবদার হাঙ্গামার চোটে মা বেচারী বিব্রত সন্ত্রস্ত। তাই আমরা রামপ্রসাদের মাতৃতন্ত্রের মধ্যে কত ভাবেরই না অভিব্যক্তি দেখেছি। ভাবে গদগদ হ'য়ে "লক্ষ্মী মা, সোনা মা, আমার কাছে এস মা" গোছের মিনতিও করছেন ;—

"জননী! পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে।"

আবার মনের মতন না হলেই চটে মটে বলছেন ;—

"করুণাময়ি! কে' বলে তোরে দয়াময়ী ?
কারো দুগ্ধে দাও বাতাসা, তারা—
আমার শাকে অন্ন মেলে কই ?
কারে দিলে ধন জন মা,
হস্তী অশ্বরথচয়।
ওগো তা'রা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আর আমি কি তোর কেহ নয় ?"

আবার ছেলের হিংসুটেপনা দেখে মা যে অলক্ষ্য থেকে ভ্রুকুটি করছেন, তা'ও তো মায়ের প্রকৃতি-জানা ছেলের কাছে অজ্ঞাত নেই, তা' আদুরে ছেলের তাতেই বা ভয়টা কিসের ?

"আমি নই আটাশে ছেলে, ভয়ে ভুলবো নাকো চোখ রাঙালে,
ওমা, আমি বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে,
শিবের দলিল সই-মোহরে যতনে রেখেছি, তুলে।"

আবার আধুনিক ছেলের মত উল্টো ভয় দেখাতেও ওর বাধে না! বলে ;—"মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে", তবে মাকে এইটুকু উপায়ও বাৎলে দিয়েছেন, মামলা করলেও ;—

"তবে শান্ত হব, ক্ষ্যান্ত করে আমায় যখন তুই মা, কর্‌বি কোলে।"

বাঙ্গালী মায়েদের আজও ছেলেমেয়েদের কাছে এক-চোখোমীর খোঁটা খেতে হয়, এটা প্রায়ই দেখা যায়। আর সে বিষয়ে বিশ্ব মায়ের ছেলেদের মত "আমার খাস মুলুকের প্রজা" ত নয়, তাই মায়ের তবিলদারী প্রত্যেক ছেলেই দাবী করলে মা বেচারীরা ফাঁপরে পড়ে যান। তা' ভক্ত ছেলে মাকে অভয় দিয়ে নিজের সার্টিফিকেট নিজেই দাখিল করতে ভোলেননি ;—

"আমায় দে'মা তবিলদারী
আমি নিমক হারাম নই শঙ্করী!"

তা'তেও যখন দরখাস্ত মঞ্জুর হ'ল না, তখন আর মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ রইল না, নির্ব্বেদ এসে গেল ;—

"তুমি এ ভাল করেছ মা, আমায় বিষয় দিলে না,
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না,
কিছু দিলে না, পেলে না, দিবে না, পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর মা!"

তা ছেলের ধন হলে মার পক্ষেই ভাল, মা যদি তার হস্তারক হন, ছেলে আর ওর বেশী কি বলবে? দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাকে শুনিয়ে বসে ;—

"মা হওয়া কি মুখের কথা?
শুধু প্রসব করলেই হয় না মাতা।
যদি না বুঝেন সন্তানের ব্যথা,
দশমাস দশদিন যাতনা সয়েছেন মাতা,
এখন ক্ষুধার বেলা শুধালে না, এস পুত্র গেল কোথা?"

মা যেমন ছেলেকে টানেন, ছেলে যতদিন শিশু থাকে, বালক থাকে, মায়ের প্রতি টান তারও বড় কম থাকে না।

যারা মায়ের ভক্ত ছেলে তারা চির-শিশু। তাই ভারতচন্দ্র মায়ের আঁচল ধরে কাতর হয়ে বলছেন ;—

"ভবানী আমারে ছাড়িও না।
সুশীলা হইয়া শিলায় জন্মিয়া
শিলাময় হিয়া হইও না।
এবার পাথারে ফেলিয়া আমারে,
দোষ বারে বারে লইও না।"

"সংসার পাথারে পড়ে" হাবু ডুবু খেতে খেতে মায়ের আর এক ভক্ত ছেলে দেওয়ান রঘুনাথ ব্যাকুল হয়ে বলছেন ;—

"পড়িয়ে ভবসাগরে ডোবে মা তনুর তরি,
মায়া ঝড়, মোহ তুফান, ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করি!
একে মন মাঝি আনাড়ী, তা'তে দু'জন গোঁয়ার দাঁড়ি,
কু-বাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবু ডুবু খেয়ে মরি।"

মায়ের ছেলেরা প্রত্যেকেই মায়ের মধ্যে জগতের সমুদয় ভয় মৈত্রী করুণা মুদিতার বিভিন্ন ভাব ও রূপের সমাবেশ দেখে কখনও হর্ষে বিহ্বল, কখনও ভয়ে প্রব্যথিত, এর মধ্যে থেকে সার সত্য আবিষ্কারও অনেকেই করে নিয়েছিলেন, তাঁদেরই একজন রামদুলাল এই গুহ্য সত্য ফাঁস করে দিচ্ছেন ;—

"জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান মা ভোজের বাজি!
যে তোমায় যে নামেই ডাকে, তাতেই তুমি হও মা রাজি।
মগে বলে ফয়া তারা, লর্ড বলে ফিরিঙ্গী যারা,
খোদা বলে ডাকে তোমায়, মোগল-পাঠান সৈয়দ কাজি
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি,
সৌর বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজী।"

আবার বলছেন ;—

"জান না রে মন, পরম কারণ, শ্যামা সুধু মেয়েই নয় !
মেঘের বরণ করিয়া ধারণ, আবার কখন কখন পুরুষও হয়।"

অবশ্য কোন কোন ছেলে মাকেই ছেলের সমস্ত ভাল-মন্দর জন্য দায়ী করেন নি ; যেমন দাশরথি রায়, তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছেন ;—

"দোষ কারো নয় গো মা !
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে-মরি গো শ্যামা !"

অনুরূপ মীমাংসা অনেকেই অনেক চিন্তা-গবেষণার পর করে নিয়েছেন। দেওয়ান রঘুনাথ মায়ের "ভয়ানাং ভয়ং" এবং "গতিঃ প্রাণিনাং" এই দুই রূপেরই সমন্বয় সাধন করে নিয়ে বলছেন ;—

"কে রণরঙ্গিণী, যোগিনী-সঙ্গিনী হয়ে উলঙ্গিনী নাচিছে সমরে,
ঝরে ইরম্মদ নয়নের কোণে, ক্ষণপ্রভা খেলে দশন উপরে,
ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখে লাগে ভয়, কিন্তু ভক্তে বিতরিছে বরাভয়,
অকিঞ্চনে কয়, সামান্য ত নয়, ব্রহ্মময়ী উদয় হয়েছেন সাকারে।"

তা ভয়ই করুন আর যাই করুন যাচ্ঞা করতে কোন ছেলেই মাকে ফেলে অন্যত্র হাত পাততে যান না। তা' বাপ ভাই যিনি যতই থাকুন, সখা বন্ধু পতি যতই পাতান, চাওয়াটা কিন্তু সেই মায়েরই কাছে। "কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখন নয়" এ বচন যে বেদের বচনের সমসাময়িক বা তার চেয়েও আগের দিনের। তাই মাতৃনামের মোহমুগ্ধ এণ্টনি সাহেবটা পর্যন্ত লুব্ধচিত্তে মায়ের কাছেই ভিক্ষা চাইছেন ;—

"অপাঙ্গে করুণা কর, ওগো মাতঃ মাতঙ্গি !
ভজন পূজন জানিনে মা, জেতে আমি ফিরিঙ্গি ।"

এই উপলক্ষ্যে দরাফ খাঁর গঙ্গাস্তোত্র স্বতঃই মনে পড়ে ;—

"সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েৎ পুণ্যবন্তম্
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিং তে মহত্ত্বম্ ?
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাম্,
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্ ॥"

মায়ের আর এক দারুণ আবুদেরে ছেলে কমলাকান্ত জোর গলায় বলেছেন ;—

"মা আমারে তারিতে হবে, আমি অতি দীন হীন দুরাচার,
না ভাবিয়া কারণ মজিলাম ভবে।
পতিত দেখিয়া যদি না তার ভব-জলধি,
পতিতপাবনী নামে কলঙ্ক রবে ॥"

এই ছেলের মাতৃভক্তি এমনই প্রবল ছিল যে, মুমূর্ষু অবস্থায় গঙ্গাতীরস্থ করবার বন্দোবস্ত করতে গেলে সেই অন্তিমকালেও সঙ্গীত রচনা করে গেয়ে ওঠেন ;—

"আমার কিসের গরজ, কেন গঙ্গাতীরে যাব ?
আমি কালীমায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কি স্মরণ নেবো ?"

সাতুবাবু বা আশুতোষ দেবও আর একটি কম জবরদস্ত ছেলে নন' ! ইনি বলছেন ;—

"অন্নদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছি পাত,
ফিরাইতে পারিবে না পরশিতে হবে ভাত,
চাহি আমি সেই প্রসাদ, ঘুচে যাতে জন্মের সাধ,
যে প্রসাদ খেয়ে শিব নাচেন হয়ে উর্দ্ধ-হাত ।"

মাকে নিয়ে ছেলেদের রঙ্গরস হাসি-তামাসাও বড় কম চলে না। অভিমান, আব্দার, ঠাট্টামস্করাও যত, আবার দৃঢ়বিশ্বাস এবং ঐকান্তিক আত্মনিবেদনও তেমনি! প্যারীমোহন কবিরত্ন বলছেন ;—

"ঐ নেংটা মেয়েটা এলো, এলো সমরে,
চেয়ে দেখ ভূপ, কি বিকট রূপ,
মড়ার মাথা গলায় গাঁথা,
মড়ার আঙ্গুল কোমরে।"

আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হচ্ছে ;—

"এইবেলা মন ডেকে নে'রে নীলাব্জবরণী মাকে,
নিলাম নিলাম ক'চ্ছে শমন, কখন নে'বে নিলাম ডেকে।"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আব্দার ধরলেন ;—

"দিয়ে সত্য জ্ঞানানুবোধ",
"কর দুর্গে দুর্গতিরোধ"

শিবচন্দ্র মায়ের দশরূপে চমকিত পুলকিত হয়ে গদগদ বচনে প্রার্থনা জানালেন ;—

"তারা কর গো মা পার,
মায়ানদীর মধ্যে পড়ি, ভাবি অনিবার।"

কুমার শম্ভুচন্দ্র গাইলেন ;—

"মন তুমি এই কালো মেয়ে কোন সাধনায় পেলে বল?"

কুমার নরচন্দ্র কিন্তু রাজবাড়ীর ছেলের নাম রেখেছেন। হুকুমবরদারদের হুকুম শোনা নয় অভ্যস্ত কি না, তাই কিঞ্চিৎ ধৈর্যাভাব, আবার মায়ের কথঞ্চিৎ বধিরতা দোষ ত' আছেই, তাই সাড়া না পেয়ে বেজায় চটে মটে গিয়ে বলছেন ;—

"কেন মিছে মা মা কর, মায়ের দেখা পাবে নাই,
থাকলে এসে দিত দেখা সর্বনাশী বেঁচে নাই।
শ্মশানে মশানে কত, পীঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হ'লাম ওষ্ঠাগত, কেন আর যন্ত্রণা পাই ?
মা গেছে নাম-ব্রহ্ম আছে, আমার তরিবার ভাবনা নাই !"

তা' মায়ের উপর এমন তম্বি বড় কমও নয়, কে' না মাকে কি বলেছে ;—

"এখনও কি ব্রহ্মময়ি হয় নাই তোর মনের মত ?"
"যে হয় পাষাণের মেয়ে তার বুকে কি দয়া থাকে ?
দয়াহীনা না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে ?"

এমন কত কথা !

আবার প্রশ্রয় পাওয়া আদুরে ছেলে অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে উঠছে ;—"নেংটা মেয়ের এত আদর জটে বেটাই ত' বাড়ালে !"

এ-সব বুকের পাটা কি আর আজকের যুগে তৈরী হয় ? এ সাহস বড় সোজা সাহস নয় !

"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি—
ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্"।

এ প্রকাশ্যে মুখে বাধলেও মনে মনে চার কাল ধরেই বলতে যে কেহই ছাড়বে না, তা'তে কোনই সন্দেহ নাস্তি।

"রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা,
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং,
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি।"

আবহমানকাল ধরেই নর-সন্তানের অন্তরোৎসারিত এই সকল কামনা বিশ্বজননীর পাদপ্রান্তে পুঞ্জীভূত হতে থাকবেই ;—

"রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥
বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।"

এ মন্ত্র যুগযুগান্তর থেকেই বিশ্ববাসীর ভয়ত্রস্ত অন্তরমধ্য থেকে নানা ভাষায় নানা বর্ণে নানা ছন্দে উত্থিত হয়েছে, হচ্ছে, অনন্তকাল ধরেই হবে। তবে তার মধ্য থেকে কখন কখন কে' একটা দামাল শিশুর আবির্ভাব হয়ে ছন্দোবদ্ধ গতানুগতিক নিয়ম-নিবদ্ধ এই ভক্তিধারার অব্যাহত গতিকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে, তারা তো মাতৃদ্রোহী নয়, বরং মায়ের কাছে প্রশ্রয় পাওয়া তাঁর গোপাল-ছেলে। এদেশে তাঁদের সংখ্যা বড় কম নয়। মহারাজ, রাজকুমার থেকে আরম্ভ করে উলঙ্গ, অর্দ্ধোলঙ্গ-সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক-সাধক, ঘোরতামসিক বলে দৃষ্ট সংসারী সকল শ্রেণীর মধ্যেই জগতের অদ্বিতীয় মাতৃরূপের রূপসাধনা নানা-ভাবেই প্রকটিত হয়েছে। ঐহিক সুখসম্পদের অভিলাষ কোথাও কোথাও থাকলেও নিষ্কামতা বা মোক্ষপদ কামনাই অধিকাংশের আত্মাভিব্যক্তিতে সুপ্রকট। যেমন নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণ বলেছিলেন ;—

"মন যদি মোর ভুলে,
তবে বালির শয্যায় কালী নাম দিও কর্ণমূলে।"

আবার আর এক মহারাজা কোচবিহারের হরেন্দ্র নারায়ণ ভূপ সহাস্যে মাকে শুনিয়ে দিলেন ;—

"তার শমনে ভয় কি, মা যার শ্যামা ?
অন্তে যাব তাঁর ধামে বাজাইয়া দামা।"

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্রের ভোগৈশ্বর্যের অভাব ছিল না, তবু যা' নেই তারই জন্য মায়ের কাছে দরবার করতে ছাড়েননি ;—"চন্দ্রে মোক্ষ প্রদায়িনী হওগো ভবাণী।"

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন বিষয়ী লোক, আইন-আদালতের খবরটা রাখেন ভাল, নালিশ জানাচ্ছেন ;—

—"শিবের মাগো অবিচার ভারী।
মাতৃধনে ছেলেয় ফাঁকি, নিজেই হ'ন তার অধিকারী।"

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন বিশ্বেশ্বরী মায়ের পরিবর্ত্তে তদানীন্তন ভারতেশ্বরীকে রাজসিক উপাসনায় পূজা প্রদান ক'রে সকাম সাধনার চরম দেখিয়েছেন। যথা ;—

"বিশাল তড়াগনীরে শোভে যথা কমলিনী,
অয়ি মাতঃ ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডে তুমি তেমনি।"

এই মাতৃভক্তদের মধ্য দিয়ে সহসা এক পার্থিবজননীর ভক্ত সমাগম হয়েছিল, কান্ত কবি রজনীকান্তের মতই।* তিনি রাজা মহিমারঞ্জন রায়, বিশ্বমাকে নয়, নিজের গর্ভধারিণী মাকে উদ্দেশ ক'রে তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন ;—

"ও মা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী, আমায় গর্ভে ধরি কত না যাতনা পেয়েছ,
এ প্রাণ থাকিতে, পারিনে ভুলিতে, কত যত্ন তুমি করেছ।"

মাকে গর্ভে ধরার গুদামভাড়া দিয়ে চুকিয়ে দে'বার নীতি

---

* "স্নেহ বিহ্বল, করুণা ছলছল,
শিয়রে জাগে কা'র আঁখিরে!" ইত্যাদি…

সে দিনে বেশী লোকে জানতো না, বিশেষ ক'রে বড় ঘরের শিক্ষিত জনসমাজে।

গিরীশচন্দ্র মায়ের রাঙ্গা পা-দু'খানির প্রকৃত রহস্য জানতে পেরে গাইলেন ;—

"আয়, জবা আনি নইলে কি দিব পায় ?
সোনা সাজে না রে মায়ের রাঙ্গা-পায়।"

ঐ রাঙ্গা পায়ের উপাসক কি কম ? কেউ বলছেন ;—

"তুলে নে' রাঙ্গা জবা মায়ের পায়ে সাজবে ভাল।"

কেউ বলছেন ;—

"তখন আমি মনে মনে, তুলবো জবা বনে বনে,
মাখায়ে ভক্তি-চন্দনে, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।"

আবার শুধু কি অঞ্জলি পেয়েই রাঙ্গা পা-দু'খানির পার আছে ? পণ্ডিত শ্যামাচরণ ঐ চরণকে ভবসাগর পার হবার জন্য তরণীর কাজেই লাগিয়ে নিলেন, বল্‌লেন ;—"দে' মা কালি, পদতরি, ভিক্ষা করি।" তা শুধু তিনি কেন, এ কথা বিস্তর লোকেই ত বলেছেন ;—

"মা তোমার চরণ দু'খানি ব্যাধির ঔষধ জানি
তব নাম নিস্তারিণী, করো না মা বঞ্চনা।"

অতুলকৃষ্ণ মিত্র ঐ রাঙ্গা পায়ের মোহগ্রস্ত হয়ে বারে বারেই পাদপদ্মে মাথা কুটছেন ;—

"কোন কামনা করিনে কিছু যাচিনে শ্যামা !
ও রাঙ্গা চরণে শুধু হেরি সুষমা।"

বলছেন ;—

"আমার জীবন মরণ, শান্তি শরণ, তোর মা দু'টি রাঙ্গা পায়।"

ক্ষের বলেছেন ;—

"ইহকালের সাধ মিটেছে, রাখিস পায়ে পরকালে।"

আনন্দময় মৈত্রও নিজ নামের অর্থকে নিরর্থক করে মাকে অনুযোগ জানাচ্ছেন ;—

"মা হয়ে সন্তানের মায়া ছেড় না গো ভবজায়া
আমি নিরানন্দে ভেসে যাই কূল দাও চরণে গো"।

রবীন্দ্রনাথ মিত্র শুধু মার কাছে আবেদন না করে নিজের মনের কাছেও করছেন,—"ভজ শ্যামপদ, ঘুচিবে বিপদ, মন রে আমার।" তা' বলে মাকেও ছাড়েন নি, তাঁকেও এক হাতে ধরে আছেন ;—

"অভয় পদে দিতে হবে যে মা ঠাঁই।"

চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সুরে সুর মিলিয়ে পায়ের দাবী পেশ করছেন ;—

"চন্দ্রে অন্তে স্থান দিও মা পাই যেন পদ দু'খানি।"

শুধু কি পা ধরেই টানাটানি, কৃষ্ণানন্দ স্বামী তারস্বরে ডাকছেন ;—

"একবার বিরাজ মা হৃদি কমল আসনে।
তোমার ভুবনভরা রূপটী একবার দেখে নিই মা নয়নে।"

জগবন্ধু তর্কবাগীশ বলছেন ;—

"হৃদকমলে চিন্তা কর বরাভয়করা শিবা।"

কেউ আবার বলছেন ;—

"হৃদকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।"

পুলিনবিহারী লাল গাইছেন ;—

"আয় মন বিরলে বসে শ্যামা মায়ের নাম গাই।"

রামচন্দ্র রায় গাইছেন ;—

"তারা-নামামৃত সদা কর পান, হবে প্রাণ সুশীতল,
পাবে দিব্যজ্ঞান।"

মাতৃভক্তিতে কেউ বা এমনি বিভোর যে, বেণীদাস শ্যামা-পূজায় বসে তাঁকেই অনুনয় করে সম্বোধন জানাচ্ছেন ;—

"হৃদয়-মন্দিরে দাঁড়াও শ্যামা রূপে শ্যাম-শশি!
পূজিব অভয়চরণে দিয়ে ভক্তি-জবা রাশি।"

তারপর এলেন মায়ের এক ভক্ত ছেলে,—সংক্ষিপ্তে নাম তাঁর 'রামদত্ত'। শক্তির পশরা দিলেন খুলে, ভক্তির সঙ্গে ভাষার তুফান উন্মত্ত বেগে ছুটে বয়ে গেল! গাইলেন ;—

"বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা!
সে কেবলই দয়া তব জেনেছি মা দুঃখহরা।"

গাইলেন ;—"শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।"

গাইলেন ;—

"তনয়ে তার তারিণি! ত্রিবিধ তাপে তারা নিশিদিন হতেছি সারা,
বার বার বৃথা আর, কাঁদায়ো না অনিবার, অধম সন্তানের দুঃখ,
নাশ মা দুঃখনাশিনি!"

অথবা— "আর কবে দেখা দিবি মা, হররমা"—

এ সব মর্ম্মছেঁড়া চিত্তদোহনকরা গভীর অনুভূতিভরা আর্ত্ত অনুযোগ অনুনয় একে মা ত' মা, মায়ের পাষাণ বাবাও বোধ হয় তুচ্ছ করতে পারেন না। বাঙ্গালী সন্তানের এই মর্মবাণী, তার এই আত্মাভিব্যক্তি, এর তুলনা আর কোন সাহিত্যে নেই। কবিরুদ্দিন মল্লিকের "তুমি সবই দিয়েছ, তাপ পাপ রোগ

শোক দুঃখ যাতনা"; তাঁর এবং নজরুল ইসলামের "কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন" এবং আরও কত কি! এর শেষ নেই, শেষ হবেও না। অন্ততঃপক্ষে ;—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

এ বাক্যের অথবা ;—

"শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।"

—এই আকুল প্রার্থনার।

এই "সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা"কেই সমস্ত সুখে দুঃখে শরণ না নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারবে না, বিশেষ রোগ শোকে। দুর্গা কালী চণ্ডী বাণী লক্ষ্মী অথবা দেশ-জননী জীব-ধাত্রী ধরিত্রীই সর্বজীবের কোন না কোন প্রকারে সান্ত্বনার উপায়। জীব যে মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই জন্ম নিয়েছে!

এ সব ছাড়া আরও এক প্রকারের নারী-চিত্র আমরা কদাচ নর-রচনার মধ্য দিয়ে পাই; সাহিত্যে একঘেয়েমির মধ্যে যা' একটু রসের জোগান এনে দেয়। এগুলি ব্যঙ্গচিত্র ;—

"বাড়ীর গিন্নি আজ চল্লে কোথায় উদাসিনী হয়ে?
তোমার এত সাধের পাকা হাঁড়ি যাওনা দুটো নিয়ে।"

প্যারীমোহন কবিরত্ন বলছেন ;—

"যার পয়সা নেই তার মরণ ভাল সংসারে।
পয়সা ভিন্ন হয় না ধন্য মান্যগণ্য কে করে?
দরিদ্র হইলে পতি, প্রাণ-প্রেয়সী রসবতী,
রোষান্বিতা হয়ে অতি, পতির পাশে ঘেঁষে না,
সদাই বলে বাঁচি মলে।"

সে যুগের বহু সহৃদয় কবি ভারতনারীর দুঃখ-দুর্দ্দশায় পরিতাপ ও অশ্রুপাত ক'রে তাদের প্রতি বহু সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। আনন্দচন্দ্র মিত্রের এই গানটী সেদিনের শিশু বিবাহের বিধবাদের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও আজও সমাজের কোন কোন স্তরে বিধবাদের অবস্থা এর চেয়ে খুব উন্নত হয় নি ;—

"ভারতশ্মশান মাঝে আমি রে বিধবাবালা,
বিষের মুরতি করে বিধি আমায় পাঠাইলা,
জানি না কেমন পতি, মনে নাইরে সে মূরতি,
তথাপি যুবতী হয়ে পেটে অন্ন নাই দু'বেলা।"

ইংরাজী কাব্যগ্রন্থে বিচিত্রিতা নারীদের বহু চরিত্র দৃষ্ট হয়। তা' এত বেশী যে একটীমাত্র প্রবন্ধে তা' নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়া হাস্যজনক। মিল্টনে নারীচিত্র তেমন কিছু নেই। বায়রণের "লিওনোরা" প্রভৃতিতে সুন্দর নারীচিত্র আছে। দেশদ্রোহী প্রেমপাত্রকে কঠোর ধিক্কারে লিওনোরার কঠোরতর প্রায়শ্চিত্তে বাধ্য করা নারীমহিমার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত,— তারপর সেই মৃত্যু-মিলন! বহু-বিলম্বিত হয়ে গেলেও সম্মিলিত হওয়াই যে তাদের ভাগ্যলিপি!

টেনিসনের "ডোরা"য় নিষ্কাম প্রেম এবং আত্মত্যাগ, "রিচ্‌পা"য় মৃত্যুমুখী জননীর ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলান রাজদণ্ডে দণ্ডিত পুত্রের খসে-পড়া অস্থিগুলি নিদ্রাহীন নিশীথ রাত্রে সংগ্রহ করার কাহিনী যেমন ভীষণ তেমনই সকরুণ। "লকস্লেহলে"র বিশ্বাসঘাতিনী অ্যামির এবং যাট বৎসর পরে পরলোকবাসিনীর স্মৃতি-তর্পণে স্নেহকোমল ক্ষমাময় প্রণয়ীর অন্তরভিব্যক্তি মানব-চরিত্রের সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত রূপ।

মিসেস হেম্যানের ভাইবোনদের বিয়োগকাহিনীর করুণ ছবিটি চোখে জল আনে, অবশ্য সমব্যথীদের।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের "গ্রাম্যমেয়ে" পল্লীগাথায় সহৃদয়তায় ফুটে আছে। তাঁর অনেকগুলি ছোট ছোট ছবির মধ্যে মেয়েদের বেশ সহৃদয় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

স্কটের "লেডী অফ দি লেকে" নির্বাসিত বনবাসী ভূতপূর্ব অভিজাত পিতার কন্যা অ্যামি চিত্র নারীত্বে সমুজ্জ্বল। আকর্ষণ-কারী আগন্তুকের দিকে মন ছুটতে চাইতেই তাকে বল্‌গা টেনে ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যে বেশ একটী সুষ্ঠু সংযম ও কৃতিত্ব আছে। বার্ণসের প্রেমগাথায় নারী-স্তুতি যথেষ্ট।

গ্যেটের "ফষ্টে"র মার্গারেট এবং মার্থা চরিত্র হিসাবে কিছুই নয়।

ফরাসী কবিদের রচনার সঙ্গে অপরিচয় জন্য তাঁদের কোন নারীচিত্রের সংবাদ সংগ্রহ হয় নি। তাঁদের গদ্যসাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যে পরিণত হয়ে পৃথিবীর অর্ধশিক্ষিতদের নিকটেও অর্ধপরিচিত হয়ে গিয়েছে, জানি না, কেন বিশ্ব-সাহিত্যে ওঁদের কাব্যের বা কবিতার তেমন হিসাবে প্রচার নেই।

জাপানী কবিতার বরং সমাদর দেখা যায়। ভাবপ্রবণ জাতির মধ্যে এ-যুগেও কবিতার কিছু সম্বর্ধনা সম্ভব, যেমন বাংলায়। তবে অনুবাদ-সাহিত্যের মধ্যে "গাথা"-জাতীয় কিছু পাওয়া যায় নি।

চীনেও কাব্যচর্চা এবং কবিতার মধ্য দিয়ে নারীবন্দনা মন্দ হয় নি, কিছু কিছু অনুবাদও হয়েছে।

তরুদত্তের ইংরাজী কবিতায় এ-দেশের পুণ্যবতীরা বিদেশে

পরিচিতা হয়েছেন, যেমন সাবিত্রী, যেমন হর-পরিণীতা পার্বতী-উমার ভিখারী সংসারের অর্থাভাবে কন্যারূপ পরিচয়ে ভক্ত শাঁখারীর কাছে শাঁখা পরা। কিম্বদন্তীমূলক হলেও ভক্তি-রসাত্মক এই গল্পগুলির একটা বিশেষ মূল্য আছে।

আধুনিক প্রায় সমস্ত ইংরাজী ঔপন্যাসিকদের রচনার মধ্যে সৃষ্টিশক্তির গভীর শিথিলতা দেখা দিয়েছে। যান্ত্রিক আবিষ্কারের যুগে মানুষের মনও একান্তভাবেই যেন যন্ত্রবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আধুনিক নারীরা যত্র তত্র হোটেলে রেস্তোরাঁয় পুরুষবান্ধবদের সঙ্গে গিয়ে "ককটেল," "ক্ল্যারেট," "শ্যাম্পেন," "পোর্ট," অ্যাপেরিটিফ, আরও কত কিছু না ফরমায়েস করছেন ; একখানা কাটলেট চাখ্ছেন, নয়ত দু'একখানা স্যাণ্ডউইচ ; রুমালে মুখ মুছে আয়না ধরে "ঠোঁটের সিন্দুর" ও পাউডরপাফ্ বা'র করে "মেক-আপ" মেরামত করে নিচ্ছেন, পুরুষ বান্ধবদের কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে নিচ্ছেন ;—দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম এ-সব বড় ব্যাপারের খবর কোথাও মেলে না! গতযুদ্ধের পরের সাহিত্যেও নূতন কিছু বড় রকম সাহিত্যিক-চরিত্র নারী-চরিত্র সৃষ্টি হতে দেখিনি। হীনতা যে অনেক বেড়েছে সে-টা নব্যসাহিত্যে অস্পষ্ট নেই ; অথচ এত বড় দুইটা সাহিত্যিক উপাদান সামনে দিয়ে চলে গেল!

সেক্সপীয়রের আদর্শ প্রণয়িনী জুলিয়েটের প্রণয়ীর শোকে মৃত্যু, ইয়াগোর চক্রান্তে ডেসডিমোনার স্বামী ওথেলোর হাতে নিধন, অফেলিয়া প্রভৃতি চরিত্র আমাদের সমবেদনা উদ্রেক করে ; পোর্শিয়া আমাদের বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা উদ্রেক করেন। "টেমিং অফ দি শ্রু" (উগ্রচণ্ডার বশীকরণ) নাটকে ক্যাথারিণা,

"কিং হেনরী ফিফ্‌থ" (রাজা পঞ্চম হেনরী)-এ রাজকন্যা ক্যাথারিণের প্রেমালাপে, "টুয়েলথ নাইট" (দ্বাদশরাত্রি) নাটকে অলিভিয়া, "মচ এডো্‌ অ্যাবাউট নথিং" (বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া) নাটকের বিয়েট্রিস. "টু জেন্টলমেন অফ ভেরোণা" (ভেরোণা নগরের দুইজন সম্ভ্রান্ত লোক) নাটকের জুলিয়া "অ্যাজ ইউ লাইক ইট" (যাদৃশী ভাবনা) এর রোজালিণ্ড এ-সমস্তই নাট্যকারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তবে এঁদের মধ্যেও নিছক সত্য কবি চিত্ত দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছিল, না কবিকল্পনা সেই বাস্তবচিত্রে রং ফলিয়েছে তা' আমাদের পক্ষে বলা কঠিন। বিশেষজ্ঞগণের মতে. তাঁর "লেডী ম্যাকবেথ"ই নারীচরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে জীবন্ত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র। তিনি রাজ্যলোভে নৃপতি ডানক্যানকে হত্যা করতে স্বামীকে প্ররোচিত ক'রে নারীচরিত্রের চরম অবনতির দৃষ্টান্ত স্বরূপা হয়ে আছেন।

শেরিডানের "মিসেস ম্যালাপ্রপ" চরিত্র নির্মল হাস্যরসের উৎস ; বড় বড় ভুল কথা বলে যারা পাণ্ডিত্য দেখাতে চায় আজও তাদের পরিহাস করে ইংলণ্ডে ম্যালাপ্রপ বলা হয়।

ডিকেন্সের "পিকউইক পেপারে"র মিসেস লিও হাণ্টার ফোতো বাবুয়ানীর আদর্শ। "অলিভার টুইষ্ট"-এর চোরডাকাতদের দলের মধ্যে কোমলহৃদয়া ন্যান্সি একটি উজ্জ্বল চিত্র; সর্বস্তরের মধ্যেই যে মহৎ চরিত্রের নরনারী থাকে তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। বাস্তবজগতেও কি এ-দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি না? "ওল্ডকিউরিঅসিটিসপ" (পুরাণো বিচিত্র জিনিসের দোকান) উপন্যাসের "ছোট নেল" ছোট হলেও তুচ্ছ নয়। এ-ছাড়া সারা গ্যাম্প, ডলি ভার্ডেন তাদেরও বৈশিষ্ট্য আছে।

রাইডার হ্যাগার্ডের "সি" (আয়েষা)-র চরিত্র অদ্ভুত রসাত্মক বলা যায় ; এ-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নূতন।

আলেকজাণ্ডার ডুমার "কাউন্ট অফ মন্টিক্রিষ্টো"তে মার্সিনেস এবং রিণি চরিত্র দু'টি সুন্দর এবং ভ্যালেন্টাইনের সৎমা অত্যদ্ভুত মন্দ চরিত্র হলেও আশ্চর্য্য নূতন। সন্তানস্নেহে পৈশাচিক পাপ করতে যার বাধেনি সেই মা সেই সন্তানকে বিষ খাইয়ে সঙ্গে করে নিয়ে পরলোকে যাত্রা করল, এ-চিত্র যেমন নিষ্ঠুর তেমনই অদ্ভুত।

থ্যাকারের "ভেনিটী ফেয়ার"-এর বেকী শার্প নীতিজ্ঞান-বিবর্জিতা এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী। জেন অষ্টেনের এলিনর বিজ্ঞতায় এবং মেরিয়ন হঠকারিতায় ও ভাবালুতার জন্য এবং গর্ব ও কুসংস্কারে ক্যাথারিণ এলিজাবেথ উল্লেখযোগ্য।

শার্লট ব্রন্টের "ভিলেটে"র শিক্ষয়িত্রী ম্যাডাম -বেক-এর কথাও এখানে বলা উচিত।

স্কটের "আইভ্যান হো" উপন্যাসের লেডী রাওয়েনা একটি মাটীর পুতুল ; কিন্তু ইহুদী নারী রেবেকার চিত্র সর্বদেশের উপন্যাস-কন্যাদের আদর্শ এবং এই বাংলাদেশে সুপরিচিত। রেবেকার দুঃখে চোখের জল ফেলে নি এমন নিষ্ঠুর অল্পই আছে। "হার্ট অফ মিডলোথিয়ন" গল্পের ড্যানী এবং এফি ডিনসের চরিত্র রবরয়ের ডায়ানা, ভার্ণন, ভিক্টর হুগোর "লে মিসারেবল" উপন্যাসের জাঁ ভলজ্যাঁ ব পালিতা কন্যা কঁসেট এরা নিজস্ব দোষগুণে বাস্তবচিত্র, কিন্তু একটি সিস্টারের চরিত্র যথার্থ অতুলনীয়! যাঁর একটী ইঙ্গিতে অভাগা "জিন্" পুলিসের হাত হ'তে বেঁচে গেল।

টলষ্টয়ের "রিসারেকশন" উপন্যাসের নায়িকা সরলা গ্রাম্য-বালিকা কাট্যুসা ডিমিট্রির প্ররোচনায় পাপে লিপ্ত হয়ে আশ্রয়চ্যুতা এবং সমাজচ্যুতা হ'ল, তারপর খুনের অপরাধে সাইবিরিয়ায় নির্বাসিত হয়। ডিমিট্রি, পরে অনুতপ্ত হয়ে নিজের সমস্ত ধনৈশ্বর্য পরিত্যাগ করে সাইবিরিয়ায় তার সঙ্গী হল, তা'র সুপ্ত মহত্ত্ব প্রেমের এবং অনুশোচনার মধ্য দিয়ে বিকশিত হ'ল।

বার্ণার্ড শ'র নাটকগুলিতে প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে সর্বত্রই বিদ্রোহ সুপরিস্ফুট। সমাজ এবং রাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করে হয়ত তিনি ভালই করেছেন কিন্তু বিদ্রূপ করাটাই তাঁর ধর্ম হয়ে যাওয়ায় অনেক বড় জিনিসের মধ্যেও তিনি কোন মহত্ত্ব দেখতে পাননি। সতীত্বের এবং এক-পতিপত্নীত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা তাঁর লেখায় বার বার ফুটে উঠেছে। "ম্যান এবং সুপারম্যান" (মানব এবং মহামানব) নাটকে তাঁর 'আনা' বলেছেন, "সতীত্বের বিরুদ্ধে একটি কথা বলার অর্থ আমাকে অপমান করা।" তাতে ডন জুয়ান বলছেন, "ভদ্রে, আপনার সতীত্বের বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলছি না, কারণ আপনার সতীত্ব একটি স্বামী এবং বারোটি সন্তানে রূপ নিয়েছে। অসতীত্বের চরমে গেলে আপনি এর চেয়ে বেশী কি করতে পারতেন?" এখানে বিবাহের মধ্য দিয়ে কামনার যথেচ্ছাচারকে তিনি আক্রমণ করেছেন, কিন্তু সে জন্য সমস্ত বিবাহবন্ধন কখনই দায়ী হতে পারে না। বিবাহের অর্থ একানুগত্যের মধ্য দিয়ে দেহমনের সংযমশিক্ষা সে কথা তিনি ভুলে গিয়েছেন। যত বড় লেখকই তিনি হোন না কেন, তিনি দেশকালের গণ্ডি-সীমাতেই

নিবদ্ধ আছেন। এইখানে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মাতৃনামের কবিতার দুটি লাইন তুলে দিলাম,—

"ত্রাসে ক্ষোভে শোকে দুঃখে, আগে নাম উঠে মুখে,
কিবা একাক্ষরী নাম মানবত্তারণ।
যার শব্দে যমচরে, নিকটে আসিতে ডরে,
এ ভব অশুভঘন, বিপদবারণ।"

এই জিনিসটি পাশ্চাত্যসাহিত্যে আমরা খুব বেশী দেখতে পাই না। তবে শোপেনহাউয়ার বলেছেন ;—"She pays the debt of life not by what she does, but by what she suffers".

গর্কীর "মাদারে" মাতৃচরিত্র অনবদ্য ; কিন্তু ভারতীয় মাতৃচরিত্র অধিকতর উদার।

ইবসেনের "ডলস্ হাউসে"র নায়িকা নোরা স্বামীর রোগের সময় ঋণ করে, জাল করে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল, কিন্তু পরে সেই স্বামীই যখন তাকে অপমান করলে, তখন এক মুহূর্ত্তে তার স্বামীপুত্রের সংসার খেলাঘর বলে মনে হ'ল, সে সব ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, স্বামীর শত অনুরোধেও তাঁর আদর্শ-বিচ্যুতির পর আর তার পক্ষে স্বামীর ঘর করা সম্ভবপর হ'ল না। তাঁর আর এক প্রসিদ্ধ নারীচরিত্র "গোষ্টস" (প্রেতগণ) নাটকের মিসেস অ্যালভিং অসচ্চরিত্র স্বামীর হাতে আজীবন অপমান এবং লাঞ্ছনা সয়ে নিজেকে বলি দিলেন ছেলের মুখ চেয়ে, সেই ছেলেও শেষে চরিত্রহীন এবং পাগল হ'ল, মায়ের চিরজীবনের স্বার্থত্যাগ বৃথাই গেল। আমাদের কাছে,—অন্ততঃ আমাদের চোখে তিনিই আদর্শ-জননী পদবাচ্যা।

টমাস হার্ডির প্রথম যুগের রচিত উপন্যাসসমূহের নায়িকাগণের চরিত্রাঙ্কণে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় পাওয়া যায় ; পরে ক্রমশঃ তিনি উহাদের অধিকতর স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য এবং স্পষ্টতর ভাবেই চিত্তবৃত্তি অনুসরণ করতে দিয়েছেন। তাঁর "ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড" যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন অনেকে উহা জর্জ এলিয়টের লেখা বলে মনে করেছিলেন। "টেস অফ দি ডর্বরভিলস"-ই হার্ডির সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ উপন্যাস ; ইহার এঞ্জেল ক্লেয়ারের করুণকাহিনী সকলেরই মর্মস্পর্শী। "দি মেয়র অফ কাষ্টারব্রিজ", "জুড দি অবস্‌কিউর", "এ গ্রুপ অফ নোবল ডেমস," "দি উডল্যাণ্ডারস্‌" এ-সকলের নারীচরিত্রগুলিও বর্ণন-ভঙ্গীতে মনোরম।

হল কেনের উপন্যাসে নারীচরিত্রের সহিত তুলনায় পুরুষ-চরিত্রগুলিই সমধিক জীবন্ত ও সমুজ্জ্বল, তথাপি অল্পাধিক ভাল ও মন্দয় সজীব নারীদের দেখা পাওয়া যায়। "মাষ্টার অফ ম্যানে" জজের মেয়ে নায়িকা একটি আদর্শ স্থানীয়া নারী। "প্রডিগ্যাল সনে"র মাতৃরূপটি একান্তই মাতৃভাবাপন্ন। 'ইটারনালসিটি'র 'রোমা' চরিত্রে স্পর্শমণির প্রভাব লক্ষণীয়!

মারি করেলীর "থেলমা", "ইটারন্যাল লাইফ," "সরোজ অফ সেটানে" একই মহীয়সী নারীকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করি। মিসেস হেনরী উডের "ঈষ্টলীনে'র ইজাবেলা বিশ্বসাহিত্যের সুপরিচিত চিত্র। বহু গ্রন্থে বহু স্বাভাবিক নারীচিত্র তিনি এঁকেছেন ; মাত্র একটির উল্লেখ করলাম।

রামনারায়ণ তর্করত্ন বা নাটুকে রামনারায়ণের "কুলীন-কুলসর্বস্ব" বাঙ্গালার প্রথম নাটক। সেদিনের কৌলীন্য পাপের

প্রায়শ্চিত্তকারিণী নারীদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গেই ইহা সৃষ্টি হয়েছিল। এইটি এবং তাঁর নবনাটক মৌলিক রচনা; তা ছাড়া রত্নাবলী, বেণীসংহার, মালতীমাধব, শকুন্তলা প্রভৃতি সংস্কৃত হতে অনুবাদ তাঁর আরও কয়েকটি নাটক আছে।

মাইকেল মধুসূদনের নারীচরিত্রে গ্রীক সাহিত্যের প্রভাব থাকলেও তাঁর সীতা আমাদেরই চিরন্তন সীতা দেবী। সরমা সমদুঃখী কোমলহৃদয়া, ধর্ম্মভীরু একটি সুপরিচিতা ঘরণী; প্রমীলা মহাভারতের নারীরাজ্যের অধীশ্বরীরই ছায়া দিয়ে গড়া কায়ামূর্তি;—"আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে" বলে আমাদের সামনে এসে দেখা দেন, আবার পতির দেহান্তে প্রতিশোধস্পৃহা বিসর্জন দিয়ে পতিশোকাকুলা সাধারণ ললনার মতই পতি-চিতানলে প্রাণবিসর্জনও করেন। নারীরাজ্যের একচ্ছত্রা রাণী মহাভারতের প্রমীলাও অর্জ্জুনকে দেখামাত্র বীরাঙ্গনা-ধর্ম বিসর্জন দিয়ে তাঁকে পতিত্বে বরণ করতে আবেদন পেশ করলেন। চিরন্তনী নারী বর্মচর্মের ভিতর থেকে এক মুহূর্তে বেরিয়ে এল। তাঁর "শর্মিষ্ঠা" ও "কৃষ্ণকুমারী নাটকে", "তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে", "একেই কি বলে সভ্যতা" এবং "বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোয়াঁ" প্রহসনদ্বয়ে, "ব্রজাঙ্গনা" এবং "বীরাঙ্গনা" কাব্যদ্বয়ে বহু বিচিত্র ধরণের নারীচিত্রের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। বীরাঙ্গনা কাব্যই মাইকেলের পূর্ণ প্রতিভার বিকাশের দৃষ্টান্তস্থল। যেমন চন্দ্রের পাশে নক্ষত্র শোভা পায় সেইমত বৈষ্ণব-প্রেমগাথা সম্বন্ধে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাসের পার্শ্বে মধুসূদনও "ব্রজাঙ্গনা" লিখে চিরদিন সমুজ্জল থাকবেন।

প্রমীলা-দ্বয়ের কথা উপলক্ষ্যে আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদাকে। কিন্তু তাঁর কল্পনাপ্রসূতা সেই মেয়েটির কথাই আগে বলি, যে সেদিনের অঙ্গদেশের মহামন্ত্রীর কাছে আত্মপরিচয় দিচ্ছিল ;—

"ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিরে ভুলাতে পাঠাইলে বনে যে কয়জনা,
সাজায়ে যতনে ভূষণে রতনে আমি তারই এক বারাঙ্গনা"।

ব্যাধবাণবিদ্ধা ত্রস্তা হরিণীর মত অন্তর্বিদ্ধ সেই মেয়েটি ! তার মর্মবেদনা না বুঝে কূটনীতিজ্ঞ "হাজার পোড়-খাওয়া সুবিজ্ঞ রাজমন্ত্রীর উপহাসকুটিল হাস্যাভাসে অধিকতর আহত হয়ে অভিমানভরে সে বেচারী বলে উঠেছিল ;—

"মন্ত্রি আবার সেই বাঁকা হাসি ? না হয় দেবতা আমাতে নাই,
মাটি দিয়ে তবু গড়ে ত প্রতিমা, সাধকেরা পূজা করে ত তাই ?
একদিন তার পূজা হয়ে গেলে চিরদিন তরে বিসর্জন,
খেলার পুতলি করিয়া তাহারে আর কি খেলিবে পৌরজন ?"

রঙ্গলালের "পদ্মিনী"তে পদ্মাবতের সেই চিরকাহিনী বাঙ্গালীর কানের কাছে ঝঙ্কৃত হলো। আজ সেই অতুলনীয়া রাজপুত রাণীর শৌর্য বীর্য ধৈর্য ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির কূটকৌশলকে রূপকথা বলে কথা উঠলেও মানুষের প্রাণের মধ্যে সে যে সুদৃঢ় আসন নিয়েছে, সেখান থেকে তাকে স্থানচ্যুত করা সহজ নয়। পদ্মিনী সত্য না হলেও কবি-কল্পনার যে একটি অপূর্ব আদর্শ সৃষ্টি, তাতে সন্দেহ নেই এবং বিভিন্ন নামে ও রূপে এঁরাই যে সেদিন রাজপুতানার ঘরে ঘরে অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন তাও নিঃসংশয়িত সত্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "সরোজিনী" নাটকে এই পদ্মিনীই

ছদ্মবেশ ধরেছেন। "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে"-র মতই ;—

"জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ।"
পরাণ সঁপিবে বিধবাবালা"

এ গানও একদা বাংলার ছেলেমেয়েদের কণ্ঠস্থ ছিল। "অলীক প্রকাশ" "অশ্রুমতী" প্রভৃতি নাটক সেদিন মহাসমারোহে অভিনীত হ'ত। তাঁর নারীচরিত্র সুচিত্রিত হলেও প্রতাপসিংহ কন্যার প্রেমচিত্র একান্তই অসঙ্গত।

কবি নবীনচন্দ্র সেনের "অবকাশরঞ্জিনী" (দুই খণ্ডে) নানা জাতীয়া নরনারীর বাস্তব চিত্র, অর্থাৎ নিরাবরণ নারী-চিত্র এঁকে তিনি উত্তর কালের কবিদের পথপ্রদর্শন করেছেন। "কোন এক বিধবা রমণীর প্রতি" প্রভৃতিতে আমরা তাঁর রুচির প্রশংসা করিনি। অভাগিনী "বাল্যবিধবা"র প্রতি প্রলোভনকারী পুরুষের নির্দ্দয়-বিশ্বাসঘাতকতার কদর্য চিত্রাবলী সুললিত শ্লোকচ্ছন্দে প্রদর্শন, কাব্যজগতের পুষ্প-বিতানে কণ্টকাকীর্ণ বিষতরুর স্থানই গ্রহন করে ; তাদের আর কোন সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। মহাকাব্যে অবশ্য অনেক কিছুরই প্রবেশপথ অবারিত। খণ্ডকাব্যে এদের স্থান সৌন্দর্য সৃষ্টির (বা আর্টের) দিক থেকে বা সমাজ পুষ্টির পক্ষ থেকে কোনদিক দিয়েই শোভা বা স্বাস্থ্যপ্রদ নয়।

তাঁর "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র," "প্রভাস"গ্রন্থে তিনি আমাদের পৌরাণিকী চিরপরিচিতাদের অর্দ্ধাবগুণ্ঠন মোচন করে তাঁদের কারু কারু প্রকৃত রূপ আমাদের চোখের সামনে ধরে দিয়ে চক্ষু সার্থক করিয়েছেন, যেমন সত্যভামা (মানের ঢেঁকি,

পারিজাতহরণ কাণ্ডের প্রসিদ্ধা নায়িকা) রুক্মিণী এবং সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণভগিনী বৈষ্ণবী সুভদ্রা। সুভদ্রা-চরিত্র কবি মহামানব ও যুগাবতারের ভগিনীর ঠিক যেমন হওয়া উচিত, সেই ভাবেই সৃষ্টি ক'রে, নিজের সৃষ্টিতত্ত্ব-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই পুত্র-বিয়োগে সুভদ্রার মুখে শুনি ;—

"দয়াময় ! নাহি শোক, সাধিল তোমার কর্ম্ম
পুত্র যার, শোক তার নাহি ধরাতলে।
ক্ষত্রিয়ের গুরু দ্রোণ, ভুজবলে তাঁর পণ,
ষোল বৎসরের শিশু লজ্ঘিল যাহার,
সেই বীর-জননীর শোক কি আবার !"

বালবিধবা পূতচরিত্রা হাস্যরহস্যময়ী অথচ মাতৃস্নেহে অভিষিক্তা সুলোচনা এবং অর্জুনের প্রতি ব্যর্থপ্রেমের পরিশেষে নিষ্কাম প্রেমে, বিশ্বপ্রেমে আত্মনিমজ্জিতা শৈল তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টা এই দুইটি নারী চরিত্র প্রকৃতই সুন্দর ! তাদের পরিচয় দু'টি কথায় দেওয়া সম্ভব না হ'লেও ঈষৎ একটু আভাস দু'টি লাইনে দেওয়া যায় ;—

"হাসে নাই নিজ সুখে, কাঁদে নাই নিজ দুঃখে,
চিরদিন প্রেমময়ী সলিলের মত,
আপন তরল প্রাণ, পরে করিয়াছে দান,
সুলোচনা চিরদিন পরপ্রাণগত।"

কুরুক্ষেত্রের শ্মশানভূমে সুভদ্রার "আমাদের বক্ষ-চিতা এরূপে কি নির্বাপণ হইবে মা ?" এই প্রশ্নের উত্তরে শৈলজার অভিব্যক্তিতেই তার চরিত্রের পরম মহত্ত্ব প্রস্ফুটিত ;—

"আমাদের কয় চিতা ?
দেখ না অনন্ত চিতা ভারত মাতার বক্ষে,
পুড়ি এই চিতানলে অধর্ম তিমির রাশি,
নবধর্ম উষা ওই আনন্দে উঠিছে ভাসি।"

অবশ্য তার ধর্মরাজ্য* ইত্যাদি নিশার স্বপনসম বর্তমান আটলান্টিক চার্টারের মতই রাজনৈতিকের কূটবুদ্ধির খেলামাত্র, তার জন্য সে নিশ্চয় দায়ী নয়।

হেমচন্দ্রের ঐন্দ্রিলা ইন্দ্র-বিজয়ী স্পর্ধিত বৃত্রাসুরের অতি-দর্পিতা পত্নী, যেমন আমরা সচরাচর ধনীগৃহে বিশেষতঃ নূতন বড়লোক হওয়া সাধারণ ঘরের মেয়েদের কাহারও কাহারও ঘরে দেখতে পাই। পুত্রবধূ ইন্দুবালা ঠিক এর বিপরীত চিত্র। সুকুমারী ধর্মভীরু কিশোরী মেয়েটি মনের বুকে ছোট্ট একটী ছবি এঁকে রেখে দিয়েছে। ঐন্দ্রিলার ঈর্ষ্যাদগ্ধ সদর্প উক্তি ;—

"সত্যই কি তবে শচী এতই রূপসী ?
আমার অঙ্গের বর্ণ তার অঙ্গে মসি !"

রূপ-গরবিণীর আহতচিত্তেরই যোগ্য বিষোদ্গার।

প্রমথনাথের "শুম্ভনিশুম্ভবধে" কিন্তু শুম্ভপত্নী শুভ্রা আমাদের পূর্বোল্লিখিত মতকে খণ্ডন করেছেন। রূপসী তরুণী-রূপধারিণী মহাশক্তি মহামায়ার প্রতি প্রেমনিবেদন করতে গিয়ে দৈত্যপতি তাঁর সংসারে ও সমাজে যে দারুণ বিপ্লব ইচ্ছা সাধে ডেকে আনলেন সেই কথার উল্লেখ করে প্রবলপ্রতাপ স্বামীর প্রতি সমুচিত ভর্ৎসনাবাণী প্রয়োগ করতে তিনি কুণ্ঠিতা নন ; তাঁদের পতি-পত্নীর আলোচনার ভিতর দিয়ে তা' সুস্পষ্ট

* ৺মহাত্মাজীর রামরাজ্যের মতও বলা যায়।

হয়েছে। দুর্ধর্ষ বীর সেনাপতি ধূম্রলোচনের রণস্থলে পতনের সংবাদে শুম্ভ যখন বিস্ময়বিমূঢ়, তখন দৈত্যেন্দ্রাণীকে আসতে দেখে আহ্বান করে সেই অত্যদ্ভুত সংবাদ প্রদান করলে ;—

—"এস শুভ্রে, শুনেছ কি সব সমাচার ?
অবলা নারীর হাতে দৈত্যের সংহার।"

দৈত্যরাজমহিষী পূর্বেই সে-সংবাদ পেয়েছিলেন, বিস্ময়প্রকাশ না করে তিনি নিজ অন্তরের তীব্র জ্বালাময় সত্য প্রকাশ করলেন ;—

"শুনিয়াছি দৈত্যরাজ অদ্ভুত কথন
নারীহস্তে হত আজি সে ধূম্রলোচন।
কিন্তু ভেবে দেখ নাথ, এ হেন অনর্থপাত,
স্বেচ্ছায় ঘটালে তুমি, হায় অকারণ
একটি নারীর রূপে মজাইয়া মন।"

পল্লীবাসী অনাদৃত কবি গোবিন্দদাসের প্রতি তাঁর স্বদেশবাসী যথেষ্ট অবিচার ও অন্যায় আচরণ করলেও তিনি করেন নি। দুঃখ শোক রোগাহত দরিদ্র কবি "প্রেম ও ফুল"-এ বঙ্গবাণীর চরণে যে পূজার অর্ঘ দান করেছিলেন, তারপর আরও কয়েকখানি কবিতা-পুস্তকে বহু অমূল্য কবিতারত্নের মাল্য রচনা ক'রে সসঙ্কোচে বাগ্‌বাদিনীর কণ্ঠে তিনি প্রদান করেছেন ; তাদের মধ্যে অনেক সাধারণ দুর্লভ বস্তু রয়েছে, কিন্তু গুণগ্রাহী সুধীজনের সে-দিকে নেত্রপাত করবার অবসর এখনও হয় নি। "প্রেম ও ফুলে' কতকগুলি মর্মন্তুদ পারিবারিক অতি করুণ চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল —যা অর্ধ শতাব্দীতেও বিস্মৃত হতে দেয়নি। একটি কন্যা প্রমদা এবং অপরটি পত্নীর অকালমৃত্যুর শোকাবহ দৃশ্য ; সেই ছবি

দু'টির সঙ্গে যেন কর্ণবিদারী রোমাঞ্চকারী "বল হরি হরিবোল" ধ্বনি কাণে ভেসে ওঠে ; প্রথমটির একাংশ ;—

"আবার সে উচ্চরোল ঘন ঘন হরিবোল,
প্রাণময়ী প্রমদারে কোথা নিয়ে যায়,
দিব না দিব না নিতে, দিব না সমাধি দিতে,
কাড়িয়া সে পাগলিনী কোলে নিতে চায় ।"

ইত্যাদি চোখে জল না এনে পারে না। পত্নী সারদার চিতা-শয্যার পাশে দাঁড়ান কবির মর্মকথাগুলিও এই রকমই মর্মন্তুদ ;—

"কি দেখিতে আসিয়াছ ওহে শশধর !
তোমার অধিক শোভা, ততোধিক মনোলোভা,
শোয়ায়ে দিয়েছি আজ চিতার উপর ।"

কন্যা মণিকুন্তলার উল্লেখ করে ;—

"মা-মরা দুঃখিনী মেয়ে বড় যন্ত্রণার
মা-মরা দুঃখিনী মেয়ে, এ-ঘরে ও-ঘরে যেয়ে,
দেখে ইতি উতি কোথা জননী তাহার
সারদার শেষচিহ্ন "মণিই" আমার ।"

এইসব শোকাশ্রুপূর্ণ কবিতার পর এর ঠিক উল্টাসুরে "কুসুমের বনে পাওয়া কুসুমকে" নিয়ে যে কাব্য, তা'তে বিস্মিত বা সস্মিত হ'বার কোন কারণই নেই, সাহিত্যিক বা বাস্তব নারীর তার সঙ্গে কোন গৌরবের সংযোগ নেই। তাঁর শেষবীণার তারের ঝঙ্কারে আমরা শোকসঙ্গীতের রেষই আবার শুনতে পাই, কিন্তু সে ব্যক্তিগত শোকের কান্নাহাটি বিলাপমর্মর ছাপিয়ে সেই অগ্নি-কষা বাঙ্গালীর বুকের মাঝখানে সপাৎ করে ঘা দিয়েছিল;—

"স্বদেশ, স্বদেশ করিস কা'রে এ-দেশ তোদের নয়",—এবং কেন নয়, সে-কথাও তিনি ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে জাতীয় জাগরণের উষালোকে বাঙ্গালী নূতন করে নারীজাতীর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করল। বাইরের জগতে অধীনতার অপমান, তার নিরুপায় অক্ষম অবস্থা তাকে যত বেশী পীড়া দিতে লাগল; ততই সে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে একটা কিছু অবলম্বন খুঁজছিল—যা দুর্বিসহ লজ্জা থেকে এবং আত্ম-অবিশ্বাস থেকে তাকে বাঁচাতে পারে। সেই সময়ে তার দৃষ্টি পড়ল তার অতীত সাহিত্যে, চিরাগত ধর্মে এবং তার সর্বংসহা শক্তিস্বরূপিণী গৃহলক্ষ্মীর প্রতি। এই নারীর নীরব অথচ প্রবল নিষ্ঠার মধ্যে সে তার মুক্তির পথ আবিষ্কার করল, নিজের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ খুঁজে পেল। নবযুগের বাংলাসাহিত্য সে-দিন তাই সহসা নারীস্তুতিতে মুখর হয়ে উঠেছিল। বিহারী-লাল "সারদা"রূপে যাঁকে অন্তরবাসিনী এবং অন্তঃপুরকল্যাণী কন্যা মাতা এবং বধূরূপে দেখে বলছেন ;—

"মানবের কাছে কাছে, সদা সে মোহিনী আছে,
যে যেমন তার ঘরে, তেমনিই মূরতি ধরে।"

যাকে পেয়ে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে বলেছেন ;—

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক গে এ বসুমতী, যার খুসি তার"

বলেছেন, "তুমি মোর অমূল্যরতন, যুগযুগান্তরে তপের ফল,
তব প্রেমস্নেহ অমিয়সেবন দিয়েছে জীবনে অমর বল।"

তাঁকেই সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার সজ্ঞানশ্রদ্ধায় "মহিলা"-কাব্যে বলেছেন ;—

"সবিলাস বিগ্রহ মানস সুষমার, আনন্দের প্রতিমা আত্মার
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার, মুগ্ধকারী মূরতি মায়ার।"

বলেছেন ;—

নর-পশু বনচারী, গৃহস্থ করিল নারী
ছিল নর জড়ের প্রকার,
আদি নারী দিয়া তার সুখ আস্বাদন
বিকাশিল বোধ কলি তার।
যদি মৃত্যু এনে থাকে মহিলা ধরায়,
সে ক্ষতি সে করেছে পূরণ,
যমযানে জরাজীর্ণে লোকান্তরে যায়,
নারী করে প্রসব নূতন।"

*　　　　*

কোন দুঃখ ধরা ধরে, নারী যারে নাহি হরে ?
মর্ত্তে মূর্ত্তিমতী মায়া অঙ্গ অঙ্গনার।

কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের নারী কোন রূপক রূপিণী নয় ; নারীর জীবন্ত মূর্ত্তি।

"প্রাণান্তক জীবনসংগ্রামে তুমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ
নিত্য জয় পরাজয়ে পাছে পাছে ফিরিতেছ
অঞ্চলে লইয়া সুখসাধ।"

তিনি অসুন্দরকে সুন্দর করেন, লক্ষ্মীছাড়াকে লক্ষ্মীশ্রী এনে দেন ;—

"আমি জগতের ত্রাস, বিশ্বগ্রাসী মহোচ্ছ্বাস,
তুমি হেসে বসে বামে, সাজাইয়া ফুলদামে,
কুৎসিতে শিখালে শিবে হইতে সুন্দর।

তোমারই প্রণয়স্নেহ, বাঁধিল বিশালগেহ,
পাগলে করিল গৃহী, ভূতে মহেশ্বর।"

আবার বলেছেন ;—

"লয়ে প্রেম সুধারাশি, এস দেবী, এস দাসি,
এস সখি, এস প্রাণপ্রিয়া
এস সুখে দুঃখ হরে, জন্ম মৃত্যু ভেঙ্গে চুরে
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ব্যাপিয়া।
এস প্রিয়া প্রাণাধিকা, জীবন হোমাগ্নি শিখা
দিবসের পাপতাপ হোক হতমান,
ওই প্রেমে প্রেমানন্দে, ওই স্পর্শে বাহুবন্ধে,
আবার জাগুক মনে আমি যে মহান।
একেশ্বর অদ্বিতীয় অনন্ত মহান॥"

পত্নীবিয়োগের পর তাঁর কাব্যলক্ষ্মীকে গৃহলক্ষ্মীরূপে চিনতে পেরে যে শোকগাথা কবি গেয়েছেন, নারীজাতির সেই স্তবগাথা, আর্য্যঋষিদেরই সমুচ্চারিত বাণীর তাহা প্রতিধ্বনি।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন বলেছেন ;—

"যাদুকরি যেই এলি, অমনি দিলাম ফেলি,
টীকাভাষ্য তোর ঐ চক্ষুদীপিকায়
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সব বোঝা যায়।
শব্দ হয় অর্থবান, রস হয় মূর্ত্তিমান,
রস উথলিয়া উঠে প্রতি উপমায়
যাদুকরি এত যাদু শিখিলি কোথায় ?"

সেই নারীরই আবার বিধবা সধবা নানান্ মূর্ত্তি এঁকে গড়ে বলেছেন ;—

"চক্ষে স্বপ্নকুহেলিকা, বক্ষে মরীচিকা মৃত্যুর তিমিরে,
নিঃশব্দে তাহার প্রীতি দীপহীন শিখা ধূমাইছে ধীরে।
সমস্ত জগৎ দিলে, যদি তার দেখা মিলে,
সমস্ত জগৎ যদি চাহে আরবার।"

অন্যত্র ;—

"পিতা নাই, মাতা নাই, পতিপুত্র নাই, অতি অসহায়।
সকল বন্ধন ছিঁড়ে, একাকিনী কোথা ফিরে,
অনলে অনিলে শূন্যে ; কোথায় ? কোথায় ?"

পুনশ্চ :—

"জীবনে সে পায় নাই সুখ,
দুঃখে কভু ভাবে নাই দুঃখ,
রোগে শোকে হয়নি চঞ্চল,
সরল অন্তরে হাসিমুখে,
সকলি সহিয়াছিল বুকে ;
কাঁদিলে যে হবে অমঙ্গল।

* *

সুখে দুঃখে ছিল চিরসাথী,
জগতজুড়ানো জ্যোৎস্নারাশি,
জীবনের জীবন্ত স্বপন,
আপনাকে হারায়ে হারায়ে,
গিয়েছিল আমাতে জড়ায়ে,
প্রতিদিন অভ্যাস মতন।
পড়ে আছে নয়নে নয়ন,
অসঙ্কোচে করি আলাপন,

দেহে দেহে নাহিক লালসা,
হৃদে হৃদি প্রাণে প্রাণে হেন,
অতিস্বচ্ছ প্রতিবিম্ব যেন !
এক আশা ভাবনা ভরসা।

*　　*

ঘরদ্বার জগৎ সংসার.
সকলি সকলি ছিল তার,
আমি নিত্য অতিথি নূতন।
দিলে পাই নিলে তুষ্ট হই,
গৃহপানে কভু চেয়ে রই,—
অনায়াস দিবস কেমন !”

রবীন্দ্র-সাহিত্যে আমরা নারীর বহু রূপকল্পনা দেখতে পেয়েছি, তাঁদের মহত্বের কথা শুনেছি, বহু বন্দনা-গান কান ভরে পান করেছি; কিন্তু সে সবের দীর্ঘ পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভবপর নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কাহারই বা পরিচয় না থাকবে? নারী মহিমার সমস্ত উজ্জ্বলতর দিকটা যে তাঁর বিরাট সাহিত্যকে সমুদ্ভাসিত করে তুলেছে একথা অবিসংবাদী সত্য। তাঁর উর্বশীকে আমরা ব্যাপিকা অভিসারিকা রূপে দেখি না; দেখি ;—

উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা, তুমি অকুণ্ঠিতা
শুভ্রকুন্দ নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা, তুমি অনিন্দিতা”।

(বেদে উষা এবং উর্বশী অভিন্না বলেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।)

সুধা এবং বিষ তাঁর দুই করে সমানভাবেই বিদ্যমান; শুধু বিষকন্যারূপেই তিনি অঙ্কিত হননি। অর্জুনের প্রেমার্থিনী

চিত্রাঙ্গদা তপস্যালব্ধ কৃত্রিম রূপের প্লাবনে প্রেমাস্পদকে প্লাবিত করে দিয়েও শান্তি পায়নি। তাঁর প্রেমের সার্থকতা আত্মপ্রকাশে ;—

* * আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

যৌবনমদদৃপ্তা বাসবদত্তার জীবনের চরমোৎকর্ষলাভই কবির বর্ণিত বিষয়, তার লাস্যলীলার চটুলতার নয়। অম্বপালির মহৎদান ; "অরণ্য আড়ালে রহি কোন মতে, চিরবাসখানি ফেলি দিল পথে" সেই ভিখারিণীর শ্রেষ্ঠদান, দুর্ভিক্ষপীড়িত আর্তজনের সেবায় ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া যে সুচিন্তিত সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন যে মহৎ দৃষ্টান্ত আজকের দিনে মেয়েদের পক্ষে একান্তভাবেই অনুকরণীয়, কবিবরের অমর তুলিকাপাতে এসব প্রাচীন চিত্র চিরন্তন হয়ে থাকবে।

"লক্ষ্মীর পরীক্ষা" তাঁর সর্বপ্রকার নারীচিত্রের একটি প্রতিযোগিতা ; এই পরীক্ষায় ডবল প্রমোশন পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন রাণী কল্যাণী।

"বহু আছে ধনী, বহু আছে মানী
সবাই হয় না রাণী কল্যাণী।"—

কাহিনীর এইই হ'ল শেষ সিদ্ধান্ত। আমরাও এবিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। দানই কলির প্রধান তপস্যা। "নরনারায়ণের" সেবা! কিন্তু যত দোষ থাকে থাক, ক্ষীরোদাসীকে আমরা কোন মতেই ভুলতে পারব না। তার যে-সব চোখা চোখা যুক্তিবাণ, সে সব বড় বড় তার্কিকের তর্কেরও অতীত ;—

"ক্ষিধের অভাব কা'রও হয় না
চন্দ্রপুলিটা সবার রয় না।"

অথবা "খাবার ত' নয় ক্ষিধের অধীন"

এ ছাড়া,— "যেটা দিয়ে দাও সেটা যে রয় না,
এর চেয়ে কথা সহজ হয় না।"

এসব বড় বড় কথা বিধি-বদ্ধ প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে থেকে তাকে এবং তার মন্ত্রী বা মন্ত্রিণী মালতীকে বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর করে রাখবে।

"পুরাণো শাস্ত্রে লিখেছে শোলোক,
গরীবের মত নেই ছোটলোক।"

এক কথাতে এতখানি প্রকাশ মার্ক্স সাহিত্যে বা তাঁর চেলাদের সাতশো পাতার বিস্তৃত প্রবন্ধে খুঁজে পাওয়া যায় না। বড় দুঃখেই বেচারী বলে উঠেছিল ;—

"ঐ-রে হয়েছে মাথাটি খাওয়া
তোমারও লেগেছে দাতার হাওয়া ?
না না যাও তুমি মায়ের বাড়ীতে
এখানের হাওয়া সবে না নাড়ীতে।"

রবীন্দ্রনাথের শতরূপা নারী প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে রঙ্গভূমে অবতীর্ণা হয়েছেন। ইদানীন্তন অনেক বড় লেখকের তিনখানি বই পড়লেই তার নারীচরিত্রগুলি আমাদের কাছে সিনেমা ষ্টারের মূর্ত্তি ধরে বসে। বহু পরিচিতাদের নূতন নূতন পরিবেশের মধ্যে—তা' তিনি যত ভাল অভিনেত্রীই হোন সত্য করে ভাল লাগে না ; বিশেষতঃ রূপসজ্জা দেখা না যাওয়ায় রেডিও-অভিনেত্রীর মতই তাঁদের সেই পূর্ব্বাপর পরিচিত বাণীরূপকে সহ্য করতে আমরা অনেক সময় বিশেষ করেই কষ্ট পাই। কিন্তু বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্য-সিন্ধুর অন্তর্বর্ত্তিনীরা বিচিত্ররূপিণী, স্বপ্রকাশ, কারু সঙ্গে কারু রক্ত-সম্পর্কটী পর্যন্ত নেই !

সপত্নীকন্যা "বিম্ববতী"র অনবদ্য রূপের ঈর্ষ্যায় ঈর্ষ্যান্বিতা রাজমহিষীর দুঃখের কাহিনী আমাদের মনকে বেশী বিচলিত করতে পারে না ; ঈষৎ কৃপার সঙ্গে বলিয়ে নেয় ;—"আহা বেচারা !" যেহেতু ;—

"বিম্ববতী মহিষীর সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।"

বৈমাতৃক ঈর্ষ্যার সনাতন চিত্র হলেও কবিত্বের যাদুস্পর্শে নূতন। অবশেষে নিজের তাপে বেচারী নিজেই জ্বলে পুড়ে ভস্ম হ'ল ; "হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলা"র সনাতন দুর্ভোগটা রাজাকে আর ভুগতে হ'ল না।

আর সেই ভাবতান্ত্রিক কবির যোগ্যপত্নী, সেই ছবিটি কি সুন্দর ! যেখানে বোকা কবির ধনরত্ন ফেলে রাজকণ্ঠের মালা চেয়ে নিয়ে বাড়ী ফেরার আহাম্মুকিতে পাঠক-পাঠিকারা অস্বস্তি

বোধ করতে থাকেন, পাঠকদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বা ইতিমধ্যে সভীতচিত্তে পুরাতন সম্মার্জনীর আবির্ভাবের আতঙ্কে রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠেছেন, এমন সময় এ-কি ইন্দ্রজাল!

"মালাখানি লয়ে আপন গলায় আদরে পরিলা সতী,
ভক্তি-আবেগে কবি ভাবে মনে,
চেয়ে সেই প্রেমপূর্ণ বদনে,—
বাঁধা প'ল এক মাল্য-বাঁধনে,
লক্ষ্মী সরস্বতী।"

মহাকবি ব্যতীত এ-চরিত্র, রমণীবিশেষের এই নিগূঢ় মর্মকথা আর কে লিখতে পারত? অন্যত্র এই রহস্যময় মনের সম্বন্ধে তিনিই লিখেছেন ;—

"বুঝা যায় আধ প্রেম আধখানা মন, সমস্ত কে বুঝেছে কখন?"

এই মানবচিত্ত রহস্য বুঝতে পারা এবং সেই গুহ্যতত্ত্ব নিজে বুঝে পরকে বুঝানো এইখানেই ত জগতের মহাকবিদের বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের শিশু-চিত্র তাঁর সর্ববিষয়ক রচনার মতই একটি বৃহৎ অংশ। "শিশু", "শিশু ভোলানাথ" প্রভৃতিই নয়, রবীন্দ্রকাব্যের বহু অংশই এদের কথায় মধুময় হয়ে রয়েছে। "মোর চার বছরের মেয়েটী"র মত শিশুচিত্তের অর্ধচেতনার মধ্যে আধ-প্রচ্ছন্ন চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণ থেকে বৃদ্ধভৃত্যের মনস্তত্ত্ব তাঁর নখদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। গ্রামের কালো মেয়েকে "কৃষ্ণকলি" আখ্যা দিয়ে তার কালো হরিণ চোখ দুটির একটু তারিফ করা, "ফুলের মত কোমল তুমি অন্ধ বালিকা" বলে সোজা কথায় একটী কাণা মেয়ের উপর দরদ ঢেলে দিয়েও মরমী কবি মানসী নারীও প্রিয়াকে তাঁদের যথাপ্রাপ্য সম্মাননা দান

করেছেন। তাঁর মানসীকে লক্ষ্য করে জগতের সার কথা তিনি বলেছেন, যে-কথা এই প্রবন্ধে আমি বলতে চেয়েছি, ক্ষমতার অপ্রাচুর্য্যহেতু যা' হয় ত' সম্যকরূপে বলতে পারি নি,—

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী !
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।"

তাঁর 'নারী'কে তিনি বলেছেন ;—

"তুমি এ মনের সৃষ্টি তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।

তার পরে মনগড়া দেবতারে, মন
ইহকাল পরকাল করে সমর্পণ।"

নারী তাঁর মতে, "অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা" এবং তাঁর কাব্যে এবং সাহিত্যে নারীর যে দুটি রূপ তিনি দিয়েছেন, কবিতার মধ্য দিয়ে তার পরিকল্পনা তিনি নিজেই প্রকাশ করেছেন ;—

"কোনক্ষণে, সৃজনের সমুদ্রমন্থনে, উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজন উর্বশী সুন্দরী, বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্য জনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী, বিশ্বের জননী তাঁরে জানি
স্বর্গের ঈশ্বরী।"

নারীর মোহময়ী রূপের পরাভব করে তার স্থিতিবিধায়িনী শক্তিরই উদ্বর্তন তিনি সর্বত্র করেছেন। যে কথা সৃষ্টিতত্ত্বের মূল কথা, আদি সত্য, মহাকবির দৃষ্টিতে তা অজ্ঞাত থাকে নি। যে 'প্রিয়া' আজ প্রগতিসাহিত্যে নরের নারী-বেশী প্রতীকমূর্তি, কমরেড অথচ লোলুপকামনার বস্তু, তারই বিষয়ে কবি সসম্ভ্রমে নিবেদন জানাচ্ছেন ;—

"শতবার ধিক আজি আমারে, সুন্দরি,
তোমারে হেরিতে চাহি এত ক্ষুদ্র করি।
তোমার মহিমা জ্যোতি তব মূর্তি হতে,
আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে,
যখন তোমার প'রে পড়েনি নয়ন,
জগৎ লক্ষ্মীর দেখা পাই নি তখন।"

একস্থানে তিনি নারী-বন্দনায় গাইলেন ;—

"পবিত্র তুমি, নির্মল তুমি, তুমি দেবী তুমি সতী।"

রবীন্দ্রনাথের "নারী পরিচিতি" কোন প্রবন্ধের ক্ষুদ্র এক অংশের বর্ণনীয় বিষয় হতেই পারে না, উহা বহু প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু। সে অসাধ্যসাধনে ব্রতী হব না। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে"র সন্ন্যাসীর মর্মভেদী শেষ বিলাপটুকু, সেই মায়াময়ী পরিত্যক্তা অনাথা মেয়েটির প্রাণশূন্য দেহটি বুকে নিয়ে ব্যর্থ ডাকাডাকি ;— "বাছা, বাছা, কোথা গেলি? কি করিলি রে?" এবং ত্রিপুরাধিপতি গোবিন্দমাণিক্যের নগণ্য একজন প্রজা-কন্যার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে সেই কঠিন স্বীকৃতি "মা। এ রক্তস্রোত আমি নিবারণ করিব।" দস্যুদলপতি রত্নাকরের বনবালিকাকে অভয় প্রদান ;—

"আয় মা আমার সাথে কোন ভয় নাহি আর
কত দুঃখ পেলি বনে আহা মা আমার !"

শিশুসম্পর্কীয় এই সকল চিত্র দৃঢ়বলিষ্ঠ পুরুষচিত্রের অন্তঃসলিলা স্নেহফল্গুর যে নিগূঢ়তম পরিচয় ব্যক্ত করেছে এ আর কোন সাহিত্য দিতে পারে নি। এর কাছে দুর্দান্ত দস্যু, কর্তব্যপরায়ণ ধার্মিক রাজ্যেশ্বর, সংসারবৈরাগী তপস্বীও যে বাদ্ পড়ে না এই সত্যই বড় সুন্দররূপে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। অত বড় দুর্দমনীয় রঘুপতিও এই বিশ্বপ্লাবী স্নেহবন্যার সর্বনাশী খরস্রোতে ভেসে গেলেন! দেখা গেল কচিমুখের আব্দার আর ছোট্ট প্রাণের আবেদনকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না ; না হ'লে আর সেই মদদৃপ্ত দাম্ভিকাচার্য রঘুপতি সহস্রবার বিতাড়িতা অপর্ণার হাত ধরে আর্তকণ্ঠে বলছেন ;— "মা জননি ! এ পুত্রঘাতীরে পিতা বলে যে ডাকিত, সেই রেখে গেছে ওই সুধামাখা নাম তোর কণ্ঠে, এইটুকু দয়া করে গেছে। আহা ডাক আরবার।"

বড় বড় কথার উজানে ভেসে গিয়ে কবি "কাঙ্গালিনী মেয়ে" বা সেদিনের কিশোরী বঙ্গবধূকেও ভুলে যান নি ;—

"বেলা যে পড়ে এল, জল'কে চল্
পুরাণো সেই সুরে, কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখী কোথা সে জল্ ?
কোথা সে বাঁধাঘাট, অশথ-তল্ !

* * *

কোথায় আছ তুমি, কোথায় মাগো
আর কি উপকথা বলিবি না গো ?"

পরিজনবিযুক্তা মেয়েটির বুকের ব্যথা এমনি করেই পল্লীকবির ভাটিয়ালিতেও প্রকাশ পেয়েছে।

সতীনারীর পুণ্যকথায় রবীন্দ্র-সাহিত্য মহাপীঠের মতই পুণ্যভূমি। ধার্মিকা নারীর চিত্র মালিনীতে, ভিক্ষুণী-সুপ্রিয়ায়, আম্রপালিতে, অ-কল্যাণী নারীর চিত্র "কাশীর মহিষী করুণায়"; অসহায়া-মাতৃমূর্তি "দেবতার গ্রাসে"র মোক্ষদায় জীবন্ত! —

"শুধু কি মুখের বাণী শুনেছ দেবতা ?
শোননি কি জননীর অন্তরের কথা ?"

কি আকুল অভিমানে ভরা মাতৃহৃদয়ের এ অভিব্যক্তি!

"বিসর্জনে"র রাণী গুণবতীর শেষ মর্মকথা ;—

"আজ দেবী নাই,—তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা।"

"রাজা ও রাণী"র রাণী সুমিত্রার পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ ;—

"রাজন্, তোমারই আমি অন্তরে বাহিরে,
অন্তরে প্রেয়সী তব বাহিরে মহিষী।"

এবং "পিতৃসত্য পালনের তরে রামচন্দ্র
গিয়াছেন বনে, পতিসত্য পালনের
লাগি আমি যাব।"

ইলার গভীর ও অন্তঃসলিলা প্রেমের ফল্গুধারায় বিক্রমদেবের নবজাগরণ সত্যই অপূর্ব! একনিষ্ঠ নারীপ্রেমের ইহাই অমোঘ মন্ত্র! এ'তে অন্ধেরও চোখ ফোটে। তার ভালবাসা গভীর অতলস্পর্শ, তাই সে প্রেম তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপল নয়। সে গান গায় ;—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মতো বাসিয়ো।"

ক্ষত্র রাজকন্যার বিবাহোৎসবের মধ্যে বর মৈত্রি-পতির গাঁটছাড়া খুলে ফেলে যুদ্ধযাত্রা এবং সেই আধখানা বিবাহের বধূর স্বেচ্ছায় পতিগৃহগমন করে যুদ্ধ-নিহত স্বামীর চিতাসঙ্গিনী হওয়া,—এইরূপ কত তেজস্বিনী মহীয়সীর আলেখ্যে রবীন্দ্রকাব্য-সাহিত্য উদ্ভাসিত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ছোট ছোট কবিতাগুলিতেও তাৎকালীন সমাজচিত্র বেশ ফুটে ফুটে উঠেছে। নববিবাহিত দম্পতীর প্রেমালাপের বধূপক্ষীয় আবেদন "আরো কুল পাড়ো গোটা ছয়", বাল্যবিবাহের একটি পরম উপভোগ্য চিত্র! অবশ্য এখনকার কনের জন্য "জীবন যৌবন করি ক্ষয়" কোন্ উপহার আহরণ করতে হবে, জিজ্ঞাসা করলে অত সস্তায় জীবন যৌবন অক্ষয় রেখে প্রিয়ার প্রীতিসাধন করা কখনই সম্ভবপর হ'ত না; কনে হয়ত বলে বসতো ;—

"ডজন খানেক সাড়ি চাই, চাই সাথে সাথে পিস্ ব্লাউসের"।

ধর্মপ্রচারকের মাথায় লাঠি মেরে এসে বঙ্গবীরের ঘরের স্ত্রীর উপর সদম্ভ জুলুম স্ত্রীর প্রতি কাপুরুষের নির্ম্মম ব্যবহার নির্দেশ করে দু'টী কথায় তাদের দুর্দশার ইসারা দিয়ে গেছে ;—

"স্বামী যবে এল যুদ্ধ সারিয়া ঘরে নেই লুচিভাজা!
আর্যনারীর এ-কেমন প্রথা সমুচিত দিব সাজা।
কোথা পুরাতন পাতিব্রত্য সনাতন লুচি ছোকা,
বৎসরে শুধু সংসারে আসে একখানি করে খোকা।"

প্রাথমিক ভাবে যাঁদের নাম কর্বার কথা তাঁদের ছেড়ে হঠাৎ দূরে চলে এসেছি ;—

বিদ্যাসাগরের "সীতার বনবাসে"র সীতা ছাত্রমহলের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে পরিচয়ে এলেন। কথকতা যাত্রা গানের

সঙ্গে সহরবাসীদের পরিচয় ক্রমে চলে যাচ্ছিল ; তবু একটা যেন যোগসূত্র রইল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "ঐতিহাসিক উপন্যাস" বাংলাভাষায় রচিত সর্বপ্রথম উপন্যাস। এর দুটি আখ্যানের মধ্যে একটিতে মহারাষ্ট্রকুলতিলক ছত্রপতি শিবাজীর সঙ্গে মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের কন্যা রোশেনারার প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বাদশাজাদীর পক্ষে দস্যুবৃত্ত পর্বতারণ্যচারী একজন হিন্দুবীরের সঙ্গে প্রেম সম্ভব কি না নারীহৃদয়ের এই নিগূঢ় রহস্যের কথা কেউ জোর করে বলতে পারে না ; কিন্তু তা' যে একেবারেই অসম্ভব নয়, সে-কথা সমস্তদেশের অতীত বর্তমানের দিকে চেয়ে অনায়াসেই প্রমাণ করা যায়। আজ দেখা যায় তরুণ-তরুণীরা জাতিনীতি কুলগোত্র বিসর্জন দিয়ে অনায়াসেই স্বজাতি বিজাতি স্বধর্মী বিধর্মীকে আত্মদান করছেন। কিন্তু সমাজহিতৈষী দুরদর্শী লেখকের মাত্র সেরূপ একটি সাহিত্যিক রস-রচনার ইচ্ছা ছিল না, বরং ঘটনাচক্রে পড়ে এ-রকম অবস্থা দাঁড়ালে তাদের কর্ত্তব্য কি তাই দেখানই যেন তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েই এরূপ জটিল আখ্যানের সৃষ্টি করেছিলেন ; তা' সহজেই বোঝা যায়। তাঁর শিবাজী এবং রোশেনারা অঙ্গুরীয় বিনিময় করে পরজীবনের জন্য প্রতীক্ষিত হয়ে থাকলেন ; আত্ম-সুখের স্রোতে সমাজধর্মকে ভাসিয়ে দিলেন না। ভদ্রকন্যাদের জীবন ত্যাগসংযমে পূত না রাখলে যে ইতর জীবের সঙ্গে কোনই প্রভেদ থাকে না, রোশেনারা-চরিত্রে এই সত্যই সুপরিস্ফুট।*

* জাহানারার আত্মজীবনীতেও প্রায়-অনুরূপ ঘটনার আভাষ পাওয়া যায়। একজন হিন্দুবীরকে তিনি মনে মনে বরণ করে পূজা করেছেন।

তাঁর আর একখানি পুস্তক, "পারিবারিক প্রবন্ধ" কল্পিতা নারী নয়, বাস্তব নারীদের উদ্দেশে বিরচিত এবং সর্বশ্রেণীর নারীর পথপ্রদর্শক। সঙ্কীর্ণচিত্তা মা যারা ছেলে পাছে বৌয়ের বশীভূত হয় সেই ভয়ে তার মনের দরজায় চাবি দিয়ে রাখতে চায়, বিবাহ-যাত্রাকালে ছেলেকে দিয়ে নিজের "ঘরের লক্ষ্মী"র বদলে "দাসী" আনবার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে তা' পালন করবার জন্য পীড়ন করে, বউকে ঈর্ষ্যা করে ছড়া কাটে ;—

"চন্দ্রমুখী মেয়ে আমার শ্বশুরবাড়ী যায়
খ্যাঁদানাকী বউ এসে বাটায় পান খায়।"

সেই সব মায়েদের ছবি এঁকে তাদের লজ্জা দিয়েছেন। যে-সব মেয়েরা ভাবে, "যে রাঁধে সে আর চুল বাঁধে না", তাদের "বিবি এবং বাঁদী" হয়ে "লক্ষ্মীচরিত্র" অধ্যয়ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন, পুরাতন ছাঁচে নূতনরূপে নরনারীর সৃষ্টিকর্তারূপে তিনি বাস্তবের নারীকে সত্যকার পথ দেখিয়েছেন, তাদের বিভ্রান্ত করেন নি। গ্রন্থের উৎসর্গটী গদ্যে লেখা পরম কবিত্বে মণ্ডিত একটি খণ্ডকাব্য! অকাল কাল-কবলিতা প্রিয়তমা পত্নীর উদ্দেশে তাঁকে দশ-মহাবিদ্যার মত দশবিধ রূপে নিজ জীবনে অনুভব করে এই যে,সশ্রদ্ধ প্রেমাঞ্জলি, এর মধ্যে অজবিলাপের বা বিরহী যক্ষের প্রেম-কাতরতা নেই। সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে ভ্রমণকারী উন্মত্ত ভোলানাথের মত বিক্ষিপ্ততা নেই, আছে অনাবিল প্রেমের সঙ্গে গভীর ভগবদ্‌বিশ্বাস, যার বলে মানুষ সর্বংসহ শক্তি সংগ্রহ করে পরলোককে প্রত্যক্ষ দর্শনে ধন্য হয়, চোখের আড়ালকে প্রাণের আড়াল ভেবে নিদারুণ দুঃখে আর্তনাদ করে না। একটুখানি নমুনা দিই ;—

"আমি কি ? এবং কি জন্য হইলাম ?—গাছে যেমন পাতা হয়, তেমনি হইয়াছি বই ত নয়। আমার ঐ "আমি" পদার্থটি কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির সমাবেশ বই ত নয়। এখন আমার থাকাই কি ?—আর না থাকাই বা কি ?

মন যে কি চায়, পায় না—কি যে চায় তা জানেই না।… পৃথিবী শ্মশানভূমি—এখানে থেকে কাজ কি ?

মনে যখন এই ভাব, এমন সময়ে একটি দেবীমূর্তি আমার সম্মুখীন হইল—আমার দুই চক্ষুতে দুই চক্ষু মিলাইল—আমার হাতে হাত দিল—বলিল, "আমি তোমার।"

'আমার' আছে। তবে 'আমি' একজন ! আমি থাকিব, আমি করিব, আমি বাড়িব আমি বাড়াইব। ইতি স্থিতি-বিধায়িনী।

আর পৃথিবীকে শ্মশানভূমিরূপে দেখাইল না। বর্ত্তমান কাল দেবীর হাস্যপ্রভায় রঞ্জিত হইয়া আশার ফলকে চিত্রিত ভবিষ্যৎ কালের সহিত একীভূত হইল। ধরাতলে একটি রমণীয় আরাম প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। ঐ আরাম দেবীর ক্রীড়াভূমি। ইতি আশ্রম-বিধায়িনী।

কিছুরই অভাব নাই—কিছুরই অস্থিরতা নাই। সকলই যথাযথ। যাহাতে দৃষ্টি করেন তাহাই উথলিয়া উঠে। যাহাতে হাত দেন তাহাই শোভাময় হয়। ইতি গৃহলক্ষ্মী।

দেখিতে দেখিতে একটি একটি করিয়া কয়েকটি শিশুমূর্ত্তি ঐ আরাম-নিকেতনে দেখা দিল। ও-গুলিকে নিতান্ত নিজস্ব জ্ঞান করিলাম। একান্তই আপনার মনে করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ইতি বর-প্রদায়িনী—

—কৈ ?—এ কি হইল ?—সেইটি—সেই সর্ব প্রথমেরটি ? —সেই সাক্ষাৎ দেবতুল্য শক্তিসম্পন্নটি ?—সে কোথায় গেল ? —আর এখানে থাকিব না। সে যথা গিয়াছে সেইখানেই যাইব। বাহির হই—হাত ধরিলেন—নিকটে একটি গাছ ছিল, তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। দেখাইলেন গাছটির তলায় অনেকগুলি অপক্ক কুঁড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। অশ্রুপূর্ণ নয়নে বাষ্পদিগ্ধ গদগদস্বরে বলিলেন, "মুকুল যত হয় ফল তত হয় না।" তথ্য বুঝিলাম। থামিলাম—ইতি প্রবোধ-দায়িনী।

এ কি হইল ?—তিনি কৈ ?—যে-সকলকে নিতান্ত আমার বলিয়া মনে করিতাম, তাহাদিগকেও ত' আর তত আমার বলিয়া মনে হইতেছে না। আমি আবার জগতে 'একা' !—আবার আমার পৃথিবী শ্মশান ! যেমন হৃদয়মধ্যে এইরূপ ভাবিলাম,—অমনি তথায় অশরীরী বাণী নিঃসৃত হইল—"শোকে মুগ্ধ হইও না—তুমি আর তেমন্ 'একা' হইতে পার না, তোমার পৃথিবী আর তেমন 'শ্মশান' হইতে পারে না।—তোমার হৃদয় শূন্য নাই —তুমি পৃথিবীকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়াই জানিয়াছ।" ইতি হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী—

যে প্রকৃতিশক্তি উল্লিখিত দশবিধরূপে আমার প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া ভক্তি এবং প্রীতিসহকারে বঙ্গবাসী স্ত্রী-পুরুষের হস্তে এই পুস্তকখানি সমর্পণ করিলাম।"

"সতীধর্ম", "স্ত্রীশিক্ষা", "সৌভাগ্যগর্ব", "দম্পতি-কলহ", "লজ্জাশীলতা", গহনাগড়ান". "কুটুম্বিতা", "কন্যাপুত্রের বিবাহ", "স্বজন-প্রতিপালন" এক কথায় সমগ্র "পারিবারিক প্রবন্ধ"

গ্রন্থখানিতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সমগ্র উন্নত ভাবের সমন্বয়ে নারীজাতির সমস্ত কর্তব্যাকর্তব্য নির্দিষ্ট রয়েছে; উদাহরণ সমূহেও ভালমন্দ নারীর জীবন্ত দৃষ্টান্তও অনেক দেখান হয়েছে। "বৌ-কাঁটকি শ্বাশুড়ী", অ-গৃহিণী সু-গৃহিণী প্রত্যেকটি নারীচরিত্রের বিচিত্র চিত্রে শিক্ষিত হিন্দুসমাজের বিধিবিধান নির্দিষ্ট আছে। তা' মাত্র আজকের বা কালকের জন্যই নয়, চিরদিনের,—সনাতনী বা পুরাতনী নহে, চিরন্তনী।

তাঁর রূপকালঙ্কারে অলঙ্কৃত পুষ্পাঞ্জলিতে মাতৃরূপের প্রথম মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারই টীকা-ভাষ্য বঙ্কিমের আনন্দমঠ।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস 'স্বর্ণলতা" সে-দিন বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। "স্বর্ণলতায়" স্বর্ণলতার চেয়ে "প্রমদা" ও "সরলা"ই প্রধান চরিত্র। প্রমদার মা-টীও বড় কম যান না! বাঙ্গালীর তদানীন্তন জীবনধারা অবলম্বন করে এই যে কাহিনীটী রচিত হয়েছিল—বলতে গেলে আধুনিক বাস্তব উপন্যাসের এই প্রথম বস্তুরূপ। নারীচরিত্র না হলেও একদা নারীর ছদ্মবেশে পলায়নপর "গডাটরচন্দ্র" লেখকের অপূর্ব সৃষ্টি! তাঁর "হরিষে বিষাদে"র পদি-পিসি সার্বজনীন পিসিরূপে আজও বঙ্গসমাজে জীবিত আছেন। "অদৃষ্টে"র সুলোচনা, জয়দুর্গারা এরা খাঁটি বাঙ্গালার মেয়ে, এদের মধ্যে পাশ্চাত্যের ছাপমাত্র নেই।

"যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "কনেবউ" সে-দিনে পাঠক, বিশেষতঃ পাঠিকাসমাজে যথেষ্ট আদর লাভ করেছিল। "বড়ভাই"য়ের শৈলজা, "বিমাতা"র তারাসুন্দরী ও চারু,

"ঠাকুরমা"র অমলা সকল চরিত্রই সে-দিনে সমাদর লাভ করেছিল।

তারকনাথ বিশ্বাসের বিপুল গ্রন্থাবলীর "সুহাসিনী," "মনোরমা" প্রভৃতির কথা হয়ত অনেকেই ভুলে গেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এর প্রধান দুটি চরিত্র ভ্রমর এবং রোহিণী। ভ্রমরের মধ্যে খানিকটা সূর্যমুখীরই পুনরাবৃত্তি পাই ; প্রভেদ এই যে, পরনারী-আসক্ত প্রিয়তমের উপর তীব্র অভিমান এবং ক্ষমাহীন অত্যুগ্র আদর্শবাদের জন্য ভ্রমর নিজেও সুখী হ'ল না, অপদার্থ গোবিন্দলালকে এতটুকু কোথাও অনুতাপের সান্ত্বনা দিয়ে গেল না। রোহিণী-চরিত্র প্রথম থেকেই পাঠকের যুগপৎ সমবেদনা এবং বিরাগ আকর্ষণ করে, শেষদিকে গোবিন্দলালের হাতে মৃত্যুর পূর্বে জীবনরক্ষার জন্য তার অনুনয়-বাণী এবং নিশাকরের সহিত গোপনে সাক্ষাৎকার তার পূর্বচরিত্রের সহিত খাপ খায় না, এ-কথা কেহ কেহ বলেন বটে, কিন্তু দুষ্প্রবেশ্য মানবচিত্তগুহার অতলস্পর্শ আধারে কি যে সঞ্চিত আছে মানুষ নিজেই কি তা' সকল সময়ে অনুমান করতে পারে? যে-দিনে রোহিণী ভ্রমরের অনুজ্ঞায় বারুণী পুষ্করিণীতে আত্মবিসর্জন করে তার ব্যর্থজীবন শেষ করতে চেয়েছিল, দুরাকাঙ্ক্ষার সাফল্যে বর্ধিতাশয় চিত্ত তার সেই হতাশা ক্লান্ত পূর্ব জীবনের সব কিছুর সঙ্গেই পূর্বেকার মৃত্যুভয়হীনতাকেও কেন না পরিহার করতে পারে? বরং ইহাই ত' তার পক্ষে স্বাভাবিক। সে একজন তুচ্ছ নারী। একনিষ্ঠা সে কোনদিনই ছিল না। হরলালের কাছে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে গোবিন্দলালকে আশ্রয় করার অর্থ এ নয় যে,

গোবিন্দলালকেই সে তার চিত্তপ্রাণ সতীলক্ষ্মীর একনিষ্ঠ প্রেমের মতই একান্তভাবে সমর্পণ করেছিল,—যেমন এই রোহিণী-রূপেরই উত্তরকালের অভিব্যক্তি "চোখের বালি"র বিনোদিনীর বিহারীর প্রতি প্রেমের প্রত্যাখ্যানে মহেন্দ্রকে আশ্রয় করা। "চরিত্রহীনে" কিরণময়ীর তদপেক্ষা বীভৎসতর প্রতিশোধ প্রচেষ্টায় প্রকাশ পেয়েছে। রোহিণীরও নিশাকর সম্ভাষণে এবং প্রাণভিক্ষায় দেখা যায় সেও তার প্রথম প্রেম হরলালের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার প্রতিহিংসাবশেই যেন তাদের সংসারের চালাঘরের চালের উপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রূপে আপতিত হয়েছিল।

শৈবলিনী-চরিত্রে অস্বাভাবিকতা দৃষ্ট হলেও নারীর মধ্যেও যে যথেষ্ট ধ্বংসকারী শক্তি নিহিত থাকে তা' আমাদের কাছে শুধু কাব্যনাট্যের মধ্য দিয়েই নয়, সংসারক্ষেত্রেও বহুবার প্রকটিত হয়েছে। "সুন্দরী" সত্যই সুন্দরী! রূপের কথা বলছি না, গুণের কথাই বলছি। আর একটি অনবদ্য ছবি কয়েকটী মাত্র রেখা দিয়ে "চন্দ্রশেখরে" বিচিত্র হয়ে উঠেছে; সে বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব হতভাগ্য মিরকাশিমের একটি ক্রীত-বেগম ক্ষুদ্র দলনীর মধ্য দিয়ে। বহুপত্নীক নবাব-হারেমের ক্ষুদ্র একটি প্রান্তের ছোট্ট চামেলী লতাটী তার স্নিগ্ধ সৌরভে আজও যেন পাঠকের মনকে সুরভিত করে রেখেছে; ছোট্ট চামেলি ফুলটির মতই তারও সেই রকমের ক্ষীণ আয়ু। উড়িষ্যার কবি রাধানাথ রায়ের "পত্রাবলী"তে মীর কাশিমের উদ্দেশ্যে লিখিত দলনীর পত্রের শেষ কথা;—

"দলনীর প্রাণ,—দলনীর আঁখি আলো আঁধারে ডুবিয়া যাবে।"

"কপালকুণ্ডলা" নামটী "মালতীমাধব" নাটকের কাপালিকার উদ্ভট নাম থেকে পরিগৃহীত; সেই পরিকল্পনায় সাগরোপকূল-নিবাসী কাপালিকের প্রতিপালিতা মেয়েটী ঠিক মিরাণ্ডা নয়। একই নির্জনবাস ভিন্ন দু'জনের মধ্যে অপর কোন মিল দেখা যায় না। প্রেম এবং প্রেমপাত্র সম্বন্ধে মিরাণ্ডা ঘোর সংসার-বাসিনীদের মতই পূর্ণ সচেতন, আর এই সরলা সন্ন্যাসিনী বন্য মৃগীর মতই চির আত্মভোলা। এই চরিত্রটী উপন্যাসের মধ্যে চমৎকার একটী কাব্যের সৃষ্টি করেছে। কবিচিত্ত দিয়েই একে উপভোগ করতে হয়, তীক্ষ্ণ বিচারদৃষ্টি দিয়ে নয়।

"কমলাকান্তে"র প্রসন্ন গোয়ালিনীর স্তুতি আমরা অনেক আগেই শুনেছি, কিন্তু স্পষ্ট করে বুঝেছি এতকাল পরে এই মহাযুদ্ধঅধ্যুষিত ভরতে তথা বাংলাদেশে বসে। দুগ্ধবতী গাভীকুল-সমন্বিতা প্রসন্নর প্রসন্নতা-লাভ যে সাধনানিষ্ঠ ও বহু সাধনালব্ধ সে-বিষয়ে কেহই আজকের দিনে দ্বিমত হবেন না।

"দুর্গেশনন্দিনী"র দু'টি প্রধান নারীচরিত্র আয়েষা এবং বিমলা। আয়েষা আবেগপ্রবণা, অসংযত; বিমলা পরিহাসতরলা, উচ্ছৃঙ্খল বাহ্যপ্রকৃতির অন্তরালে সতীত্বের এবং পরিপূর্ণ আত্ম-সংযমের মূর্ত ছবি। আয়েষা জগৎসিংহকে চেয়েও পান নি, বিমলা পেয়েও ভোগ করেন নি। তিনি বীরেন্দ্রসিংহের বিবাহিতা পত্নী হয়েও চিরদুঃখিনী দাসী, তাঁর অবজ্ঞা ও উপেক্ষা-অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে চিরদিন আত্মগোপন করে থেকেছেন, দাসীর কর্তব্য করে। কিন্তু স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছেন তিনি যে কোন পরমসোহাগিনী পত্নীর অপেক্ষাও বেশী করেই।

"দেবী চৌধুরাণী"র দুটি প্রধান নারীচরিত্র প্রফুল্ল এবং সাগর ; প্রফুল্ল দুঃখীর ঘরের মেয়ে, একমুঠো ভাতের জন্য শ্বশুর-বাড়ী এসেছিল, ধনীর আদুরে মেয়ে সাগর কদাচ কখন শ্বশুরবাড়ী আসে, শ্বশুর-শাশুড়ী তাকে পোষ মানাতে পারেন নি; কিন্তু সেই শিশুর মত সরল মেয়েটা সতীন প্রফুল্লকে স্বামীর স্নেহভাগিনী করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। সতীনকে স্বেচ্ছায় স্বামী দেওয়ার এই আদর্শ আজ সকলের ভাল লাগতে না পারে কিন্তু সাগরের ত্যাগকে শ্রদ্ধা না করে আজও কারও উপায় নেই। ভবানী পাঠকের সাহায্যে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতালাভ করে এবং ডাকাতি করে প্রভূত অর্থের অধিকারিণী হয়েও প্রফুল্ল মনে শান্তি পেল না, শেষ পর্যন্ত পতিসেবাই নারীর শ্রেষ্ঠধর্ম ভেবে সংসারে ফিরে এল, "হারীর মায়ের পারীর মায়ের হুকুম-বরদারী"তেই বাহাল হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এ আদর্শ অত্যাধুনিকাদের হয়ত বিস্মিত করবে।

"বিষবৃক্ষে"র মূল চরিত্র দুটিকে প্রতিহত করে জীবন্ত হয়ে আছে হীরা। তার ব্যর্থপ্রেমের অভিশাপ সে বিষবাষ্পের মত তার চারিপার্শ্বে বিকীরণ করে নিজে গ্লানিকর বিষাক্ত অভিশপ্ত জীবনের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করেছিল। হীরা পদ্মপলাশ-লোচনা, কুটবুদ্ধিশালিনী অথচ অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষায় আত্মহারা,—হীরা আমাদের সহানুভূতি না কেড়ে নিয়ে পারে না। সংসার জ্ঞানে অনভিজ্ঞা, ধর্মবোধে বঞ্চিতা কত দুর্ভাগিনীর দুর্ভাগ্য জীবনেই ত' এই ব্যাপার নিয়ত ঘটছে।

সূর্যমুখী অত্যুচ্চ আদর্শবাদিনী, স্বামীপ্রেমের বন্যায় ডুবে থেকে সর্বসুখে সুখী ছিলেন, কিন্তু পতির আদর্শে আঘাত লাগায়

তাঁকে অন্যাসক্ত জেনে আত্মসংযম হারিয়ে সে-দিনের মত দিনের লোকলজ্জা পরিহার করে যে-দিকে দু'চোখ যায় এমনই পূর্বাপর জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হ'ল না। গভীর পতিপ্রেম তাঁর মনের দড়ি টেনে রইলো পুতুল নাচের পুতুলের মত। দূরে সরে যেতে না দিয়ে ফের ফিরিয়ে আনলে।

কুন্দনন্দিনী আজন্মদুঃখিনী, অদৃষ্টের হস্তের তুচ্ছ ক্রীড়নক, তার মধ্যে ভালমন্দ এমন একটা কিছুই নেই যা' দিয়ে সে উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র তারাচরণকে বা শিক্ষিত নগেন্দ্রকে আকৃষ্ট করতে বা তাকে চিরদিন রক্ষা করতে পারে। শুধু হীরার প্রতিহিংসা-প্রদত্ত বিষের কল্যাণে মরে গিয়ে সে সাহিত্যজগতে বেঁচে রইলো।

"আনন্দমঠ' গদ্যে লেখা একখানি মহাকাব্য। বঙ্কিমচন্দ্র নূতন গদ্যছন্দের প্রবর্তক না হলে পদ্যেই এ-পুস্তক বিরচিত হ'ত। জাতীয় জাগরণের মহাসন্ধিক্ষণে এর মূলমন্ত্রটি তিনি তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় ভূদেবের কাছেই গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রমাণ ভূদেবের "পুষ্পাঞ্জলি"। কিন্তু বঙ্কিমের ভাষালালিত্যে ও শক্তি-ময়ী শান্তি ও কল্যাণময়ী কল্যাণীর সুকল্যাণ স্পর্শে "আনন্দমঠ" সহজতর ও সুন্দরতর হয়ে উঠেছে; ভগ্নপ্রাণ বাঙ্গালীকে আশার বাণী শুনিয়েছে, তার প্রাণে আনন্দ দিয়েছে, মাতৃমঠ প্রতিষ্ঠা-ব্রতে ব্রতী করেছে, অশোকমন্ত্র অমোঘমন্ত্র প্রচার করেছে ;—সে-মন্ত্র "বন্দে মাতরম্।"

"আনন্দমঠ" আরও একটী নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদের নিসুপ্ত মনোবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলবার জন্য প্রয়োগ করেছে, তা' মাতৃপূজার মন্ত্রজাগরণে নারীর স্থাননির্দ্দেশ করে। শুচিস্মিতা

ত্যাগ-মহীয়সী নারীর এই মহাপূজায় পূর্ণাধিকার স্বীকৃত, কিন্তু পতিত বা পতিতা কাহারও পূজামণ্ডপে স্থান নেই। এ-পূজা পূর্ণ তান্ত্রিক পূজা, পঞ্চ মকারকে বলি দিয়ে তবে এর অধিকারী হওয়া যায়। শান্তি বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি, আজ বাংলাদেশে তেজস্বিনী মেয়েদের ছবিগুলিতে চোখ বুলালেই শান্তির প্রতিচ্ছায়া সর্বত্র দেখতে পাওয়া যাবে; যেমন ভ্রমর, কমলমণি, সূর্যমুখী, শৈবলিনীকেও দেখা যায়। শক্তিমান্ সৃষ্টিকর্তার শক্তির পরিচয় তো এইখানেই।

এ-যুগের আর একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁর "বঙ্গবিজেতা" "মাধবীকঙ্কণ", "জীবন-সন্ধ্যা", "জীবনপ্রভাত"—এই শতাধিক বর্ষের ইতিহাসে আমরা বহু নারীচরিত্রের স্ফুরণ দেখি। অমলা, কমলা, সরলা, বিমলা, মহাশ্বেতা, হেমলতা, লক্ষ্মী, পুষ্পকুমারী এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র ভীলবালা। "সংসারের" জ্যেঠাইমা, বিন্দু, সুধা, কালীতারা, উমাতারা ঘরোয়া মানুষ, নেহাৎ বাংলাদেশেরই। কিন্তু তাদের থেকে ঢের বেশী করেই তাঁর মারাঠী, রাজপুতানীরা মনোহরণ করে নেয়।

বঙ্কিমযুগের অন্যান্য বড় লেখকদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; দামোদর মুখোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির নাম করতে হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের "জাল প্রতাপচাঁদ" সে সময়কার সামান্য পূর্বের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে রচিত; "কণ্ঠমালা" ও "মাধবীলতা" উপন্যাসের শৈল ও মাধবী চরিত্র মধ্যে শৈল আধুনিক সাহিত্যের নারীচরিত্রের পূর্বরূপ, মাধবী প্রাচীনযুগের আদর্শ মেয়ে।

দীনবন্ধুর "নীলদর্পণে"র প্রধান নারীচরিত্র সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা। ইংরাজকুঠিয়ালের অত্যাচারে নবীনমাধবের পিতা কারাগারের মধ্যে আত্মহত্যা করলেন, তিনি নিজে লাঠিয়ালের হাতে মারা গেলেন, মা উন্মাদ হয়ে পুত্রবধূকে হত্যা করে নিজে প্রাণত্যাগ করলেন। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল নীলকরদের অত্যাচারের প্রতি দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা; সে-উদ্দেশ্য প্রভূতরূপেই সফল হয়েছিল। দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে লিখিত মার্কিন লেখিকা মিসেস হ্যারিয়েট বিচার স্টো'র "আঙ্কল টম্'স কেবিনে"র মতই "নীলদর্পণ"ও একটা বিরাট বর্ধিষ্ণু অন্যায়ের পথ রুদ্ধ করেছিল। অতিরিক্ত কান্নাকাটিতে এবং সর্বত্র সাধুভাষার ব্যবহারে নাটকটা ভারাক্রান্ত, স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে ভদ্রঘরের মেয়েরা অতিরিক্তরূপেই আড়ষ্ট, তবে তাদের ফাঁকে ফাঁকে দাসী, গ্রাম্যনারী, পদী ময়রাণী প্রভৃতি কয়েকটা নিম্নশ্রেণীর নারীচরিত্র তাদের অনাড়ম্বর কথাবার্তায় খুব সুন্দর ফুটেছে। "নবীন তপস্বিনী"তে জগদম্বা কুৎসিত কলহপরায়ণা নারীর একটি আদর্শ।

দীনবন্ধুর সৃষ্ট সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় দুটি নারীচরিত্র "জামাই বারিকে"র পদ্মলোচনের দুই পত্নী বিন্দুবাসিনী এবং বগলামুখী ওরফে 'বগি-বিন্দি' একসময় বাংলাদেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। সে-যুগের সপত্নীকলহের যে অপূর্বচিত্র দীনবন্ধু এঁকেছেন তার মধ্যে হাসির খোরাক যথেষ্ট আছে, অশ্রুর খোরাকও নেহাৎ অল্প নেই। "লীলাবতী" নাটকে নেশাখোর হলেও তৎকাল প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় মুখ্য কুলীনের সঙ্গে শিক্ষিতা মেয়ে লীলাবতীর বিবাহ-ব্যবস্থা দৈবগতিকে বন্ধ

হয়। এই নাটকে নারীচরিত্রের চেয়ে হেমচাঁদ, নদেরচাঁদ, শ্রীনাথ প্রভৃতি পুরুষচরিত্রগুলিই বেশী জীবন্ত এবং তদানীন্তন সমাজের নাকি ফটোচিত্রের মতই বাস্তব।

প্রথম যুগের বঙ্গরঙ্গমঞ্চ স্থাপনকর্তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কর্মী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সতী কি কলঙ্কিনী"র একটি গান, "চল চল সবে মোরা ত্বরায় যাই লয়ে বারি" একদা জনসমাজে খুব বেশী প্রচলিত ছিল। তাঁর "পারিজাতহরণে"র রুক্মিণীচরিত্র মূলানুগত হলেও সুন্দর ফুটেছে। রুক্মিণীর গীত; "যাও হে সেখানে তোমার মন যারে চায়" এ-গানটীও আমরা পথের পথিক, নৌকার মাঝিকেও গাইতে শুনেছি, যেমন নিধুবাবুর টপ্পা বা পরবর্তী যুগের "নন্দবিদায়", "প্রভাসমিলন" প্রভৃতির গানগুলি সর্বত্র গীত হ'ত।

রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলীতে পৌরাণিক, সামাজিক বহুবিধ নারীচরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে, বিশেষত্ব বলবার মত কিছু নেই।

অমৃতলালের নাটক সে-দিনে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল, সে-কথা এখনও লোকে বিস্মৃত হয় নি। তাঁর ক্রম-পরিবর্তিত বঙ্গসমাজের ব্যঙ্গচিত্র ও সরস ব্যঙ্গরস সৃজনশক্তি যে অপরিমেয় ছিল তা' অস্বীকার করা চলে না। হয়ত কোথাও অত্যুক্তিবাদ এসে পড়তে পারে, কিন্তু তা'তে দোষ দে'বার কিছু নেই। অতিপ্রাকৃত বা অপ্রাকৃত এ-সমস্তই নাট্যকলার অঙ্গ। তাঁর "তিলতর্পণ" নাটকে যখন বাপ্পা-মহিষী তাঁর মহামহিম স্বামীর "আমি রাণা বাপ্পারাও বীরচূড়ামণি" ইত্যাদি বাহ্বাস্ফোটের সঙ্গে "আলিবর্দী নিপাতে"র প্রতিজ্ঞা শুনছেন, তখন সহসা কান্না-সুরে তাঁর "মহারাজ, আমি পা রাখি কোথায়?"

আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের সেই বিয়ের কনের "জীবনযৌবন ক্ষয় করে" তৃপ্তিসাধনের প্রস্তাবের উত্তর ;—"আরো কুল পাড়ো গোটা ছয়।"

নব্য-বন্যার নূতনস্রোতে ভাসমানা মেয়েদের নিয়ে তাঁর রঙ্গ-ব্যঙ্গ সর্বত্রই যে অস্বাভাবিক হয়েছে তা' কেউই বলবে না, কবির চিত্তে ভবিষ্যতের ছায়া পড়ে এ চিরন্তন সত্য কথা! "ফাটকে আর আটক রবো না।" এ ত মেয়েরা বলেইছে চিরদিন এবং আটক আর নেইও। "বিবাহবিভ্রাটে"র বিলাসিনী কার্ফরমা সমাজে অদৃষ্টপুর্বা ন'ন। খাসদখলের বিধুঝির "বাবুকে বাঘে খাইয়াছে, পৃথিবী গোলাকার, মা দুঃখ করিবেন না।" সত্যই উপভোগ্য! শিক্ষিতা মহিলা মোক্ষদার ;—"বিধুঝি, যে আমার চুল আঁচড়ে দেয়, ষ্টকিং পরিয়ে দেয়, তার যখন-জ্বর হয় তখন ওঠে একশ চার, আর আমার কি না নাইনটি-নাইন!" অতি উপাদেয়। গিরিবালা চরিত্রটিতে চিরপুরাতনী নারীর সেই সনাতনী রূপ যার একান্ত অভাব ঘটলে পৃথিবী থাকলো বা গেল কিছুই এসে যাবে না! অমৃতলাল তাঁর 'বাবু', 'বৌমা', 'অবতার' 'কালাপানি' প্রভৃতিতে বহু বিভিন্ন নারীচরিত্র সৃষ্টি করেছেন। "তরুবালা"র পারুলে এবং তরুবালায় মোহ এবং প্রেমের দুই পরস্পরবিরোধী ছবি সুন্দর রূপে ফুটেছে। ঠান্‌দি চরিত্রটী সত্যই সুন্দর। অমৃতলাল বহুবিধ হাস্য-সরস সঙ্গীতে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং অনেক দিক থেকেই অভাগা বাঙ্গালীর প্রাণে হাসি যুগিয়েছেন, অন্ততঃ কিছুক্ষণ সময়ের জন্যও। "ঠান্‌দি, তোমায় সাজাব কনে","ও-মা গঙ্গা তোর রাঙ্গা পায়ে দে' জননি স্থান", "ইংরাজীতে এলে বি-এ, পাশ করেছেন

ঠাকুরঝি”, “আর আমাদের সাহেব হ'বার বাকি কি ?” এমন আরও কতই আছে।

যোগীন্দ্রনাথ বসুর “চিনিবাস চরিতামৃতে”র “রামমণি”র সঙ্গে এ যুগের ছেলেমেয়েদের নিশ্চয়ই পরিচয় নেই; “মডেল ভগিনী”র কমলিনীর সঙ্গে ত নয়ই। আমাদের কালে এই বইগুলি যদিও আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল তথাপি চোরা-বাজারের কারবার ত চিরদিনই অল্পবিস্তর চলে আসছে! রামমণি এবং কমলিনী নব্যভাবে শিক্ষাপ্রাপ্তা মেয়েদের ব্যঙ্গ চিত্র; সত্যের অংশ হয়ত খানিকটা ছিল, তবে অবাস্তবতাও মনে হয় যেন যথেষ্ট! প্রথম দিকটায় বাঁধা গরু ছাড়া পাওয়ার মত নরের মত নারীর মধ্যেও কোথাও কোথাও কতকটা উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল, এ কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না, তবে অতটাই কি না বলা যায় না, অন্ততঃ বিশ্বাস করতে প্রাণে লাগে।

তাঁর “শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী” একখানি বিরাট উপন্যাস। “লক্ষ্মী” এবং তার মার মধ্যে জাঁ ভলজাঁর পালিতা কন্যা ‘কসেট’ এবং তার দুঃখাহতা মায়ের ছায়া দেখা যায়।

অমরেন্দ্রনাথ দত্তের শ্রীরাধিকার জবানীতে একটি গান লোক হৃদয় স্পর্শ-গৌরব লাভ করেছিল, সেটী এই ;—

“হারে নিপট কপট তুয়া শ্যাম !”

অতুলকৃষ্ণ মিত্রের নাট্যচরিত্রগুলিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য না থাকলেও গানের দানে তিনি যে বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর “নন্দবিদায়”এর প্রায় সব কয়টি গানই এককালে বাংলার নরনারীর কণ্ঠস্থ হয়ে

গিয়েছিল, সে গান যে তাদের সেই চিরন্তন নন্দ যশোদার, শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলীর বিরহ-বেদনার বিলাপ তান, সে যে তাদের চির অবিস্মৃত ব্যথার করুণ-কঠিন স্মৃতি।

"আয়রে আয় কানাই বলাই, আয় নারে ভাই গোঠে যাই"

"কি কর, কি কর, শ্যাম নটবর, যাই সব গৃহকাজে"

"তুই না গেলে ও ভাই কানাই,

আর কারে নিয়ে আমরা ব্রজে যাব রে?"

"মালঞ্চে ফুল আপনি ফুটে বাস বিলাতে চায়"

এবং সকলের চেয়ে বেশী ক'রে মনে পড়ে "মাধবী কঙ্কণের" নাট্যরূপে অভাগিনী দেওয়ানা জোলেখার সেই প্রসিদ্ধ সঙ্গীত;—

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল

সকলি ফুরায়ে যায় মা,

* * *

স্বরগ হইতে, জ্বালারই জগতে

কোলে তুলে নিতে আয় মা।"

এ ছাড়া রাধাভাবের গোপীভাবের বহুবিধ প্রসিদ্ধ সঙ্গীত, মাতৃ-ভাবের অনেক ভাল ভাল পদও তাঁর আছে।

সুপ্রসিদ্ধ কাব্য নাট্য সৃষ্টি ক'রে এবং হাস্যরসের উৎস একসঙ্গে উৎসারিত করে যে শক্তিমান লেখক সেই ষড়রসের অপূর্ব নৈবেদ্য বঙ্গবাণীর পদপ্রান্তে উপচার দিয়েছিলেন, তার সমুদয় সাহিত্যনারীদের পরিচয় দেওয়া সহজ নয়; মাত্র দু' চারটি রেখা টেনে দেখাব মাতৃমন্ত্রে তিনি সিদ্ধ থাকলেও তাঁর ন্যায়পর চিত্ত স্নেহ-দুর্ব্বলতার অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত ছিল। যাকে তিনি অন্তরের অন্তর থেকে শ্রদ্ধা ঢেলেছিলেন বলেই নারীর

কোন রকম হীনতা তাঁর সহ্য হয়নি। অতি গাম্ভীর্যপূর্ণ "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে" বলে বাংলাদেশের জন্মদাত্রী এবং পালন-ধাত্রী জননী জাহ্নবীর স্তোত্রগীতি এবং

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ !
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ।"

এবং এদেরই সঙ্গে সমতালে দেশপ্রেমের ও মাতৃপূজার কত না অবদান তাঁর কাছ থেকে দেশবাসী লাভ করল ;—যাদের কারু কারু মূল্য শুধু এদেশেই নয়, বিশ্বের দরবারেও স্থায়ী হয়ে রয়ে গেল।

"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ
কেন গো মা তোর মলিন বয়ান,
কেন গো মা তোর মলিন বেশ ?"

তারপর সব চেয়ে বড় কথা সেই যে বুক ফুলিয়ে বলা ;—

"আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহি ত মেষ,
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ !"

এবং "ধনধান্যপুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা,
সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।"

এ সব গান কি শুধু মুখের কথা ? নিশ্চয়ই নয়। আমরা দেখেছি এই বজ্র বিদ্যুতে ভরা মেঘমন্দ্র বাণীকে মূর্ত্ত হ'তে। এরা যে একদিন প্রাণবন্ত হয়ে উঠে মরা বাঙ্গালীর কাণে সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান করে তাদের প্রাণের তারে জীবনীশক্তির অনুপ্রেরণা দিয়েছিল! আজ দুর্ভাগ্য বাংলা কি তার এই চরম দুর্দ্দশার সামনে দাঁড়িয়ে সেই স্মৃতির সুরকে জীবনের তারে আবার তেমনই

করে ফিরিয়ে এনে বাঁধতে পারবে না ? "মা"কে পূজা-নিবেদন করে ভোগের প্রসাদ ত মায়ের সন্তানেরাই উপভোগ করে। দ্বিজেন্দ্রলালের "চন্দ্রগুপ্ত", 'মেবারপতন", "প্রতাপসিংহ", "দুর্গাদাস","সিংহলবিজয়" নাটকে অর্থাৎ সমগ্র দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে মাতৃপূজার যে মন্ত্র জীমূতমন্দ্রে বিঘোষিত হয়েছিল, তাঁর চারণ-গীতিবৎ অগ্নিগর্ভ সঙ্গীতসমূহ দেশের যে উপকার করতে পেরেছিল দেশবাসী কি এত শীঘ্রই তার প্রভাব হারাবে ?

তাঁর "আবার তোরা মানুষ হ" সমগ্র জাতিকে দেশাত্ম-বোধে অনুপ্রাণিত করে সন্তপ্ত কবির আদেশবাণীর মতই আজও বাংলার,—তথা ভারতের মেঘ-মেদুর গগনপ্রান্তে ধ্বনিত হচ্ছে। সে 'শব্দময়' আহ্বানকে চেষ্টা করে ঢেকে ফেলা যাবে না ; এ ধ্বনি ঘুমন্তকে জাগিয়ে তোলে, মুমূর্ষুকে পাশ ফেরায়।

অথচ ঐ একই লোক হাসির গানে মানুষের মনকে কি সহজ হাল্কা সুরেই না ভরিয়ে দিয়েছেন। মেয়েদের অত্যুচ্চ গুণের যেসব পরিচয় তাঁর "রেবা" ইত্যাদিতে দিয়েছেন, তিনিই আবার তাদের দুর্বলতাকে প্রচণ্ড কষাঘাত করতে ছাড়েন নি। বেশ তীব্র অনুযোগের সঙ্গেই "তোমরা ও আমরা"তে বলছেন ;—

"বিপদে আপদে আমরাই পড়ে লড়ি,
তোমরা গহনাপত্র ও টাকাকড়ি
অমায়িকভাবে গুছায়ে পাল্কি চড়ি
দ্রুত চম্পট দাও।

*　　*　　*

তোমরা অবাধে যা খুসী বলিয়া যাও
ভয়ে আমরা স্তব্ধ রই,

আমরা বলিতে পাছে কি বেফাঁস বলি
সেই ভয়ে সারা হই।

* * *

সম্পদে ছুটে কোথা হ'তে এসে পড়,
যেন কতকাল চেনা,
তোমরা দোকানী পসারী সেকরা ডাক গো
আর আমাদের হয় দেনা।

* * *

কথায় কথায় ধরণী ভাসাও কাঁদি
আমরা যেন বা কতই না অপরাধী,
পড়িয়া যুগলচরণ ধরিয়া কাঁদি
তবুও না ফিরে চাও।

আমরা দু'টাকা জোড়ার কাপড় পরি
তোমাদের চাই সোনা দশ বিশ ভরি,
বোম্বাই বারাণসী বছর বছরই,
তবু মন ফিরে না-ও।"

আর একটি গানে বলছেন ;—

"প্রথম যখন বিয়ে হ'ল, ভাবলুম বাহা বাহারে !
কি রকম যে হয়ে গেলাম, বলবো তা আর কাহারে?
শঙ্কা হ'ত পাছে প্রিয়া কখন করে অভিমান,
উর্বশীর ন্যায় পেখম তুলে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যান।
দেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে হ'লে আরো পরিচয়,
উর্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয়।

বরং শেষে মাথার রতন, লেপ্‌টে রইলেন আঠার মতন,
বিফল চেষ্টা বিফল যতন, স্বর্গ হতে হ'ল পতন ।
ভাবলুম বাহা রাহারে !

আবার একতরফাই মক্ষিকাবৃত্তি করেন নি, দোষগুণের বিশ্লেষণটা দ্বৈতভাবেই করেছেন। "যদি জানতে চাও আমি কি রকম স্ত্রী চাই", কিম্বা ;—

"আর কিছু না পার, স্ত্রীদের ধরে মার,
কিম্বা তাদের মাথায় তুলে নাচ ভাল আরও" ;—
"একেবারে নিবে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক
এম-এ, বি-এ, ঘোড়সওয়ার যাহো'ক কিছু হো'ক"

এই সব নানা পদের মধ্য দিয়ে দেখা যায় মেয়েদের ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে পুরুষদের দায়িত্ব কতটা সে-সম্বন্ধে সংসার-অভিজ্ঞ কবির ভূয়োদর্শন ছিল। এক পক্ষকে তিনি কোথাও দায়িত্ব দেন নি, বিচারকের নিরপেক্ষ দৃষ্টি ঠিকই রেখেছেন। তত্রাচ মাতৃপূজার পূজারী মাতৃচরিত্রের হীনতার দিকটাকে কোথাও প্রকট করতে ভরসা করেন নি। তিনি জানেন নারীর কল্যাণময় মাতৃরূপই সন্তানের দ্রষ্টব্য, তার পাপের পশরা হাটের মধ্যে ভেঙ্গে দেখালে ছেলেরই লজ্জা।

মনমোহন বসুর "প্রণয়পরীক্ষা" নাটকে দুই সতীন সরলা ও মহামায়া এবং কাজলাদাসী লহনা খুল্লনা এবং দুর্বলা জাতীয়া। তাঁর একটী নারী-গীতি উপভোগ্য, গানটী কোনও বাস্তব নারীর (নিজপত্নীর) উদ্দেশে রচিত। একটু নমুনা দেওয়া গেল ;—

"এই দুঃখে দহে মন, ওরে নিদ্রে শোন,
গৃহিণী থাকিতে গৃহে একাকী করি ভোজন।

রাম কাণার পাতের কাছে, লোকে তবু দু'বার যাচে,
কথার দোসর সবার আছে, বঞ্চিত কেবল মনমোহন।"

আবার তাঁহার বিয়োগের কয়েকদিন পরেই লেখেন ;—

"কোথায় গেলে, আমায় একা ফেলে, সংসার তুফান ঘোরে ?
বিলম্ব ক'রো না প্রিয়ে সাথে নিয়ে যেতে আমারে।"

গিরীশ চন্দ্র ঘোষের নাম বাংলার নাট্যসাহিত্যে চির-অমরতা লাভ করে থাকবে তাতে কোন সংশয় নেই। যুগে যুগে মানুষের রুচি পরিবর্তিত হয়, একদা তাঁর যে-সব নাট্যাভিনয়ে রঙ্গভূমি লোকাকীর্ণ থাকতো আজ তারা নির্বাসিত হলেও তাঁর লেখনী নিঃসৃত যে-সব দেবদেবী সম্বন্ধীয় এবং প্রেমের গান জনসাধারণের মধ্যে সুপ্রচারিত হয়ে রয়েছে তা'রা কোনদিন বিলুপ্ত হ'বার নয়। তাঁর কতকগুলি নাটক আজও মহাসমাদরে অভিনীত হয়, ছায়াচিত্রেও তাহা প্রতিফলিত হয়,—যেমন 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'জনা', 'বিল্বমঙ্গল'। প্রফুল্ল নাটকের প্রফুল্ল, বড় বউ প্রভৃতি চরিত্র জীবন্ত। "বলিদানে" সমাজসমাজের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। "পৌরাণিকচিত্র হলেও "জনা" কখন পুরাণ হবে না, আধুনিক চিত্রের রেখাপাত করে রেখেছে। "বিল্বমঙ্গলে"র চিন্তামণি তুলসীদাস-পত্নীর মতই তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের পাত্রী। সমাজে এইসব দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নিত্যকাল ধরেই রয়েছে এবং থাকবে। শরৎচন্দ্রও তাঁর সতী-অসতীদের মধ্য দিয়ে এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন। গিরিশ-সাহিত্যের আলোচনা যথেষ্টই হয়েছে ; বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে স্থানাভাব ; তথাপি তাঁর "ছত্রপতি শিবাজী"র জিজাবাই, "সিরাজউদ্দৌলা"র লুৎফউন্নিসার উল্লেখ না করলে চলে না।

"মীরকাসিম" নাটকের নারীচরিত্র স্মরণ নেই, যেহেতু উক্তগ্রন্থ তিনখানি নিষিদ্ধ-ফলরূপে নির্দিষ্ট হবার পূর্বেই পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, দ্বিতীয়বার আর চক্ষে দেখিনি।

গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গে আরও দু'জন নাট্যকারের কথা এখানে বলা প্রয়োজন। অপরেশচন্দ্রের নাট্যশক্তিও নিতান্ত সামান্য ছিল না। "অযোধ্যার বেগম"এ যে চরিত্র তিনি প্রদর্শন করেছেন তা' এ-দেশে আজকের দিনে বারবার করেই দেখতে পাওয়ার দরকার। "জিন্নৎ" একটি সুমিষ্ট নারীচরিত্র। "কর্ণার্জ্জুনের" পৌরাণিকারা মূলানুগা থেকেও সজীব এবং সুন্দরমূর্তি ধারণ করেছেন। আর এক বিষয়ে তাঁর শক্তি অনন্যসাধারণ ছিল, তা' অপরের উপন্যাসকে নাট্য রূপ দেওয়ার কলাকৌশল। প্রত্যেকটি কথাবার্তা মূল গ্রন্থ থেকে আহরণ করে তার মর্যাদার এতটুকু হানি না করে তিনি যেমন কৃতিত্ব দেখিয়ে সাফল্যলাভ করেছিলেন সে-শক্তি অপরে দেখা যায়নি। নিজের লেখা অপরের রচনার মধ্যদিয়ে তার উদ্দেশ্য বদলে দিতে অথবা গ্রন্থকারের অঙ্কিত চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করে দিতে অপর নাট্যকাররা দ্বিধাবোধ মাত্র করেন না।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর "সীতা"য় অনুজ্জ্বল শ্রীরামচন্দ্র চরিত্র বহুল পরিমাণে খর্ব করা হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের মহত্ব বোধ হয় লেখক নিজেই ভাল করে বোঝেন নি, তা' পরকে চেনাবেন কি করে? সীতা উদ্ধারের চেয়ে যে সীতাবর্জনেই তাঁর মহত্ব, ঘরের কোণে বসে সীতার অয়েলপেন্টিং আঁকার চাইতে অশ্বমেধ যজ্ঞকালে সীতার স্বর্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে সহধর্ম্মিণীর পদ দানে পতি রামচন্দ্র যে পত্নীর নির্দোষিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে

নিঃসন্দেহ দৃঢ়তার সঙ্গে তার প্রমাণ সেই প্রজাদেরই অগ্নিকথা দিয়ে দিয়েছেন, রাজা হিসাবে তিনি যাদের কথায় পত্নীকে বাধ্য হয়েই ত্যাগ করেছিলেন,—এ-দিক দিয়ে নাট্যকার আদৌ ভেবে দেখেন নি। ফলে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গেই তাঁর আঁকা 'সীতা' চরিত্রও ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

সরলা দেবীচৌধুরাণীর দান নারীচরিত্র সৃষ্টিতে নয়, মাতৃ-পূজায়। "অতীত গৌরববাহিনী মম বাণী গাহ আজি হিন্দুস্থান" জাতীয় মহাসম্মিলনক্ষেত্রে বিশাল জনসমাজে একদা এই শক্তিময়ী মহিলার লিখিত এবং সংগীত এই গৌরব-সংবাহিনী বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সাক্ষাৎ চারণীদেবীর মতই তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত সেই প্রাণোন্মাদিনী বাণীর সম্মোহনশক্তি সে-দিনকার সেই নিরস্ত্রযুদ্ধের যোদ্ধৃবর্গ অনুভব না করে পারেন নি। যখন তিনি বীরাষ্টমী ব্রতধারিণী ও যুবজাগরণের পথপ্রদর্শিকা হয়েছিলেন তখন পুরুষের মধ্যেই বা কয়জন দেশের কথা ভাবতে শিখে-ছিলেন? অথচ দেখা যাচ্ছে দেশ এর মধ্যে সে-কথা ভুলে যেতেই বসেছে! কিন্তু তাঁর মর্মবাণী ক্ষোদিত হয়ে রৈল ঐ গানের ভাষায় এবং "আহিতাগ্নিকায়"। "আগুনের পরশমণি" যাকে প্রাণে ছোঁয়াতে পারলে "জীবন ধন্য ও পুণ্য" হতে পারে তারই একটু ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গমাত্র হলেও সে আগুনই, তার দাম আলেয়ার চেয়ে অনেক বেশী!

মাতৃপূজায় প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর দানও নিতান্ত সামান্য নয়।

"তুই মা মোদের জগৎ আলো
সুখে দুঃখে হাসি মুখে,
আঁধারে দীপ তুমিই জ্বালো।"

"নম বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী
যুগে যুগে জননী লোকপালিনী।"
"শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়,
গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির গাহ জয়"।

"হের কি মহামঙ্গল রাজে
মধুমিলন বঙ্গসমাজে।"

"আপনজনে নিলে যদি চিনে,
সবার হৃদয় লহ আজি জিনে,
এক শোণিতধারা, বহে পীযুষপারা
সবার ধমনী মাঝে।"

প্রভৃতি স্বদেশী যুগের সুপরিচিত গান ছাড়া আরও বিভিন্ন কবিতা ও গান তাঁর আছে। "নারীচরিত্র" বলতে আমি শুধু নর-কল্পিতা সামাজিক নারীকেই বুঝিনি। দেশমাতা ও বিশ্বমাতা নারীজগতের আদর্শ স্বরূপা, তাঁদের কে' কি ভাবে দেখেছে এবং দেখিয়েছে সে-ভাবে এঁর স্থানও তুচ্ছ নয়।

রজনীকান্ত সেনের রচনার সঙ্গে এ-যুগের ছেলেমেয়েদের পরিচয় ক্রমেই কমে আসছে, খুবই দুঃখের কথা সন্দেহ নেই। তাঁর গানের সম্মোহিনী মায়া দেশবাসী এত শীঘ্র না কাটালেই গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিত। তাঁর "মাতৃবর্ণনা" একটি অতুলনীয় সম্পদ ;—

"স্নেহবিহ্বল, করুণা ছলছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখিরে
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা,
এনেছে অশরণ লাগিয়ে।"

দ্বিজেন্দ্রলালের মত তাঁরও বহু ব্যঙ্গরচনা আছে ; তাদের মধ্য দিয়ে "ঘরওয়ালী" নারীচরিত্র স্থানে স্থানে বেশ ফুটে উঠেছে। পুত্রবিবাহে বরের বাপের ফর্দ এই প্রকার ;—

"নগদে চাই তিনটি হাজার,
তাতেও আবার গিন্নি বেজার,
বলেন এবার বরের বাজার
চড়া কি রকম !
কিন্তু তোমার কাছে চক্ষুলজ্জা
লাগে যে বিষম।
* * *
আর পড়ার খরচ মাসে তিরিশ,
হয় না কমে বলে গিরীশ,
তা' সে তোমার মেয়ে, তোমার গরজ, তোমার আকিঞ্চন
আমার কি ভাই, আজ বাদে কাল মু'দব দু'নয়ন।"

আর একটি পতি তাঁর পত্নীকে বড়ই মর্মবেদনার সঙ্গে যে কথাগুলি নিবেদন করেছিলেন তার মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য আছে বই কি ! সেটা অস্বীকার করবার উপায় দিনদিনই কমে যাচ্ছে ;—

"বাজার হুদ্দা কিইন্যা আইন্যা ঢাইল্যা দিছি পায়,
তোমার লগ্যে কেমতে পারমু হইয়্যা উঠছে দায়।
আরসি দিছি, চিরুণ দিছি, গা মাজনের হাপান দিছি,
চুল বাদনের ফিত্যা দিছি, আর কি দেওন যায় ?"

দ্বিজেন্দ্রলালও এঁদের ব্যক্তিবিশেষকে নয়, জাতিগতভাবেই প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন ;—

"জেনে রেখো ভায়া নারী আসিয়াছে জগতে কি কাজ সাধিতে।
পরিতে বোম্বাই সাড়ী বেনারসী"...ইত্যাদি।

আবার এঁরা দু'জনেই মহীয়সী নারীচিত্রও নিতান্ত অল্প আঁকেন নি।

নজরুল ইসলামের অমর কাব্যকথার মধ্যে বাস্তব নারীর খুব বড় ও খুব ছোট বহু পরিচয় না পেলেও তাঁর আদ্যানারীর যে সমস্ত বন্দনাগীতি আমরা শুনেছি, যদি সত্য করে তার মর্ম গ্রহণ করতে পেরে থাকি, তাহ'লে 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তা" সেই পূজাতেই পূজা পেয়েছেন ভাবতে পারেন। তাঁর "দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার" গানে যাত্রীগণকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে "বাঙ্গালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর" সেই পলাশীর প্রান্তর দেখিয়ে বলেছেন "উদিবে সে রবি আমাদের খুনে রাঙ্গিয়া পুনরায় হে"; "অরুণ প্রাতের তরুণদল"কে যে চলতে উৎসাহ দিয়েছেন সে ত' নরনারীর ভেদ রেখে নয়? তাঁর "নারী" কবিতায় নারীজাতির একটী জীবন্ত চিত্র আমরা দেখতে পাই;—

"বিশ্বে যা কিছু মহান্ সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার নারী সৃজিয়াছে অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
নরককুণ্ড বলিয়া যে তোমা করে নারী হেয় জ্ঞান,
তারে বল আদি পাপী নারী নহে, সে যে নর সয়তান।
এ-বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ রস মধু, গন্ধ সুনির্মল।

জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য লক্ষ্মী নারী
সুষমা লক্ষ্মী নারীই ফিরেছে, রূপে রূপে সঞ্চারি।"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অসাধারণ কবিপ্রতিভায় নারীর প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি বর্ষিত হয়েছে। পৌরাণিক নরনারীর চিরন্তন প্রকৃতি ও তাদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ আর্ত্তনাদ যে আজও ঠিক সমস্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি যেন আমাদের হতাশাচ্ছন্ন চিত্তে কিঞ্চিৎ বলাধানও করেছেন। ব্যাধি ধরা পড়লে প্রতিকারের পথও নির্দিষ্ট হয়। তাঁর বিশিষ্ট কয়েকটিমাত্র কবিতা থেকে বিশেষ বিশেষ চিরন্তনী নারীর ঈষৎ মাত্র আভাস দেওয়া ছাড়া বেশী কিছু বলবার অবসর নেই, সেগুলি যে আলোচনা ও গবেষণার উপযুক্ত বিষয় তাতে সন্দেহ নেই। দুঃখের কথা, পাঠ্যপুস্তকের কোথাও এদের স্থান দেখি নি। বিদ্যালয়ের আবৃত্তিতে অভিনয়ে এরা স্থান পেলে না। এ-বিষয়ে আমাদের নিজেদের অমনোযোগও আছে, রুচিবিকারও কম নেই, আর আছে সর্বোপরি ভীরুচিত্তের দুর্বল সংশয়।*

রাজরোষে সমুদ্রগর্ভে আত্মনিমজ্জনকারী গিরিরাজপুত্র মৈনাকের রূপকে কবি যে বর্ত্তমানযুগের রাজবন্দীদের পথ-চাওয়া মায়েদের নিগূঢ় অন্তর্বেদনা প্রকাশ করেছেন সেই সহানুভূতিপূর্ণ নির্ভীকতা সামান্য নয়। মৈনাক-জননী পুত্রবিচ্ছেদবিধুরা আমাদের মায়েদের মতই বলছেন ;—

* আজ শেষোক্ত বিষয়টা দূর হ'লেও পাঠ্য নির্বাচনের গুপ্ত রহস্য অনাবৃতই রয়ে গেছে।

"আমার উমা এলো, হায় গিরিরাজ ! কই এলো মৈনাক ?
কই এলো বীর পুত্র আমার, কই সে অভয়ব্রতী ?
অত্যাচারের মিথ্যাচারের শত্রু উদারমতি ।"

প্রবাসিনী কন্যাকে বুকে পেয়েও যে তাঁর বুকের আধখানা ভরতে পারলো না, পারা সম্ভবপর নয় ; মায়ের প্রাণের এই নিগূঢ় তথ্য কতখানি সহানুভূতি প্রাণে থাকলে তবেই পুরুষ লেখক তাকে এমন নিখুঁত চিত্রে অঙ্কিত করতে পারে। সেইজন্যই কবিকে ঋষি বলা হয়। দিব্যদৃষ্টি না থাকলে মানুষের গুহানিহিত অন্তরে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। মাতৃচিত্তের অন্তর্ব্যথা যে অবরুদ্ধ রোষের আকারে সহসা বিলাপ-মর্মর হ'তে আকারপ্রাপ্ত হয়ে আহতা সিংহীর মত গর্জে উঠতে পারে তা-ও তিনি দেখাতে ভোলেন নি ;—

"মায়ের প্রাণের এ অভিশাপ ফলতে হবে ফলতে হবে,
ত্রিভুবনের রাজা হ'লেও আসন তাহার টলতে হবে।
অভিশাপের ভস্ম-পুতুল বিরাজ কর সিংহাসনে,
নিশ্বাসেরও সইবে না ভর, মিলবে হঠাৎ স্বপ্ন মনে।"

মায়ের প্রাণের এ হাহাকার আমরা আজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করছি ; অন্তরের অন্তঃস্থলে কেবলই বেজে বেজে উঠছে ;—

"লুকিয়ে বেড়ায় চোরের মতন বড় চোরের ভয়ে,
কেমন আছে ? আছে কি না কেই বা দেবে কয়ে ?"

"কয়াধু" কবিতায় আবার আমরা সেই আর্তা-জননীরই অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বাষ্পপূর্ণ নেত্র বারম্বার মার্জনা করেও শুষ্ক রাখতে পারি না। সুপ্রসিদ্ধ দেশনেতাদের কারাবরণের প্রথম যুগে (এখন এ জিনিস বেশ গা-সওয়া হয়েছে) প্রাচীন রাজপুত

চারণের মতই তিনি বর্তমানের সঙ্গে তুলনীয় এক অতীত অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনীর পটভূমিকা নিয়ে এসে আমাদের মাতৃ-হৃদয়ের সামনে ধরে দিয়েছিলেন। সেই তীক্ষ্ণাগ্র সূচিমুখ বাণ আমাদের হৃদয়কে শোণিতাক্ত করেছিল, কিন্তু সে সূচিকাভরণ কি অসাড় মনোবৃত্তিকে স্থায়ী রাখতে পেরেছে? কে' ক'দিনের জন্যই বা বলতে পারলে ;—

"কার তরে এই শয্যা দাসী, রচিস্ আনন্দে ?
হাতীর দাঁতের পালঙ্কে মোর দে'রে আগুন দে।
পুত্র যাহার বন্দীশালায় শিলায় শুয়ে, হায়,
ঘুম যাবে সে দুধের ফেনা ফুলের-বিছানায় ?
কুমার যাহার উচিত ক'য়ে সয় অকথ্য ক্লেশ,
সে কি রাজার মন ভোলাতে পরবে ফুলের বেশ ?
দুলাল যাহার শিকল বেড়ীর নিগ্রহে জর্জর,
জন্তলিকা ? রত্নমুকুট তার শিরে দুর্ভর।
...   ...   —নাই কিছুরই সাধ,
যে-দিকে চাই কেবল দেখি লাঞ্ছিত প্রহ্লাদ।"

আমরাও কি সেই আহতচিত্ত কবির দৃষ্টির অনুসরণ করে আজ লক্ষ লক্ষ প্রহ্লাদের সেই—

"যে-দিকে চাই মলিন অধর উপবাসীর চোখ,
যে-দিকে চাই গগন-ছোঁয়া নীরব অভিযোগ
যে-দিকে চাই ব্রতীর মূর্তি নিগ্রহে অটল।"

দেখতে পাচ্ছি না ? আমাদের অন্তরাত্মা কি আজ সত্যই ডুকরে কেঁদে উঠে বলছে না ;—

"বিদ্রোহ নয় বিপ্লবও নয়, ন্যায্য অধিকার।
উচিত বলে দণ্ড নে'বার দিন এসেছে আজ,
(যার জন্য) দুঃখবরণ করেছে মোর নির্দোষী প্রহ্লাদ।"

আজ সমস্ত ভারতভূমির বঙ্গভূমির মেয়েদের ক্ষুব্ধ অন্তর থেকে এই বিস্ময়বেদনা কি উথলে উঠছে না, আর তার সঙ্গে অননু-ভূতপূর্ব একটা আত্মগৌরবও কি সংমিশ্রিত নেই ?—

"উচিত বলে দণ্ড নে'বার দিন এসেছে আজ,
উচিত বলে পরতে হবে চোর-ডাকাতের সাজ,
চিত্ত-বলের লড়াই সুরু পশু-বলের সাথ,
বন্যা-বেগের হানার মুখে কিশোর-তনুর বাঁধ!
প্রলয় জলে বটের পাতা! চিত্ত-চমৎকার!
তীর্থ হল বন্দীশালা, শিকল অলঙ্কার।
খেদ কিছু নাই, আর না ডরাই, চিত্তে মাভৈঃ রব;
উচিত বলে বন্দী ছেলে এ-মম গৌরব!
কয়াধু তোর জন্ম সাধু, মোছ রে চোখের জল,
রাজ-রোষেরি রোশনায়ে তোর মুখ হ'ল উজ্জ্বল!"*

সত্যেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ্য-বিদ্বেষ এবং মক্ষিকাবৃত্ত হয়ে বিরাট সমাজদেহের ক্ষত অন্বেষণ করে যথেষ্ট অসহিষ্ণুভাবে দেশমান্য প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞদেরও অযথা আক্রমণ করেছেন, কিন্তু মাতৃজাতির কোন চ্যুতি-বিচ্যুতিকেই তিনি লক্ষ্য করেন নি। অধিকাংশ কবিই তাই করেন, কিন্তু তা'তে নিরপেক্ষতা থাকে না। এক-

* (১৯৪৯) সেদিনের সঙ্গে প্রভূত প্রভেদ সত্ত্বেও বন্দী ছেলের জন্য মায়ের চোখের জল মুছবার সময় আজও আসেনি!

তরফা অত্যাচারের কাহিনী দেখে শুনে মনে হয় বুঝি এ-দেশের মেয়েরা কসাইখানার পশুপাল, নির্বিচারে খড়্গাঘাত সইবার জন্য যূপকাষ্ঠের পাশে ভিড় ক'রে আছে, তা'ছাড়া তাদের আর কোন পরিচয়ই নেই। তারা শুধুই অত্যাচারিতা হয় এবং ভক্ত খৃষ্টানদের মত দ্বিতীয় গালটা বাড়িয়েই রেখেছে, ভুলেও কখন অপর কোন উল্টো নীতিই অনুসরণ করে নি! তবে প্রাচীন যুগের নারীদের সম্বন্ধে তাঁর বহু রচনা সেই মনস্বিনীদের মধ্য দিয়ে আমাদের বর্তমানের সমস্যা সমাধানের পথ দেখাবার সহায় হয়েছে, গৌরববোধকে জাগ্রত করবার সহায়তা করেছে। নারী যে নারী থেকেও জগতে একটা উচ্চতম স্থান লাভ করতে পারে, তার জন্য তাকে অতলে নামতে হয় না, ইহাই হ'ল চিরযুগের প্রধানতম শিক্ষা। এ আমরা তাঁর "কয়াধূ", "গিরিরাণী"-তেই শুধু নয়, "স্কন্ধ-ধাত্রী", "সর্বদমন" প্রভৃতিতেও পেয়েছি। "মল্লিকুমারী" একমাত্র জৈন-নারী-তীর্থঙ্কর, তীর্থঙ্কর হয়েও তিনি নিজের নারীত্বের মহিমা অতিক্রান্ত হতে পারেন নি, মাতৃত্ব যে তাঁকে নিজ স্নেহপাশ দিয়ে বিশ্বের সন্তানদের সঙ্গে বিজড়িত করতে ছাড়েনি, ক্ষুদ্র "স্ব"কে বৃহৎ করে মাতৃত্বের সীমাকে মাত্র প্রসারিত করেছিল, তাঁর মুখের কথায় তা' সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে ;—

"মমতার পথে মোক্ষ আমার,
সাধনা আমার ত্রিকাল ভরি,
বিত্ত আমার চিত্ত-চারিত্র,
হৃদয়ে ললাটে রত্ন ধরি।
প্রসূতি না হ'য়ে শত সন্তান
পেয়েছি হৃদয়ে নিয়েছি টানি ;

প্রসবের ব্যথা যে খুসী সে নিক
পালনের ব্যথা আমারি জানি।"

"স্কন্ধ-ধাত্রী"তে যে চিত্র দেখি, তার স্থান, কাল ও পাত্র কিছুই যেন বদলায় নি, শুধু নামরূপমাত্রই পরিবর্তিত হয়েছে। একজন 'মা' যখন এতটাই আশা জানাচ্ছেন ;—

"বজ্রকাটা আঙুলে যার জ্যোৎস্না জড়িয়ে ;
পাড়িয়েছি ঘুম ঘুম-পাড়ানি মন্ত্র পড়িয়ে,
সে মোর হবে দৈত্যজয়ী ?—পুরবে মনের সাধ ?...
অন্যায়েরি বন্যাজালে পারবে দিতে বাঁধ ?..."

পৌরাণিক রাজাধিরাজ ভরত বা সর্বদমনের ন্যায়বিচারকে আমরা সমর্থন করতে পারি নি, তাঁর ন্যায়ের মূলে নিশ্চয়ই প্রচণ্ড ভুল ছিল ;—

"পীযুষ পিয়েছে যার কাছে, আজ বিষ পিবে সেই তাহারি কাছে ;"

তার চেয়ে রাজার "দেহের দুষ্টব্রণ"কে রাজাই স্বহস্তে অস্ত্রাঘাত করতে পারতেন, নিরুপায়া জননীকে নিজের ন্যায়-বিচারের মর্য্যাদার পায়ে এত বড় অন্যায় করতে বাধ্য করা কোন্ রাজধর্মের পক্ষ থেকে সুবিচার—তা' তো জানি না !

সত্যেন্দ্রনাথের লেখনী নারীর প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদে কোন সময়েই নিশ্চল থাকেনি। "দোরোখা একাদশী"তে,—

"উড়িয়ে লুচি আড়াই দিস্তে দেড় কুড়ি আম সহ—
একাদশীর বিধানদাতা করেন একাদশী,
এদিকে ওই ক্ষীণ মেয়েটি নিত্য একাহারী—
একাদশীর বিধান পালন করছে প্রাণে ম'রি,
কণ্ঠাতে প্রাণ ধুঁকছে, চোখে সর্ষে-ফুলের সারি।"

—এবং "স্নেহলতা"র বিবাহ-পণ দিবার জন্য পিতাকে ভিটা বাঁধা দিতে হবে শুনে পুড়ে মরার পর সমাজকে যে তীব্র কষাঘাত করেছিলেন তার জন্য বঙ্গনারীমাত্রেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

কিন্তু কথা এই যে, চাবুক হাতের কাছে থাকলেই যে তা' নির্বিচারে চালাতেই হবে সেটা সভ্যতাও নয়, সুবিচারও নয়। হিন্দুসমাজের ভালমন্দ স্থূলসূক্ষ্ম সমস্ত রীতিনীতিকে এবং মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃত শিক্ষিত মাত্রকেই চাবুকপেটা করায় আত্মপ্রসাদ হয়ত আত্ম-রুচি অনুসারে লাভ করা যেতে পারে; কিন্তু যে ন্যায়ের মর্যাদার গৌরব তিনি নিজের মনের মধ্য থেকেই করেছেন, তা'তে নিশ্চয়ই আঘাত দেওয়া হয়। কারু লেখার ভালমন্দ সমালোচনা করতে গেলেই যে তাঁকে কুৎসিত ভাষায় গাল দিতে হবে, এমন বিধান কোন দেশেরই শিষ্টাচারে নেই। তাঁর সুললিত ছন্দের, দেশপ্রেমের, নারীমাহাত্ম্য উপলব্ধির এবং নারীর প্রতি গভীর সহানুভূতির আমরা প্রশংসা করি। তথাকথিত সেই সব নারী-হিতৈষী যাঁরা উচ্ছৃঙ্খল নারীচিত্র এঁকে তাদের সর্বনাশের পিচ্ছিল পথকে পিচ্ছিলতর করতে চান, তাঁদের চেয়ে আমরা এই রকম নারী-মহিমা উদ্বোধনকারীকেই প্রকৃত নারীবন্ধু বলি। নারীর নারীত্ব বজায় রেখে যে উন্নতি তারই নাম প্রগতি।

মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় অনেক বিচিত্র ধরণের নারীচিত্র দেখা যায়। তাঁহার "উর্বশী পুরূরবা" এবং "নূরজাহান" উল্লেখযোগ্য; "দেবদাসী" কবিতার একাংশ উদ্ধৃত করা হলো;—

"আমি দেবদাসী, দেবী নই আমি—
দাবী নাই সুধাপানে,

আমি নারী নই, নরের মোহিনী,
আমি সবাকার, মানস-মোহিনী,
আমি দেবতার ভোগের প্রসাদ,
ভক্তের পূজা-দানে।
নয়ন অন্ধ, শ্রবণ বধির-
নৃত্য-পুত্তলিকা।
বাজে করতাল,, বাজে মৃদঙ্গ,
নেচে ওঠে মোর সকল অঙ্গ,
প্রাণ নাই, তবু গান গাই আমি—
সৃষ্টির প্রহেলিকা!"*

আধুনিক লেখকদের মধ্যে প্রভাতমোহনের রচনায় নারীর প্রতি শ্রদ্ধা নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর "ব্রতী" নাটকের যে দুটি নারী সিদ্ধার্থকে পতিরূপে কামনা করে নিষ্ফল হয়ে তাঁকে তাদের তপস্যার ফল অর্পণ করেছিল সেই নন্দা ও নন্দবালার কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর "মুক্তিপথে" কাব্যগ্রন্থের "নারী" কবিতাটিতে তিনি এ-দেশের নারীকে তাদের আত্মমহিমা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, দেশের মুক্তিসাধনায় তাদের যোগ দিতে পূর্বাহ্ণেই ডাক দিয়েছিলেন ;—

"পতি-পুত্র ধন-জন, নারী-দেছে বিসর্জন
যে-দেশে ধর্মের মুখ চেয়ে,—
মাগো তুমি সে-দেশেরই মেয়ে।

---

* শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর "দেবদাসী" ছোট গল্প ও নাটিকা সর্বপ্রথম এঁদের দিকে সাহিত্যিক-সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিল মনে হয়।

আত্মার সম্মান তরে, সব দেছে অকাতরে,
সর্বভয় যারা বিস্মরিয়া,—
বোন তুমি তাদেরই আত্মীয়া।"

"অন্নপূর্ণা" কবিতায় তিনি নারীর সম্বন্ধে যা' বলেছেন তাতে চিরন্তনী নারীর একটী সম্পূর্ণ চিত্র আমরা দেখতে পাই ;—

(১) যে-দেবী ক্ষুধার অন্ন যুগে যুগে যোগাইল জীবে,
অন্নপূর্ণা তারে মোরা বলি।
তাহার বিহারক্ষেত্র নহে কোনো সুদূর ত্রিদিবে,
মর্ত্যভূমি আছে সে উজলি।
মাতারূপে জায়ারূপে কন্যারূপে প্রতি ঘরে ঘরে,
দেশে দেশে প্রাসাদে কুটিরে।
নিখিল নরের মর্মে উপবাসী ভিখারী শঙ্করে,
অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়া ফিরে।

(২) যে-অন্নে মিটায় নারী দেহের মনের সর্ব ক্ষুধা,
পুরুষে সার্থক করি তুলে !
রাখিতে তাহার মান্য ধনে ধান্যে ভরিয়া বসুধা,
তাই নর আনে আত্মভুলে।
নারী লজ্জা পায় তাই সভ্যতার নেমেছে গুণ্ঠন,
মানুষের পশুত্বের পরে।
নারী লজ্জা চায় তাই বসুন্ধরা করিয়া লুণ্ঠন,
পুরুষ চরণে দেছে ধরে।

(৩) স্নেহ দিয়া সেবা দিয়া স্বপ্ন দিয়া নারী বাঁধে ঘর,
তারা লক্ষ্মী, তারা প্রেমময়ী।

তারা শক্তি দেয় বুকে, তারা হাতে দেয় ধনুঃশর,
তাই নর ত্রিভুবনজয়ী।
হাসিমুখে অকাতরে সৃষ্টিসিন্ধুমন্থনের বিষ,
সংগোপনে তারা করে পান।
মানুষের ঘরে ঘরে তাই ভরে আজো অহর্নিশ,
আনন্দের অমৃত অম্লান।"

জসিমুদ্দিনের কবিতার মধ্য দিয়ে বাংলার গ্রাম্য নারীর সুখদুঃখের অভাব-অভিযোগের, আনন্দের স্মিতহাস্য ও অশ্রুসজল নেত্রের যে ছবির পর ছবি আমাদের মনের মধ্যে ফুটে ওঠে, তা' আমাদের বাস্তব জীবনের মতই সমানভাবে হাসায় কাঁদায়। নারীর চিত্তগহনে ঢুকে অতি সহজ সুন্দর ভঙ্গীতে তিনি তাদের যে-সব মনের কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন, তা' দেখেও তারাও অতিমাত্রায় বিস্মিত হবে। তার একটি চিত্র এই ;—

"এ-গাঁও হতে ভাটীর সুরে কাঁদে যখন গান
ও-গাঁর মেয়ে বেড়ার ফাঁকে রয় সে পেতে কান।"

খুনদায়ে পলাতক পতির হতভাগিনী পত্নীর এই করুণ চিত্রখানি ;—

"ঘরের ভিতরে সপটি ফেলায়ে বিছায়ে নকসী কাঁথা,
সিলাই করিতে বসিল যে সাজু একটু নোয়ায়ে মাথা ;
পাতায় পাতায় খস খস করে শুনে কাণ খাড়া করে
যারে চায় সে-তো আসেনাকো শুধু ভুল করে করে মরে।
তবু যদি পাতা খানিক না নড়ে ভাল লাগে নাক তার।
আলো হাতে করে দূর পানে চায় দ্বার খুলে বার বার।"

পতিবিরহিণী বঙ্গবধূটি দুঃখের দহনে দগ্ধ হয়ে হয়ে অবশেষে যখন ঝরে পড়বার অবস্থায় পৌঁছেচে, তখন শ্রীরাধিকার মতই—সে,

"মরিলে তুলিয়ে রেখ তমালের ডালে"র মতই একটী করুণ আর্জি সোনা-মাকে করছে ;—

"এই কাঁথাখানি বিছাইয়া দিও আমার কবর 'পরে
ভোরের শিশির কাঁদিয়া কাঁদিয়া এর বুকে যাবে ঝরে।
সে যদি আবার ফিরে আসে কভু, তার নয়নের জল
জানি জানি মোর কবরের মাটি ভিজাইবে অবিরল।"

তার 'কবর' কবিতাটি রক্তের রংয়ে আঁকা, এর সঙ্গে তুলনায় মনে পড়ে মিসেস হেমান্সের সেই বিখ্যাত কবিতা ;—

"দে গ্রু ইন্ বিউটি সাইড বাই সাইড, দে ফিল্ড্ ওয়ান হোম উইথ গ্লি,
দেয়ার গ্রেভস্ আর সিভারড্ ফার এণ্ড ওয়াইড্ বাই মাউণ্টেন রিভার এণ্ড দি সি।"

রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যও সব দিক দিয়ে পদ্যসাহিত্যের মতই বিশাল, বরঞ্চ পরিধির হিসাবে বিশালতর। আমরা এখানে তাঁর গল্প উপন্যাস নাট্যসাহিত্যের মধ্যবর্তিনী নারীদেরই একটা রেখাচিত্র মাত্র দিয়ে যাচ্ছি। পূর্বেই বলেছি এ-ছাড়া তাঁর সাহিত্যিক চরিত্রের বিস্তৃত আলোচনা করবার মত স্থান বা শক্তি আমাদের নেই। রবীন্দ্রনাথের এক একটি ছোট গল্প কাব্যগাথার মতই চমৎকারিত্বপূর্ণ এবং কবিতার মতই সুখপাঠ্য। "কাবুলীওয়ালা" গল্পে খুকী মিনি শিশু-চিত্রের আর একটী অভিনব দান, "ছুটি"র ফটিকচাঁদ, "অসমাপ্ত"র চঞ্চলা মেয়ে মৃন্ময়ী, "পোষ্টমাষ্টারে"র রতনের ছোট মনের বিশ্লেষণ তদানীন্তন বঙ্গসাহিত্যে নূতন আলোকসম্পাত করেছিল। "মেঘরৌদ্র"-এর বজ্রাওনের নবাবপুত্রীর প্রণয়কাহিনী যেমনই সকরুণ তেমনই

নারীমহিমা দীপ্ত। নারী যে পুরুষের মহত্ত্বের দ্বারেরই উপাসিকা এই তথ্যটি এই দেওয়ানা নবাবজাদীর অতিকরুণ ক্লান্ত জীবন-কথার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বলরূপে প্রকটিত হয়ে উঠেছে।

আমাদেরই ঘরে ঘরে প্রতিবেশীর গৃহাঙ্গনে, গ্রামের মধ্যে, সহরের পথের ধারে ধারে কতই অকথিত, অমীমাংসিত রহস্য ও মিলন-বিরহাত্মক সুখদুঃখের ইতিহাস প্রাত্যহিক জীবনে সংগঠিত ও সংঘটিত হয়ে উঠছে,—এই সবের মধ্য থেকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন কবি এবং কথাকার অতি সহজে ঘটনা সংস্থান করে নিয়ে কেমন করে মানবচিত্তকে চমৎকৃত করে দিতে পারেন বলতে গেলে রবীন্দ্র নাথই তার প্রথম পথপ্রদর্শক। গণ-সাহিত্য আজ যাকে বলা হয়, ফরাসী এবং রুষ সাহিত্যিকরা যে-পথ জনসাধারণের জীবনদ্বন্দ্বের মধ্য থেকে খুঁজে নিয়েছিলেন, সে-পথের যাত্রারম্ভ বাংলাসাহিত্যে আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প দিয়েই শুরু হয়েছিল। অবশ্য প্রাচীন বাংলায় আমরা বহুপূর্বেই এই গণ-সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ে ভালভাবেই এসেছি। রাজা মহারাজদের আশেপাশে শুধু পাত্রমিত্র সেনাপতি বয়স্য বণিক নয়, সেখানে অতি সামান্য নগণ্যদেরও, যেমন দাসদাসী, অস্পৃশ্যজাতীয় পরিবারবর্গের সুখদুঃখের কথাচিত্রের কোনই অভাব ছিল না। ইদানীং সে-চিত্রের উপর কালের ধূলিজাল পড়েছিল এবং নূতন রংয়ে যে আলেখ্য লেখা হচ্ছিল তা' প্রায় ধনী পরিবার অথবা রাজপুতানার রাজা রাজকুমার বা রাজকন্যাদের নিয়েই হচ্ছিল। আর এইজন্যই তাদের নিজেদের দেশের থেকেও বাংলাদেশেই টডের "রাজস্থান" গ্রন্থের প্রচার খুব বেশী হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র গরীব গৃহস্থের পরিচয় দু'একবার দে'বার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে-চিত্র তেমন করে ফোটেনি এবং "প্রফুল্ল", "রাধারাণী" বা কাণা ফুলওয়ালীর দৈন্যগ্রস্ত জীবন যেন তাদের ঐশ্বর্য-সমুজ্জ্বল পরবর্তী জীবনের ঔজ্জ্বল্য বর্ধনের সহায়তা করেই গেছে। বাস্তব জীবনচিত্র নয়। রবীন্দ্রনাথেব ছোটগল্পগুলি মানবজীবনের বাস্তব কথা।*

"বৌঠাকুরাণীর হাট"-এর সুরমা রাজ-সংসারের আবর্জনামাত্র! রাজকন্যা ও রাজরাণী বিভাও রাজ দ্বারের কাঙ্গালিনী মেয়ে। দু'টি চিত্রই অনবদ্য। "নৌকাডুবি"র কমলা আমাদের মন প্রথম থেকেই এমন করে কেড়ে নেয় যে, শিক্ষিতা পিতৃ-আদরিণী হেমনলিনীর শূন্য হৃদয়ের প্রতি আমাদের চেয়ে দেখবার পর্যন্ত অবকাশ থাকে না। নলিনাক্ষের সংসারবিরাগী মা হিন্দুনারীর পবিত্রতায় এবং তেজস্বিতায় সমুদ্ভাসিত, যে তেজকে যথার্থ সতীতেজ বলা যায় সেই জিনিসটাই আমরা তাঁর মধ্যে দেখতে পাই। নিবিড় সখ্যের সহানুভূতিতে "উমার মা" শৈলজাকে সহজেই আপন করতে পারা গেছে।

অবস্থাচক্রের জটিলতায় কমলার পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য ছিল যে পতি-পত্নীর মধ্যের একাত্মতা, সখী শৈলজার সেই আত্মহারা পতিপ্রেমই তার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল।

"চোখের বালি"র বিনোদিনী রোহিণীর উত্তরাধিকারিণী এবং কিরণময়ীদের পূর্বপুরুষ(?) হলেও নারীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবান লেখক তাকে পাপের পথে বার করে দিয়েও আগাগোড়া রাশ টেনে রেখেছেন; ডুব-জলে গিয়ে পড়েও সে শুধু হাবুডুবু খেয়েছে,

* অবশ্য টেকচাঁদ এঁর পূর্ববর্তী।

ডোবেনি। অতি নমনীয়া ও কমনীয়া "আশা"র কাছে ক্ষমা পেয়ে সে তার দুর্বার চিত্তবিভ্রমের প্রায়শ্চিত্তে অনুতাপতপ্ত জীবন উৎসর্গিত করে দিয়ে পাঠকসমাজের কাছেও ক্ষমার্হ হয়েছিল।—ভুল করা মানব-ধর্ম।

"অন্নপূর্ণা" "গোরা"র আনন্দময়ীরই সগোত্রা, ঘটনাচক্রের সংঘাতে পড়ে আনন্দময়ী উদারতর হয়ে উঠতে অবকাশ পেয়েছিলেন। "গোরা"র ললিতা আধুনিক সাহিত্যরথীদের আদর্শ একরোখা মেয়ে, সে ভাল কি মন্দ জানি না; যেমন যুগধর্মে জন্মাচ্ছে তারই একটি আলোকচিত্র। সুচরিতা মেয়েটি পুরাণো বাংলার, ভাগ্যচক্রের আবর্তনে যখন যেখানে গিয়ে পড়ে, সামলে নেয়।

"চতুরঙ্গে"র "দামিনী" "শেষের কবিতা"র লাবণ্যর কাঠামো একই জাতের; দারুণ দুষ্প্রবেশ্য!

"দুই বোন" এ-দু'খানি মডেল, একমেটে করে ছেড়ে দেওয়া, দোমেটে করা হয়নি, নেহাৎ উপরোধে লিখে দিতে হয়েছিল হয়ত। "মালঞ্চ"-এ সঙ্কীর্ণ নারীচিত্রের প্রতীক। বড় ভাল লাগে আমাদের "গোড়ায় গলদ"-এর ইন্দুমতীকে, হাসিখুসীভরা, সঞ্চারিণী দীপশিখার মত, ঝলকে ওঠা দীপালোকের মত মন ধাঁধিয়ে দেওয়া চমৎকার মেয়ে! "গয়লার গাই"কে চাকর বানিয়ে যে নাকালটা করেছিল, ইদানীংকার হাসতে ভুলে যাওয়া বাঙ্গালীর ঘরে আজও সে একটা সত্যকার প্রাণ খুলে হাসবার উপাদান দিয়ে রেখেছে। এমন হাস্য-সরস মধুর চরিত্র আমরা বাস্তবেও কদাচিৎ দেখেছি এবং তারা আজ তাদের সেই ব্যঙ্গ রঙ্গ-হাস্যস্রোত সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে, "ইন্দু"র মত আমাদের হাঁপ ছাড়বার

কোন উপায়ই দান করে যেতে পারেনি। সত্যে ও কল্পনায় অথবা সত্যেরই প্রতিলিপিতে এইখানেই প্রভেদ।

"ছাগলের খুরের মত খুটখুটে" জুতাপরা "এনামেল-করা-মুখী" কেটিকে আজকাল হাটে বাটে সর্বদাই দেখতে পাচ্ছি, তবে সে ঐ দুটি ঐশ্বর্যের প্রসাদে অমর হয়ে রইল। ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়েসে বিয়ে না দিলে যে কি রকম্ বিয়ে-পাগলা হয়ে ওঠে "চিরকুমার সভা"র কুমার-কুমারীগুলি তারই প্রকৃষ্টতর উদাহরণ।

বীরবল বা প্রমথ চৌধুরীর রচনা শিক্ষিত লোকেদের জন্য, ঠিক জনসাধারণের জন্য নয়। তাঁর গল্পরচনার ঢংও নূতনতর। "চার ইয়ারি কথা"র গল্পচতুষ্টয়ের নায়িকারা চারিজনেই বিদেশিনী। বিদেশিনী চরিত্রচিত্র আমরা বিদেশী সমাজেই দেখতে অভ্যস্ত, স্বদেশীয় নরের সংস্রবে বিদেশিনীকে আমরা একটু সন্দেহের চক্ষেই দেখে থাকি, রস গ্রহণে বাধা পড়ে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনেক ভাল গল্পেও আমরা এই অবস্থায় পড়েছি। অবশ্য তাই বলে বীরবলের সরস রচনায় "দিদিমার গল্প" বা "বীণাবাই" প্রভৃতির কথাও বাদ পড়েনি।

প্রভাতকুমারের নারীচরিত্র অনেক এবং বহু বিচিত্রতাপূর্ণ। ছোট গল্পের মধ্য দিয়ে অপূর্ব রসসৃষ্টিই তাঁর বঙ্গসাহিত্যে অমূল্য দান। 'দেবী' গল্পের কথা কোনদিন ভুলতে পারা যাবে না। ঘটনাচক্রে পড়ে স্বয়ং ভগবানকে যখন ভূত হ'তে হয়, তখন বেচারী একটি পল্লী-বধূর অদৃষ্টে শ্বশুরের স্বপ্ন-দর্শনের ফলে দেবীত্ব-প্রাপ্তি এ আর বিচিত্র কথা কি? এমন ব্যাপার নাকি আজও ঘটছে। তাঁর উপন্যাস বর্ণিত বহু নারী-চরিত্র নিয়ে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, তবে শুধু একটিরই কথা বলবো।

"সিঁদুর কৌটা"র বকুলাবলিকা বা বকুরাণী আদর্শহিসাবে হয়ত খুবই বড়, সতীনারীর মহত্বও হয়ত তাঁর অক্ষুণ্ণ আছে, মনুষ্যত্ব কতখানি রইল বলতে পারি না। সূর্যমুখী স্বামীর বিয়ে দিয়ে সেই স্বামীর ঘরে ঘর করতে পারেন নি। স্বামী-দর্শনে এসে ধরা না পড়লে ফিরেই যেতেন। স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিশোধে নিজের উচ্ছৃঙ্খলতা নিশ্চয়ই সতীধর্ম নয়; কিন্তু তা'তে প্রশ্রয়দানও তাঁর ধর্মবিধানের বহির্ভূত। পতিকে পাপ পথ থেকে নিবৃত্ত করাই সতীধর্ম, সেই পথ বাধামুক্ত করা আত্মত্যাগ হ'তে পারে; কিন্তু তাতে কর্ত্তব্যপালন হয় না, কর্ত্তব্যের পথ ক্ষুরধার।

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে সবচেয়ে খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলিতে বহু নারীচিত্র উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর ভাষার জোর ছিল, নিজের জীবনের বিচিত্রতা ও নূতনতর অভিজ্ঞতা ছিল, প্রতিভার সঙ্গে সহৃদয়তার মিশ্রণে তিনি অনেকগুলি জীবন্ত নারীচরিত্র সৃষ্টি করে গেছেন। পল্লীর প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে তিনি অনেক সময় পাপীকে প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং অপরিণতবুদ্ধি যুবক-সমাজকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করেছেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

"কাশীনাথ" গল্পের কমলা সংসারে থাকতে পারে, ঐতিহাসিক ও বাস্তবচিত্রে পাওয়া যায়, সৌভাগ্যক্রমে সংসারে দেখিনি, তবে এরকম আসামীর কথা হয়ত শুনে থাকবো।

"বড়দিদি"তে মাধবী-চরিত্র রহস্যাবৃত হলেও মানবীয় পরিচয়ের হিসাবে নিতান্ত অস্বাভাবিক বলা চলে না।

শরৎচন্দ্র আদর্শবাদী, নিম্নশ্রেণীর জীবনযাত্রা এবং সমাজ-বহির্ভূতাদের কেবলমাত্র কুৎসিত দিকটাই নয়, তার ভাল দিকটাও দেখেছেন এবং এঁকেছেন। প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব অনুভূতিই তাঁর লেখাকে সজীব এবং সবল করেছে। রবীন্দ্র-নাথের মত তিনি রসের ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করতে পারেন নি; বিশ্বজগতের অনাদি অনন্তযুগের বড় বড় কথা কোথাও ভাবেন নি, সীমাকে অসীমে মেলাবার সাধনা বা সাধ্যও তাঁর ছিল না। নিজের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে নগরের এবং পল্লীসমাজের ভীরু স্বার্থান্ধ পৌরুষহীন পুরুষের পাপের এবং অত্যাচারের বোঝা বহন করে যেখানে নারী নিঃশব্দে অন্ধকারে প্রতিদিন লুটিয়ে পড়েছে, সেখানে শরৎচন্দ্রের অকৃত্রিম সহানুভূতি আলোকসম্পাত করে সমাজকে তার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলে তাকে সাবধান করতে চেয়েছে। তাঁর লেখার 'মটো' (motto) হ'ল—

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই
মিলিলে মিলিতে পারে লুকানো রতন।"

"পথনির্দেশ"-এর নায়িকা হেমের চরিত্রের বিশেষত্ব পরবর্তী ললিতা, ভারতী এমন কি কমলের মধ্যেও (ঘরকন্না করবার সময়) অল্পবিস্তর দেখতে পাই; এদেরই সর্বপ্রথম সংস্করণ 'হেম'। এই বইয়ের কতকগুলি মন্তব্য সামাজিক অল্পশিক্ষিতা নারীর পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর হয়েছিল বলে জানি।

"চরিত্রহীন"-এর কিরণময়ীতে "নৌকাডুবি"র বিনোদিনীর ছাপ সুস্পষ্ট। "রোহিণী"র প্রেতাত্মা কিরণময়ীর পরেও বহুকাল ধরে বঙ্গসাহিত্যের ভাঙ্গা-মন্দিরের অন্তবর্তী পচা ডোবা এবং বাঁশঝাড়ের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছিল; এখন যেন একটু

গা-ঢাকা হয়েছে, বুঝি কেউ বা গয়ায় পিণ্ডদানই করে থাকবেন! তাঁর অপূর্বসৃষ্ট "বিরাজ বৌ" পড়ে মনে হয়েছিল, অমৃতকুম্ভে এক ছিটে গোময় প্রদত্ত হয়েছে। বিরাজের গৃহত্যাগ তার চরিত্রের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খায় না। আত্মহত্যা বরং সম্ভবপর ছিল, ও-প্রকৃতির মেয়ে এ-রকম চিন্তা অতক্ষণ ধরে মনে পুষতে পারে না।

"পণ্ডিতমশাই" উপন্যাসের 'কুসুম', 'শৈলজা', 'নারায়ণী', 'মেজদিদি', 'বিন্দু' এদের সমজাতীয়া। তেজস্বিতা ও স্নেহের রৌদ্র-ছায়ায় চরিত্রগুলি উজ্জ্বল ও সুমধুর। এঁদের সুসময় অথবা দুঃসময়ে দেবর, ভাসুরপো, জায়ের-সতাতো ভাই যে কোন বাড়ীর অথবা পরের ছেলে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরতে বাধে না; আবার রাগের মুখে এঁদের মাকে বা বড় জাকে কুকথা বলা, স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, ঝনাৎ ক'রে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে পৃথক হওয়া, এ সব ব্যাপার একই ধরণের হলেও লেখকের রচনাশক্তির যাদু দণ্ড স্পর্শে অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছে। ঘরে ঘরে এদের দেখা আমরা নিয়তই পেয়ে থাকি বলে বারে বারে দেখেও অসঙ্গত মনে হয় না।

"মেজদিদি"র মেজদি বিন্দু ও নারায়ণীর সমশ্রেণীর, একই মডেল, তবে "বিন্দুর ছেলে"র বিন্দু-চরিত্রে ভাবাধিক্য কিছু অতিরিক্ত থাকলেও চরিত্রটী অনবদ্য। "রামের সুমতি"র নারায়ণী শরৎচন্দ্রের একটি অপূর্ব সৃষ্টি, কাল্পনিকতাশূন্য অতি সহজ পরিচিত অথচ বিশিষ্ট একটী রূপ আছে।

"আঁধারে আলো"র আঁধার বড় সহসাই যেন কেটে গিয়েছিল; অস্বাভাবিক তবুও বলা যায় না। "বাসনায় আগুন

দেওয়া"র কথা শুনেই লালাবাবু একদিন বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিলেন।

"পল্লীসমাজ"-এর জেঠাইমা বিশ্বেশ্বরীর চরিত্র "গোরা"র আনন্দময়ীর ছাঁচে গড়া হলেও সুন্দর। রমা, রমার মাসী, পল্লীসমাজের কলহপ্রিয়া নারীরা বাস্তবচিত্র।

"শ্রীকান্ত"র অন্নদাদিদির চরিত্র বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাওয়ারই যোগ্য, শরৎ সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র।

"বৈকুণ্ঠের উইল"-এর বিমাতা ভবানীর চরিত্র নারীচরিত্রের অত্যুচ্চ পরিণতি।

"অরক্ষণীয়া"র জ্ঞানদা অনেকটা "মহানিশা'র অপর্ণার স্বগোত্রা। নিজেকে কোনমতে পরের গলগ্রহ হয়ে থাকা থেকে মুক্ত করতে আত্ম-পীড়নের চরমে যেতেও প্রস্তুত। দুজনেরই অন্তরে প্রেমপাত্রের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র অভিমানই তাদের আত্মত্যাগী করেছে।

"নিষ্কৃতি"র সমস্ত চরিত্রই চমৎকার ফুটেছে। "গৃহদাহ"এর মৃণাল মেয়েটি আমাদের পূর্বপরিচিতাদেরই যমজা, তথাপি মরুভূমে ওয়েসিস। অচলা সাহিত্যে যাই হোক, সংসারে অচলা। "দত্তা"র বিজয়া চরিত্রটি মনোরম।

"দেনা পাওনা", "বামুনের মেয়ে", "নববিধান" এদের মধ্যে বিশেষত্ব এমন কিছু দেখা যায় না। "বামুনের মেয়ে"তে কৌলীন্য প্রথার পাপের চরম দুর্দশায় মন শিউরে উঠে, বলে ওঠে "ভগবান রক্ষা করো!" এদেশে যতকিছু সামাজিক ক্ষতিকর বিধান হয়েছিল, তার মধ্যে এই বৈবাহিক কৌলীন্য-প্রথাকে প্রশ্রয় দান সব চেয়ে বেশী ক্ষতিকর হয়েছে।

'চন্দ্রনাথ"-এর সরযূ তার শান্ত মাধুর্যে আমাদের মনের উপর যথেষ্ট দাবী করে। পিতামাতার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত এমন ক'রে কত নিরীহ সন্তানকেই করতে হয়! প্রভাতকুমারের ছোট গল্প "কাশীবাসিনী"তে কুলত্যাগিনী অপরিচিতা জননী হঠাৎ মেয়ে-জামাইয়ের বাসায় এসে স্নেহ-বুভুক্ষা মিটাতে গিয়ে 'চোর দায়ে পড়া'—বাস্তবিক চোখে জল আনে। পাপ এইজন্যই নরের চেয়ে নারীর পক্ষে সাজ্ঘাতিক। মা অবনতির চরমে পৌঁছেও মায়ের প্রাণ হারায় না; আর সেইখানেই হয় তার ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত!

তাঁর নায়িকারা রন্ধনবিদ্যায় অতি পটীয়সী, অথচ নিজেরা সেকালের দিদিমায়েদের মত কৃচ্ছ্র ব্রতপরায়ণা নিরামিষাশী বা উপবাসী। এ রকম মেয়েদের দাম যুগে যুগে খুবই চড়া, সে যে কোন শ্রেণীর মধ্যেরই হোক, তাতে সন্দেহ কি! বিশেষতঃ এই বাজারে ত কথাই নেই। তবে কথা এই, হোটেল রেস্তোরাঁয় আধুনিক মেয়েদের নির্বিকার ভোজন-বিলাস দর্শনকারী পুরুষ পাঠকবর্গ এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখতে পারলে হয়!

তবে শরৎচন্দ্র এ বিষয়ে পূর্ববর্তীদেরই অনুসরণ করেছেন মাত্র, কোন মৌলিক গবেষণারই পরিচয় দিতে পারেন নি। ভোজন-বিলাসী বাঙ্গালী সর্বযুগেই রান্নাঘরের খবরদারীটা বজায় রেখেছেন, তা সে 'চলে যেতে চলে পড়া' "নবনীত-দেহা" শ্রীরাধিকাই হোন, নবীনা কিশোরী খুল্লনা, নববধূ জয়াবতী, ব্যাধপত্নী ফুল্লরা এ বিষয়ে কারুকেই সেখানে ঢুকতে দিতে আপত্তি নেই। আপত্তি ছেড়ে বরঞ্চ সাগ্রহ সম্মতিই আছে। আর তাঁরাও পিয়ানোর দু'খানা গৎ শুনিয়ে না দিয়ে বা চায়ের

টেবিলে "'ক' চামচ চিনি চায়ে দেব" প্রশ্নে প্রেমাস্পদকে পরম আপ্যায়িত না করে, সত্যকার হাত পুড়িয়ে, রীতিমত "পুরী, পুয়া, খাজা, সরভাজা", (রাধিকা করেছিল) এবং "চিনি, ফেনি, কলা, মাখন রসালা, রেউড়ি কদম্ব-তিলা, অমৃত-কেলিকা আদি সে লড্ডুকা, স-ঘৃত মুদ্গ ঝুরি" ইত্যাদি তৈরি করেন।

তাঁরা আবার সুধু জলখাবারের থালাটী সাজিয়েই নিশ্চিন্ত নন। "সুবাসিত অন্ন ব্যঞ্জন মনোহর, পাক করিল তাঁহ গোই।" আবার "ক্ষীর সর কলা চিনি, খণ্ড নবনী" এ সব ত হামেসাই জোগাচ্ছেন! খুল্লনা, ফুল্লরা দ্রৌপদী কে' না রন্ধন-বিদ্যায় পটীয়সী? বাঙ্গালীর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, তিল পিটালীর পোরে ভাজা, শাক-শুক্তানি থেকে কলাবড়া, মুগ-সামুলি, পুলি-পিঠা, ক্ষীরপুলি, পায়েস, মুগতক্তি, রসবড়া এ সবের এতটুকু ত্রুটি,—রাধা খুল্লনা ফুল্লরা রঞ্জাবতী পদ্মাবতীরা কেউই প্রিয়তমদের জন্য হ'তে দেন নি। পিরু-খানসামার তৈরি কেক, চপ, কাটলেট বা স্যাণ্ডউইচ প্যাটি দিয়ে হাত নেড়ে চুকিয়ে দেন নি। শরৎচন্দ্র ও দেশের মেয়েদের অতীত ও তখনকার বর্ত্তমানের এই সমস্ত চারিত্রিক দোষ বা গুণগুলি ভাল করে লক্ষ্য করেছিলেন এবং লক্ষ্য করে মনে মনে মুগ্ধ হয়েছিলেন তাই তাঁর সাহিত্যে নারী চরিত্রের এই বিশেষ দিকটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু তা'তেই কি অতীতকে ফেরাতে পারবেন?

"পথের দাবী"র ভারতী আমাদের সেই পূর্ব্বাপর বহু পরিচিতাদেরই একজন, শক্তিশালী রূপকারের হাতের গুণে নেহাৎ নেত্রপীড়াদায়ক হয়নি! সুমিত্রা-চরিত্রটী নূতন হলেও ভাষাশক্তির ইন্দ্রজালেই যেটুকু ফুটেছে, নইলে এমন কিছুই সার

বস্তু তাতে নেই। "পথের দাবী"র আসল দাবী যেখানে সেই সব্যসাচী-চরিত্রই আমাদের আলোচনার বাইরে।

"শেষ প্রশ্ন"র কমল, রূপসী দাসীর রূপসী অবৈধ কন্যা, ক্ষণিক মোহ এবং দেহের ধর্মকেই সব চেয়ে বড় আদর্শ বলে সে রক্তের গুণে মেনে নিয়েছিল; তাই আর্টিষ্ট শিবনাথ যখন তাকে ছেড়ে মনোরমাকে প্রেম-নিবেদন আরম্ভ করেছিল, তখন বিনা অভিযোগে মনোরমার বাগ্‌দত্ত স্বামী অজিতকে দয়া করে তার অসহায়তা দূর করতে গে'ল। মনোরমার গৃহত্যাগ আদর্শ চরিত্র আশুবাবুকে আঘাত দিল। কিন্তু 'শেষপ্রশ্ন' 'যা' নিয়ে সেই অসংযমে এবং আদর্শবাদে তার সমাধান কিছুই হ'ল না,—অবশ্য অত সহজে হ'বার কথাও নয়। কমলের বাগ্মিতায় বিদ্বৎসমাজ স্তম্ভিত হয়ে রইল এবং তার ধৃষ্টতা দেখে আমরাও রইলাম! তার শেষনীতি তার মত মেয়েরই উপযুক্ত এ কথা আমরা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি।

শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রে অনেক শ্রেণীর নারীকে আমরা একত্র দেখেছি, অনেক হীনতা এবং নীচতার মধ্যেও খুবই বড় বড় আদর্শের ছাপও সোনার মত উজ্জ্বল হয়ে আছে। তারা পুরুষকে নিয়ে বাঁদর নাচায় বটে, তবে পুরুষ সংযম হারালে তাকে মাঝে মাঝে চাবুক দিতেও যথেষ্ট চেষ্টা করে এবং নিজেরাও কৃতকার্যের জন্য কোথাও অনুশোচনা কোথাও অন্য রকমে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ ক'রে থাকে, কিন্তু তাঁর পথানুসরণকারীদের মধ্যে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধ সান্ন্যাল, এমন কি সুবিদ্বান ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর লেখাতেও সেকালের ভারতচন্দ্র প্রভৃতির মত আব্রু পরদার একান্ত অভাব ছিল, যেটা

এই বিংশ শতাব্দীর রুচির সঙ্গে খাপ খায়নি। শেষোক্ত লেখকের "মেঘনাদ"-এর "মনোরমা" এ বিষয়ে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। "শুভা"ও বড় কম যায় না। আদর্শ চরিত্র মেঘনাদকে মনোরমা কি ক'রে ক্রমে আদর্শভ্রষ্ট করল তার চিত্র এঁকে লেখক মানুষের অপরাধ-প্রবণতার জয়গান গেয়েছেন এবং ফৌজদারী আদালতের নোংরামি ভদ্র-সাহিত্যে টেনে এনেছেন অথচ তা' থেকে কোন আশার কথা শোনাতে পারেন নি। 'শুভা', 'শাস্তি', 'রক্তের ঋণ' প্রভৃতি প্রথম দিকের রচনায় আমরা তাঁর কাছ থেকে যেমন আঘাত পেয়েছি, তাঁর পরবর্তী রচনার মধ্য দিয়ে সেই মর্মাঘাত আমাদের মন থেকে সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়ে গভীর কৃতজ্ঞতার সঞ্চারও করেছে। "রাজগী"র সাবিত্রী চরিত্রে আমরা প্রথম চকিত বিস্ময়ে তাঁর আধুনিক যুগের নব সাবিত্রীকে দর্শন করি। তারপর কত সতী, কত সাবিত্রী, কত মদালসা, কত উভয় ভারতীর সঙ্গে পরিচয়ে আসবার সুযোগে আসা গেল। "সতী" উপন্যাসের সুরমা, "তৃপ্তি"র মিনতি, "অভয়ের বিয়ে" এবং "তারপর"-এর সরমা, "রবীন মাষ্টার" "বংশধর", "শেষ পথ", "পাগল"-এর নারায়ণী, "মিলন-পূর্ণিমা" প্রভৃতি বহু বিভিন্ন উপন্যাসে প্রত্যেকটী বিভিন্ন নারী চরিত্র সৃষ্টি করে লেখক তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করেছেন।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "স্রোতের ফুল", "হেরফের", "দোটানা", "মুক্তিস্নান", "চোরকাঁটা", "পঙ্কতিলক", "ধোঁকার টাটি", "হাইফেন" প্রভৃতি বহু উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের নারীদের সাক্ষাৎ পেয়েছি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের অন্তঃপুরের চিত্র ভালই ফুটেছে, উন্নত চরিত্র সৃষ্টির একান্ত অভাব।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের শতাধিক গল্প উপন্যাস নাটকের কয়জনের কথাই বা বলা যায়। তাঁর প্রথম যুগের ছোট গল্পগুলিতে ছোট ছোট যুঁই কুঁড়ির অভাব ছিল না। "কাজরী"তে একটি তরুণী মেয়ের মনঃস্তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে লেখকের সূক্ষ্ম দর্শনের প্রশংসা করতেই হয়। "আঁধি", "স্ত্রীবুদ্ধি", "নির্ঝর" প্রভৃতিতেও কয়েকটি সুন্দর চরিত্র দেখেছি। তদ্ভিন্ন তাঁর অসংখ্য উপন্যাসের বহু শত নারী ভালয় মন্দয় সংসারচক্রের আবর্তনে আবর্তিত হচ্ছেন।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "রাজপথ" উপন্যাসে স্বদেশ-সেবকের গুণমুগ্ধা ধনীকন্যা সুনীতির পরিবর্তন এ যুগের পক্ষে সঙ্গত আদর্শ। বাস্তব জগতে এ ধরণের ঘটনা ঘটতে দেখাও যায়। "অন্তরাগ" উপন্যাসে বর্ণিত অস্বাভাবিক নারী-চিত্তবৃত্তিকে প্রশংসা করা যায় না; ঠিক স্বাভাবিক মনেও হয় না। "শশীনাথে"র লীলা বলিষ্ঠ নারী চরিত্রের দ্যোতক, যাকে অবলা বলে কৃপা করা হয়, তা' নয়। "অভিজ্ঞানে"র সন্ধ্যাকে আমরা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারিনি। দুর্বল স্বামীর দুর্বলতার বা অক্ষম স্বামীর অক্ষমতার পরিশোধে যে নারী তার প্রতি হিংস্র প্রতিশোধ গ্রহণ করতে আত্মবিক্রয় করে, সে যে কোন সমাজেরই আদর্শ নারী নয়· বহু উচ্চাঙ্গের কলা-বিন্যাসেও তার সে ঘৃণ্য আদর্শ ঢাকা পড়ে না। তবে ঐ উপন্যাসের সিনেমা-চিত্রে বিনা অপরাধে অপরাধিনী দুর্বলচিত্ত পতির ঐ অভাগিনী পত্নীর যে পরিণাম প্রদর্শন করা হয়েছে, আমরা তাকেই সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আজ নারী, বিশেষতঃ "সন্ধ্যা"র মত মেয়ে যা'রা, তা'রা কিছুতেই অবলা বা অসহায়া নয়। দেশের, দশের, ধর্মের, সমাজের

সেবার জন্য তাদের প্রায় সমস্ত দরজাই চৌচাপটে খোলা। এ কাহিনীর প্লট অন্ততঃ ষাট সত্তর বৎসর পূর্বেকার হ'লে অসহায়া অবলার নিরুপায়ত্ব বরং বিশ্বাসযোগ্য হ'ত, আর তা' হ'লেও সেদিনেও নৌকাডুবির কমলা, "ইন্দিরা"র ইন্দিরা অনেকেই আত্মরক্ষার সাধারণ উপায় অবলম্বন করে অসাধারণ ফল লাভ করেছিলেন। "চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া"র দৃষ্টান্তই সন্ধ্যার অধঃপতনের মূল কারণ।

পরশুরামের (রাজশেখর বসু) "গড্ডলিকা", "কজ্জলী", "হনুমানের স্বপ্ন" বিচিত্র রস-সরস। পৌরাণিকা ও আধুনিকা নারীকে তিনি অতি পরিচিতাদের মধ্য থেকেই নির্বাচন করেছেন, অথচ অতি পরিচয়ের ভারাক্রান্ত করেন নি। ওরা ঈষৎ আড়াল দিয়েই চলে গেছে, আমরা তাদের সাড়ীর আঁচলা, চাবীর শব্দ, চুড়ির রিনিঝিনি থেকেই তাদের অস্তিত্ব বুঝতে পেরেছি ; মায় "কচি সংসদ"-গল্পের গৃহিণীর সদ্য-কেনা হীরের ব্রোচের ঝিলিকটাও আমাদের চোখের মণিতে ঠিকরে পড়েছে। বুঁচকীর ঘাড় বেঁকিয়ে "য্যাঃ" বলা,—যার মানে "হ্যাঁ",—সে ব্যাখ্যা আমরাও মেনে নিয়েছি। "দেড়হাতি বাঁদীপোতার গামছা"পরা, "পাকা লঙ্কার মত ওষ্ঠাধরা", "ভুট্টার কচিদানার মত দন্তবিশিষ্টা", "জ্বলন্ত একটি হাউইয়ের কাঠি"র সহিত উপমেয়া "জোয়ান জিলটার"কে বিচিত্র সাড়ীপরা অবস্থায় আমরা আজকাল প্রায়ই পথে ও ঘরে দেখতে পাই ; তাই ঐ বিদেশিনী মেয়েটীকে খেতে শুতে উঠতে বসতে মনে না পড়ে উপায় নেই।

কল্‌কাতা সহরের রাজপথ-বিচারিণী আমাদেরই ঘরের কন্যা বধূদের নিরাবরণ মাথার চুলের সিঁথিতে সিঁদুর রেখা খুঁজে না

পেয়ে অধর এবং ওষ্ঠের প্রতি দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করি এবং স্বতঃই পরশুরামের কথা স্মরণে ভাসে, "মা, তোমার ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক!"

"বনফুলের" 'জঙ্গমের' "ভীমজাল" ছাড়িয়ে বহু উজ্জ্বল নারীচিত্র আমাদের চোখে ভাসে। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মতই সে সব সৃষ্টিও একান্ত স্বভাবগত এবং জীবন্ত। বেলা, বিনি, হাসি, উমা, সুরমা, হীনচরিত্রের উপর রঙ্গীণ ঢাকনা ঢাকা "মিষ্টি" ও "সোনা" সোহাগ গলান নামের "দিদি"রা, আর সব চেয়ে চিত্তাকর্ষণ করে অথচ একেবারেই ঘরোয়া মানুষটী সাহিত্য-সংসারে নবপ্রতিষ্ঠিত মূর্তি ভন্টুর বৌদিদি এবং তারও চেয়ে সেই অভাগিনী রহস্যময়ী পানওয়ালী। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থবর্ণিত সকল চরিত্রেই একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে, পৌনঃপৌনিক এক ঘেয়েমী,—যার জন্য অনেক মস্ত বড় লেখকের লেখাও বেশীক্ষণ সহ্য করা যায় না, সে জিনিসটা নেই। তাই "স্থাবর" বা "জঙ্গম" হলেও নেহাৎ অসহ্য হয় না। নারী চরিত্র সমালোচনার প্রবন্ধে অসঙ্গত না হলে একটী কথা এখানে বলি "জঙ্গম" শেষদিকে আর দেড়শো পাতার কমে কলেবর নিলেই ভাল করতো।

সজনীকান্ত দাসের হাতের চাবুকটাতেই তাঁর সাহিত্যসাধনার সাফল্য। তাঁর স্ব-নামে রচিত গল্প বেশী পড়িনি, পড়েছি কবিতা এবং সমালোচনা এবং তাঁর সাহিত্যজগতের দাম তাতেই। "বনফুলে"র সঙ্গে এখানে আমরা সকলেই হয়ত একমত,— "কুখ্যাতি করে যে যশ লভেছ, সুখ্যাতি করে হারাবে হে।" 'মাতৃজাতি'কে তিনি অবশ্য যথেষ্ট খাতির করেই চলেন, নেহাৎ

নিরুপায় না হ'লে চোখ ফিরিয়েই রাখেন, তবে "কমরেডের" ও "মায়ের" দাবী একসঙ্গে শোধ করা যায় না ; তাই বেত্রাঘাত না করেও ঈষৎ বক্রোক্তির কঠোরতর আঘাত কালে ভদ্রে কখন করে থাকেন, পাত্রবিশেষে সেটা কার্যকরীও হ'য়ে থাকে। এ দেশে আজও মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে সৌজন্যে বাধে, বহু সহস্র বৎসরের কুসংস্কারের ফল কি না !* খুব সময়োচিত বলে তাঁর অজস্র ব্যঙ্গ-কবিতার মধ্য থেকে নারী সম্পর্ক শূন্য হলেও একছত্র মাত্র উদ্ধৃত করছি ;—

"পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, লিজ লেণ্ডের চলে কারবার
দিবে আর নিবে, চেনাবে চিনিবে, যাবে না ফিরে।"

অপর একজন হাস্যরস সরস ঔপন্যাসিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আই হ্যাজ"-এর ইরানী ও ইমানী বোন দু'টি নীরবালা নৃপবালাদের মতই কৌমারব্রতের সংস্থারিকা। সবচেয়ে মর্ম স্পর্শ করে পরিণত-যৌবনা রায়গৃহিণীর একান্ত অভাবনীয়ভাবে সম্মুখীন সপত্নী-বিভীষিকা। তাঁর রচনায় নারী চরিত্র একটু ঝাপ্‌সা, পুরুষচিত্রই জ্বলজ্বলে।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের বহু রচনায় স্বদেশিনী ও বিদেশিনী অনেক নারীর পরিচয় পাওয়া যায় ; অত্যাধুনিক যাদের বলা হয় তাদেরও এবং বেশ একটু সেকেলে বলে যাদের পরিচয় আছে তাদেরও। মিষ্টি লেগেছিল "সত্যাসত্য"র উজ্জয়িনীকে, তার সমস্ত

* সম্প্রতি স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন বাংলা এই ভীরু কুসংস্কারের হাত ছাড়িয়ে সুসংস্কৃত হয়ে উঠেছে, এখন মাতৃত্বহীনা মাতৃজাতির উপর হাত নয়, লাঠী ও গুলি অবাধেই চলছে। ভরসা এই, মহম্মদ ঘোরীরা এখন গরুর পাল সামনে নিয়ে যুঝতে এলে হিন্দুস্থান পিছন ফিরবে না।

খেয়ালখুসী দোষগুণসমেত। তা'বলে পরবর্তিনী উজ্জয়িনীকে এ প্রশংসা দেওয়া যায় না। পাশের বাড়ীর সর্বসুখী সুশান্ত বউটি যে স্বামী শাশুড়ী নিয়ে প্রশান্ত জীবনকে উপভোগ করছিল, তার কথা মন থেকে মুছে যায়নি। আর বিদেশিনী ল্যাণ্ডলেডী মায়ের মত স্নেহশীলা, যে বর্ণবিদ্বেষে নারীত্ব হারায়নি সে-ও আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছে। নব্যা নারীদের উচ্ছল ও উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রগুলিকে অস্বাভাবিক বলি কি করে?—"যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং।"

দিলীপকুমার রায়ের কল্পিতাদের সঙ্গে সত্যকার রক্ত-মাংসের যে সকল নারী তাঁর লেখায় গ্রথিত হয়ে রইলেন, তাঁদের ছবিই যেন বেশী ফুটেছে। সেই অকালবর্ষার ঘনায়মান্ বাদল-নিশীথে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া কলকণ্ঠীকোকিলা "উমা" বা হাসি, তার মা, তাঁর দেশবিদেশের "দিদি"দের রূপ-মূর্তি আমাদের সঙ্গে পরিচয় জমিয়ে নিয়েছে। তাঁর ঔপন্যাসিক নারীরা অতি সাধারণ।

দুর্ভাগা ভারতের দুঃখময় যুগান্তের তরুণ অরুণের "তরুণের স্বপ্ন" শুধু তরুণেরই স্বপ্ন হয়ে নিশ্চয়ই থাকবে না; তরুণীদের তরুণ চিত্তকেও ভারতের অদ্বিতীয় তরুণ-বীরের জীমূত-মন্ত্রের আহ্বান দুঃস্বপ্নঘোর কাটিয়ে দিয়ে জীবন-আহবে ঝাঁপ দে'বার জন্য নিশ্চয়ই উদ্বুদ্ধ করে তুলবে,—তা' সুভাষচন্দ্রের "তরুণের স্বপ্ন।" তাঁর সে-স্বপ্ন তিনি সফল করে তুলে 'স্বাধীন ভারতে' নারীর যুগযুগান্তে হারিয়ে ফেলা স্থানকে পুনরুদ্ধার করে দিয়েও ছিলেন, সেটা নিছক 'স্বপ্ন'ই নয়;—আশ্চর্য সত্য!!!

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালী"র অপুর দিদি দুর্গা মেয়েটী আমাদের চোখের জলে স্নাত হয়েছে। অতিবৃদ্ধা

ইন্দির ঠাকুরাণীর চরিত্র থেকে আমরা শতাব্দীপূর্বের একটি বৃদ্ধাকে তার কতকগুলি স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে দেখতে পাই ; পরিণামটুকুও মর্মভেদী। চিরভাগ্যবিড়ম্বিতা সর্বজয়ার জন্য সহানুভূতিতে মন বেদনায় টনটন করে। "আরণ্যক" নূতনত্বে ভরপূর। "দৃষ্টিপ্রদীপে"র দৃষ্টিগুলিও অতি সুন্দর। এঁর সাহিত্যিক নারী সহজ বাস্তবতায় বাংলাসাহিত্যের গৌরবের বস্তু। "দেবযান" এবং তার "পুষ্প" মানুষকে দেবযানেই তুলে নেয়, তা' যতটুকুর জন্যই হোক !

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু উপন্যাসের বিভিন্ন নারী-চরিত্রের দীর্ঘ আলোচনা বর্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। কিন্তু এ কথা আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলার তথা-কথিত প্রগতি সাহিত্যের ধারা তারাশঙ্কর "বনফুল," বিভূতি মুখোপাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু প্রমুখ নবীন সাহিত্যিকেরা প্রবল বন্যার মুখে বাঁধ বেঁধে দিয়ে প্রায় বন্ধ করে এনেছেন। তারাশঙ্কর একজন সত্যকার শক্তিমান লেখক। ইতিমধ্যেই তিনি বঙ্গসাহিত্যকে অজস্র মূল্যবান অলঙ্কারে বিভূষিত করেছেন। "কালিন্দী" ও "ধাত্রীদেবতা"র মা, জ্যোতির্ময়ী পিসিমা, শৈলজা, রায়গৃহিণী, হেমাঙ্গিনী, সুনীতি, উমা, "গণদেবতা"র সন্তান ক্ষুধাতুরা কামার-বৌ পদ্ম, উচ্চ হৃদয়বতী চরিত্রহীনা চাঁড়ালের মেয়ে দুর্গা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের পৌত্রবধূ জয়া নারীমর্যাদায় ও বিশিষ্টতায় কে'ই বা তুচ্ছ ! "রাইকমল," "প্রতিমা," "অগ্রদানী," "পিতাপুত্র," "মন্বন্তর," "বিংশ শতাব্দী" প্রত্যেক বইখানিতেই বর্তমান বাংলা তার সমস্ত-সুখদুঃখ, শান্তি অশান্তি অভাব অভিযোগ সমেত যেন প্রতিকার-

প্রার্থী হয়ে বাঙ্গালীর সামনে মূর্তি পরিগ্রহ করে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের ভুলভ্রান্তি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র হলেও তা' থেকে কি না হ'তে পারে—উজ্জ্বল আলোকসম্পাতে তা সকলকার সামনেই সুস্পষ্ট-রূপে প্রকট হয়ে উঠেছে। আধুনিক বাংলার গলদ কোথায় এবং তা' দূর করবার প্রচেষ্টা কি, ইনি সেইটী প্রাণস্পর্শী চিত্রে অঙ্কিত করে সকলকার সামনে ধরে পথপ্রদর্শকের কাজও করেছেন। নিছক রসসৃষ্টিতেই সব কর্তব্য সমাধা করেন নি।

বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্পগুলি সুরুচিপূর্ণ বলে "নীতিপাঠ"* বা চাণক্যনীতি-জাতীয় এমন কথা কেউ বলবে না। সুখপাঠ্য হাস্যরসসিক্ত এবং সজীব। "ছোট্ট রাণুর" আদর-আব্দার আমাদের মনকে পরিষিক্ত করে রাখে। তাঁর উপন্যাস "নীলাঙ্গুরীয়" পড়ে আমরা সে তৃপ্তি পাইনি যা' তাঁর গল্পগুলিতে পেয়ে এসেছি। "মীরা" অনাবশ্যকে "শেষের কবিতা"র লাবণ্যর পথ গ্রহণ করলে এবং "নীলাঙ্গুরীয়" পাঠিয়ে দিয়ে দরিদ্র প্রেমিককে অপমানের উপর চরম অপমান করলে। ভাল বলতে পারি না এ পথকে।

শক্তিমান লেখকদের একটি বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। সুন্দর হলেও একই চরিত্রের পৌনঃপৌনিকতায় প্রথম সৃষ্টির মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়। নবনব চরিত্রসৃষ্টির গৌরব থেকেও লেখক বঞ্চিত হন। কলাবিদরা এ দিকে দৃষ্টি রাখলেই দৃষ্টিপ্রদীপের আলোয় নিজেরাই ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি দেখতে পাবেন।

---

* যেমন "না-পড়া পণ্ডিতরা" মধ্যে মধ্যে কোন কোন বড় বড় সাহিত্যিকের উচ্চতম শ্রেষ্ঠ রচনা সম্বন্ধেও ব্যঙ্গ টিপ্পনী করিতে দ্বিধা করেন না।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বহুসংখ্যক উপন্যাসে চিত্রিতা অনেক নারীচিত্রই আমাদের ভাল লেগেছে। ভালকে তো ভাল লাগেই, কিন্তু মন্দের মধ্যে যারা ভাল, তাদের ভাল দিকটাকে দেখিয়ে তাদের পরে মায়া জন্মে দেওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, ইনি সে বিষয়ে ভাষার সংযম দিয়ে নৈপুণ্যের সঙ্গে তবু কতকটা লক্ষ্য রেখেছেন। শরৎচন্দ্রের সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী, বিজলী, বৌদ্ধযুগের আম্রপালি, বসন্তসেনা, বাইবেলের মেরী ম্যাগডালেন এদের সমজাতীয়াদের আমরা নিশ্চয়ই মায়া করে থাকি, জগতের একজন মহাপুরুষই ত' এ বিষয়ে আমাদের উপদেশ দিয়েছেন,—"পাপকে ঘৃণা করবে, কিন্তু পাপীকে নয়।"

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের "শাশ্বত পিপাসা" হাসিকান্নার মলয়-শিশিরে সিক্ত ছবিটী বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সংসারের প্রস্ফুট চিত্র।

জলধর চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত নাটক "রীতিমত নাটক"-এর অধ্যাপকের আদর্শচরিত্রা শিক্ষিতা বোনটী অত্যাধুনিকতার অসংযম যা' মধ্যে মধ্যে সংসারেও দেখা যায় তাই-ই। পত্নীর চরিত্রটী সুসংযত ও সুসঙ্গত। নাট্যজগতে চরিত্রসৃষ্টিতে শান্তা-চরিত্র একান্ত একঘেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে ;—অবশ্য সমাজেও ;—এবং তার কারণও যথেষ্ট রয়েছে, প্রতিবিধান নিরপেক্ষ !

প্রবোধকুমার সান্যালের পরবর্তী রচনায় যুগোচিত ভাব ও ভাষার সংযম লক্ষণীয়।...'বৌদি' চরিত্রটী বঙ্গসাহিত্যে নূতন দান। দেশের কাজে যে সব বাস্তবনারীরা যোগ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও খাঁটি সোনা ও মেকি আধলা দু'একটা মিশে মিলে আছে। বৃহৎকাণ্ডে এ রকম হয়েই থাকে, তার মধ্য থেকে

যতটুকু কাজ চলে যায় ততটুকুই লাভ। দুর্ভিক্ষের ভিখারী ভিক্ষা পাওয়া ধনকে বাজিয়ে নিতে ভরসা পায় না।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পুতুল নাচের ইতিকথা"য় নারী-চরিত্রে বৈশিষ্ট্য আছে। ভালয় মন্দয় তারা সাধারণদৃষ্টাদের মতই, কেহ কেহ অদৃষ্টপূর্বা।

প্রমথনাথ বিশির "জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার"-এর নারীচিত্রে করুণা আকর্ষণ করে।

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের একটী ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসের নায়িকা "মন্ত্রশক্তি"র বাণীর অতি বিকৃত কঙ্কালমূর্তি! নারী'র মধ্যে ;—"নার্যা পিশাচ্যা" নেই, তা' কে বলতে পারে, তবে যিনি আদর্শপুরুষ তিনি তেমন নারীর পিছনে পোষা বিড়ালের মত ঘুরতে যান না। যারা যায়, তা'রা নর নয়, বা-নর।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস "উপনিবেশ" বাংলায় নূতন ধরণের হ'লেও বর্ণিত নারীচরিত্রে বলবার মত বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। নানা জাতির ও নানা শ্রেণীর পুরুষচরিত্রের বৈশিষ্ট্যই কৌতূহলপ্রদ।

বিধায়ক ভট্টাচার্য নাট্যজগতে, বিশেষতঃ ছাত্রমহলে, পরিচয়-স্থাপন করেছেন। ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে স্বল্পাবসর অভিনয়ের দিনে সত্যকার নাট্যকলার স্থান কোথায়? এ-কথা আধুনিক অন্যান্য নাট্যকারগণের রচনা সম্বন্ধে সমভাবেই প্রযোজ্য।

জ্যোতির্ময় রায়ের "উদয়ের পথে"র দু'টি নারীচরিত্র দুই আদর্শের, কিন্তু দেখা গেল যে বাইরের খোলসটাই মানুষের আসল মূর্তি নয়, পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা সেটা বিচিত্রিত হয়, ভিতরের বস্তু একই।

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের রচনায় মৌলিকতা আছে; বিংশ-শতাব্দীর নারীকে নিরপেক্ষভাবেই দেখাবার চেষ্টা করেছেন তাঁর "পথ ও পাথেয়" উপন্যাসে, উপন্যাসকারগণ এখন উপন্যাসের অযথা কলেবর বৃদ্ধির জন্য কি প্রতিযোগিতায় নেমেছেন?

বাংলাসাহিত্যে সৃষ্টি করা নারীচরিত্র নিয়ে যদি আলোচনা করা যায় তবে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের চেয়েও বড় এক গ্রন্থ হয়ে উঠে। যে দেশে হাতে হাতিয়ারে কিছু করবার নেই,* সে দেশে হাতে কলমে কল্পনাবিলাস না করে লোকে করে কি? সব লেখক লেখিকার নাম দেওয়া সম্ভব নয়; তাঁদের সৃষ্টির আদ্যন্ত পরিচয় দেওয়া আরও কঠিন। অনেক নূতন লেখক ও লেখিকা উদীয়মান হচ্ছেন। তাঁদের রচনা পদ্ধতিতে বৈদেশিক-আধুনিকতা থাকলেও† একটা নূতনতর রূপও দেখা দিয়েছে। রুচিপ্রবৃত্তির মধ্যেও রকমফের যথেষ্ট হয়েছে। এক একজন সাহসিকতার সহিত সংমিশ্রিত শক্তির পরিচয় অল্পদিন মধ্যেই দিতে পেরেছেন। মনোজ বসু তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর 'সৈনিক' বইখানি ১৯৪১ হইতে ১৯৪৪ অব্দের অতি পরিচিত ঘটনাবলীর একটি মনোজ্ঞ ছায়াছবি;—যা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলুম ও করছি, যার বিভীষিকা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমরা তাঁর 'পান্নালালে'র মতই পালিয়ে বেড়াবার এবং দ্বারিকের মত পাগল হ'বার জোগাড় হয়েছি অথচ যা থেকে চোখ বা মন ফিরিয়ে নেওয়া

* সুদীর্ঘ চারি বৎসরাধিক কালের মধ্যে সে দেশের অসম্ভাবিত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে, আজ হাতে হাতিয়ারের অভাব নেই, আর যত যা নাই থাক্!

† সমাজেও তাই।

অন্যায় বলেও বিবেকের কাছে লাঞ্ছিত হ'চ্ছি,—সেই তাকেই তিনি এইখানে অমর করে রেখেছেন। "উমা", "সুপ্রিয়া", "যামিনী" এ-যুগের মেয়ে এবং সত্যই তারা যুগোচিত। অসহায় পুরুষের পাশে ততোধিক অসহায়া নারী, কতটুকু তাদের শক্তি, তথাপি তারা অনেকেই যথাসাধ্য করতে চেষ্টা করেছিল; ঘরের কোণের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বিপদের অংশ নিতে, দেশের কাজ করতে যেমন একদিন মেয়েরা সত্যাগ্রহ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তার চেয়েও নৃশংস এই মারণযজ্ঞের উৎসর্গিত বলিদের জন্য সুখবিলাস ছেড়ে "সুপ্রিয়া"-দের কেউ কেউ বাহিরে বেরিয়ে এসেছিলেন। এই ধরণের নারীচিত্র আমরা আরও কোন কোন নূতন লেখকের লেখায় দেখেছি। বিপদের সম্ভাবনায় ভীত না হয়ে বাস্তব নারীদের মধ্যে কেহ কেহ যেমন দেশপ্রেমিক নেতাকে আশ্রয় দিতে পশ্চাৎপদ হননি, এঁরা তাঁদেরই চিত্র আঁকবার সুযোগ পেয়েছেন এবং তা গ্রহণ করেছেন। অতীত যুগের সাবিত্রীর মত যমভয় বিমুক্তচিত্তা কত মহীয়সী নারীও এই স্বার্থভরা হিংসাদ্বেষজর্জরিত বর্ত্তমান যুগেও সৃষ্ট হচ্ছেন, তা' কি বিধাতার হাতে, কিং মানুষের কলমের ডগায়। মহৎ আদর্শের একটা মস্ত বড় দোষ বা গুণ এই যে,—সে কালজয়ী কোন দিনই তার বিনাশ নেই, মারতে চাইলেও সে মরে না!

এতক্ষণ পুরুষের রচনায় নারীচরিত্রের কথাই বলা হয়েছে। আবহমান কাল থেকে অসংখ্য নর লেখক নারীচিত্রকে কোন চোখে দেখে কি ভাবে তাদের চিত্রণ করেছেন, সেই বিষয়ে দৃষ্টি-পাত করতে গিয়ে আমরা দেখতে পেলুম, তাঁরা অত্যন্ত শুচিশুদ্ধ চিত্তে একান্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতেই তাঁদের দেখেছেন এবং অত্যন্ত

সাবধানতাগুপ্ত চারু তূলিকাপাতে সেই মাতৃমূর্তি, কন্যা-প্রতিমা এবং প্রিয়ারূপ অঙ্কিত করেছেন। যাকে যেমন মান ও সম্মান দেওয়া উচিত তার কোন ত্রুটিই তাঁরা করেননি এবং তাঁদের চিত্রফলকে এঁদের কোনভাবই অপ্রতিবিম্বিত থাকতে পায়নি। বিদ্যা এবং অবিদ্যা নারীর শাস্ত্রীয় দু'টি রূপই তাঁদের চিত্তস্পর্শ করেছিল এবং অশুচিচিত্তা অনভিপ্রেত নারীকেও সত্যের খাতিরে তাঁদের সৃষ্টির বহির্ভূতা রাখা সম্ভব হয়নি। এর জন্য তাঁদের দায়ী কর্বার কিছুই নেই ; কারণ সংসারে ভালমন্দ দুইই আছে, কেবল ভাল বা নিছক মন্দ নিয়ে সংসারচিত্র আঁকা যায় না তবে কথা এই, পাপের পঙ্কিল নগ্ন রূপকে দেখাতে গেলে সুদক্ষ শিল্পীর সাবধান হস্তের প্রয়োজন।

অতঃপর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নারী তাঁদের নিজ প্রতিবিম্বকে কোন্ রূপে দেখতে সমর্থ হয়েছেন তারই একটি ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত পরিচয়-রেখা আমরা টেনে দিচ্ছি। নারীর রচনায় এ পর্যন্ত কোন নারীচরিত্র নর রচিত নারী চরিত্রকে পরাভব করে বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করতে পেরেছে বলে মনে হয় না, পারাও অবশ্য কঠিন! তাঁরা যাদের ভালয় মন্দয় সৃষ্টি করেছেন, (পৃথিবীর সাহিত্য ঘেঁটেও) হয়ত তার বাইরে নূতন সৃষ্টির পথ পড়ে নেই। ইদানীং যদি বা কোন নূতন ভাব দেখা যায়, অনুসন্ধিৎসু চিনতে পারবেন বৈদেশিক কোন পুরুষ লেখকেরই তা' অনুকৃতি। অবশ্য পুরাকালের কাছে নবীনকালকে চির-কালই ধারে মাল কিনতে হবে ; তা' কি নর আর কি নারী।

নারীর সাহিত্যসৃষ্টির কথা বলতে গেলে প্রথমতঃ শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম করা প্রয়োজন। 'দীপনির্বাণ', "ছিন্ন-

মুকুল", "মিবাররাজ", "বিদ্রোহ", "হুগলীর ইমাম বাড়ী", "কাহাকে" প্রভৃতি তাঁর বহু উপন্যাসে নারীচরিত্রে নূতনত্ব খুব বেশী নেই। "ইমামবাড়ী"র "মুন্না" এবং "বিদ্রোহ"-এর "সেবন্তী" তথাপি বেশ জীবন্ত। তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "স্নেহলতা"; যদি বলা যায় যে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে ঐ নারীরচিত উপন্যাসটীই সত্যকার ঘরোয়া চিত্রের নূতন একটা ধারা দেখিয়েছে তবে খুব অন্যায় দাবী করা হয় না। "স্নেহলতা"র পূর্ববর্ত্তী উপন্যাস-সাহিত্য প্রায়শঃই ঐতিহাসিক ভিত্তিতে অথবা বিশিষ্ট ধনী পরিবারের আকস্মিক বিশিষ্ট ঘটনাসম্পাতের মধ্যবর্ত্তী হয়ে জাত হয়েছিল। ঘরকরণার খুঁটিনাটির ব্যাপারও অপূর্ব সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির বাইরেও হিন্দু গৃহস্থঘরের মানুষদের নিয়ে যে রীতিমত রোমান্সের সৃষ্টি করা চলে এ-দৃষ্টান্ত* "স্নেহলতা"ই সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্য-সেবীদের জানিয়েছে। অবশ্য বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করতে বসে কেউ এ সত্য এ পর্যন্ত স্বীকার করেননি। মেয়েদের সম্বন্ধে একটা নির্বিকারচিত্ততা এবং অজ্ঞতার ভান পূর্বাপরই দেখা যায়,† অবশ্য প্রথমকার দিকে উচ্ছ্বাসবাহুল্য একটু যে না ছিল, তা' নয়।

* আলালের ঘরের দুলাল ও স্বর্ণলতায় একটু পুরনো দিনের মানুষদের দেখা পাই কিন্তু ওদুটীকে ঠিক রোমান্স বলা যায় না।

† ৺ললিতকুমার প্রভৃতি কয়েকজন নিরপেক্ষ সমালোচক ভিন্ন, বিশেষ করে আধুনিকরা ত তাঁদের সাহিত্য জগৎ থেকে নির্ব্বাসিতই করতে চান, এর কারণ কি পুরুষ সাধারণের স্বাভাবিক রক্ষণশীলতার অবচেতন মনের ছায়া হতে উৎপন্ন? দশের মধ্যে নারী সম্পর্কে আলোচনায় লজ্জিত করে? অথবা চিরন্তন পৌরুষ তাদের কাছে কোন ঋণ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়?

স্বর্ণকুমারী দেবীর বহু গল্প উপন্যাসের নায়িকাদের মধ্যে খুব বেশী বৈশিষ্ট্য না থাকলেও "স্নেহলতা"র 'গৃহিণী', 'টগর', "জীবনের মা" এবং রেখাচিত্র "ছোট বউ" এতেও একটি একটি জীবন্তমূর্তি প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাঁর "কাহাকে" বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম ইঙ্গবঙ্গসমাজ নিয়ে গল্প ও উপন্যাস রচনার পথ খুলে দেয়। আজ অবশ্য সে-পথে যাত্রীর অভাব নেই, কিন্তু পথ-প্রদর্শনের সম্মাননা যথাস্থানে দিতে কুণ্ঠিত হওয়া অসঙ্গত।

স্বর্ণকুমারী দেবীর কবিতা গাথা "খড়্গপরিণয়ের" "অলকা"র প্রাপ্ত পত্রখানি তখনকার বাংলাসাহিত্যে কাব্যলিপিকার প্রবর্তক বলা চলে; তার বহু অনুলিপি হয়েছিল। একটু নমুনা দিচ্ছি;—

—"গত নিশি স্বপনে, মরমের বিজনে,
মরি কি তোমার রূপ হেরেছিনু অলকে,
সেই ছটা মহিমা, সেই প্রেম প্রতিমা,
দেখিতে দেখিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল পলকে।
যেন হেসে হেসে লো, প্রেমময়ী বেশে লো,
সোহাগে আগুলি তুমি পথে এসে দাঁড়ালে।
কিবা ধীর তাকানি, লাজমাখা মু'খানি,
ঈষৎ পড়েছে বাঁধা অলকেরই আড়ালে।"—ইত্যাদি

স্বর্ণকুমারী দেবীর পর অর্থাৎ সমসময়ে কয়েকজন লেখিকার লেখা বই ছাপা হয়েছিল। "সিন্ধুবালা" বা "সন্তাপিনী"তে একটু নূতন ধাঁচের চরিত্রসৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল। "বিজনবাসিনী" প্রভৃতিতে খুব সাধারণ নারীরই দেখা পেয়েছি।

কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী এঁরা স্রষ্টা নারী, এঁদের লেখায় সৃষ্টা নারী বেশী নেই, যাঁরা আছেন, তাঁরা

পৌরাণিকা। নারীচিত্তের কল্যাণ নির্ঝর ঐ তিনটী ধারাতেই সমাজে সংসারে ঢেলে দিতে কার্পণ্য হয় নি। তাঁদের রচনায় বহু নারীচিত্র সুখদুঃখে শোকে সান্ত্বনায় যুঁই বেল, বকুল চম্পক চামেলীর মতই ফুটে উঠেছে। এঁদের মধ্যে মানকুমারীর রচনায় বাস্তব নারীর দেখা পাই।

(রাণী) মৃণালিনীর "কল্লোলিনী", "নির্ঝরিণী" প্রভৃতিতে তাঁর আত্মগত কয়েকটী কবিতা তদানীন্তনকালে লোকপ্রিয় হয়েছিল।

কিছুদিন বাংলাসাহিত্যে নারীরচিত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বই দেখা দেয়নি। তবে ছোট গল্প বা কবিতা লেখা বন্ধও ছিল না, তা' অনায়াসে বলা চলে। আবার ১৯০২-০৩ খৃষ্টাব্দ থেকে যেন একটু হঠাৎ করেই তাঁদের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব ঘটলো। অবশ্য জগতে হঠাৎ কিছু সত্যকার ঘটে না, যা' ঘটে তার আরম্ভ অনেক আগে থেকেই হয়, যবনিকার অন্তরালে গোপনসৃষ্টি লোকচক্ষের অজ্ঞাতে চল্‌তে থাকে, তারপর সহসা একদিন সর্ব-সমক্ষে প্রকট হয়ে পড়ে। অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা, নির্ঝরিণী ঘোষ, আমোদিনী ঘোষ, নিস্তারিণী দেবী, তরুলতা দত্ত প্রভৃতি লেখিকাগণ লেখনী পরিচালনা করছিলেন, কিন্তু বিশেষ এমন কোন চরিত্রসৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। "ভারতী"—মাসিকপত্রকে বাহন করে এই সময় কয়েকজন শক্তিশালিনী লেখিকা দেখা দিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমদিকে সকলেই ছোট গল্প লেখিকা ছিলেন; কেহ বা স্বনামে কেহ বা বেনামীতে ইতঃস্তত লেখা ছাপাতেন।

১৯০৯-১১ খৃষ্টাব্দের "ভারতী"তে ধারাবাহিকভাবে বাহির হ'বার পর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে অনুরূপা দেবীর "পোষ্যপুত্র" উপন্যাস

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার "শান্তি" এবং "শিবানী" নিজ নিজ অংশাভিনয়ে যে কৃতকার্য্য হতে পেরেছিল, সে-যুগের সাহিত্যসমালোচনায় তার বহুতর প্রমাণ পাওয়া যায়। "সিদ্ধেশ্বরী" ঐ চরিত্রের নারীদের একটি সাহিত্যিক জ্বলন্ত উদাহরণ, যা' বাংলার পল্লীতে বিরাজমানা থেকে সংসার ও সংসারীকে আজও অতিষ্ঠ করে তুলছে।

"বাগ্‌দত্তা" উপন্যাসের কমলা, গৌরী, বড়বৌ, বিন্ধ্যবাসিনী আমাদেরই ঘরকন্নার একেবারে ভিতরকার লোক। জানা ও চেনা। তবে 'কমলা'র জীবনের বিয়োগান্ত ব্যাপারের মধ্যকার গভীর সমস্যাটাই শেষ পর্যন্ত পাঠককে চিন্তিত রাখে যা হোক একটা সমাধানের প্রত্যাশায়; যেহেতু সেটা ইহলোকের চেয়ে পরলোকেরই মুখাপেক্ষী।

"জ্যোতিহারা"র অণিমা ঠিক যেন আমাদের ঘরোয়া মেয়ে নয়। তাই পাঠকের সহানুভূতি স্নিগ্ধ শান্ত আত্ম বিসর্জনকারিণী শারদজ্যোৎস্নার মত "জ্যোৎস্না"র প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হয়েছে। নাস্তিকতা নিশ্চয়ই আমরা পছন্দ করি না, তা'য় আবার কোন মেয়ের মধ্যে দিয়ে! তবে জগতে যত মত, তত পথ। "সুপ্রভাত" মাসিক পত্রিকায় উপন্যাসটী প্রকাশকালে এই চরিত্রটী সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বড় ভাল লেগেছিল, সে কথা তিনি লেখিকাকে নিজে বলেছিলেন। কোন অসাধারণ দার্শনিক পণ্ডিত প্রবরেরও* ঐ শান্তিহীনা মেয়েটীর প্রতি উপন্যাস বর্ণিত "দাদা মশাই"য়ের মত কৃপাদৃষ্টি পড়েছিল বলে জানা আছে।

---

* যিনি ঐ উপন্যাসে চিত্রিত "দাদা মহাশয়ের" সত্যরূপ।

একজন সাহিত্য সমালোচকের বিচারে "ব্রজরাণী" "মা" উপন্যাসে দ্বিতীয় চরিত্র হলেও তা'র প্রধানতম রূপচিত্র। বর্ত্তমান যুগেও দুর্ভাগ্যক্রমে সে "সতীনে পড়া মেয়ে"। ব্রজরাণী কোথায়ও দেবী নয়। তার সমস্ত মেয়েলি দোষের সঙ্গে ব্যর্থ-মাতৃত্বের অতৃপ্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষায় কেমন করে সে সপত্নীপুত্রের প্রতি ক্রমশঃ বাৎসল্যরসে ভিজে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিতা হ'ল, সেইটিই বিশেষ করে এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হয়েছে। এই চিত্রে বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার হয়ত যৎসামান্য ভেজাল থাকতে পারে, কিন্তু যদি থাকে,—তা' অতীব মৃদু মাত্রায়! মা হ'বার আগ্রহ বা মাতৃত্বের ক্ষুধা নারীকে কত উচ্চে নিয়ে যেতে পারে, ব্রজরাণী চরিত্রে তা' সুপ্রকট। বহুনারীর মধ্যে সপত্নী পুত্রের প্রতি নিজ গর্ভজাত পুত্রবৎ স্নেহ আমরা লক্ষ্য করেছি, আবার সপত্নী সন্তান-বিদ্বেষও বড় কম দেখিনি। 'মনোরমা' বাস্তবিকই ভারতের চিরন্তন আদর্শ নারী সীতা সাবিত্রীরই সম জাতীয়া, এ যুগের পক্ষে হয়ত একটুখানি বেশী ভাল! ব্রজরাণী ছাড়া স্পষ্টভাষিনী "শরৎশশী"কে সবাই পছন্দ করে, ব্রজরাণীও তাকে হারিয়ে তার গুণ পরে বুঝেছিল। যুগের হাওয়া অতিক্রম করেও যে আদর্শ বেঁচে থাকে, এ তারই প্রমাণ।

"মন্ত্রশক্তি"র বিদ্রোহিনী "বাণী" একই সঙ্গে পাঠকের ক্রোধ উদ্রেক এবং সহানুভূতি আকর্ষণ করে; ভ্রান্ত আদর্শ ও তীব্র আভিজাত্যবোধ তাকে তার নারীধর্ম থেকে বিচ্যুত করেছিল, কিন্তু সে ভিতর থেকে খাঁটি জিনিস ছিল বলেই নিজধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিতা হ'তে তার আটকায়নি। অবশ্য বড় দুঃখের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করবার পর এই মন্ত্রশক্তির পূর্ণ প্রভাব প্রকট হয়েছিল।

একজন সাহিত্যিকের মতে "মহানিশা"র ধীরার ত্যাগমহিমায় মাথানত হয়, কিন্তু পতিতপাবনীর ভাষায় বল্‌তে 'কৌসুলি মেয়ে' অপর্ণা পাঠক পাঠিকার হৃদয় হরণ করে বেশী; তার মাছের মুড়োর ঝোল এবং চাল্‌তার গুড় অম্বল রসনায় জল আনে, দুর্মুখ দাদামহাশয়ের মুখ ততোধিক মুখরতায় বন্ধ করে দেওয়ায় মন সায় দেয় এবং যখন বিপদের বন্ধু বৃদ্ধ বিহারীকে সে নিজেকে সমর্পণ করে কথঞ্চিৎ মাতৃঋণ শোধ করবার জন্য বিশ্বাসঘাতক প্রিয়তম নির্মলকে তীব্র ভৎর্সনা করে ফিরিয়ে দেয়, তখন হৃদয় তাকে গভীর শ্রদ্ধায় ধন্য ধন্য বলে ওঠে।"

"পথহারা" এবং "চক্র" উপন্যাসের পূর্বে দেশের তদানীন্তন রাজনীতিকে উপন্যাস সাহিত্যের বিষয়বস্তু বোধ হয় কেহই করেন নি, অথবা অতটা খোলাখুলিভাবে করতে ভরসা করেননি, আজ মৃত বাঘকে পদাঘাত করবার সাহসকে অন্ততঃ দুঃসাহস বলা চলে না। "বিবর্তনে"র পল্লীসংস্কার চিত্র আজ বাংলা সাহিত্যে প্রচুরতরভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে।

বহু সমালোচকের মতে বঙ্কিমযুগের পর উপন্যাসসাহিত্যে যখন ভাঁটা পড়ে গেল, যখন একমাত্র সব্যসাচী রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য সাহিত্যিকেরা বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ এবং ছোট গল্প লেখা নিয়েই বিভোর ছিলেন, ঠিক সেই যুগে (১৯০৯-১০) "প্রবাসী"তে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "নবীন সন্ন্যাসী" এবং "ভারতী"তে অনুরূপা দেবীর "পোষ্যপুত্র" আত্মপ্রকাশ করে বাংলাসাহিত্যকে উপন্যাসের জোয়ারে প্লাবিত হ'তে সুযোগ দিয়েছিল। সেই সঙ্গেই আমোদিনী ঘোষ, নিরুপমা দেবী,

ইন্দিরা দেবী, শৈলবালা ঘোষ, হেমনলিনী দেবীদেরও আবির্ভাব হয়।*

অনুরূপা দেবীর গল্প, উপন্যাস, নাটক, নাটিকা, বহুতর—প্রবন্ধ মিলে সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়; কাজেই আমরা 'রামগড়ে'র ক্ষমাপারমিতা-সাধনাসিদ্ধা, লিচ্ছবিরাজকন্যা "সুসঙ্গতা", দেশের জন্য আত্মদানকারিণী মহীয়সী "শুক্লা" এবং "উত্তরায়ণে"র প্রেমাস্পদের সাংসারিক শান্তিরক্ষার্থে আত্মোৎসর্গকারিণী "আরতি"র ও বিশিষ্ট চরিত্র স্বর্ণলতার নামমাত্র করেই নিশ্চিন্ত হলেম। "বিদ্যারণ্যে"র অলোকা, "কুমারিল ভট্টে"র সত্যকামা, সুজাতা, ইন্দিরা এবং "বিজয়িনী"র রেবা চরিত্রও খুব অনুল্লেখ-যোগ্য নয়।

নিরুপমা দেবীর "অন্নপূর্ণার মন্দির"-এর ধনীকন্যা ও জমি-দারপত্নী দুঃখিনী কমলা, আত্মঘাতিনী 'সতী'-চিত্র পাঠককে মর্মপীড়িত করে; "জাহ্নবী দেবী"র জাহ্নবীর মত অসীম ধৈর্যে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিতে বুক যেন ভরে উঠতে থাকে, মনে পড়তে থাকে এই চিত্রই সমস্ত বাংলার স্ত্রীর ও মায়েদের সত্যকার রূপ। ভাগ্যে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে সাবিত্রীর বিয়েতে এই করুণ রসচিত্র সমাপ্ত হ'ল, তাই পাঠকেরা শেষ পর্য্যন্ত অশ্রু

---

* বঙ্গসাহিত্যের কোন ইতিহাস লেখক শ্রীমতী অনুরূপা দেবীকে 'শরৎ-গ্রুপের লেখক' বলে অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁর পুস্তকে প্রচার করেছেন, এটা তাঁর কষ্ট কল্পনা। অনুরূপা দেবীর পোষ্যপুত্রই এঁদের উপন্যাস সাহিত্যে নামার পথ দেখিয়েছে বলাই বরং সঙ্গত! "ভারতী ও ভারতবর্ষেই" তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ওঁদের হাতে-লেখা পত্রিকায় অনুরূপা দেবী কখন একটা কালির আঁচড়ও কাটেননি॥

মুছে একটুখানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। অসহিষ্ণু জ্যেঠাইমাটী তাঁর ছোট জায়ের বিপরীত রূপ অথচ খুব অপরিচিতা নন।

"দিদি" উপন্যাসের সুরমা বাংলাসাহিত্যের একটি স্থায়ী চিত্র। দীপ্তিস্মতী দিদির পাশে একান্ত নির্ভরপ্রত্যাশী সরলা "চারু" মেয়েটী যেন সূর্যের পাশে চাঁদের মত,—তেমনই স্নিগ্ধ তেমই করুণ এবং এই দুটী চিত্রই বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনবদ্য দান। এ-চিত্রের বহু অনুলিপি আজ বাংলা সাহিত্যের বহু গল্প উপন্যাসে দেখা যায়।

বোবামেয়ে "শ্যামলী" বঙ্গসাহিত্যে নূতন সৃষ্টা। "দেবত্র", "বন্ধু", "বিধিলিপি", "পরের ছেলে", "উচ্ছৃঙ্খল" "অনুকর্ষ" প্রভৃতিতে বহু বিচিত্র নারীচিত্র দেখা যায়। তার মধ্যে বিধিলিপি'র অনন্যপূর্বা কাত্যায়নী, সুন্দর ও নূতন সৃষ্টি। "অনুকর্ষে"র অস্থিতচিত্তা ললিতা একটী নব্যমেয়েদের প্রতীক, তার কাকীমাটী নারীত্বে মণ্ডিত।

ইন্দিরা দেবীর "স্পর্শমণি"র উমা চরিত্র বঙ্গসাহিত্যে নূতন না হ'লেও তার নিজস্ব স্বভাবে একান্ত অভিনব অথচ মোটেই অবাস্তব বা অসঙ্গত নয়। উমার মত উচ্চাদর্শের কত সতী-তেজোদ্দীপ্তা অথচ স্নিগ্ধ স্বভাবা পুণ্যবতী কত উচ্ছৃঙ্খল সংসার ও সংসারীকে নবজন্ম দান করছে সে কি আমরা ইতস্ততঃ দেখতেই পাচ্ছি না? এরাই ত' বঙ্গলক্ষ্মী! "কল্যাণী" ছিন্নতন্ত্রী, সুরভরা বীণার মত অকরুণ ভাগ্যবিধাতার নির্দয় ক্রীড়নক হ'লেও নিঃস্বার্থ নীরব প্রেমের এমন একটী স্বর্গীয় ছবি যে সহানুভূতি স্বতঃই মনে জাগে।

প্রত্যাবর্তনের চঞ্চলা হিমানী মেয়েটী এবং নির্মাল্যর দু'একটী যুঁই চামেলী সিউলির মতনই ছোট্টর মধ্যে সুরভি ভরা মেয়ে দেখা গেছে।

আমোদিনী ঘোষজায়ার "ডায়েরীর দৌত্য" "চিত্রাঙ্গদা" প্রভৃতিতে যে-সব নারীচরিত্র পাই, অনেকেই বর্তমানের পরিচিতা নব্যভাবাপন্না, নারী না বলে তাঁদের মহিলা বলাই সঙ্গত।

শৈলবালা ঘোষজায়ার "সেখ আন্দু', "মিষ্টি সরবৎ", "ইমানদার", "আড়াইচাল", "নমিতা", "মঙ্গলমঠ" প্রভৃতিতে পুরুষচরিত্রের বৈশিষ্ট্য দেখি, নারীচরিত্র অসম্পূর্ণ, বহুস্থলে অসংযত এবং অসঙ্গতি দোষদুষ্ট। "বিপত্তি" এবং "নমিতা"য় নারীকে এ দেশের মেয়ে বলে বেশ চেনা যায়।

শান্তা এবং সীতা দেবীর সম্মিলিত উপন্যাস, "উদ্যানলতা" সাহিত্যে নূতনচরিত্রের আমদানী করে, লেখিকারা সে দিনের পাঠকসমাজের চিত্তকে চমকে দিয়েছিলেন। নায়িকা চপলা চঞ্চলা মেয়ে "মুক্তি"কে আমরা নিজেদের ছোটবেলায় যেন নিজেদের মধ্যেই দেখেছি, এমনই পরিচিতা লেগেছিল তাকে। পরে পরে অনেক গল্প ও উপন্যাস তাঁরা লিখেছেন, আধুনিক স্কুল কলেজের মেয়েদের জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি নিয়ে ছবিগুলি অতি সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে, যদিও নায়িকা-চরিত্র মধ্যে কতকটা একঘেয়েমী এসে গিয়েছে। অন্যান্য নারী-চরিত্র কয়েকটী অতি সুন্দর এবং তাদের মধ্যে বৈচিত্র্যেরও কোন অভাব হয় নি। ত্যাগপূত পুণ্য চরিত্রের সঙ্গেও আমরা পরিচিত হতে পেরেছি অতি সাধারণদের আশে পাশে।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর বিরাট সাহিত্যের সব কথা বলা সম্ভব নয়। তবু "পথের শেষে", "দূরের আশায়" প্রভৃতির নায়িকাদের মধ্যে অনেক উচ্চাদর্শের ও আদর্শ লক্ষ্মী স্বরূপিনী বঙ্গবালা এবং বঙ্গবধূ আমাদের মুগ্ধ করেছেন। দেবী, সীতা, বীথি প্রভৃতি আমাদের মনের ভিতর একটা স্থান করে নিয়েছে যা' চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। তাঁর "মাটির দেবতা"য় তরলমতি ও নীতিজ্ঞানকে কুসংস্কারবোধে বিসর্জন করা আধুনিক কতকগুলি নারীচরিত্রের ফটোগ্রাফ দেখে এদের সঙ্গে তুলনা করে স্বতঃই কণ্ঠাগ্রে আসে ;—

কি ছিলে, কি হলে, কি হতে চলিলে,
অবিবেক বশে কিছু না বুঝিলে!

কাঞ্চনমালা দেবী রচিত নারীচিত্রে বৈশিষ্ট্য খুব বেশী কিছু আছে বলে মনে হয়নি।

গিরিবালা বসুর কতকগুলি উপন্যাস আছে, নারীচরিত্রে নূতন কিছু পাওয়া গেছে বলে মনে হয় না, তথাপি রচনা সরস ও ভাষা মার্জিত বলে পড়তে ভালই লাগে।

সরসীবালা বসু বহু উপন্যাসের লেখিকা। নূতন কিছু বলতে বা দিতে পেরেছেন কি না সন্দেহ! অবশ্য জগতে কিছুই ব্যর্থ হয় না। চারুবালা দেবীর "সতুর মা" প্রভৃতি কয়েকখানি বইয়ে বঙ্গনারীর মর্মকথা, বিশেষ কিছু নূতনত্ব না থাকলেও পড়তে লাগে ভালই।

মায়ালতা বসু তাঁর 'ত্রিধারা'য় তিনটী বিভিন্ন নারীচরিত্রের সমাবেশ করে বেশ একটু জটিলতার সৃষ্টি করেছেন, তিনটী চরিত্রই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে বিভিন্ন।

অমলা দেবীর (কল্পিত নাম কি না জানি না) প্রত্যেক নর এবং প্রত্যেক নারী বর্তমানের জীবন্ত লোক,—যাদের নিয়ে আমরা ঘর করছি, অথচ অতি পরিচয়ের জন্য যাদের কথা লিখতে মনেই পড়ে না। নরনারীর যুগপৎ চরিত্রগুলি যেন শুধু চোখে নয়, মাইক্রোস্কোপের সামনে বীজাণুর মত বৃহত্তর হয়ে ওঠে।

অপরাজিতা দেবীর অসমাপ্ত উপন্যাস "বঙ্গরমণী"র এবং "বিজয়ী"র জন্য আমরা প্রত্যাশিত হয়ে পথ চেয়েছিলাম, কিন্তু আজও আমাদের সে প্রতীক্ষা পূর্ণ হয়নি। এ দুটী উপন্যাসের বধূরা 'রুক্মিণী', 'সুদেষ্ণা'. 'কৈকেয়ী চৌধুরাণী'দের চরিত্রগুলি অতি নিপুণ হস্তেই অঙ্কিত হয়েছে। আবার সুদূর বঙ্গপল্লীর মর্মরূপও চাপা নেই। "বুকের বীণা", "আঙ্গিনার ফুল" ইত্যাদির লেখিকা অপরাজিতা দেবীর বিংশ মধ্যযুগীয় অত্যাধুনিক এবং নারীর স্বভাবজ সলজ্জভাব বহির্ভূত প্রগল্‌ভ ভাবের নারী-চরিত্র অর্থাৎ নারীর "আত্ম-প্রচার" অনেকেই পুরুষ রচিত বলে সন্দেহ করে থাকেন! রচনায় শক্তির প্রাচুর্য্য ও নূতনত্ব যথেষ্ট থাকলেও ভাষা ও ভাবের সংযম একেবারেই নেই। নারী চিত্তের গোপন রহস্য একান্তই উন্মুক্ত হয়ে গেছে। সেটা আধোমুক্ত থাকলেই মনে হয় পাঠকদের আগ্রহ উদ্রিক্ত করে।

পুষ্পলতা দেবীর নীলিমার অশ্রুতে নীলিমা ও অশ্রু দু'টি চরিত্রই ভাল হয়েছে। "ইন্দিরা" আধুনিক ধরণের মেয়ে, ভাল মন্দর সংমিশ্রণে "ব্রজরাণী", "সুরমা"দেরই ছাঁচে গড়া। তা' একটা কথাই তো আছে;—

"যে-মেয়ে সতীনে পড়ে
ভিন্ন বিধি তারে গড়ে।"

"বিনিময়ে"র নারীচরিত্র দুটীই দুদিক থেকে ত্যাগে পূত ও সমুজ্জ্বল। "মরুতৃষা" ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের একখানি বাছাই করা বই, বর্তমান বাঙ্গালী সমাজের সুন্দর চিত্র। আলেয়ার আলোকে বা মরীচিকায় বিভ্রান্ত তরুণীর তৃষিত জীবনের পরিণাম ফল প্রায়শঃই করুণ রসের মধ্যেই সমাধা হয়। তার ভ্রান্তিবিলাসে অন্যের জীবনে যে ক্ষতি আসে সেইটাই হয় সাংঘাতিক বেশী। এঁর অনেকগুলি ছোটগল্পেও নারী চরিত্রে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সেগুলি নেহাৎ চর্বিত চর্বণ নয়।

আশালতা সিংহের "স্বয়ম্বরা" প্রভৃতি অনেকগুলি বড় উপন্যাস আছে। নারীচরিত্র সর্বত্রই ছায়ানুগভাবে চিত্রিত হয়েছে। আমাদের ঘরোয়া মেয়েদের মধ্যে ভদ্রসংসারে বা সমাজ অনুবর্তী থেকে যতটুকু বিশিষ্টতা অর্জন করা সম্ভব, তাঁর নায়িকারা তার চেষ্টা করেছেন।

আশালতা দেবীর উপন্যাসে বহু, নারীচরিত্রের মধ্যে গতানুগতিকতাই দৃশ্যমান। যা' হয়ে থাকে এবং হওয়াই উচিত তেমনি ভাবেই তাঁরা চলেছেন। অন্ততঃ অদ্ভুত রসের বা বীভৎস রসের অবতারণা করে পাঠককে শিউরে বা চমকে দে'বার সাধনা করেন নি।

বাণী রায় একজন উদীয়মানা লেখিকা; নারীচরিত্রগঠন সম্বন্ধে তাঁর মতটাই এখানে উদ্ধৃত করছি ;—

"* * নারীজীবনে সামাজিকতা ও শিক্ষার অভাব। তার ফলে আজ আমাদের দেশে কোনদিকেই নারী কোন চমকপ্রদ সাফল্যলাভ করতে পেরে উঠছে না, যদিও নবজাগরণের ফলে চেষ্টার কিছু ত্রুটি নেই। অন্ধকার পটভূমিকায় দু'একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র বিচ্ছিন্নভাবে উদিত হলেও তারকাসভা কোথায়? একটী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতে চাহিদা মেটে না, অনেক চাই।" —তবে আমরা বলি, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, সুভাষচন্দ্র বসু বা জওহরলাল নেহেরু অনেক হয় না; এবং দরকারও হয় না, —সেনাপতি এক'জনই হয়, আজ্ঞানুগ সৈন্যদল তৈয়ারী করাই কঠিন। তার জন্যই চাই সামাজিকতা জ্ঞান এবং তার সর্ববিধ শিক্ষা। আজকের শিক্ষায় মেয়েদের একটু ক্ষুদ্র নিজস্ব সংসার চালাবারই সামর্থ্য জন্মে না, সমাজ চালাতে বা রাজনীতি চালাতে কত সংযম, কত ত্যাগ, কত কঠোরতার শিক্ষা পাওয়া দরকার।—

লীলা দেবীর "ধ্রুবা" বাংলাসাহিত্যে পূর্বাপর সৃষ্টীকরা কোমল পেলব সুগন্ধি পুষ্পটীর মতই একটি অনবদ্য সুন্দর রূপচিত্র। কিন্তু এ কথা বল্লে অত্যুক্তি হবে না যে, সেটি একটি রূপককাব্যও বটে। তার মধ্যে ব্যক্ত যতটা হয়েছে, তার চেয়ে বেশী অব্যক্ত আছে;—যেমন রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গে"র দামিনীতে, শরৎচন্দ্রের "বড়দিদি"র মাধবীতে, হেমলতা দেবীর এবং লীলা দেবীরও কতকগুলি ছোট ছোট চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্যের সুরঙ্গমা ও সুদর্শনাতে।

অন্নপূর্ণা গোস্বামীর কয়েকটী ছোট গল্পে ও উপন্যাসে নারী চরিত্রে অত্যাধুনিকতা দোষ দেখা যায়। অনর্থক নারী চিত্রের কথাটি

উন্মোচন করে তার উলঙ্গ চিত্রকে সহস্র লোচনের দ্রষ্টব্য করায় লাভটা কি ?

এখানে দু'জন নূতন লেখিকার নারী চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করি, এক আশাপূর্ণা দেবীরও অপর কাত্যায়নী দেবীর। দু'জনেই হিন্দু সংসারের মধ্য থেকে টেনে এনে বিশিষ্টা নারীদের পাঠকের সম্মুখীন করতে সমর্থ হয়েছেন। যেমন, "বলয়গ্রাসের" মহালক্ষ্মী "হেমাঙ্গিনীর সংসারের" হেমাঙ্গিনী প্রভৃতি।

আধুনিক মুসলিম লেখিকাদের উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র রচনা চোখে পড়েনি, তাঁরা যদি হিন্দুসমাজের চিত্র না এঁকে নিজ সমাজের দু'একটি বাস্তব ছবি আঁকেন, সাহিত্যজগতে হয়ত কিছু নবতর দান দিতে পারেন। গোঁড়া-ভক্ত সম্প্রদায়ের বাইরেও তো বহু আধুনিক শিক্ষিতা মোসলেম নারীর অভ্যুদয় হচ্চে, নিজ সমাজের বহু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কি জন্য তাঁরা লেখনী পরিচালনা করেন না ? "গুণ্ডার" ভয়ে নিশ্চয়ই নয় ? হিন্দু সমাজের মধ্য থেকে সে চেষ্টা করা প্রায় অসম্ভব। যেহেতু "রাবণ" না হ'লে "শ্রীরাম-চরিত্র" ফুটিয়ে তোলা যায় না, এ দিকে,— "রাবণের" স-গোত্রাদি যদি তর্জ্জন করে ওঠেন, "কেন রাবণকে অমন মসিবর্ণে চিত্রিত করা হলো এবং কেন রামকে হলো না ? নিছক এটা সাম্প্রদায়িক অসৎ উদ্দেশ্য।" যদি "বিভীষণে"র উদাহরণ দেখাতে চেষ্টা করা হয়, হয়ত শোনা যাবে ; 'ও ব্যক্তি বিধর্মীর পাদপূজক কাফের, ও নজীর নজীরই নয়।" সেই জন্যই ইচ্ছা করলেও হিন্দুর পক্ষেও দ্বার রুদ্ধ। সকল সমাজই যেমন চিরদিন ধরে করে এসেছে, আজও করছে, অর্থাৎ নিজ সমাজের দোষ গুণের বিচার বিশ্লেষণ করে অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রচেষ্টা,

এ দিনের শিক্ষিতা মোসলেম নারীরা তাই করুন। যেমন ;— বহু বিবাহ, অন্য ধর্মীকে জোর করে বিবাহ করা ইত্যাদি আরও কত বিষয়েই তাঁরাই তাঁদের পতি পুত্র পিতার কার্যফলে ঘরে নির্যাতীতা ও বাইরে নিন্দিতা হন, এ সকলের প্রতিকার প্রচেষ্টার আন্দোলন, সমাজ-সংস্কার জন্য করবার অধিকার তো তাঁদেরই জোর করে হাতে নে'ওয়া উচিত।

পরিশিষ্ট

আমি পৃথিবীর ইতিহাস লিখতে বসিনি, তবে আজ সমস্ত পৃথিবী তার কমলালেবুর উপমাটী চৌচাপটে মাথায় নিয়ে সেই রকম ক্ষুদ্র হয়েই আমাদের হাতের কাছে এসে পড়েছে; দূরে সরে থাকলে বা ঠেলে রাখলেও আজ আর কারো থেকে কা'রো দূরত্ব রক্ষা হচ্ছে না। দেখা যাচ্চে, নির্বিরোধী থাকবো বল্লেও কোন নৃশংস আক্রমণ তার উপর থেকে বন্ধ থাকছে না; "জানি না" বল্লে তখনই প্রশ্ন ওঠে;—"কেন জান না"? "জান্‌তে চাই না" বল্লে আদেশ আসে, "সে বল্লে তো চলবে না, জান্‌তেই হবে।"

বিশ্বসংসার আজ আলোড়িত হয়ে চলেছে, কোথায় এর শেষ? এই খণ্ডপ্রলয়ের পর আবার কবে, কখন, কোথা হ'তে নবসৃষ্টির নূতন ধারা আরম্ভ হবে, অথবা আদৌ হবে কি না, তা' কেউই জানে না। তবে আশা এই যুগে যুগে যা' হয়ে এসেছে, আজও তাই হবে, প্রলয়ের পর সৃষ্টি হয়, যুদ্ধের পর ক্ষণিকের জন্যও একটা সাময়িক শান্তি আসে, সেই সময় সেই যুদ্ধ ক্লান্ত জনগণ আত্মবিনোদনের জন্যও বটে এবং বিগত ব্যাপারটাকে সম্যকরূপে প্রণিধান করে নে'বার জন্যও বটে, সৃষ্টিকার্যে নিরত হয়; তার প্রধান সহায়ক হয় সাহিত্য। এমনি করেই রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ডের সৃষ্টি হয়েছিল; এমনি করেই গত যুদ্ধের পর যুদ্ধমান দেশসমূহে বহু ইতিহাস, উপন্যাস, নাটকাদির সৃষ্টি হয়েছিল। এবারের এই পৃথিবীব্যাপী মহাপ্রলয়ের সূচনা সর্বদেশ ও সর্বজাতিকে প্রায় সমসূত্রে নিবদ্ধ করতে অংশতঃ

সাফল্য লাভ করেছে। তাই মনে হয়, এর অবসানে দু'দিনের হোক, দশদিনেরই হোক, যুদ্ধবিরতির শুভ মুহূর্তগুলিতে সর্বদেশের সাহিত্যসেবী মনীষীদের সঙ্গে একত্র হয়ে নারী-সাহিত্যসেবিকারাও এবার তাঁদের নিজ নিজ প্রত্যক্ষদর্শনের অমূল্য ফলাফলকে বহু পূর্ববর্ত্তীদের মত সার্বজনীন সাহিত্যের রূপদান করে, গদ্যে হোক বা পদ্যে হোক চিরযুগজীবী মহাকাব্য উপন্যাস গান গল্প বা নাটক রচনা দ্বারা সার্থকতা লাভ করবেন। এই যন্ত্রদানবীয় যুগধর্মের অমানুষিকতা, স্বার্থান্ধ নৃশংস লোভীদের আত্মতোষণের জন্য পরশোষণের ;—যার দুর্ভিক্ষ রূপ ভয়াবহ পরিণতি, বর্ত্তমানের জীবিত সাহিত্যিকেরা অদূর অতীতের পূর্ববর্ত্তীদের অপেক্ষা বহুগুণেই চাক্ষুষ দ্রষ্টা হিসাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে অবসর পেয়েছেন। কেবলমাত্র মিথ্যা বিজ্ঞপ্তিত রিপোর্টের মধ্যেই যেন তারা ব্যর্থ হয়ে না যায় ; যুগে যুগে যেমন হয়ে এসেছে, ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের জন্য তাদের মধ্যেও পাপ পুণ্য, ন্যায় নিষ্ঠা, অন্যায় অবিচার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে যেন চিরভবিষ্যতের জন্য আবার মহত্তর সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। আর তার মধ্যে যেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিশক্তি নিয়ে পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সহায়তা করতে পারেন,—স্রষ্ট্রী নারীরাও।

"স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টির" নারীরা যেন তাঁদের পূর্বগৌরবকে চির অক্ষুণ্ণ রেখে দিতে সমর্থ হন।"*

সমাপ্ত

* আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন, স্বাধীন ভারতের নারীদের সৃষ্টিতত্ত্বের মহত্তর দায়ীত্ব গ্রহণ ও তা' বহন করবার দিন সামনে এগিয়ে এসেছে।